সাহিত্য বীক্ষা

নীরেন্দ্রনাথ রায়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

SAHITYA BIKSHA

Nirendranath Ray

Published by West Bengal State Book Board in Collaboration with National Book Agency LTD., Calcutta.

পর্ষদ সংস্করণ

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
আর্য ম্যানসন (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা—৭০০০১৩

মুদ্রক :
সুদীপ প্রিণ্টার্স
শ্রীদুলাল চন্দ্র ভুঞা
৪/১এ, সনাতন শীল লেন
কলিকাতা—৭০০০১২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

প্রচ্ছদ : শ্রীদুর্গা রায়

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of Production of books and literature in regional languages at the University level, launched by the Government of India, the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.



প্রথম সংস্করণের প্রকাশকের কথা

'পরিচয়' পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত ছ'টি প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের পটভূমিকা' প্রবন্ধটি তৎকালীন একটি বিতর্কের জবাবে লেখা, 'শেকসপীয়র প্রসঙ্গে' ও 'মার্কসবাদী বঙ্কিম-বিচার' প্রবন্ধ দুটির আশু উপলক্ষ দুটি গ্রন্থের সমালোচনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রত্যেকটি প্রবন্ধে সাহিত্য-বিচারের এমন সব মূল প্রশ্ন উত্থাপিত ও আলোচিত হয়েছে যার মূল্য সাময়িক নয়। তাছাড়া এই প্রবন্ধ ছ'টির বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন একটি ধারাবাহিকতা আছে এবং বক্তব্যের পরিবেশনের মধ্যে এমন একটি ক্রমসম্পূরকতা আছে যে এগুলি অনায়াসেই একটি গ্রন্থ-সূত্রে গ্রথিত হবার মর্যাদা দাবি করতে পারে। প্রকাশক হিসেবে আমরা এই দাবিকেই মেনে নিয়েছি। এ থেকে যেন এ সিদ্ধান্ত কেউ না করেন যে সাহিত্য-বিচারে মার্কসবাদের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ সম্পর্কে গ্রন্থকারের মতামতকে আমরা সর্বাংশে নির্ভুল ও অবশ্যগ্রাহ্য বলে ঘোষণা করতে চাই। বরং আমরা খুশি হব যদি এই গ্রন্থটি ব্যাপকতর আলোচনার সূত্রপাত করতে পারে এবং সেই উপলক্ষে আমরা এ-ধরনের আরো গ্রন্থ প্রকাশ করবার সুযোগ পাই।

আগস্ট, ১৯৫৫

ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড
কলিকাতা

'পরিচয়'-প্রতিষ্ঠার
সানন্দ স্মৃতিতে

সূচীপত্র

*প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবিত্ব

বাংলার সাহিত্যপঞ্জীতে পঁচিশে বৈশাখ আপন মহিমায় স্থিত। ঐ তারিখে ১২৬৮ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে যে শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তাহার নামকরণে আছে একদিকে নূতনত্বের অ-পূর্বতা—ইহার পূর্বে কোন শিশুর নাম রবীন্দ্র-নাথ ছিল বলিয়া জানা নাই ; অন্যদিকে আছে ভাবীজীবনের নির্দেশ—বাঙলা সংস্কৃতির কোন্ প্রদেশ এই শিশুর প্রতিভার বিকাশে প্রোজ্জ্বল হইয়া ওঠে নাই ?

সাহিত্যিক তাৎপর্যের দিক দিয়া আর-একটি তারিখও আমাদের অক্ষয় আনন্দের স্মৃতি দাবি করিতে পারে, পঁচিশে বৈশাখের পরিপূরক হিসাবে। সে তারিখ ১৩ই নভেম্বর ১৯১৩, যে দিন এই বার্তা বিদ্যুৎ-গতিতে বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িল যে বিগত বৎসরের নোবেল সাহিত্য-পুরস্কার অর্জন করিয়াছেন একজন বাঙালী কবি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙালী পাঠক, এমন কি অতি সতর্ক পাঠকও, ইহার পূর্বে নোবেল প্রাইজ লইয়া মাথা ঘামাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। বাঙালীর পরিচিত যে ইংরেজ লেখকের ভাগ্যে ইতিপূর্বে এই পুরস্কার-লাভ ঘটিয়াছিল তাহাতে এদেশে কাহারো উৎসাহিত হইবার কারণ না থাকারই কথা। তাই রবীন্দ্রনাথের গৌরবে যে দেশময় উদ্দীপনার সৃষ্টি হইবে তাহা কল্পনা করা কঠিন নয়।

বাঙলাদেশের বাহিরে, বিশেষ করিয়া ইউরোপের সংস্কৃতিসমৃদ্ধ দেশগুলিতে ইহা লইয়া বিস্ময় এমনকি ক্ষোভেরও সঞ্চার কম হয় নাই। বারবার এই কথা ধ্বনিত হইতে লাগিল, একজন এশিয়াবাসীর পক্ষে এই সাফল্য অভূতপূর্ব; এ যেন ইউরোপের সাংস্কৃতিক একাধিপত্যের বিরুদ্ধে অবদমিত এশিয়ার প্রথম চমকপ্রদ বিজয়, আগামী কালের ইতিহাসের গতির এক গূঢ় সম্ভাবনাপূর্ণ সংকেত।

ইহা সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হইবে বাঙলাদেশে বাঙালী কবির প্রতিষ্ঠা যদি একান্তভাবে নির্ভর করিত বিদেশী সম্মানের উপর, তাহা হইলে কবির পক্ষে ইহা কম বিষাদ বা ক্ষোভের কারণ হইত না। রবীন্দ্রনাথকে বলা যাইতে পারে প্রায় শৈশব হইতে বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক। তিনিও ছিলেন, মৎসার্ট-এর মতো, 'শিশু-বিস্ময়'। মাইকেল ও বঙ্কিমের মতো পরিণত বয়সে ইংরাজি রচনার মোহ কাটাইয়া তিনি মাতৃভাষার পূজাপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন নাই। প্রথম যৌবন হইতেই তিনি স্বগৃহে ও সুধীসমাজে যে সমাদর পাইয়াছেন তাহার তুলনাও সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল। পঞ্চাশৎ-বর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে কোনো কবির সম্মাননা ইহার পূর্বে বাঙলাদেশে কখনও ঘটে নাই। এই 'জাতীয় ত্রুটি' সংশোধনের উদ্দেশ্যে দেশের প্রতিভূস্বরূপ হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা ও অভিনন্দন জানাইতে রামেন্দ্রসুন্দরের কর্মকুশলতায় যে শোভন-সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সগর্বে স্মরণ করিতে হইবে তাহা নোবেল পুরস্কারের বৎসরাধিক পূর্বে। অভিনন্দন-পত্রে লিখিত ছিলঃ "তোমার পূর্বগামিগণের স্নিগ্ধ নেত্র তোমাকে বর্ধিত করিল, অনুগামিগণের মুগ্ধ নেত্র তোমাকে পুরস্কৃত করিল, বাগ্দেবতার স্মেরাননের শুভ্র জ্যোতি তোমার ললাটদেশে প্রতিফলিত হইল।" আর এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে রচিত এক কবিতায় তখনকার তরুণ-কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেনঃ

জগৎ-কবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব
বাঙালি আজি গানের রাজা, বাঙালি নহে খর্ব।
দর্ভ তব আসনখানি
অতুল বলি লইবে মানি
হে গুণী! তব প্রতিভা-গুণে জগৎ-কবি সর্ব।

নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্তিতে বাঙালী কবির প্রতিভা-গুণের বিশ্বজনীন স্বীকৃতি প্রকাশ পাইল। বাঙলা সাহিত্যও যে আঞ্চলিকতার স্তর হইতে উন্নীত

হইয়া বিশ্বব্যাপী ভাবধারার অঙ্গীভূত হইতে পারিয়াছিল, তাহার কারণ বাঙলাদেশেই সূচিত হইয়াছিল সেই অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক আলোড়ন, যাহা ছিল, মার্কস্-এর মতে, 'এশিয়ার একমাত্র সমাজবিপ্লব'।

॥ দুই ॥

"জীবন-শিখা যখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তখন টগ্‌বগ্ করিয়া সমস্ত মানবচরিত্র ফুটিতে থাকে, তখন নবনব বিস্ময়জনক বৈচিত্র্যের আর সীমা থাকে না। সাহিত্য সেই পরিবর্তমান মানবজগতের চঞ্চল প্রতিবিম্ব'। (পঞ্চভূত)। রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির সংক্ষিপ্ত গভীরতা উপলব্ধি করিতে পারা যায় ইউরোপীয় সাহিত্যে যাহাকে বলা হয় রেনেসাঁস তাহার উদ্ভবের কথা মনে রাখিলে। রেনেসাঁস ইউরোপে বুর্জোয়া-বিপ্লবের সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশ। মানবসভ্যতার ইতিহাসে ইহা এক বিস্ময়কর অগ্রগতি। ইহার ভুঙ্গবিন্দু ইতালির চিত্রভাস্কর্যস্থাপত্যে, ও ইংলণ্ডের এলিজাবেথীয় সাহিত্যে। এলিজাবেথীয় পর্বে চলিতেছিল এক গভীর সামাজিক দ্বন্দ্ব; একদিকে প্রাচীন ফিউডাল ভূস্বামী শ্রেণী, অন্যদিকে নব-উদ্ভূত বণিকশ্রেণী, যাহারা গ্রাম ভাঙিয়া শহর গড়িতেছিল, আর দেশে দেশে বিশ্বব্যাপী বহির্বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত করিতেছিল। এই সামাজিক আলোড়নের দুর্বার আবেগ এলিজাবেথীয় সাহিত্যে বলিষ্ঠ কল্পনায় রূপায়িত হইয়া আছে।

বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রকৃতিই হইতেছে পরিবর্তনশীলতা। "বুর্জোয়া-শ্রেণী বাঁচিতেই পারে না যদি সে ক্রমাগত উৎপাদনের উপায়গুলিকে বৈপ্লবিকভাবে পরিবর্তিত না করে, যাহাতে উৎপাদন-সম্বন্ধ ও সামাজিক সকল সম্বন্ধেরই বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। অপরপক্ষে, পুরাতন উৎপাদন-পদ্ধতিকে অপরিবর্তিত ভাবে রক্ষণ করাই ছিল পূর্বতন শ্রমজীবী শ্রেণীর অস্তিত্বের প্রথম শর্ত। প্রাচীনতর সকল যুগের সহিত বুর্জোয়া যুগের পার্থক্য চিহ্নিত হয় উৎপাদনের অবিরাম বিপ্লবীকরণে, সমস্ত সামাজিক অবস্থার অবিচ্ছিন্ন আলোড়ন, চিরন্তন অনিশ্চয়তায় ও আন্দোলনে। সমস্ত নিশ্চল জমাটবাঁধা সামাজিক সম্বন্ধ, তাহার অনুবর্তী সকল সনাতন ও শাস্ত্রপূতসংস্কার ও সিদ্ধান্ত বিতাড়িত হয়, এমন কি নবসৃষ্ট সংস্কার ও সিদ্ধান্তও প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই অচল হইয়া পড়ে। যাহা কিছু ভাব-ঘন গলিয়া বাষ্প হয়, যাহা কিছু পবিত্র তাহা হয় কলঙ্কিত, এবং মানুষ অবশেষে বাধ্য হয় বিনা ভাবাবেগে তাহার জীবনের বাস্তব অবস্থার, ও পরস্পরের সম্বন্ধের সম্মুখীন হইতে।" (মার্কস্ ও এঙ্গেলস্)

বুর্জোয়া সাহিত্য এই বিপ্লবী অবস্থার প্রসূত ফল, ও ইহাকে প্রতিবিম্বিত করাই তাহার উপজীব্য। ইহার ফলে ইয়োরোপীয় সাহিত্য যে নবজন্ম লাভ করিল, তাহার বিশিষ্ট লক্ষণগুলি সাহিত্যের ছাত্রমাত্রেরই জানার কথা। তাই সংক্ষেপে বলা যায়, এই নূতন চেতনার মূল সুর দুইটি—চিন্তার মুক্তি, ও ঐহিকতা। একটু ভাবিলে দেখা যায়, বিজ্ঞান-সাধনার মূলেও এই দুই সুর ধ্বনিত। অর্থাৎ সাহিত্য ও বিজ্ঞান একই সামাজিক আলোড়নের গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, সহোদর ভাই-এর মতো, রূপে বিভিন্ন হইলেও রক্তগত সম্পর্কে সংবদ্ধ। শেকসপীয়র ও বেকন যে সমকালীন তাহা আকস্মিক নহে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সন্ধ্যাসংগীতের যুগেই জানিতেন, বৈজ্ঞানিক সাধনার মধ্যে কল্পনা আছে, কাল্পনিকতা নাই। মনের এই প্রসার আছে বলিয়া ইয়োরোপীয়রা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি। "যে দেশে শেকসপীয়র জন্মিয়াছে, সেই দেশেই নিউটন জন্মিয়াছে, যে দেশেই অত্যন্ত বিজ্ঞান-দর্শনের চর্চা সেই দেশেই অত্যন্ত কাব্যের প্রাদুর্ভাব। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, কল্পনার কাজ কেবলমাত্র কবিতা সৃজন করা নয়।" (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড)। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এই নূতন ভাবাদর্শ বুর্জোয়া আন্দোলনের বিশ্বব্যাপী প্রসারের ফলে ভারতেও আসিয়া পৌঁছিল ব্রিটিশ বণিকের অভ্যাগমে, ও বাঙলার মাটিতে তাহার মূল প্রোথিত হইল ব্রিটিশ রাজের প্রতিষ্ঠায়। বাঙলায় রামমোহন হইতে রবীন্দ্রযুগের সংস্কৃতিসাধনা এই বিদেশাগত বৃক্ষের এদেশীয় ফুল-ফল; একই জীনাস-এর স্পীশিজ।

॥ তিন ॥

"বর্তমান যুগে য়ুরোপ সর্ববিধ বিদ্যায় ও সর্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারিদিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। এই প্রভাবের প্রেরণায় য়ুরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিত্তজাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা অবিমিশ্র মূঢ়তা! য়ুরোপ যে-কোন সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। কিন্তু সেই অধিকারের আত্মশক্তির দ্বারাই প্রমাণ করতে হয়—তাকে স্বকীয় করে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চাই। আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্য, য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাঙলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা।···তাই বলি, সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন তোলা না হয়।" (সাহিত্যের পথে)।

রবীন্দ্রনাথের এই অভিমতের সত্যতা মানিয়া লওয়াও আমাদের মনে রাখা দরকার ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রভাব আমাদের দেশে আসিয়া পেঁছায় নাই স্বাভাবিক বিকাশের নিয়মানুসারে, তাহা আসিল ইংলণ্ডের রাষ্ট্রশক্তির দুর্নিবার ধনলিপ্সার, নিরঙ্কুশ পররাজ্য-গ্রাসিতার সহায়ক হিসাবে, পরাধীনতার অভিশাপ বহন করিয়া। রবীন্দ্রনাথ নিজেও পরে বুঝিয়াছিলেন, "পশ্চিম পূর্বদেশে কোন রঙিন কল্পনা, কোনো আদর্শবাদের মোহ লইয়া উপস্থিত হয় নাই ; যে-সমবেদনা সৃষ্টি করে, সংযোগ সাধন করে, তাহা লইয়া সে আসে নাই। সে পূর্বদেশে আসিয়াছে রিপুর আক্রোশে, লোভের তাড়নায়। পশ্চিম প্রাচ্যে গুরুর ন্যায় আসিতে পারিত ; কিন্তু সে আসিল প্রভুত্ব করিতে, ব্যক্তি ও জাতিকে দাসত্বে বন্ধন করিতে।" (রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড)। বাঙলায় তথা ভারতে তাই বুর্জোয়া সামাজিক বিপ্লবের ভিত্তি অতি শিথিল, বিস্তার বিলম্বিত ও খণ্ডিত। সেই কারণে তাহার সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিও সামূহিক সম্ভাবনার তুলনায় ক্ষীণ-প্রাণ ও স্তিমিত-জ্যোতি। জাতি হিসাবে এ দেশে যে প্রগতি হইতে পারিত তাহা হয় নাই, যাহা হইয়াছে তাহা স্বল্পসংখ্যক ব্যক্তির তীক্ষ্ন বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও সৃজন-কুশলতার পুরস্কার। নিদারুণ সীমাবদ্ধতার বাধা সত্ত্বেও নূতন বঙ্গসাহিত্যের পত্তন করিলেন প্রধানত মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের অনুগামী হইয়াও তাঁহাদের কীর্তিকে ছাড়াইয়া গেলেন। ইহা একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিচয় অন্যদিকে তেমনিই বাঙালীর জাতীয় জীবনের বিকাশেরও পরিচয়। নবজাগ্রত বাঙলার জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণ বাণীরূপ বলিয়াই রবীন্দ্রকাব্য বিশ্ববন্দিত, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি।

॥ চার ॥

"অনেকদিন থেকেই লিখে আসছি, জীবনের নানা পর্বে নানা অবস্থায়। শুরু করেছি কাঁচা বয়সে—তখনও নিজেকে বুঝিনি। তাই আমার লেখার মধ্যে বাহুল্য এবং বর্জনীয় জিনিস ভূরি ভূরি আছে তাতে সন্দেহ নেই। এ-সমস্ত আবর্জনা বাদ দিয়ে বাকি যা থাকে আশা করি এই ঘোষণাটি স্পষ্ট যে, আমি ভালবেসেছি এই জগৎকে, আমি প্রণাম করেছি মহৎকে ! আমি কামনা করেছি মুক্তিকে, যে মুক্তি পরমপুরুষের কাছে আত্মনিবেদনে ; আমি বিশ্বাস করেছি মানুষের সত্য মহামানবের মধ্যে, যিনি সদা জনানাং হৃদয়ে

সন্নিবিষ্টঃ। আমি আবাল্য-অভ্যস্ত ঐকান্তিক সাহিত্যসাধনার গণ্ডীকে অতিক্রম করে একদা সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য আমার কর্মের অর্ঘ্য আমার ত্যাগের নৈবেদ্য আহরণ করেছি—তাতে বাইরের থেকে যদি বাধা পেয়ে থাকি অন্তরের থেকে পেয়েছি প্রসাদ। আমি এসেছি এই ধরণীর মহাতীর্থে—এখানে সর্বদেশ সর্বজাতি ও সর্বকালের ইতিহাসের মহাকেন্দ্রে আছেন নরদেবতা,—তাঁরি বেদীমূলে নিভৃতে বসে আমার অহংকার আমার ভেদবুদ্ধি ক্ষালন করার দুঃসাধ্য চেষ্টায় আজও প্রবৃত্ত আছি।" (রবীন্দ্ররচনাবলী, অবতরণিকা)

সত্তর বৎসর বয়সে নিজের সুদীর্ঘ সাহিত্যসাধনার দিকে ফিরিয়া তাকাইয়া তিনি যে 'ঘোষণাটি' করিয়াছেন তাহাকে বলা যাইতে পারে ইয়োরোপীয় মানবিকতাবাদের ভারতীয় সংস্করণ। ইহার প্রকাশভঙ্গীতে আছে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রচার, ইহার বক্তব্য ইয়োরোপীয় রেনেসাঁস-এর মর্ম-কথার একান্ত অনুরূপ। মধ্যযুগীয় পরলোকস্পৃহাকে পরিহার করিয়া ইহজগতের সম্বন্ধে সাগ্রহ বিস্ময়বোধ বুর্জোয়া সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার সমর্থন পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথে—"আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনও তাতে ক্লান্ত হোল না, বিস্ময়ের অন্ত পাইনি।" 'নিত্যসত্য সনাতন এক'-এ অধ্যাত্মবাদী বিশ্বাস তাঁহার ছিল, কিন্তু কবি-হিসাবে তাঁহাকে যে উপলব্ধি সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করিয়াছে তাহা হইতেছে বিচিত্রের সংবেদনা। "এই সত্তর বৎসর নানা পথ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, আজ আর আমার সংশয় নেই, আমি চঞ্চলের লীলা-সহচর।" নিজের কবি-জীবনকে তিনি কী মূল্য দিতেন তাহা বুঝিতে পারা যায় যখন পড়ি,—"নানাখানা করে নিজেকে দেখেছি, নানা কাজে নিজেকে প্রবর্তিত করেছি, ক্ষণে ক্ষণে তাতে আপনার অভিজ্ঞান আপনার কাছে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জীবনের এই দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "জীবনে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে অনেক অনেক মিথ্যাচরণ করা যায় কিন্তু কবিতায় কখনো মিথ্যা কথা বলিনে—সেই আমার জীবনের সমস্ত গভীর সত্যের একমাত্র আশ্রয়স্থান।" (রবীন্দ্র-জীবনী ১ম খণ্ড।) কবিতা ছিল, তাঁহার মতে, তাঁহার জীবন-দেবতার পূজা। "যিনি আমার সমস্ত ভালোমন্দ,

আমার সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল উপকরণ লইয়া আমার জীবনকে রচনা করিয়া চলিয়াছিলেন তাঁহাকেই আমার কাব্যে আমি 'জীবন-দেবতা' নাম দিয়াছি।" (আত্মপরিচয়)। এই জীবন-দেবতা কাব্যরচনায় কবিকে কি ভাবে পরিচালিত করিতেন ? "যখন যেটা লিখিতেছিলাম তখন সেইটেকেই পরিণাম বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। এইজন্য সেইটুকু সমাধা করার কাজেই অনেক যত্ন ও অনেক আনন্দ আকর্ষণ করিয়াছে। আমিই তাহা লিখিতেছি এবং একটা কোনো বিশেষ ভাব অবলম্বন করিয়া লিখিতেছি এ সম্বন্ধেও সন্দেহ ঘটে নাই। কিন্তু আজ জানিয়াছি, সে সকল লেখা উপলক্ষ্য মাত্র, তাহারা যে অনাগতকে গড়িয়া তুলিতেছে, সেই অনাগতকে তাহারা চেনেও না। তাহাদের রচয়িতার মধ্যে আর একজন কে রচনাকারী আছেন, যাঁহার সম্মুখে সেই ভাবী তাৎপর্য প্রত্যক্ষ বর্তমান।" (আত্মপরিচয়)। পড়িতে পড়িতে অনিবার্যভাবে স্মরণে আসে শেলী-র কথা, "The Poet not only beholds intensely the present as it is, and discovers those laws according to which present things ought to be ordered, but he beholds the future in the present and his thoughts are the germs of the flower and fruit of latest time...A Poet participates in the eternal, the infinite and the one" (A Defence of Poetry).

॥ পাঁচ ॥

নিরীশ্বরবাদী শেলী-র সহিত ব্রহ্মবাদী রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির সৃজন পদ্ধতি সম্বন্ধে এই মত-সাদৃশ্যের ঐতিহাসিক কারণ আছে। ইংরেজি কাব্য-সাহিত্যের সহিত রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত পরিচয় ছিল। কিন্তু তাঁহার আত্মিক যোগ ছিল এলিজাবেথীয় যুগের সহিত নহে, রোমান্টিক যুগের সহিত। ইংরেজি রোমান্টিক কাব্য-সাহিত্য বুর্জোয়া মানবিক ভাবধারার একটি বিশিষ্ট পর্ব, ফরাসী বিপ্লবের উন্মাদনার সহিত ইহার যোগ প্রত্যক্ষ। বলা যাইতে পারে ব্লেক-বার্নস্-এ ইহার সূচনা এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজ হইয়া বায়রন-শেলী-কীটস্-এ ইহার পরিণতি। কবি হিসাবে ইহাদের প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, অথচ যুগ-কবি হিসাবে ইঁহাদের রচনা একটি ভাবমণ্ডলের পরিধিতে বেষ্টিত। ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, জাতি-চেতনা ও মানবপ্রীতির উদার স্বপ্ন—ইঁহাদের কাব্য-রচনাকে নিয়ন্ত্রিত করিত, কারণ ফরাসী বিপ্লবের দার্শনিক অভিযানে এই

প্রত্যয়গুলির উপর পড়িয়াছিল প্রচণ্ড জোর। ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে ইঁহাদের প্রত্যেকের রচনাবলী ভ্রমাতীতভাবে স্বকীয়; ভাষা, ছন্দ, উপমা ও ইমেজ ব্যবহার একান্ত আপনার। জাতিচেতনার কবি হিসাবে ইঁহারা প্রত্যেকেই সমগ্র জাতির মুখপাত্র হইতে চেষ্টা করিতেন, শ্রেণীবিশেষের নহে। তাই সমগ্র জাতির হিতার্থে শ্রেণীবিশেষকে সমালোচনা করিতে ইঁহাদের বাধে নাই। ইংলণ্ডের বিখ্যাত রোমাণ্টিক কবিরা সমাজের একই শ্রেণীতে জন্মান নাই। তবুও তাঁহাদের সামাজিক ন্যায়-অন্যায় বোধে মিল ছিল অনেকখানি। আমাদের মনে রাখা দরকার, যে বিপ্লবী চেতনা সমাজকে অগ্রগামী করে তাহাতে কোন শ্রেণীবিশেষের জন্মগত অধিকার নাই, তাহার বিচার হয় বাস্তব কর্মের কষ্টিপাথরে। জমিদার রবীন্দ্রনাথের পক্ষে 'দুই বিঘা জমি' রচনা করা এই জন্যই হয় সম্ভব। আর মানবজাতির ভাবী-কাল সম্বন্ধে ইঁহাদের প্রত্যেকের ছিল স্বপ্ন, সেই স্বপ্নের আলোকে ইঁহারা বিচার করিতেন বর্তমানকে; সেই স্বপ্নের সাফল্যের সম্ভাবনা দেখিলে বর্তমান হইত সুষমামণ্ডিত, অন্যথায় তাহার কদর্যতা ডাকিয়া আনিত বিষাদ হতাশা অথবা ব্যঙ্গ। এই স্বপ্নই ছিল তাহাদের নিকট প্রকৃত সত্য, এবং সত্যকে বাদ দিয়া সুন্দরের অস্তিত্ব তাঁহাদের নিকট অর্থহীন। যে সমাজ আত্মতৃপ্ত, সে সমাজে এই রোমাণ্টিক কবিদের স্থান নাই, কারণ সে সমাজে সুন্দরের স্বপ্ন দেখিবার বাস্তব ভিত্তি অবলুপ্ত। কিন্তু যে সমাজে আছে অতৃপ্তি, আছে আকাঙ্ক্ষা, আছে বর্তমানকে ভাঙিয়া অন্তরের কামনার অনুরূপ করিয়া গড়িবার স্পৃহা, রোমাণ্টিক কবিরা সেইখানেই পান তাঁহাদের সম্মানের আসন। তাঁহারা আসেন এই সামাজিক অতৃপ্তির প্রতিকার করিতে; ফোটাইয়া তোলেন এমন এক ভবিষ্যতের আদর্শ যাহাকে বর্তমানের অসুন্দর পীড়িত করিতে পারে না; জাগাইয়া তোলেন কর্মানুপ্রেরণা এই বৃহৎ-সুন্দরকে বাস্তব সত্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে। কীটস-এর বিখ্যাত উক্তি "Beauty is truth, truth beauty" রোমাণ্টিক কাব্যের অন্যতম মূলমন্ত্র। তবুও ইহার প্রকৃত ব্যাখ্যা কী হইবে তাহা লইয়া আজিও সমালোচক মহলে মতভেদের অন্ত নাই। কিন্তু সত্য ও সুন্দরের সম্বন্ধ লইয়া মার্কস্-এঙ্গেলস্-এর সমকালীন রুশ দার্শনিক চেরনিশিয়েভস্কি যেভাবে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে এই সমস্যার একটা সমাধান পাওয়া যায়। চেরনিশিয়েভস্কি বলেন,—Beautiful is that being in which we see life as it should be according to our conception; beautiful is

the object which expresses life, or reminds us of life. *** By real life we mean not only man's relation to the objects and beings of objective world, but also his inner life. Sometimes a man lives in a dream,—in that case the dream has for him (to a certain degree and for a certain time) the significance of something objective. Still more often a man lives in the world of his emotions; these states, if they become interesting, are also reproduced by art. Art takes for its subject everything that can interest man. এই দিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে কীটস্-এর বক্তব্যের মর্ম দাঁড়ায় এই ঃ বর্তমানে যাহাকে সত্য বলিয়া দেখিতেছি তাহা সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান না-ও হইতে পারে, কিন্তু চিরন্তনের দৃষ্টি দিয়া দেখিয়া কবি তাহাতে ভবিষ্যৎ সুষমা আবিষ্কার করিতে পারেন, আর যাহাকে কবি চিরন্তন সুন্দর বলিয়া ভাবেন, তাহা বর্তমানের কদর্যতাকে শোধন করিয়া না লইলে আপনাকে সার্থক করিতে পারে না। কবি-প্রকৃতির এই বর্ণনার সহিত শেলীর ও রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত বর্ণনার সগোত্রত্ব খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন নহে। শেলী-কীটস্ এর মতো রবীন্দ্রনাথও জন্মিয়াছিলেন এক সামাজিক পরিবেশে যেখানে বুর্জোয়া মানবিকতার প্রথম উল্লাসের যুগ কাটিয়া গিয়া (পরাধীন দেশে তাহা কোনদিনই স্ফীতবক্ষ হইতে পারে না) উত্তরোত্তর বাড়িতেছিল অতৃপ্তি ও অশান্তি, উন্মোচিত হইতেছিল স্বাধীনতার স্পৃহা, জাগিতেছিল কর্মোদ্যমের প্রেরণা ও সৃষ্টি করিতেছিল সুন্দরের স্বপ্ন।

॥ ছয় ॥

নিজের সম্বন্ধে পরিহাস-ছলে রবীন্দ্রনাথ একসময়ে লিখিয়াছিলেন, 'আমি জন্ম-রোমান্টিক'। যেন রোমান্টিকতার সহিত বাস্তবতার আছে আত্যন্তিক বিরোধ। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ইংলণ্ডে বা ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে যেখানে যখন রোমান্টিক কবিতার আবির্ভাব হইয়াছে সেখানকার সামাজিক সংস্থান-ই ছিল রোমান্টিকতার উদ্ভব-ক্ষেত্র। যে বাঙলাদেশে জন্মিয়া রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রসিদ্ধি, সেখানেও রোমান্টিকতার আবির্ভাবের উদ্যোগপর্ব চলিতেছিল বলিয়াই রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক। রোমান্টিকতার দুটি প্রকার—পজিটিভ ও নেগেটিভ। গোর্কি দেখাইয়াছেন

পজিটিভ রোমান্টিকতা বস্তুনিষ্ঠ, কারণ, তাহা বাস্তবকে অন্তরঙ্গভাবে দেখিতে শেখায় কল্পনার আলোকে, এবং বাস্তবে যাহা কিছু যুক্তি-অসিদ্ধ তাহার সহিত সংগ্রামের অনুপ্রেরণা যোগায়, আদর্শ-সুন্দরের মহিমাগানে। কিন্তু রোমান্টিক কবিরা যে সর্বদা সচেতনভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিপ্লবী কবিতা রচনা করিতে বসেন, এ ধারণা সত্য নহে। রোমান্টিক কবিতার প্রথম লক্ষণ, দেখা গিয়াছে, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ কবির একান্তভাবে আত্মপ্রকাশের তাগিদ। রোমান্টিক কবি সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকে নিজের চোখে দেখিতে চান, তাই রোমান্টিক কবিতায় প্রকৃতিবর্ণনায় এত গুরুত্ব ও এত বৈচিত্র্য। এ বৈচিত্র্য ও গুরুত্ব শিল্পসৃষ্টিতে চিরদিন ছিল না, ইহাও সামাজিক বিবর্তনের ফল: প্লেহানভ লিখিয়াছেন ঃ Landscape holds a far more permanent place in the history of painting. Michelangelo and his contemporaries despised it. It did not begin to flourish in Italy until the period of decline at the very end of the Renaissance. Neither did the French artists of the 17th and even the 18th centuries attach any independent significance to it. In the 19th century the position changed markedly. Landscape began to be valued for its own sake. Why was this ? Because French social relationships had changed and consequenly the psychology of the French hed changed. Thus man's impressions of nature differ in various epochs of his social development, since in each he views it from a different standpoint.—(Art & Social Life.) রবীন্দ্রনাথের মতে, "আদিযুগের মানুষের কাছে বিশ্বপ্রকৃতি যা ছিল আমাদের কাছে তা নেই। প্রকৃতিকে আমরা মানবভাবের যতই অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি আমাদের মনের পরিণতিও ততই বিস্তার ও বিশেষত্ব লাভ করেছে।" (সাহিত্যের পথে)। পৃথিবীর নরনারীর সহিত রোমান্টিক কবিরা আপন অন্তরের সম্পর্ক পাতাইতে চান, তাই রোমান্টিক কবিতা মূলত মানবীয় প্রেমের কবিতা ঃ "আমার প্রধান কথাটা এই—সাহিত্যের জগৎ মানেই হচ্ছে মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্মিলিত জগৎ।……সাহিত্যে, প্রকৃতিবর্ণনা করেই হোক, আর মনুষ্যচরিত্র গঠিত করেই হোক, মানুষকে প্রকাশ করতে হয়, আর সমস্ত উপলক্ষ্য।" (সাহিত্যের পথে)।

আর প্রকাশভঙ্গীতে রোমান্টিক কবি সর্বদা অনন্যসাধারণ হইতে সচেষ্ট, তাই রোমান্টিক কবিতায় এত রকমের উদ্ভাবনা—ভাষায়, ছন্দে, স্তবকগঠনে, শ্রুতিসূক্ষ্মতায়। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বল্পকালস্থায়ী শিক্ষার্থীর পালা শেষ করিয়াই এই আত্মপ্রকাশের পথে অগ্রসর হন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে বাঙলা লিরিক-এর প্রধান সৃষ্টিকর্তা। আত্মপ্রকাশ জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কাল্পনিকতার আতিশয্য উদ্ভটত্বে পর্যবসিত হয়, বক্তব্যে স্পষ্টতা থাকে না, ইমেজ দৃঢ় হয় না, 'অনন্ত' 'অসীম' প্রভৃতি আড়ম্বর-পূর্ণ শব্দের ছড়াছড়িতে কবিতা ভারাক্রান্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের কবিতায়—শেলী ও কীটস্-এর ন্যায়—এই বাক্-বাহুল্যের ত্রুটি ছিল; তাই পরে তিনি ইহাদের পরিত্যাগ করিতে চান, কারণ সেগুলি ছিল 'অপরিণত মনের প্রকাশ অপরিণত ভাষায়।' কিন্তু এই অপরিণত বয়সেও রবীন্দ্রনাথ এমন কবিতা লিখতে পারিয়াছেন যাহার স্থায়ী সাহিত্যিক মূল্য অস্বীকার করা যায় না। যেমন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' ও 'রাহুর প্রেম'। 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলিতে যে দেহবিলাস ও ইন্দ্রিয়গ্রাহিতার বর্ণনা আছে তাহা সর্বত্র "কবিতার রূপ" (রবীন্দ্রনাথ) না পাইলেও, মধ্যযুগীয় ইহ-বিমুখীনতার বিরুদ্ধে ঐহিকতার প্রতিবাদ হিসাবে নূতন বস্তুবাদী চেতনার বিস্তারে সহায়তা করিয়াছিল। এই ধরনের কবিতা প্রাচীনপন্থীদের পছন্দমতো না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথকে লইয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপের যে ব্যবস্থা হয়, 'মিঠেকড়া'র প্রকাশ তাহারই প্রমাণ। এ ঘটনা রোমান্টিক সাহিত্যের ইতিহাসে অজ্ঞাত নহে, ইংলণ্ডে বায়রন-শেলী-কীটস্‌কেও উদীয়মান কবি হিসাবে কম লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় নাই। এ অবস্থার প্রতিকার হয়, নূতন চেতনাকে বলিষ্ঠতর রূপ দিতে পারায়। রবীন্দ্রনাথেরও সেই পথ, 'মানসী' হইতে তাঁহার জয়যাত্রা অবধারিত। এই কবিতাগুচ্ছে অধিকাংশই আত্মকেন্দ্রিত লিরিক, কিন্তু নিছক আত্ম-উপভোগের কাহিনী নহে। প্রকৃতির বর্ণনায় সজাগ পর্যবেক্ষণে, নরনারীর মনোজগতের সাবেগ সংবেদনে ইহারা নূতন চেতনার রূপদক্ষ প্রকাশ। রোমান্টিক কবিরা প্রকৃতির অনুশীলন করেন বৈজ্ঞানিকেরই মতো নিষ্ঠার সহিত। নারী সম্বন্ধে নূতন চেতনা নূতন সামাজিক আলোড়নের পরিচায়ক। "ইতিহাসের কথা যাহারা কোন কিছু জানে তাহারাই জানে যে বৃহৎ সামাজিক পরিবর্তন অসম্ভব নারী-সম্পর্কিত উদ্দীপনা ব্যতিরেকে। সামাজিক উন্নতি ঠিকমতো মাপিতে পারা যায় সমাজে নারীর কোন্ স্থান তাহারই মাপকাঠিতে,

অবশ্য কুরূপাকেও বাদ না দিয়া।" (মার্কস্)। রবীন্দ্র কাব্যে যে কুরূপারও স্থান আছে তাহার নিদর্শন, 'মানসী'র-'গুপ্তপ্রেম'—'তবে পরাণে ভালোবাসা কেন গো দিলে, রূপ না দিলে যদি বিধি হে', ও রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার নারী-সুলভ রূপহীনতা। কবিতায় নূতন চেতনার আবির্ভাব হইলে তাহা খোঁজে নূতন উপযুক্ত আধার। 'মানসী'-তে কবির নূতন চেতনা বিচ্ছুরিত হইয়াছে অভাবিত-পূর্ব ছন্দ-নৈপুণ্যে। মধুসূদনের বিপ্লবী কীর্তির পর বাংলা কবিতা এই নূতন কবির প্রতিভায় নূতন স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন করিয়া নূতন রূপের ছটায় বাঙালী পাঠককে বিমুগ্ধ করিল। 'মানসী'-তে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের পরিমাপ করা বিদেশী পাঠকের পক্ষে খুবই কঠিন যদি না তিনি বাঙলা ধ্বনি ব্যঞ্জনার ক্রম-বিকাশকে ঐতিহাসিকভাবে অধ্যয়ন করেন, যেমন করিয়াছেন লেগুই ও কাজামিয়া ইংরেজি সাহিত্যের, অথবা যেমন করেন নাই রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ চরিতকার রেভারেণ্ড টমসন। ইংরেজি সাহিত্যের যে পর্বে রোমাণ্টিকতার প্রচলন তাহাতে পশ্চাতে ছিল বুর্জোয়া মানবিকতাবাদের প্রভাবে ইংরেজি ভাষার অতুলনীয় উৎকর্ষ। শেলী ও কীটস্ ছিলেন এক বিরাট ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানকে অমান্য না করিয়াও বলা যায়, সে তুলনায় রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী ছিল স্বল্প-সম্বল। পুশকিনকে, রবীন্দ্রনাথের মতো, রুশভাষার এক অনগ্রসর স্তর অবলম্বন করিয়া রোমাণ্টিকতা প্রবর্তন করিতে হয়। তাই তাঁহার প্রধান কাব্য-গ্রন্থ 'ইয়েভগেনি আনিয়েগিন' বায়রনের 'ডনজুয়ান' দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় অনেক সমালোচক তাঁহাকে বলিতেন, 'রুশিয়ার বায়রন'। রবীন্দ্রনাথকে যে তখন 'বাঙলার শেলী' বলা হইত অনুকরণপ্রিয়তাই তাহার একমাত্র ব্যাখ্যা নহে, বাংলাভাষায় রোমাণ্টিকতার উজ্জ্বল আবির্ভাবের ইহাই সানন্দ স্বীকৃতি।

॥ সাত ॥

'মানসী'-তে রোমাণ্টিকতার প্রবর্তন উত্তরোত্তর বিকশিত হইতে লাগিল 'সোনার তরী' 'চিত্রা' 'চৈতালী' 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' নামক কবিতা-গুচ্ছগুলিতে। 'ক্ষণিকা'-য় যে আত্মকেন্দ্রিত লিরিকগুলি আছে, তাহা রবীন্দ্র-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ কীর্তির অন্যতম। প্রাচীনপন্থী চন্দ্রনাথ বসুর সহিত নবীনপন্থী তরুণ রবীন্দ্রনাথের মসীযুদ্ধ বাঙলা সাহিত্যের অঙ্গীভূত। তথাপি 'ক্ষণিকা' পড়িয়া চন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, "তোমার প্রতিভার

পরিমাণ নাই—উহার বৈচিত্র্যও যেমনি, প্রভাও তেমনি। আমি তোমার প্রতিভার নিকট অভিভূত।…'ক্ষণিকায় বঙ্গের পল্লীজীবনের পল্লীপ্রকৃতির যে অনির্বচনীয় সৌরভ পাইলাম তাহাতে আমি পল্লীপ্রিয় পাড়াগেঁয়ে মুগ্ধ হইয়াছি।" (রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড)।

তবু বলিতে হইবে 'ক্ষণিকা'র মূলসুর চন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। মোহিতচন্দ্র সেন ঠিকই বলিয়াছিলেন : "ক্ষণিকা'র মধ্যে আর একটি জিনিস আছে তাহা বিদ্রোহ। প্রতিকূলতার কাছে বেদনা স্পর্ধাপূর্বক আপনাকে বিরূপ মূর্তিতে প্রকাশ করিতেছে। 'মাতাল' যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে, তাহা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া গায়ের জোরের কথা। বিদ্রোহী অভিমান বলে, আমি সমাজ-সংগত ভব্যতার ধার ধারি না—বিদ্রোহী প্রেম বলে আমি ক্ষণকালের খেলামাত্র; আমি চিরস্থায়ী একনিষ্ঠতার ধার ধারি না—, একান্ত বেদনাকে স্পর্ধিত অত্যুক্তির মধ্যে গোপন করিয়া রাখিবার এই বিড়ম্বনা। এই সকল কথার যথার্থ তাৎপর্য গ্রহণ করিতে গেলে অনেক সময় ইহাদিগকে উল্টা করিয়া বুঝিতে হয়।" (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড)।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিকতার পরিসর অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিত তাঁহার কবিতায় এই বিদ্রোহের ভাব প্রকাশ না পাইলে। তাঁহার জাতি-চেতনা ও মানব-প্রীতি প্রত্যক্ষভাবে তাঁহার কাব্যগ্রন্থে স্থান পাইয়াছে 'মানসী, হইতেই। ইহার সামাজিক কারণ এই যে, সিপাহী বিদ্রোহের পর হইতে ইংরেজ শাসনে ভারতে যে সুশৃংখল শোষণের প্রয়োগ হইতে লাগিল তাহাতে এদেশবাসীর মনে পরাধীনতার গ্লানি না জাগিয়া পারে না। ইংরেজী সভ্যতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা না কমিলেও ইংরেজী-শাসনের মোহ কাটিতে শুরু করিল। জন্মভূমির দুঃখ সম্বন্ধে জাগিল চেতনা, প্রতিকারের উপায় খোঁজা হইতে লাগিল চারিদিকে, দেশের তুচ্ছ জিনিসেও আসিল মমত্ববোধ, অনুকরণপ্রিয়তা হইল হাস্যাস্পদ অথচ অতি-গোঁড়ামিও হইল পরিত্যাজ্য। যে স্বাধীনতা-স্পৃহা আমাদের জাতীয় জীবনে প্রথম সজ্ঞানে বিস্ফোরিত হইল স্বদেশী আন্দোলনে, এ যুগ ছিল তাহার প্রস্তুতি-পর্ব। জাতীয় মুক্তির পথ কি তাহা কাহারো জানা নাই, অথচ জাতির অন্তরে মুক্তির আকুতি, মাতৃগর্ভে শিশুর মতো, প্রকাশের অপেক্ষায় রহিয়াছে। জাতির অন্তরে প্রবেশ করিবার যে নিগূঢ় শক্তি রোমান্টিকতার অন্যতম প্রধান লক্ষণ, তাহাই রবীন্দ্রনাথের মর্মকোষে সৃষ্টি

করিল এক অননুভুত-পূর্ব সংবেদনা, যাহাকে কবি ভাবিতেন জীবনদেবতা। ইহার লীলা তাঁহার চক্ষে রহস্যময়, কেননা জাতির ভবিষ্যৎ অগ্রগতির পথরেখা তখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অগোচর। ইহা কখনো তাঁহাকে ঠেলা দেয় দেশের অতীত গৌরবের দিকে ; কখনো তাঁহাকে প্রেরণা দেয় 'রাত্রিবেলায় নূতন খেলা' খেলিতে। কারণ আমাদের "প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাসের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই দুঃখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মানুষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।" (সাহিত্যের পথে)। আবার কখনো জাগায় নিঃস্বার্থ কর্মপ্রেরণা—

মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে না করি শঙ্কা।

ইহা নিশ্চিত যে মাত্র আবেগ দিয়া বিপ্লবকে সত্য করিয়া তোলা যায় না, ব্যক্তির মৃত্যু দিয়া বিশ্বের মুক্তি আনা যায় না। তাহার জন্য প্রয়োজন, সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বের পূর্ণতর বিকাশ ও তাহাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করিবার শিক্ষা : to start from perceptual knowledge, and then, actively develop it into rational knowledge, and then, starting from rational knowledge, actively direct revolutionary practice—such is the dialectical materialist theory of the unity of knowing and doing. [মাও সে তুঙ]। তবুও মানিতে হইবে বিপ্লবী আস্পৃহার ছন্দোময় প্রকাশ সামাজিক চেতনাকে নাড়া দিয়া ভাবী বিপ্লবের পথের ইঙ্গিত দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'জীবন-দেবতা' কবিতাগুলিকে মিস্টিকভাবে না দেখিয়া এইভাবে গ্রহণ করিলে তাহাদের মর্যাদার উপযুক্ত মূল্য দেওয়া হয়। ইহাতেই বোঝা যায় যে কবিকে কেন বলা যায় ভবিষ্যতের দিশারী।

রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিতেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি সচেতন সৃষ্টি নহে, জীবনদেবতার লীলা। ইহার অর্থ এই নয় যে, কবিকে কিছুই করিতে হইত না, কোন অদৃশ্য শক্তি আসিয়া তাঁহারা লেখনী পরিচালনা করিত। বরং তাহার অর্থ এই যে, কবির নিজেকে প্রস্তুত রাখিতে হইত তাঁহার সমস্ত জ্ঞান, সুচারু

দক্ষতা ও পূর্ণ একাগ্রতা লইয়া, বাসর-সজ্জিতা বধূ যেমন অপেক্ষা করে প্রিয়তমের আবির্ভাবের জন্য। এই অবস্থাতে তাঁহার অন্তরে তিনি অনুভব করিতেন তাঁহার বিশিষ্ট সত্তার সহিত বৃহৎ সামাজিক সত্তার মিলন-যোগ, যে মিলন ঘটিত জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোকে নয়, সংবেদনার অস্পষ্ট অন্ধকারে, যাহাতে একাধারে ছিল বর্তমানের কাব্য-সৃষ্টির নিবিড় সার্থকতাবোধ ও ভবিষ্যৎকে অর্জন করিবার সুতীক্ষ্ন প্রয়াস। তখনকার সমাজসংগঠনের ফলে এই প্রয়াসে সাফল্যের সম্ভাবনা দেখা যাইত না বলিয়া আনন্দের মধ্যে বাজিয়া উঠিত বেদনার সুর। অথচ কেন যে তাহা বাজিত তাহা কবির নিকট থাকিয়া যাইত অজ্ঞাত। তাই তিনি বলিতেন, তাঁহার নিজের কবিতা যে কেন এমন রূপ নেয়, যাহা তিনি নিজেও ভাবেন নাই, তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না!

॥ আট ॥

রবীন্দ্রনাথের এই জাতি-চেতনা, এই নিগূঢ় সমাজবোধ তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার শ্রেষ্ঠ কাব্য-সৃষ্টিকে কিভাবে সঞ্চালিত করিত, এই পর্বে রচিত 'বিদায়-অভিশাপ'কে তাহার উদাহরণস্বরূপ নেওয়া যাইতে পারে। কচ ও দেবযানীর এই নাটকীয় 'সংবাদ'টি কবির একটি সর্বজনপ্রিয় রচনা। প্রাচীন উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ইহাতে নূতন তাৎপর্যের সঞ্চার করা হইয়াছে, এই রীতি রোমাণ্টিক সাহিত্যে সুপরিচিত। কিন্তু নূতন তাৎপর্যের দাবিতে প্রাচীন উপাখ্যানকে হুবহু গ্রহণ করা যায় না, প্রয়োজনমতো পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। 'বিদায়-অভিশাপে'ও তাহা ঘটিয়াছে। সঞ্জীবনী বিদ্যার্জনের পর কচ স্বস্থানে প্রস্থান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে দেবযানী মনের কথা ভাঙিলেন, তিনি কচকে পতিত্বে বরণ করার ইচ্ছা জানাইলেন। কিন্তু গুরুকন্যা সহোদরাতুল্য জ্ঞানে কচ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ইহার উল্লেখ নাই। এবং থাকিতে পারে না বলিয়াই নাই। এই কবিতায় কচ ও দেবযানীর সম্বন্ধ অতীত ফিউডাল যুগের নহে, বর্তমান বুর্জোয়া যুগের। রবীন্দ্রনাথের দেবযানী বাঙলা সাহিত্যে বুর্জোয়া কুমারী-চরিত্র-চিত্রণের প্রথম প্রয়াসের অন্যতম। সে কুমারী আত্মসচেতন, পুরুষকে সে ভালোবাসে আপন আবেগে, তাহার দ্বিধা-সংকোচ নাই, আপন প্রণয়-কথা অকপটে প্রকাশ করিয়া আপন ভাগ্যকে সবলে অধিকার করিতে

এবং ব্যাহত হইলে সবলে প্রত্যাঘাত করিতে অপমানের দুর্বহ ব্যাথায় ভাঙিয়া না পড়িয়া ;

তোমা'-পরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ ;

এহেন কুমারী-নারীর অভ্যুদয় বাঙালী সমাজে তখনও হইয়াছিল কিনা সন্দেহ তবে হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। সেই সম্ভাবনাকে বিলাতি সমাজের জ্ঞান ও ইংরেজি সাহিত্যে পুষ্ট কল্পনার আলোকে উদ্দীপ্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ আঁকিয়াছেন এই নারী। কিন্তু প্রাচীন উপাখ্যানে আছে, কচ বলিলেন, "মন্ত্র অমোঘ, ইহা ব্যর্থ হইবার নহে। আমি এ মন্ত্রে ফল পাইব না বটে, কিন্তু আমি যাহাকে শিক্ষা দিব সে অবশ্যই ফল পাইবে।" ইহা বলিয়া কচ দেবযানীকে অভিসম্পাত দিলেন যে অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণভোগ্যা না হইয়া ক্ষত্রিয়ভোগ্যা হইবেন। এই পাপের ফলে দেবযানী ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির পত্নী হন। অতঃপর কচ আর বিলম্ব না করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন, এবং তথায় দেবগণকে ঐ মন্ত্র শিক্ষা দিলেন, যাহাতে পরে দেবগণ অসুরগণকে পরাজিত করিতে পারিলেন।" (সুবলচন্দ্র মিত্রের বাংলা অভিধান হইতে)।

প্রাচীন উপাখ্যানের নূতন সংস্করণে কবি কেন যে শেষ পরিণামে পরিবর্তন ঘটাইলেন তাহা তিনি স্পষ্ট করিয়া বোঝেন নাই। বোঝেন নাই বলিয়া পঞ্চভূতে ইহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, স্বীকার করিয়াছেন, 'যখন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম তখন কোনো অর্থই মাথায় ছিল না', কিন্তু পরে সমর্থন করিয়াছেন এই সিদ্ধান্তকে যে, 'কচ-দেবযানী সংবাদে মানবহৃদয়ের এক অতি চিরন্তন এবং সাধারণ বিষাদ-কাহিনী বিবৃত আছে, সেটাকে যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন এবং বিশেষ তত্ত্বকে প্রাধান্য দেন তাঁহারা কাব্যরসের অধিকারী নহেন।' বলা নিষ্প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্তে যে-প্রশ্ন এখানে তোলা হইয়াছে তাহার মীমাংসা হয় না। রবীন্দ্রনাথের কচ চরিত্রকে নূতন করিয়া বিশ্লেষণ করিলে হয়তো ইহার সন্ধান মিলিতে পারে। টমসন সাহেবের মতে, কচ ছিলেন যাহাকে ইংরেজি ভাষায় বলে 'ক্যাড'; দেবযানীর অযাচিত প্রেম উপেক্ষা করার অধিকার তাঁহার ছিল না, যেহেতু তিনি নিজে এই প্রণয়-ব্যাপারে

ইন্ধন জোগাইয়াছিলেন। টমসন সাহেবের এই মত সমর্থনযোগ্য হইত যদি কচ ও দেবযানীর ভিতর কোন সামাজিক ব্যবধান না থাকিত। কিন্তু এই সামাজিক সংঘাতই রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে দিয়াছে নূতন নাটকীয় রস। রবীন্দ্রনাথের সমাজও তখন খুঁজিতেছিল সঞ্জীবনী বিদ্যা, যাহা দেশকে বাঁচাইয়া তুলিবে। সে বিদ্যা স্বদেশে অপ্রাপ্য, বিদেশে শত্রুপুরে গিয়া দেশের তরুণের পক্ষে ইহার সাধনা করা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। কচ চলিলেন তাই দৈত্যপুরীতে। বিদেশের শাস্ত্রকে শুধু পুঁথি পড়িয়াই অর্জন করা যায় না। তাহার জন্য চাই বিদেশী সমাজের সহিত অন্তরঙ্গ যোগ, তাই কচ দেবযানীর মনোরঞ্জনে নিরত। এই যোগ কোন নর ও নারীতে কেন্দ্রীভূত হইলে তাহাতে যে প্রণয়ের সঞ্চার হইবে ইহা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু দেবযানীর নিকট কচ একজন ব্যক্তি, যাঁহাকে তিনি ভালোবাসেন। সুতরাং তাঁহার কামনা-পরিপূরণের পথে কোনো বাধাই তিনি দেখিতে পান না, কচের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ছাড়া। তিনি বুঝিতে পারেন না, দৈত্যপুরে কচ একজন ব্যক্তি নহেন, দেবপুরের প্রতিভূ। প্রতিভূ হইতে গেলে এমন অনেক কর্তব্য থাকে যাহাতে ব্যক্তিগত সুখসম্ভোগ প্রতিহত হয়। এই কর্তব্য ভুলিতে পারেন না বলিয়াই কচ দৈত্যপুরে বাস করিয়া দেবযানীর সরস সাহচর্যে চিরকাল সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাইতে পারিলেন না। তাঁহাকে ফিরিতে হইল—দেবযানীর প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও ফিরিতে হইল।

স্বর্গ আর স্বর্গ ব'লে
যদি মনে নাহি লাগে, দূর বনতলে
যদি ঘুরে মরে চিত্ত বিদ্ধ মৃগসম,
চিরতৃষ্ণা লেগে থাকে দগ্ধ প্রাণে মম
সর্বকার্য-মাঝে—তবু চলে যেতে হবে
সুখশূন্য সেই স্বর্গধামে।

স্বদেশপ্রেমের আদর্শনিষ্ঠায় কচকে আত্মসুখ বিসর্জন দিতে হইল :

দেব-সবে
এই সঞ্জীবনীবিদ্যা করিয়া প্রদান
নূতন দেবত্ব দিয়া তবে মোর প্রাণ
সার্থক হইবে ; তার পূর্বে নাহি মানি
আপনার সুখ।

তবুও আপন প্রেমের আলোকে দেবযানীর চিত্তের ব্যথা বুঝিতে কচের বাধে না। কারণ দেবযানীর তো এমন কোন ব্রত নাই; তাঁহার জীবন তো বুর্জোয়া নারীর একান্ত আপন জীবন, আপনার জন্মগত সমাজের পরিবেশে।

আমার কী আছে কাজ, কী আমার ব্রত।
আমার এ প্রতিহত নিষ্ফল জীবনে
কী রহিল, কিসের গৌরব।

কচের যা ব্রত তাও দেবযানীর হইতে পারে না, বিজয়ী দৈত্যপুরী হইতে বিজিত দেবলোকে আসিবার কোন হেতুই তাঁহার মনে লাগে না। তাই কচের প্রতি হইল দেবযানীর অভিশাপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কচ, প্রাচীন উপাখ্যানের মতো, ফিরাইয়া অভিশাপ দিলেন না। ইহাতে নারীর চেয়ে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় না। ইহা হইল কচের পক্ষে সামাজিক সত্যকে স্বীকার। বিজিত জাতি অপেক্ষা বিজয়ী জাতির সামাজিক পরিবেশের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার, পরাধীন বাঙলা অপেক্ষা স্বাধীন ইংলণ্ডের সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার। তাই কচের শেষ উক্তি এই যে, আপন স্বাভাবিক পরিবেশে দেবযানী একদিন হৃদয়ের জ্বালা কাটাইয়া উঠিয়া আবার আপন গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। আর আপন হৃদয়ের ক্ষত বহন করিয়া কচকে স্বদেশের অভিমুখে ফিরিতে হইবে কর্তব্যের আহ্বানে। রবীন্দ্রনাথের স্বাধীনতাকামী মন সে যুগের বাঙলাদেশে কচের মতো স্বদেশপ্রেমিক যে বিদ্যার্থীর স্বপ্ন দেখিতেছিল তাহার আবির্ভাব আসন্ন বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা প্রাচীন কাহিনীকে ভাঙিয়া গড়িতে ইতস্তত করে নাই।

॥ নয় ॥

এতদিন যাহা ছিল আসন্ন তাহা অভিব্যক্ত হইল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে। লর্ড কার্জনের উদ্ধত হঠকারিতার প্রতিবাদে বঙ্গবিভাগব্যবস্থার প্রতিকারকল্পে বাঙলাদেশে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইল, স্বদেশী আন্দোলন তাহারই প্রকাশ। বাঙলার সামাজিক ইতিহাসে ইহা এক অভিনব ঘটনা। ইতিহাসে কোন নূতনই আকস্মিক নহে, তাহার উদ্ভবের পশ্চাতে থাকে সুদীর্ঘ প্রস্তুতি। প্রস্তুতির গুণগত পরিবর্তন হয় ইতিহাসের এক বিশেষ মুহূর্তে, 'মুহূর্ত' শব্দের হেগেলীয় দার্শনিক অর্থে। তখনই হয় নূতন পরিস্থিতির আবির্ভাব। বাঙলাদেশেও এই প্রস্তুতি চলিতেছিল, যাহার নূতন রূপ প্রকাশ পাইল

১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলনে। আগমনের পূর্বেও ইহার নিকটায়মান পদধ্বনি উৎকর্ণ বাঙালীর শ্রুতিতে যে কম্পন লাগাইয়াছিল তাহা বিধৃত হইয়া আছে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথে।

স্বদেশী আন্দোলনের যে লক্ষণটি সকলের আগে চোখে পড়ে তাহা হইতেছে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীর ইংরেজ-বিদ্বেষ। "যতদিন দেশীবিদেশীতে বিজিত-নেতৃ-সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা নিকৃষ্ট হইলেও পূর্বগৌরব মনে করিব, ততদিন জাতি-বৈর-শমতার সম্ভাবনা নাই; এবং আমরা কায়মানোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, যতদিন ইংরেজের সমতুল্য না হই ততদিন যেন আমাদিগের এই জাতি-বৈরিতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে। যতদিন জাতিবৈর আছে ততদিন প্রতিযোগিতা আছে। বৈরভাবের জন্যই আমরা ইংরেজদিগের কতক কতক সমতুল্য হইতে চেষ্টা করিতেছি। ইংরেজের নিকট অপমানগ্রস্ত, উপহাসিত হইলে যতদূর আমরা তাহাদিগের সমকক্ষ হইবার যত্ন করি তাহাদের কাছে বাবু-বাছা ইত্যাদি আদর পাইলে ততদূর করিব না, কেননা সে গায়ের জ্বালা থাকিবে না। বিপক্ষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ঘটে, স্বপক্ষের সঙ্গে নহে। উন্নত শত্রু উন্নতির উদ্দীপক, উন্নত বন্ধু আলস্যের আশ্রয়। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের জাতিবৈর ঘটিয়াছে।" স্বদেশী আন্দোলনের গায়ত্রী মন্ত্রের উদ্‌গাতা বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায়, দেশপ্রেমের আদর্শের সহিত শিক্ষিত শ্রেণীর 'গায়ের জ্বালা' কতখানি মেশানো ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের তাই দুটি রূপ। একটি পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ; অন্যটি, নেতৃস্থানীয় শিক্ষিতশ্রেণীর দাবি আদায়ের তাগিদ। সাধারণের ধারণা ছিল, ইহা এদেশীয় ইংরেজ-শাসকের সহিত কলহ। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইহাকে বিস্তৃততর পরিপ্রেক্ষিতে ভাবিতেন, ইহা পূর্বের সহিত পশ্চিমের সংঘর্ষ, অথবা এশিয়ার সহিত ইয়োরোপের। ইহা যে বিশ্বব্যাপী ধনবাদের বিকাশের অনিবার্য পরিণাম, তাহা বুঝিতে পারা তখন এদেশের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

অভ্যন্তরীণ আত্ম-দ্বন্দ্বের তাড়নায় বর্ধিষ্ণু ধনবাদ ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। মনে রাখিতে হইবে, পরদেশ বিজয় মাত্রকেই সাম্রাজ্যবাদ বলা যায় না। সাম্রাজ্যবাদ ধনবাদের একটি বিশেষ স্তর, যখন ইহার অর্থনীতিতে কার্যকরী হয় উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার পরিবর্তে একচেটিয়া পুঁজি-সংস্থান। সাম্রাজ্যবাদী পর্বে ধনবাদের শোষণ ঘনীভূত হয় স্বদেশে ও

বিজিত দেশে। স্বদেশ জাগায় শ্রেণী-সংঘর্ষ, ধনিকের সহিত শ্রমিকের; আর বিজিত দেশে জাগায় স্বাধীনতা-সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। ধনবাদী জগতে ইংলণ্ড তখন নেতা। তাই ইংলণ্ডেই হইল সাম্রাজ্যবাদের সূচনা। ইংলণ্ডের অর্থনীতিতে এই নূতন শোষণপদ্ধতি কবে কায়েম হইয়া বসিল, লেনিন বলেন, তাহা প্রায় সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়, তাহা হইতেছে বিংশ শতকের প্রারম্ভ। স্পেন-আমেরিকার যুদ্ধ (১৮৯৮) ও ব্রিটিশ-বুয়োর যুদ্ধ (১৮৯৯-১৯০২) ইহার জন্মলগ্নের নির্দেশক। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিল, রুশ-জাপান যুদ্ধ। বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনের সহিত ইহার ভাবাবেগগত সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। জারতন্ত্রী রুশিয়ার সহিত সদ্য-শক্তিশালী জাপানের সংঘর্ষে জাপান এদেশে পাইল সম্মান ও সমর্থন, নবোত্থিত এশিয়ার অগ্রদূত হিসাবে। অথচ এ জাপান তখন নিযুক্ত ছিল চীন, কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার স্বাধীনতা অপহরণে। রুশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানকে ইংরেজ সহায়তা করিতেছে, ইংরেজ-বিদ্বেষ সত্ত্বেও ইহা এদেশে নেতৃবর্গের দৃষ্টি এড়াইয়া গেল। সব চেয়ে বেশি, রুশিয়ার পরাজয়ের প্রকৃত কারণ যে জাপানের সামরিক শক্তি নয়, রুশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর প্রথম বিপ্লবী অভ্যুত্থান, তাহা বুঝিবার মতো বাস্তব অবস্থা এদেশে তখন ছিল না, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর কোনরূপ সংগঠনের অভাবে। তখনকার আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবর্গের হ্রস্বদৃষ্টি আন্দোলনের জন্ম হইতেই তাহাকে নিয়তি-অভিশপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তবুও মানিতে হইবে বাঙলার সাংস্কৃতিক জীবনে স্বদেশী আন্দোলনের অবদান এক অবিস্মরণীয় ঐতিহ্য। কারণ, পরাধীন ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামে ইহাই প্রথম সজ্ঞান অভিযান, নির্ভীক শৌর্য ও অনুপ্রাণিত আত্মত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণে মহীয়ান, ইহা রুদ্রের দীপ্তিতে সুন্দরের অভিষেক।

॥ দশ ॥

'নৈবেদ্য'-গুচ্ছ কবিতাগুলি এখন পড়িলে মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথের জীবন দেবতা স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইবার পূর্বেই তাঁহাকে দিয়া তাহার আগমনী গাওয়াইয়াছেন। এ কবিতাগুলিতে ছন্দের চমক নাই, আছে প্রকাশের সরলতা। এ চেষ্টা 'চৈতালি'তেও দেখা গিয়াছিল। কিন্তু 'চৈতালি'তে কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সংসারের ছোটখাট ঘটনাগুলির উপর, যাহাকে তিনি কল্পনার মাধুর্যে অসামান্য করিয়া তুলিয়াছেন, যেমন করিয়াছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, তাঁহার

অনেক কবিতায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোলরিজএর সংযুক্ত প্রতিভা 'লিরিক্যাল ব্যালাডস্' রচনাকালে নূতন ভাবধারা প্রবর্তনার তাগিদে 'পরিচিত' ও 'অদ্ভুত'-এর সাহিত্যিক রূপায়ণ সম্পর্কে রোমান্টিক কল্পনার যে দুটি মৌলিক করণীয়ের সন্ধান পায়, তাহাদের উভয়েরই বিস্ময়কর সম্পাদন দেখিতে পাওয়া যায় 'গল্পগুচ্ছের' গীতিধর্মী ছোটগল্পগুলিতে। কিন্তু 'নৈবেদ্য'র সুর গভীরতর। দেশের সামাজিক অবস্থার জড়তা, ক্লীবতা ও দৈন্য তাঁহার চেতনাকে পীড়িত করিয়াছিল ; দেশকে সমৃদ্ধতর, বলবত্তর করিবার প্রার্থনা তিনি ঈশ্বরের নিকট নিবেদন করিয়াছেন। প্রায় সমসাময়িক এক পত্রে তিনি স্ত্রীকে লিখিতেছেন "আজকাল আমার মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা এই, আমাদের জীবন সহজ ও সরল হোক, আমাদের চতুর্দিকে প্রশান্ত এবং প্রসন্ন হোক : আমাদের অভাব অল্প, উদ্দেশ্য উচ্চ, চেষ্টা নিঃস্বার্থ, এবং দেশের কাজ আমাদের কাজের চেয়ে প্রধান হোক।" (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড)।

পরাধীন দেশে জাতীয় অভ্যুত্থানে বর্তমানের দৈন্যকে ঢাকিবার জন্য অতীতের গৌরবগান সহজেই আসে, বিশেষ করিয়া ভারতের মতো দেশে, যাহার অতীত গৌরব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে, প্রাচীন ভারতের যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথের ভাবনেত্রে উদ্ভাসিত, তাহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল না। তাঁহার বর্ণিত পুরাতন ব্রাহ্মণ-সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব একান্তই কাল্পনিক।

> হে ভারত নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
> ত্যজিতে মুকুট দণ্ড, সিংহাসন ভূমি।

ইহা ইতিহাস নহে, কবির কল্পনা-বিলাস। "আমি আশ্রমের আদর্শরূপে বারবার তপোবনের কথা বলেছি। সে তপোবন ইতিহাস বিশ্লেষণ করে পাইনি। সে পেয়েছি কবির কাব্য থেকেই।" (আত্মপরিচয়)। কালিদাসের কাব্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ছিল অগাধ। এবং কালিদাসই তাঁহার কাছে অতীত ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই দুর্বলতা তাঁহার একার ত্রুটি নহে ; সমস্ত দেশের জাগ্রত মনে তাহা পরিব্যাপ্ত। তাই স্বদেশী আন্দোলনে যে হিন্দুত্বের ছাপ পড়িয়াছিল তাহাতেই নিহিত ছিল ভবিষ্যতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বীজ। ইহা তো গেল স্বদেশী আন্দোলনের নেগেটিভ দিক। কিন্তু 'ত্রাণ' 'দীক্ষা' 'ন্যায়দণ্ড' 'প্রার্থনা' প্রভৃতি কবিতায় প্রকাশ পাইল তাহার পজিটিভ দিক।

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর

* * *

ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি' দাও সক্ষম স্বাধীন।

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

* * *

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত·········
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত

নূতন মন্ত্রের মতো, এই সকল পদ বাঙলার তরুণকে মাতাইয়া তুলিল. তাহারা প্রস্তুত হইতে লাগিল স্বদেশী আন্দোলনের যজ্ঞানলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে।

॥ এগারো ॥

স্বদেশী অন্দোলন যখন প্রকৃতই আসিয়া পড়িল তখন দেখিতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা প্রকাশের পথ পাইয়াছেন, কবিতায় তত নয়, যত গানে ও কর্মপ্রচেষ্টায়। স্বদেশী আন্দোলনের অব্যবহিত পূর্ব হইতে তাঁহার স্বাদেশিক কর্মপ্রচেষ্টা শুরু হয়, যখন তিনি তাঁহার বিখ্যাত প্রবন্ধ—'স্বদেশী সমাজ'—সভা ডাকিয়া পাঠ করিয়া শুনাইলেন—২২শে জুলাই ১৯০৪। সেই প্রবন্ধে তিনি দেশের নেতাদিগকে বলিলেন, ভারতের মর্মকেন্দ্র তাহার গ্রামে, সেই গ্রামের সমস্যা ভারতের সমস্যা। গ্রামে নূতন প্রাণসঞ্চার করিতে না পারিলে ভারতের কল্যাণ অর্থহীন, অবাস্তব। 'সফলতার সদুপায়' প্রবন্ধে তিনি দেশের ঐক্য সাধনের উদ্দেশ্যে স্বদেশী সংসদ স্থাপন করিয়া একজন অধিনেতার চতুর্দিকে একত্র হইবার আহ্বান জানাইলেন। এবং দেশের মুক্তির পথের নির্দেশ দিলেন আত্মনির্ভরশীল হইয়া অহিংসভাবে দেশের সেবার ভিতর দিয়া। এই কর্মপদ্ধতির অন্তর্নিহিত খণ্ডতা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথের

রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির প্রমাণ, পরবর্তীকালে গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের সহিত ইহার গভীর সাদৃশ্য। কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য অবদান তাঁহার গানে। তাঁহার গীতধারা উৎসারিত হইল আকস্মিক বন্যার মতো, ও প্লাবিত করিল দেশের তরুণ চিত্তকে। দেশ মাতিয়া উঠিল। ইহার পূর্বেও কবি কখনো কখনো জাতীয় সংগীত রচনা করিয়াছেন, কিন্তু সেগুলি ছিল অনেকটা আনুষ্ঠানিক বা ফরমায়েসি। কিন্তু তাঁহার এখনকার স্বদেশী গানের চরিত্র বিভিন্ন, তাহারা যেন এক নূতন সামাজিক আবেগের অকুণ্ঠ প্রকাশ, সমূহের আকাঙ্ক্ষার প্রতিভাময় পরিপূরণ।

কিন্তু আন্দোলনের সহিত কবির যোগ স্থায়ী হইতে পারিল না। নেতাদের সহিত ঘটিল তাঁহার মতবিরোধ। বিশেষ করিয়া আন্দোলনের ভাবোচ্ছ্বাসে কবি অসন্তুষ্ট। এবং তাঁহার তখনকার সমালোচনা অধিকাংশে সত্য। তবুও রবীন্দ্রনাথের পথও দেশ গ্রহণ করিতে পারিল না। কারণ, তখন দেশের যাহা মূল সমস্যা—রাজনৈতিক স্বাধীনতা—সে সম্বন্ধে তাঁহারও দৃষ্টি ছিল অস্বচ্ছ।

তাঁহার প্রধান বক্তব্য, "মানুষের মনকে মুক্ত করিলে সে সর্ববিষয়ে স্বাধীনতা পায়।" (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড)। রবীন্দ্রনাথের এই মত দেশের লোকের মনে সাড়া জাগাইতে পারিল না। এমন কি, রবীন্দ্রনাথের পরম অনুরাগী সুহৃৎ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীও তাঁহার বিপক্ষে মত দিলেন। রবীন্দ্রনাথ দেশের কাজের যে ফর্দ দিয়াছিলেন তাহার বাধা কোথায় তাহাও ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি বলিলেন, সরকার যেখানে প্রবল পক্ষ ও বিরোধী, সেখানে দেশের 'কাজ'-টা যেদিন খুশী বন্ধ হইতে পারে। কর্মভার স্বহস্তে গ্রহণ করো, ইহাই রবীন্দ্রনাথের উপদেশ, স্বদেশী আন্দোলনের মজ্জাগত শিক্ষা ইহাই। কিন্তু ত্রিবেদী মহাশয় দেখাইলেন যে ইংরেজ ভারতবাসীর মতের অপেক্ষা না করিয়া "আমাদের হিতচিকীর্ষাপ্রণোদিত হইয়া আমাদের হাত হইতে সকল কাজই ক্রমশ স্বহস্তে গ্রহণ করিতেছেন।" (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড)।

মতবিরোধ সত্ত্বেও নেতৃবর্গ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একেবারে শ্রদ্ধা হারান নাই, তাহার প্রমাণ তাঁহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা,—'অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।' অরবিন্দ আবাল্য ইংলণ্ডের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া, রবীন্দ্রনাথের কচ-এর মতো, দেশকে সঞ্জীবনীমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছিলেন। তাঁহার কারাদণ্ডে রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয় উদ্বেল হইয়া স্বদেশী আন্দোলনের পজিটিভ দিকের চিত্র চিরকালের

মতো ছন্দে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। এই সময়ে রচিত আর একটি কবিতায়—'সুপ্রভাত'—তিনি রুদ্রের যে জয়গান গাহিয়াছেন তাহারও বাস্তব ভিত্তি স্বদেশী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা। "নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই"—অগ্নিযুগের আত্মোৎসর্গ ছাড়া নিছক কল্পনা হইতে এ লাইন আসে নাই। বাস্তববাদীর দৃষ্টিতে, ব্যক্তির আত্মত্যাগ তখনই সার্থক যখন তাহা সাধিত হয় মানবজাতির প্রয়োজনে। মানব-সমাজের মৃত্যু নাই, ইহার জীবনের মধ্যেই ব্যক্তির অমরত্ব। সহিংস বিপ্লবে রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল না। তবুও রুদ্রের আহ্বানে বাঙালীর এই বীরত্বপূর্ণ স্পন্দনকে রবীন্দ্রনাথ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। "বস্তুত বহুদিন হইতে বাঙালী জাতি ভীরু অপবাদের দুঃসহতার বহন করিয়া নতশির হইয়াছে বলিয়াই বর্তমান ঘটনা সম্বন্ধে ন্যায় অন্যায় ইষ্ট অনিষ্ট বিচার অতিক্রম করিয়াও অপমান মোচনের উপলক্ষ্যে বাঙালীর মনে একটা আনন্দ না জন্মিয়া থাকিতে পারে নাই।" (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড)। কিন্তু এ দুটি কবিতাতেই স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবী প্রেরণার সহিত মিশিয়া আছে এক অতীন্দ্রিয় ভগবৎ-শক্তিতে বিশ্বাস, যাহা ডাকিয়া বলিতেছে, "আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির', ও যাহাতে জীবনেশ্বরের চরণস্পর্শে মৃত্যু হইয়া উঠে অমৃত। বিপ্লবী চেতনার সহিত চিরন্তন এক-এর সংমিশ্রণ, শেলীর কবিতাতেও দেখা যায়। তাঁহার কাব্যের উপর প্লাতোনিক দর্শনের প্রভাব রবীন্দ্রকাব্যের উপর উপনিষদ্-এর প্রভাবের অনুরূপ। এ প্রভাব হইতেছে বর্তমান বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় পূর্বতন সমাজব্যবস্থার অন্তর্লীন উত্তরাধিকার; সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সর্বাঙ্গীন সাফল্যের পূর্বে যাহার একান্ত নিবৃত্তি সম্ভব নহে।

স্বদেশী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের চেতনায় ঘটিল এক প্রকোষ্ঠ-বিভাগ। একদিকে সমাজমুখী প্রবণতা, ভারতের নানা সমস্যার বিচার ও জটিলতার মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা, যাহার প্রকাশ গোরা'-য়; অন্যদিকে অন্তরমুখী প্রবণতা, অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্মবাদের পথে অগ্রগতি, যাহার প্রকাশের মাধ্যম হইল প্রধানত গীতিকবিতা—খেয়া ও গীতাঞ্জলী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবাদে মানবিকতার সংবেদনা কখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। তাঁহার জীবনদেবতা শেষ পর্যন্ত নরদেবতা। "আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তা-ও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ।" (মানুষের ধর্ম)। ব্লেক, এমিলি ব্রণ্টি, বা ফ্রান্সিস টমসন যে মিস্‌টিক স্তরে পৌঁছিয়াছিলেন তাহা রবীন্দ্রনাথের

অনায়ত্ত। খেয়ার 'কৃপণ' ও 'দান' কবিতায়, গীতাঞ্জলির 'ভারত-তীর্থ' ও 'অপমানিত'-এ স্বদেশী আন্দোলন-সম্ভূত সমাজ-সচেতনতার ধ্বনি বাজিয়া উঠিয়াছে। এই মানবিকতাবোধ আধ্যাত্মিক নহে, রোমাণ্টিক। ইংরেজি 'গীতাঞ্জলির' অধিকাংশ কবিতা নৈবেদ্য, খেয়া ও গীতাঞ্জলি হইতে নির্বাচিত। বাঙলা গীতাঞ্জলি বাঙালী পাঠককে বিশেষ অভিভূত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ইংরেজি অনুবাদে তাহা ইংলণ্ডের কাব্যসাধকগণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অনেকেই রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা লইয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন। সমালোচক-শ্রেষ্ঠ ব্রাডলে কেবল জানাইলেন, It looks as though we have at last a great poet among us again (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড)। রোমাণ্টিক যুগের পর হইতে ইংলণ্ডে কবিদের আকৃতি খর্ব হইতেছিল, 'গ্রেট' বলা যায় এমন কবির সন্ধান পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সেই রোমাণ্টিক ভাবাবেগ ইংরেজি ভাষায় পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিল, ইংরেজি অনুবাদের ছদ্মবেশ সত্ত্বেও ব্রাডলে-র সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা ধরা পড়িয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কেননা ব্রাডলে-র কাব্য-বিচারে অধ্যাত্মবোধ অপেক্ষা মানবিকতাবাদের মূল্য ছিল উচ্চতর।

॥ বারো ॥

'গীতিমাল্যে'র একটি কবিতায় কবি সুন্দরকে সম্বোধন করিয়া গাহিয়াছেন, 'এই জীবনে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর'। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তিপান্ন বছরের জন্মদিনে তাঁহার একটি নবজন্মের সংবাদ বাংলা সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া আছে, 'সবুজপত্রে'র প্রকাশে। সবুজের অভিযানের মুখপত্র এই পত্রিকা নবীনের জয়গানে মুখর, যে নবীন জীবন্ত অশান্ত, প্রচণ্ড, প্রমত্ত অথচ প্রমুক্ত। মনে রাখিতে হইবে, 'সবুজপত্র' প্রথম প্রকাশ কালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বজ্রনির্ঘোষে নিজেকে প্রকাশ করে নাই। কিন্তু তাহার উদ্যোগপর্ব ছিল প্রায় সম্পূর্ণ। আয়োজন সকলই প্রস্তুত, অপেক্ষা মাত্র একটি স্ফুলিঙ্গের। এই অগ্নিকাণ্ডের অনিবার্যতা সম্বন্ধে লেনিন বহুপূর্ব হইতেই সাবধান-বাণী কহিতেছিলেন। ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ফলে তিনি জানিতেন ধনবাদের চরমপর্বে অসমানভাবে বর্ধিত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির শক্তিপরীক্ষা অবধারিত। সমস্ত পৃথিবীটাই তখন সাম্রাজ্যবাদের কুক্ষিগত, ধনবাদের মুক্ত বিস্তারের জন্য কোন অঞ্চল তখন খোলা নাই। কোনো একটি রাষ্ট্রকে বাড়িতে

হইলে অন্য রাষ্ট্রকে বঞ্চিত না করিলে চলিবে না। পৃথিবীব্যাপী পণ্য-বাজারের পুনর্বণ্টনের প্রয়োজনেই এই বিশ্বযুদ্ধ এবং এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রই দায়ী। বাঙলা তথা ভারত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বৃহৎ অংশ বলিয়া এই বিশ্বযুদ্ধের ঘূর্ণাবর্তে তাহাকেও জড়িত হইয়া পড়িতে হইল।

এতকাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চেতনা বাঙলা বা ভারতের বাস্তব অবস্থাতে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার মানবিকতার ভিত্তি ছিল নিজের দেশের পরিস্থিতি। কিন্তু 'সবুজপত্র'-যুগে দেখা যায় তাঁহার দৃষ্টির বিস্তৃতি, সংবেদনার পরিব্যাপ্তি। বিশ্বযুদ্ধ ঘটিবার পূর্বেই তাঁহার মর্মে আসিয়া আঘাত করিয়াছে বিশ্বপরিস্থিতির সংকট। 'সর্বনেশে' কবিতা লিখিবার অনেক পরে মহাযুদ্ধের তড়িৎবার্তা আসে। কবি বলেন, "আমার এ অনুভূতি ঠিক যুদ্ধের অনুভূতি নয়। আমার মনে হয়েছিল যে আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি, এক অতীত রাত্রি অবসানপ্রায়। মৃত্যু-দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে বৃহৎ নবযুগের রক্তাভ অরুণোদয় আসন্ন। সেজন্য মনের মধ্যে অকারণ উদ্বেগ ছিল।" (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড)।

যুদ্ধের সংবাদের পর এক উপাসনায় তিনি বলিতেছেন,—"সমস্ত ইউরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল। এক-এক জাতি নিজ নিজ গৌরবে উদ্ধত হয়ে সকলের চেয়ে বলীয়ান হয়ে উঠবার জন্য চেষ্টা করছে। এ যে মানুষের পাপ পুঞ্জীভূত আকার ধারণ করেছে—সেই পাপই যে মারবে এবং মেরে আপনার পরিচয় দেবে। আজ যে রক্তস্রোত প্রবাহিত হয়েছে, সে যেন ব্যর্থ না হয়। রক্তের বন্যায় যেন পুঞ্জীভূত পাপ ভাসিয়ে নিয়ে যায়।" (রবীন্দ্রজীবনী হইতে)।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্লেষণে লেনিনের বৈজ্ঞানিক দূরদৃষ্টি নাই, কিন্তু মানবিক সংবেদনার গভীরতায় ইহা অতুলন। বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা সত্ত্বেও মানুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে কবির আস্থা অটুট। 'পাড়ি' কবিতায় তাঁহার 'নেয়ে' চলিয়াছেন এক অগৌরবের উদ্দেশ্যে, তাঁহার হাতে 'একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার'। কবি স্বয়ং বলিয়াছেন, এই কবিতার মধ্যে যুদ্ধের চিন্তা আছে। তিনি অনুভব করিয়াছেন, যুদ্ধের সমস্ত প্রমত্ততা অবসিত হইবে এক নতুন সৌন্দর্যে। লেনিন প্রমুখ বস্তুবাদীরা জানিতেন এই বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবীর প্রসব-বেদনা, ইহা হইতে ভূমিষ্ঠ হইবে পৃথিবীতে প্রথম সমাজবাদী রাষ্ট্র, মানবসভ্যতার ইতিহাসে এক নব পর্যায়। মার্কস্ বহুপূর্বেই তাঁহাদের

শিখাইয়া গিয়াছেন "পুরাতন সমাজের গর্ভ হইতে নূতন সমাজের জন্মকালে বলপ্রয়োগ ধাত্রীর কাজ করে।" সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্ম দিয়া প্রমাণিত হইল রবীন্দ্রনাথের আশাবাদ ব্যর্থ হয় নাই।

॥ তেরো ॥

এই আশাবাদের মূলে ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক সিদ্ধান্তের সহিত তাঁহার পরিচয় ও সমগ্রভাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার জীবনব্যাপী ঔৎসুক্য। রেনেসাঁস যুগে বিজ্ঞানের সহিত কাব্যের যোগ সকলেরই জানা কথা। রোমান্টিক যুগে, শেলীর রসায়নের আসক্তি ছিল প্রবল। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হোয়াইটহেড-এর মতে, 'যৌবনকালে ওয়ার্ডসওয়ার্থের নিকট পর্বতমালা যাহা ছিল, শেলীর নিকট কেমিষ্ট্রির ল্যাবরেটরি ছিল তাহাই। এক শতাব্দী পরে জন্মিলে শেলী রসায়নবিদ্‌গণের মধ্যে নিউটন হইতে পারিতেন।' বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ছাত্র না হইয়া বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যতখানি জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব, সে বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাঁহার অনেক সুপ্রসিদ্ধ কবিতায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। যেমন 'বসুন্ধরা' 'সমুদ্রের প্রতি' ইত্যাদি। 'বলাকা'র কবিতাগুলি রচনাকালে গতির প্রকৃতি লইয়া বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে নানা গবেষণা চলিতেছিল, যাহার প্রতিভাস তখনকার ইয়োরোপীয় দার্শনিক চিন্তায় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে মার্কসবাদের সিদ্ধান্ত তখন তেমন প্রচলিত ছিল না। "সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি, অণুতম হইতে বৃহত্তম, বালুকণা হইতে সূর্য, আদিম জীবকোষ হইতে মানুষ, হইতেছে অস্তিত্ব ও নাস্তিত্বের অবিরাম আবর্তনে চিরস্থায়ী বিলোড়ন, ও নিরবচ্ছিন্ন গতি ও পরিবর্তনের নিয়মাধীন।" (এঙ্গেলস্)। কবিও তাঁহার 'চঞ্চলা'-কে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—

শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও,
উদ্দাম উধাও,
ফিরে নাহি চাও।
যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও
কুড়ায়ে লও না কিছু করো না সঞ্চয়,
নাহি শোক নাহি ভয়—
পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।

এই যুগে কবির অন্তরলোকের কথা ঃ

ওরে কবি, তোরে আজি করেছে উতলা,
ঝঙ্কারমুখা এই ভুবনমেখলা,
অলক্ষিত চরণের অকারণ, অবারণ চলা ;
নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি
বক্ষ তোর উঠে রনরনি ।

মানবসমাজে এই অগ্রগতির রহস্য অবশ্য কবির নিকট 'অকারণ অবারণ চলা'। কিন্তু মার্ক্সবাদে বলে,—"উৎপাদনশক্তিসমূহে রহিয়াছে অবিরাম বিকাশের গতি, সামাজিক সম্বন্ধসমূহের বিনাশ, নব নব আইডিয়ার সৃষ্টি। একমাত্র নির্বিকল্প গতি-ই হইতেছে পরিবর্তনহীন" (মার্ক্স)। মার্ক্স-এর এই উক্তিতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের বলাকা কবিতার শেষাংশের বাস্তব ব্যাখ্যা,—

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখির সাথে
দিনেরাতে
এই বাসাছাড়া পাখি ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হতে কোন্ পারে।
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা অন্য কোনখানে।

বুর্জোয়াযুগের কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় প্রথম হইতেই এই সুদূরের অভীপ্সা নানা ভাবে দেখা দিয়াছে—'ডাকে যেন ডাকে যেন, সিন্ধু মোরে ডাকে যেন', 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী', 'ডাকঘরে' অসুস্থ শিশু অমলের বিদেশ ভ্রমণের অচরিতার্থ কামনা। কিন্তু বিজ্ঞানের সহিত কল্পনার এই অঙ্গাঙ্গী সংযোগ রবীন্দ্রনাথ ইহার পূর্বে অর্জন করিতে পারেন নাই। ইহা মহৎ সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। "সায়ান্সেই বলো আর আর্টেই বলো নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন।" (সাহিত্যের পথে)। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাগুষায় দান্তের কল্পনা উদ্বোধিত হইয়াছিল এই আবিষ্কারে যে

পৃথিবী সমতল নহে, গোলাকার। হোমরের ইউলিসিস-চরিত্র অবলম্বন করিয়া তিনি তাহাকে দিলেন নূতন রূপ। সে আর ভাগ্য-বিতাড়িত সাহসী ও কৌশলী বীর মাত্র নহে; সে দুঃসাহসী নাবিকশ্রেষ্ঠ, সে পৃথিবীর অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিতে চাহে। পৃথিবী গোলাকৃতি হইলে আকাশের উত্তরার্ধের তারকাপুঞ্জ দক্ষিণার্ধে ক্রমশ অদৃশ্য হইবার কথা। এই নূতন বৈজ্ঞানিক তথ্যকে প্রয়োগ করিয়া দান্তের কল্পনা একটি মাত্র হ্রস্ব বর্ণনার বিশালত্বে দেখাইয়া দিল, ইউলিসিস-এর তরণী পরিচিত জগৎ হইতে কতদূরে গিয়া পড়িয়াছিল।

Full stiff and old my fellows were, and I
  When finally we reacht the narrow cleft
  Where Hercules his pillars lifted high,
A mark for man, of further flight bereft.
  Sebilia then I past upon my right ;
  Already Septa faded on the left.
"Brethren," I spake, "thro' many a plight,
  Despising dangers, ye have reacht the west.
  Few moments now remain before the night
Enfolded your senses in eternal rest.
  Permit this fleeting eventide to scan
  Th' unpeopled world, in sun-pursuing quest.
Consider what a noble thing is man !
  Ye were not born to ruminate like kine
  But to achieve what wit and valour can."
My comrades I so keenly did incline,
  With brief harangue, untraveled way to learn,
  That scarce had they been checkt by words of mine ;
And leaving all the morning skies astern,
  With flapping oars we winged our reckless flight :
  But ever to the left our course did turn.
Already all the stars were seen by night
  Of the other pole, and ours so downward bent,
  The sea's horizon hid it from our sight.

উনিশশতকের ইংলণ্ড ছিল বিজ্ঞানসাধনার প্রধান কেন্দ্র। তাই বিজ্ঞান-সচেতন কবি টেনিসন, দান্তের ইউলিসিস-কে গ্রহণ করিয়া তাহার নাবিক সত্তায় আরোপ করিলেন বৈজ্ঞানিকের জ্ঞানান্বেষণের অন্তহীন পরিপ্রেক্ষিত ;

...This grey spirit yearning in desire
To follow knowledge like a sinking star
Beyond the utmost bound of human thought.

টেনিসন-এর কবিপ্রতিভা দান্তের সমতুল্য ছিল না ; তাই দান্তে-বর্ণিত ভৌগোলিক সত্যের কল্পনাকুশল প্রয়োগের তুলনায় টেনিসন-এর বর্ণনা প্রাচীনতর ভৌগোলিক ধারণার অনুবর্তী। অথচ টেনিসন-এর যুগ দান্তের যুগের চেয়ে সভ্যতার বিবর্তনে অগ্রগামী। তাই দেখিতে পাই দান্তের ইউলিসিস, তাহার ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিল না। কিন্তু টেনিসনের ইউলিসিস, তখনকার বিজ্ঞানের মতো আশাবাদী,—

To strive, to seek, to find and not to yield

বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই আশাবাদে সন্দেহ জাগিয়াছিল। তাই রোমা রোলাঁ বলিয়াছেন, মানুষের নিয়তি হইতেছে,

To strive, to seek, not to find and not to yield.

বিজ্ঞানে আশা নাই অথচ এষণার শেষ নাই, এই মর্মান্তিক অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথকে যাইতে হয় নাই। তাই তাঁহার বৈরাগিনী ভৈরবীর নিরুদ্দেশ চলার রাগিণীতে বৈপরীত্যের 'কাউন্টার পয়েন্ট' তেমন সজোরে বাজিয়া ওঠে নাই, মৃত্যু সহজেই জীবনের মূলে বাসা বাঁধিয়া বিস্মৃতির মর্মে বসিয়া রক্তে দোলা দেয়। বিজ্ঞাননিষ্ঠ আশাবাদ অদৃষ্টবাদী হিতপরিণতির সমীপবর্তী হইয়া পড়ে।

আমাদের চরম আদর্শ ও আমাদের দৈনন্দিন জীবন, ইহার মধ্যে যে একটা অনুত্তরণীয় বৈপরীত্য আছে তাহা অবশ্য এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ জানিতেন। ইহারই বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা আছে চতুরঙ্গে—তাঁহার সামাজিক জীবন-আলেখ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রচনায়। শচীশ জ্যাঠামহাশয়ের ও লীলানন্দের নাস্তিক্যের ও ভক্তিবাদের অসম্পূর্ণতা পরীক্ষা করিয়া দেখার পর নিজের ব্যক্তিগত সাধনায় এই উপলব্ধিতে আসিয়া পৌঁছিল যে আমাদের সাবজেকটিভ ধারণার অতীত এক অবজেকটিভ অসীম আছেন। "এতদিন আমি তাঁকে আপনার মত করিয়া বানাইতে গিয়া কেবল ঠকিলাম। ওগো আমার প্রলয়, আপনাকে আমি তোমার

মধ্যে চুরমার করিতে থাকিব—চিরকাল ধরিয়া।" সাবজেকটিভ-অবজেকটিভ প্রবণতার মৌলিক দ্বন্দ্বে আসিয়া পেঁছিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ এইখানে। কিন্তু শচীশের অসীমের কোনো কর্মরূপ তাঁহার দৃষ্টি-পরিধির বাহিরে ছিল। শ্রীবিলাস শচীশের সহকর্মী বন্ধু; তাহার জীবনেও আদর্শগত বিবর্তন শচীশের অনুরূপ ও শচীশের দ্বারা প্রভাবিত। শচীশের প্রাখর্য তাহার নাই, কিন্তু সাবজেকটিভতাও নাই। যখন যাহা করা প্রয়োজন বলিয়া তাহার যুক্তিতে বলে তাহা সে করে এমন সহজভাবে যাহাতে আত্মলাঞ্ছনার চিহ্ন থাকে না। দামিনীকে ভালো সে বাসে, দামিনীর অন্তর কোথায় তাহা সে জানে, তবু দামিনীকে বিবাহ করিয়া সে বাসা বাঁধিল আদর্শগত কর্তব্যের আহ্বানে। তখন "বাহিরে আমার কাজ আর ভিতরে দামিনীর কাজ এই দুইয়ে যেন গঙ্গাযমুনার স্রোত বহিয়া গেল।" জীবনের শেষ মুহূর্তে দামিনী শ্রীবিলাসের অন্তরের সৌন্দর্য, জীবনের মহত্ত্ব বুঝিতে পারিল। তাই দামিনী পায়ের ধুলা লইয়া এই বলিয়া মরিল, "সাধ মিটিল না, জন্মান্তরে আবার যেন তোমাকে পাই।" আত্মরতিকে জয় করিয়া মানবিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ, মানবসমাজের নূতন জীবনের লক্ষণ। সোভিয়েত দেশে যে নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিতেছে সেখানেও ইহার অগ্রগতির পথে আত্মরতি যে কত বড় বাধা তাহার চিত্র পাওয়া যায় সাম্প্রতিক সোভিয়েত সাহিত্যে। এই নূতন জীবনাদর্শের পূর্বাভাস যেন ফুটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের শ্রীবিলাস-চরিত্রে। তাই বলিয়া শ্রীবিলাসের একক কর্মপন্থা সোভিয়েত জীবনের সুবৃহৎ কর্মপন্থার সহিত একাত্ম, ইহা ভাবিলে ভুল করা হইবে। বিশ্ব-কমিউনিজম্-এর পূর্ণবিকাশ—যখন প্রত্যেক মানুষ কর্মশীল থাকিবে নিজের যথাশক্তি ও গ্রহণ করিবে নিজের যথাপ্রয়োজন—তাহা যে এখন হইতেই দিনের পর দিন ইঁটের পর ইঁট গাঁথিয়া, অসংখ্য বাধাকে অতিক্রম করিয়া অসমানগতিতে অগ্রসর হইতে হইতে সংঘবদ্ধভাবে দৃঢ়সংকল্পের সহিত গড়িয়া তুলিতে হইবে—এই বৈজ্ঞানিক কর্মযোগ তখন আমাদের দেশে প্রায় অজ্ঞাত ছিল। রবীন্দ্রনাথের দর্শন তাই ভাববাদের উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিয়াও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক পন্থা কোনদিন গ্রহণ করিতে পারে নাই—যেমন পারিয়াছিলেন তাঁহার সমকালীন কথা-সাহিত্যিকরা—বারবুস, গোর্কি, রোলাঁ, ড্রাইসার ও লু-সুন। ভারতের অনগ্রসর সামাজিক পরিস্থিতি ছিল ইহার পক্ষে প্রধান অন্তরায়। বৃহত্তম ব্যক্তিগত প্রতিভাও যে সামাজিক কারণে প্রতিরুদ্ধ হয়—রবীন্দ্রনাথের উদাহরণই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। তবুও আমাদের পক্ষে ইহা

পরম গৌরবের কথা যে বিশ্বমানবের কল্যাণের পথে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ইঁহাদের সহযোগী, ও সম্মানিত সহযোগী। আর ধনবাদী জগতের সমবয়স্ক কবিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সকলের চেয়ে অগ্রগামী।

'চতুরঙ্গে' ও 'বলাকা'-য় রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যাহ্ন-দীপ্তি। গতিবিজ্ঞানের নিয়মে মধ্যাহ্ন-বিন্দুতেই নিহিত থাকে অপরাহ্নের সূচনা। রবীন্দ্রপ্রতিভার ক্ষেত্রেও তাহা হইয়াছিল। ইহার পর সামাজিক সত্য তাঁহার অন্তরে জাগাইত সংবেদনা, কিন্তু কবিদৃষ্টি তাহাকে সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিত না। প্রথম মহাযুদ্ধের পর্ব হইতে ভারতে দেখা দিল জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার প্রশ্ন। এই পর্বে রচিত 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের ইহাই হইল মর্মকথা। কিন্তু ভারতের পরাধীন অবস্থায় এই দ্বন্দ্বের যে চিত্র রবীন্দ্রনাথ আঁকিলেন তাহাতে দেখা যায়, জাতীয়তা মূলত বিকৃত ও আন্তর্জাতিকতা অনেকাংশে অক্রিয়। পুরাতন হইতে নূতনের উদ্ভবের প্রশ্নও তাঁহার সমাজ-সচেতন মনকে যে আঘাত করিয়াছিল, তাহা দেখা যায় তাঁহার 'ফাল্গুনী'-তে। কিন্তু সেক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে অত্যন্ত সরলীকৃত রূপে, ঋতু পরিবর্তনের রূপকে। পুরাতনের পরাভব ও নূতনের বিজয় সংসাধিত হইয়াছে যেন অচেতন প্রকৃতির নিয়মক্রমে, মানুষের সংগঠিত কর্মসাধনার ভূমিকা তাহাতে গৌণ। 'পূরবীতে' দেখা দিল সন্ধ্যা রাগিণীর তান, কবির পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখা, স্মৃতি-নির্ভর হইয়া উঠা। জীবনদেবতা এই পর্বে দেখা দিলেন লীলা-সঙ্গিনীর বিচিত্র বেশে, আপন প্রতিভার কীর্তিকে উপভোগের তৃপ্তিতে ও আনন্দে।

কিন্তু রবীন্দ্র-প্রতিভার অপরাহ্নও দ্যুতিমান অপরাহ্ন। বিষুবরেখার সূর্য যেমন অস্তগমনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আলো দেয়, রবীন্দ্রনাথের লেখনীও সেইরূপ তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত কাল পর্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল, রচনায় তাঁহার কখনো ক্লান্তি আসে নাই। কবিতার আঙ্গিক লইয়া তাঁহার নানা উদ্ভাবনা আগামী কালের কবিদের অপার বিস্ময় ও অগাধ কৃতজ্ঞতার বিষয় হইয়া থাকিবে। আর বিস্ময়ের বিষয় হইয়া থাকিবে বয়সের প্রাচীনত্বকে অতিক্রম করিয়া নব-তারুণ্যের উৎসাহ লইয়া কবির সংগ্রাম,—বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে মানবিকতার আবাহনে। অপটু শরীর লইয়াও কবি দেশে দেশে পর্যটন করিয়াছেন সূর্যের মতো, আলোক বিকিরণ করিতে, অন্ধকার দূর করিতে। "পৃথিবীর যে সকল দুর্বল জাতি শক্তিমান নেশনের নিষ্ঠুর শোষণনীতিবলে লাঞ্ছিত ও বসুন্ধরার স্বাচ্ছন্দ্য হইতে বঞ্চিত—আমি তাহাদের

সকলের বেদনাই গভীরভাবে অনুভব করি—তা সে পূর্বেরই হউক আর পশ্চিমেরই হউক।" (রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড)। এই পর্বে মাঝে মাঝে তাঁহার কবিতায় দেখা দিয়াছে সামাজিক অনুপ্রেরণার স্ফুলিঙ্গ-স্ফুরণ, যেমন, 'আফ্রিকা' 'প্রশ্ন' 'বুদ্ধশিষ্যগণের প্রতি'। এই কবিতাগুলিতে তাঁহার সামূহিক চেতনা প্রকট। সোভিয়েত দেশে যে বিপ্লব তখন বীর্যবান আত্মপ্রতিষ্ঠা অর্জন করিতেছিল, তাহার প্রতি তাঁহার আকর্ষণ তাই স্বাভাবিক। আর সোভিয়েত দেশেও তাঁহার যে সংবর্ধনা হইয়াছিল, তাহাও কোন গূঢ় রাজনৈতিক অভিসন্ধি-প্রসূত নহে। রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষপূরণে 'গোল্ডেন বুক অব টাগোর' গ্রন্থে মস্কো হইতে যে অভিনন্দন পাঠানো হয় তাহাতে লিখিত আছে, A thinker reflecting on the Eternal and a Revolution full of today's interest and immediate problems are not enemies. There is no rupture between them, and somewhere high upon the last summit they will hold a friendly meeting. Our Revolution dose not reject the hope of a 'golden age', of a future brotherhood of humanity, the idea which during many thousand years animated all religions and also the best representatives of humanity. The Communist Revolution has traced on its banner the practical realisatian of these ideals.

সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া এই কমিউনিস্ট বিপ্লবের সাফল্য সম্পূর্ণ করিতে লাগিতে পারে শতাব্দীর পর শতাব্দী। ততদিন যখনই যে-কোন দেশে শুরু হইবে মানবিকতার সংগ্রাম, অন্যায়ের প্রতিরোধ আর সুন্দরের স্বপ্ন, তখনই সে-দেশে হইবে রবীন্দ্রপ্রতিভার সম্মাননা। বাঙালী কবির কাব্য তাহার রচয়িতার নাম সার্থক করিয়া নব নব দেশে উদিত হইবে—

গগনে গগনে নব নব দেশে রবি
নবপ্রাতে জাগে নূতন জনম লভি ॥

৩১-১০-৫৪

মেঘনাদবধ কাব্যে সমাজ-বাস্তবতা

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে 'মেঘনাদবধ' রচয়িতার জীবনযুদ্ধের অবসান হইল। যে-প্রতিভার আকস্মিক স্ফুরণে ভারতের কাব্যাকাশে ঘটিয়াছিল নব অরুণোদয়, সেদিন নিবিয়া গেল তাহার দিব্যদীপ্তি। বঙ্গের গৌরব রবি গেলা অস্তাচলে।

মধুসূদনের সাংসারিক জীবনের শোচনীয় পরিণতি স্বভাবতই প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্তরে শোকের আলোড়ন তুলিয়া থাকে, তার সামাজিক দায়িত্ববোধে আঘাত করে। মনে হয় এমনটি হওয়া উচিত ছিল না; তখনকার সমাজের উচিত ছিল এই যুগপ্রবর্তক কবিকে সকল অভাবের ঊর্ধ্বে রাখা, দারিদ্র্যের অভিশাপ হইতে মুক্ত করা। মেঘনাদবধের প্রথম টীকাকার হেমচন্দ্র প্রসঙ্গান্তরে অভিযোগ করিয়াছিলেন,

> হায় মা ভারতি, চিরদিন তোর এই ত অখ্যাতি ভবে,
> যেজন সেবিবে ও পদযুগল সেই সে দরিদ্র হবে।

কিন্তু হেমচন্দ্রের এই অভিযোগে যোগ দিবার অধিকার মধুসূদনের ছিল না। তিনি দরিদ্রের ঘরে জন্মান নাই, চিরদিন দারিদ্র্য-পীড়িত ছিলেন না। তাঁহার দারিদ্র্য স্বোপার্জিত। প্রতিভার অনাদরকে তাহার কারণ বলা যাইতে

পারে না। মধুসূদনের মতো ক্রান্তিকারী কবি তাঁহার সমসাময়িকগণের নিকট যে সমাদর ও স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন তাহা প্রকৃতই বিস্ময়কর। ইহা বাঙালী পাঠকসমাজের কাব্যগুণ বিবেচনার উজ্জ্বলতম নিদর্শন।

মৃত্যুকালে মধুসূদনের বয়স ছিল পঞ্চাশ। কিন্তু তাঁহার দৈহিক জীবনের সমাপ্তির পূর্বেই তাঁহার কবিজীবনের সমাপ্তি ঘটিয়াছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" তাঁহার শেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। নিজের কবিত্বশক্তিসম্বন্ধে মধুসূদনের আত্মবোধ ছিল চিরদিন দৃপ্ত। তবু এই কবিতাগুচ্ছের অনেক সনেটে ধ্বনিয়া উঠিয়াছে বিষণ্ণ অবসাদের সুর, আপন শক্তিহ্রাসে আত্মসচেতন অনুভূতির প্রকাশ। কিন্তু এই অবসাদের পর্বেও কবি নিজেকে লইয়াই একান্তভাবে বিব্রত ও ব্যাপৃত ছিলেন না। এই কবিতাগুলি বিদেশে বসিয়া রচিত, আর কে না জানে আমাদের দেশে বিদেশিয়ানার প্রধান অগ্রদূত ছিলেন মধুসূদন। অথচ এই পুস্তকের ১০২টি সনেটের মধ্যে মাত্র পাঁচটির বিষয়বস্তু বিদেশীয়। ইহা হইতে প্রমাণ হয় না যে শেষ বয়সে মধুসূদনের বিদেশীয় সংস্কৃতিতে বিতৃষ্ণা আসিয়াছিল। তাহা যে আসে নাই—হেক্‌টর বধ-এর কথা ছাড়িয়া দিলেও—বাংলা ভাষায় সনেট প্রবর্তনই তাহার প্রমাণ। ইউরোপীয় সাহিত্যে সনেট মহৎ কবিগণের আত্মপ্রকাশের সুপ্রতিষ্ঠিত মাধ্যম। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই নাকি শেক্‌স্‌পীয়র আপন অন্তরদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। সুতরাং মধুসূদনের তদানীন্তন হৃদয়াবস্থা সনেট-রূপে প্রকাশ পাইবে, ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু কোনো মহৎ-কবি মনোজগতেও একক হইতে পারেন না আপন স্বদেশীয় প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে একান্তভাবে উপেক্ষা করিয়া। তাঁহার সুদূর প্রবাসে মধুসূদনের স্বদেশ তাঁহাকে কিভাবে টানিত তাহার অজস্র নিদর্শন আছে এই সনেটগুচ্ছে। পরাধীনদেশে স্বদেশনিষ্ঠা প্রকৃতপক্ষে পরাধীনতার গ্লানি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না, পারা সম্ভব নয়। কবি মধুসূদনকে সাধারণ বিচারে রাজনীতি-নিরপেক্ষ মনে হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানি তিনিও উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এই প্রসঙ্গে, "আমরা" নামক সনেটটি উদ্ধৃত করা যায়:

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে?
আমরা,—দুর্ব্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,

পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?—
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে ? কে কবে মোরে ? জানিব কি মনে ?
বামন দানব কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?
রে কাল, পুরিবি কি রে পুনঃ নব রসে
রস-শূন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃতকল্পে ? পুনঃ কি হরষে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?

সহজেই চোখে পড়ে মধুসূদনের স্বদেশনিষ্ঠা কূর্মবৃত্তি নহে, বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া স্বদেশের কুকুরকে পূজা করার দুস্বদৃষ্টিপ্রবণতা নাই। মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম মানবিকতার মূল্যবোধে মহীয়ান।

॥ দুই ॥

'মানবিকতাবাদ' শব্দটি প্রথম ব্যবহারে আসে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপীয় সেইসব লেখক ও পণ্ডিতগণের মনোবৃত্তিকে নির্দিষ্ট করার জন্য যাঁহারা নবজন্মের বা রেনেসাঁস-এর প্রভাবে প্রভাবিত হন। এই নূতন জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রে বিধায়করূপে বিরাজমান মানবসমাজ ; তাই ইহা মানবিকতা-বাদ বলিয়া খ্যাত। রেনেসাঁস ইউরোপীয় ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়, কিন্তু ইহার যুগসীমা সুনির্ধারিত নহে। কবে যে ইহার সঠিক আরম্ভ ও কোথায় ইহার শেষ, তাহা লইয়া মতভেদের অন্ত নাই। কিন্তু সামাজিক অগ্রগতির বিচারে ইহার কয়েকটি মূল অবদান, মনে হয়, তর্কাতীত। মধুসূদনের প্রায় সমকালীন মানবিকতাবাদী মার্কিন বক্তা রবার্ট ইংগারসল্ যে 'বিশ্বাস'—ক্রীড্—প্রচার করিতেন, মনে হয় না তাহা মানিয়া লইতে মধুসূদনের কোথাও বাধিতে পারিত। তিনি বলিতেন ঃ

ন্যায় আমার একমাত্র উপাস্য,
প্রেম একমাত্র পুরোহিত,
অজ্ঞান একমাত্র দাসত্ব,
সুখ একমাত্র মঙ্গল।

সুখী হইবার সময়—বর্তমান
আর তাহার দেশ—এই পৃথিবী,
উপায়, সুখী করা অন্যকে ;
জ্ঞান হইতেছে সুখী হওয়ার বিজ্ঞান।

কিন্তু ইহা তো শুষ্ক মতামতের কথা। ইউরোপীয় রেনেসাঁস নিছক মতামতের ব্যাপার নহে, মানবসভ্যতার ইতিহাসে ইহা আনিয়াছিল এক যুগান্ত-কারী উন্মাদনা। এ-উন্মাদনার প্রসার কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ও বিশাল ভূখণ্ড ব্যাপিয়া। স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, চিত্রে, সাহিত্যে, গণিতে, বস্তু-বিজ্ঞানে, ইহার বিরাটত্ব চিরাঙ্কিত হইয়া আছে। এই উন্মাদনার প্রতীকস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে সিস্‌টিন চ্যাপেল-এ অঙ্কিত মিকায়েল আঞ্জেলোর বিরাট চিত্রকে —'আদমের নবজন্ম'। গ্রীকযুগের পর মানবদেহকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করা হইতেছে নবতর জ্যোতিতে ; সে-দেহ অনাবৃত ও অলজ্জিত ; তাহার সবল বাহু, উপবাস-অক্লিষ্ট, জীবনের ও আলোকের দিকে প্রচণ্ড আগ্রহে প্রসারিত। ঐহিক জীবনকে উপভোগ করার উদগ্র কামনা, রেনেসাঁস-এর সহজাত প্রেরণা। এই প্রেরণাই জমাট হইয়া আছে রাবুলে-এর তিনটি বিখ্যাত চরণে :

কান্নার চেয়ে হাসির কথা লেখাই ভালো,
কারণ, হাসিই হচ্ছে মানুষের নিজস্ব অধিকার ;
বাঁচো ফুর্তিতে।

মনে রাখিতে হইবে মিকায়েল আঞ্জেলো-র চিত্রে বা রাবুলে-এর সাহিত্যে জীবন উপভোগের যে-চিত্র প্রতিফলিত, তাহা ক্লীবের নহে, বীরের। এই বীরোচিত সাহস লইয়া তখনকার মানুষ তুচ্ছ করিতে পারিয়াছিল অতি-প্রাকৃতের মায়াপাশকে, ভাঙিয়া ফেলিতে চার্চ-এর অত্যাচারকে, ব্যক্তিকে মুক্ত করিতে মধ্যযুগের শৃংখল হইতে, ও স্বাধীনভাবে স্বপ্রতিষ্ঠ হইতে যুক্তি-প্রয়োগের ভিত্তিতে। এই রেনেসাঁস-এর আদ্যপীঠ ইতালী ও তাহার পরিণত প্রকাশ ইংলণ্ডে, পঞ্চদশ শতকের ইতালীতে জন্মিয়াছিলেন লেওনার্দো, আর ষোড়শ শতকের ইংলণ্ডে শেক্‌স্‌পীয়র।

ইউরোপের রেনেসাঁস পর্বে চেতনার ক্ষেত্রে নবসৃষ্টির যে বিপুল প্রেরণা ও সাফল্য লক্ষ্য করা যায় তাহা ছিল তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় বিরাট বিলোড়নের প্রতিফলন। মানুষের সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টাকে বলা যায় উপরিতলের ব্যাপার, যাহার প্রকৃতি নিরূপিত হয় প্রধানত সামাজিক জীবনের প্রকৃতি দিয়া। আর

সামাজিক জীবনের প্রকৃতি নির্ভর করে সমাজের অভ্যন্তরস্থ অর্থনৈতিক শ্রেণী-সম্পর্কের গুণাগুণের উপর। উৎপাদন পদ্ধতিতে পরিবর্তনের ফলে শ্রেণী-সম্পর্কে কখনো থাকে এক শ্রেণীর আধিপত্য, কখনো ঘটে অন্য শ্রেণীর—এই শ্রেণীগত আধিপত্য পরিবর্তনের ফলে আসে নূতন সমাজব্যবস্থা, নূতন রাষ্ট্রসংগঠন, নূতন সমূহ-চেতনা, নূতন শিল্পসৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। রেনেসাঁস-পর্বে ইতালীতে ও ইংলণ্ডে যে অভূতপূর্ব সৃষ্টিশীলতা দেখা যায় তাহার মূলে ছিল সুদৃঢ়-প্রোথিত ফিউডালী সমাজ-ব্যবস্থাকে বিধ্বস্ত করিয়া নূতন বুর্জোয়া-সমাজ প্রবর্তনের বিপ্লবী উন্মাদনা। সমাজ-ব্যবস্থায় এত বড়ো বিপ্লব ইহার পূর্বে আর ঘটে নাই, তাই ইহার সম্ভাব্যতারও তুলনা ছিল না। বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে নূতন সমাজ-গঠনের প্রচেষ্টা ইতালীতে আংশিকভাবে সফল হইলেও অর্ধপথে অবরুদ্ধ হইল। নানা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে ইংলণ্ডে শ্রেণীসংঘর্ষ প্রচণ্ডতর হওয়ায় ওদেশেই ধনবাদী সমাজের প্রথম স্থায়ী প্রতিষ্ঠা হয়। বৃহৎ শ্রম-শিল্পের প্রসার, জীবিকার্জনে ব্যক্তির বন্ধন-মুক্তি, সুতীব্র জাতীয়তাবোধ ও জনগণের প্রতিনিধি সমন্বিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থা—মানবীয় অগ্রগতির এই প্রকাণ্ড অবদানগুলি ইংলণ্ডেই প্রথম সুস্পষ্ট মূর্তি পরিগ্রহ করে। ইংলণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লব হইয়া ওঠে ভবিষ্যতে ফ্রান্স, জার্মানী প্রভৃতি দেশে ফিউডালী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা। ইংলণ্ডে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান,—শেক্‌স্‌পীয়র, বেকন ও নিউটন—আলোকবর্তিকার মতো সকল দেশের সংস্কৃতিসাধককে তাহাদের জাতীয় সংস্কৃতি-গঠনের পথ দেখাইয়া দেয়। বিশেষ করিয়া সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কারণ ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর প্রকৃষ্টতম সাহিত্য-রূপ ইংরেজী সাহিত্যে। ফ্রান্সে হুগো ও বালজাক, জার্মানীতে গোটে ও শীলার, রুশিয়ার পুশকিন ও লেরমনটভ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ইবসেন ও বিয়র্নসন—সকলেই অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করিয়াছেন ইংরেজী সাহিত্যের নিকট তাঁহাদের ঋণ। কিন্তু কেবল সাহিত্যে নহে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক আন্দোলনের গুরুত্বে ইংলণ্ডের ইতিহাস সমৃদ্ধ। ইংলণ্ডের জীবনযাত্রার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়ার ফলে মার্কস ও এঙ্গেলস্‌-এর জীবনদর্শন ও লেনিনের বিপ্লবী সাধনা পূর্ণতালাভ করে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, মানব-সমাজের অভীপ্সিত পূর্ণমুক্তির পথে বুর্জোয়া-বিপ্লব প্রাগ্রসর পদক্ষেপ হইলেও অসমাপ্ত স্তর। ইহাতে শ্রেণীসংঘর্ষের

অবসান হয় না, শ্রেণী-আধিপত্যের হস্তান্তর হয় মাত্র। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে বুর্জোয়াশ্রেণী জনসাধারণের নেতৃত্বের ভূমিকা পরিত্যাগ করিয়া কঠোরতর শোষণের পরিচালকে পরিণত হয়। তাহার ভয়াবহ কুৎসিতরূপ প্রকটতর হয় ধনবাদ যখন প্রবৃত্ত হয় পরদেশবিজয়ে ও অনুন্নত দেশগুলিকে অবাধ লুণ্ঠনে। ইহাই ধনবাদের সাম্রাজ্যবাদী রূপ। প্রথমত লুণ্ঠনকারীর ভূমিকা লইয়া ইংলণ্ডের ধনবাদ ভারতের ভূমিতে আসিয়া পদার্পণ করিল ও ক্রমে অখণ্ডভারতের অপ্রতিহত অধীশ্বর হইয়া দাঁড়াইল। ভারত হইল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মুকুটে উজ্জ্বলতম রত্ন। ইংরেজের স্বার্থে ভারতে ধনবাদের প্রবেশ ধনবাদের বিশ্বব্যাপী প্রসারের একটি বিশেষ জটিলতাপূর্ণ অধ্যায়। এবং ফিউডালী ভারতের সহিত ধনবাদী ইংলণ্ডের ঐতিহাসিক সংযোগের প্রত্যক্ষ ফল—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

॥ তিন ॥

ইংরেজ বণিকরূপে ভারতের নানা প্রদেশে সুপরিচিত হইলেও তাহার রাজরূপের প্রথম প্রকাশ বাংলাদেশে, পলাশী-বিজয়ে। এ-যুগের ইতিহাসে তাই বাংলার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মার্কস্ যাহাকে বলিয়াছেন “একমাত্র সামাজিক বিপ্লব যাহার কথা এশিয়াতে শোনা গিয়াছে”, তাহার সূত্রপাত হয় বাংলাদেশে ও পরে ভারতের অন্যত্র ছড়াইয়া পড়ে। এই সামাজিক বিপ্লবের প্রধান লক্ষণ, সনাতন গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য যান্ত্রিক শ্রম-শিল্পের ভিত্তিতে নূতন ধনবাদী অর্থনৈতিক উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রবর্তন। পুরাতন ভারতের সহিত নূতন ভারতের ইহাতেই ঘটিল মূলগত ছেদ। কারণ, ভারতের ইতিহাসে অতীত যুগে যতই বৈচিত্র্যময় রাজনৈতিক ঘটনা ঘটিয়া থাকুক না কেন, তাহার অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার ধারা মোটামুটি অব্যাহত ছিল উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত, ইহাই মার্কসের অভিমত। অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার পরিবর্তন সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিফলিত না হইয়া পারে না। তাই বলা যাইতে পারে পলাশী-বিজয়ের তারিখ—১৭৫৭, আমাদের জাতীয় জীবনে যে গুণগত রূপান্তর সূচিত করে, কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপনের তারিখ—১৮১৭, তাহার অবধারিত ফল। এই কলেজ স্থাপনে ভারতে ইংরেজ শাসকের সদভিপ্রায় সূচিত হয় না। ইহাতে শুধুই প্রমাণ হয়, কোনো শাসকশ্রেণী ইতিহাসের অগ্রগতিকে অর্গলিত করিতে পারে না। নিজেদের

অজ্ঞাতসারেও তাহাদিগকে ইতিহাসের উদ্দেশ্যসাধনে সহায়ক হইতে হয়। হিন্দুকলেজ স্থাপনের ফলে, ইংরেজের অনিচ্ছা ও কৃপণতা সত্ত্বেও মার্কসের মতে ভারতে একটি নূতন শ্রেণীর উদ্ভব হয় যাহারা দেশ-শাসনের উপযুক্ত ক্ষমতায় ভূষিত, ও যাহারা ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত। মার্কসীয় পরিভাষায় "শ্রেণী" শব্দটির বিশেষ দ্যোতনা আছে, যাহা সাধারণ ভাষায় প্রযুক্ত "শ্রেণী" শব্দটির সমার্থক নহে। ধনী-দরিদ্র শ্রেণী বা শিক্ষিত-অশিক্ষিত শ্রেণী প্রভৃতি পদাংশে শ্রেণী শব্দটি ব্যবহৃত হয় শিথিল অবৈজ্ঞানিকভাবে। মার্কসীয় বিজ্ঞানে 'শ্রেণী' বলিতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে লেনিন লিখিতেছেন:

শ্রেণীগুলি হইতেছে জনগণের বৃহৎ বৃহৎ গ্রুপ যাহারা পরস্পর হইতে পৃথক হয় সামাজিক উৎপাদনের ইতিহাস-নির্দিষ্ট-সিসটেমে তাহাদের অধিকৃত স্থান দ্বারা, উৎপাদনের উপায়গুলির সহিত তাহাদের সম্বন্ধের দ্বারা (যে সম্বন্ধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ও নিয়মবদ্ধ হয় আইন-সমূহে), শ্রমের সামাজিক সংগঠনে তাহাদেব ভূমিকা দ্বারা, এবং ফলত সামাজিক ঋদ্ধির যে অংশ তাহারা পায়, তাহার পরিমাণ ও প্রণালী দ্বারা। শ্রেণী বলিতে বোঝায় জনগণের গ্রুপগুলিকে যাহাদের একটি অন্যের শ্রম গ্রাস করিতে পারে, সামাজিক অর্থনীতির নির্দিষ্ট সিসটেমে তাহাদের বিভিন্ন স্থান অধিকারের ফলে। [লেনিন, নির্বাচিত রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৩২—৩৩]

এই সংজ্ঞা অনুসারে দেখা যায় নূতন শ্রেণীর উদ্ভব যে-কোনো দেশে যে-কোনো সময়ে হইতে পারে না। তাহার জন্য প্রয়োজন, শ্রমের সামাজিক সংগঠনে এমন পরিবর্তন যাহাতে প্রচলিত শ্রেণীগুলির ভূমিকায় ভারসাম্য বজায় থাকে না, নূতন সামাজিক ব্যবস্থার প্রবর্তন অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ভারতে ব্রিটিশ ধনবাদের অনুপ্রবেশে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়াই এদেশে নূতন শ্রেণী-সৃষ্টিও সম্ভব হইল। ভারতে প্রচলিত ফিউডাল সমাজ-ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ শ্রেণী-সংঘর্ষের ফলে হয়তো কোনোদিন ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আবির্ভাব হইতে পারিত। তাহাই হইত প্রকৃত ভারতীয় ধনবাদ। কিন্তু ইতিহাসের ঘটনাচক্রের গতিতে ভারতে ধনবাদের প্রবর্তন হইল বিদেশী শাসনের ছত্র-ছায়ায়। এই ধনবাদ কখনও সুস্থ ও সবল হইতে পারে না। আর স্বাধীন দেশের ধনিকশ্রেণীও যখন জনগণের স্বার্থকে শেষ পর্যন্ত মানিয়া চলে না তখন ঔপনিবেশিক ধনিক শ্রেণীর নিকটে তাহা আশা করা, ইতিহাসের নির্দেশকে অবজ্ঞা করার নামান্তর! যে সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রার উচ্ছেদ ধনবাদের অবশ্য কর্তব্য, ভারতে ব্রিটিশ ধনবাদ ও তাহার অনুচর ভারতীয় ধনবাদ কেহই তাহা সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করিল না। যে নূতনশ্রেণীর উদ্ভব

হইল তাহা রহিয়া গেল আধা-ফিউডাল ; পুরাতন জীবনাদর্শের মোহ তাহাদিগকে অনেকাংশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পুরানো অবস্থাও টিকিয়া থাকিতে পারিল না। সমাজের জীবনে আসিল গতিশীলতা, আসিল জাগরণ, আসিল স্বাধীনতার স্বপ্ন, আসিল পরাধীনতার গ্লানি, আসিল জ্ঞান-স্পৃহা, আসিল উম্মাদনা। এই নূতন চেতনার প্রধান পুরোহিত রামমোহন ও ডিরোজিও ; এবং এই চেতনার প্রধান রূপকার—মধুসূদন।

॥ চার ॥

মধুসূদনের জীবনচরিত পড়িতে গেলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তাঁহার পক্ষে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার প্রয়াস অপ্রত্যাশিত আপতিক ব্যাপার। হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁহার মত ছিল "বাংলাভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভালো", 'শিব' শব্দের বানানে লাগে 'শ' কি 'ষ' তাহাও তিনি সঠিকভাবে জানিতেন না। বাঙালী-বর্জিত মাদ্রাজ প্রদেশে বাস করিয়া, ইংরেজ মহিলার সহিত সংসার করিয়া, ইংরেজী ভাষায় কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা যশস্বী হইয়া তিনি যখন পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন সাগরদাঁড়িতে শেখা মাতৃভাষার ভাণ্ডার তাঁহার অন্তর হইতে প্রায় অবলুপ্ত বলিলেই হয়। কিন্তু যে-সমাজে বুর্জোয়া অর্থনীতি প্রবেশ করে তাহার অন্যতম প্রধান দাবি হইয়া ওঠে মাতৃভাষার বিকাশ। এই ঐতিহাসিক নিয়মের ব্যতিক্রম বাংলাদেশেও হয় নাই। রামমোহন, অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের প্রযত্নে বাংলা গদ্যের প্রকাশক্ষমতা জন্মের পর হইতেই ক্ষিপ্রগতিতে বাড়িতে থাকে। ইহাতে সূচিত হয়, ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালীর মনে, বিজাতীয় শিক্ষার ফলেই, জাতীয়তাবোধের সঞ্চার হইতেছিল। উক্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ডেভিড হেয়ার-এর তৃতীয় সাংবৎসরিক স্মৃতি-সভায় অক্ষয়কুমার বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া যেন এক নূতন প্রচেষ্টার সূত্রপাত করিলেন ; জাতীয়তাবোধ একবার সঞ্চারিত হইলে তাহা আর শুধু গদ্যে তৃপ্ত থাকিতে পারে না। জাতীয় সংস্কৃত-সম্পদ রচনার আগ্রহ অদম্য কণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করে। যে-বৎসর শুরু হয় মধুসূদনের মাদ্রাজ-প্রবাস, সেই বৎসরেই—১৮৪৮—মধুসূদনের সহাধ্যায়ী সুহৃদ রাজনারায়ণ বসু, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে এক সভায় ঘোষণা করেন যে স্বদেশীয় ভাষায় উন্নতিসাধন স্বদেশবৎসল ব্যক্তিমাত্রেরই একান্ত কর্তব্য, এবং বিদেশীয় মহাকবিগণের রচনা অমৃততুল্য হইলেও তাহা হৃদয়ের তৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করিতে পারে না ঃ

"যথার্থ বলিতে কি হোমর প্লেটো ও সফোক্লিস রচিত চারুতম, নিরুপম কাব্যরস পানের প্রভূত সুখ সম্ভোগ করি, কিম্বা চরিত্র বর্ণনা নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক শেকসপীয়রের অমৃত-ধর্মপ্রাপ্ত নাটক সকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হই, কিম্বা অদ্ভুত সংকল্পনাশক্তি-সম্পন্ন গেটে ও শিলারের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্যার্ণবে মগ্ন হই তথাপি এক আশা অসম্পূর্ণ থাকে এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে, সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন-পূজ্য, বিশাল-খ্যাতি গ্রন্থকার-দিগের যশঃ-সৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা। সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্যক্ষরিত অমৃত-ধারা পান করিবার তৃষ্ণা। হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সেই আশা কবে পূর্ণ করিবে, সেই তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্মভাষায় রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্য দেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে?" (উদ্ধৃতি যোগীন্দ্রনাথ বসুর "জীবন-চরিত" হইতে গৃহীত)।

ইহা হইতে কি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না যে বাংলাভাষায় কলম ধরিবার কথা মধুসূদনের স্বপ্নেও গোচর হইবার পূর্বেই তাঁহার ভবিষ্যৎ শিল্পসৃষ্টি উপভোগ করিবার উপযুক্ত পাঠক বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিয়াছিল? মাদ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসার পর যে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলি মধুসূদনকে বাংলা রচনায় প্রবুদ্ধ করে তাহাদের অন্তরেই কি নিহিত ছিল না ইতিহাসের ইঙ্গিত? ধনবাদী অর্থনীতির প্রভাবে ইউরোপীয় মানবিকতার যে-আদর্শ তখনকার সমাজ-চেতনায় বাঙ্ময় হইয়া উঠিতেছিল মধুসূদনের বাংলা রচনার প্রয়াস তাহারই অনিবার্য কাব্যরূপ। বাংলায় ভালো নাটক নাই, আচ্ছা, আমিই রচনা করিব, অথবা বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োজন আছে কিন্তু সম্ভাবনা নাই, আচ্ছা আমিই তাহা সম্ভব করিব—এই ধরনের উক্তিগুলিকে মধুসূদনের অহংকৃত উচ্চাশার, অথবা অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রতিভার পরিচায়ক বলিলে ইহাদের প্রকৃত মূল্য দেওয়া হয় না। একথা নিশ্চিত মধুসূদনের যশঃ-কামনা ছিল দুর্বার, আর তাঁহার প্রতিভাও ছিল দুর্লভ। সেই সঙ্গে এ-কথাও মানিতে হয় যে কেবল কামনা ও প্রতিভা দিয়াই বৃহৎ-কবির সার্থকতা অর্জন করা যায় না। তাহার জন্য প্রয়োজন একদিকে অনুকূল পরিবেশ, অন্যদিকে ব্যক্তিগত প্রস্তুতি। তাঁহার প্রতিভাবিকাশের অনুকূলে পরিবেশ মধুসূদন পাইয়াছিলেন কপোতাক্ষতীরে জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীতে নয়, অথবা মাতৃভাষা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন মাদ্রাজ প্রবাসের বিজাতীয় সমাজেও নয়। সে অনুকূল পরিবেশ তিনি পাইয়াছিলেন কলিকাতায়,—ছাত্রাবস্থায় হিন্দুকলেজে; এবং লেখকজীবনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পাঠকসমাজে। ফিউডল সমাজ হইতে বুর্জোয়া সমাজের অভিবর্তনের সঙ্গে সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্রও স্থানান্তরিত হয় গ্রাম হইতে শহরে।

বুর্জোয়া সংস্কৃতি প্রধানত নাগরিক সংস্কৃতি। কলিকাতার নাগরিকেরা তখন বাঙালী সমাজের উন্নততর অংশ, এবং বাংলা ভাষার রঙ্গমঞ্চে মধুসূদনের প্রবেশ ইহাদের আনন্দবিধানের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবেশক হিসাবে। কলিকাতার সমাজই গড়িয়া তুলিয়াছিল মানবিকতার প্রথম বাঙালী মহাকবি মধুসূদনকে, যেমন করিয়া, বেন জনসন-এর মতে, সে যুগের লণ্ডন গড়িয়া তুলিয়াছিল মানবিকতার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেকস্‌পীয়রকে।

প্রতিভার স্ফুরণে অপর প্রয়োজন, প্রস্তুতি। এ-ক্ষেত্রেও শেকসপীয়র সম্বন্ধে যেন জনগণ-এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। যতদূর জানা যায়, ইংরেজ সমালোচকগণের মধ্যে বেন জনসনই প্রথম শেকস্‌পীয়রের অলৌকিক প্রতিভা ও বিশাল নাটকাবলীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহাতীত বিশ্বাসবান ছিলেন। শেকস্‌পীয়রের মৃত্যুর সাত বৎসরের মধ্যে প্রকাশিত প্রথম ফোলিও-র ভূমিকায় তিনি যে-কবিতা লেখেন তাহাতেই ঘোষণা করেন যে এই কবি এক যুগের নহেন, চিরকালের। ইহা সত্ত্বেও বেন জনসন শেকস্‌পীয়রের রচনায় বহু ত্রুটি লক্ষ্য করিতেন, ও অতিরঞ্জনের সুরে একবার রায় দিয়াছিলেন যে তাঁহার রচনায় অন্তত হাজার লাইন সম্মার্জনীর অপেক্ষা রাখে। সুশিক্ষিত কবি বেন জনসন শেকস্‌পীয়রের প্রতিভাকে স্বীকার করিয়াও তাঁহার অশিক্ষিত স্খলনকে ক্ষমা করিতে পারিতেন না। কিন্তু ছাত্রাবস্থা হইতে কবিযশঃপ্রার্থী মধুসূদন নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন যে বেন জনসন-এর মানদণ্ডের পরীক্ষাও তিনি সহজে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। রিচার্ডসনের অতুলনীয় শিক্ষার অনুপ্রাণনায় বুর্জোয়া সংস্কৃতির সমৃদ্ধতম কাব্যের সহিত তাঁহার যোগ হয় প্রাণময়। ইহার পর বিশপ্‌স্ কলেজে শিক্ষার সুযোগে তিনি আয়ত্ত করেন লাতিন, গ্রীক ও হিব্রুভাষা। রেনেসাঁস-এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ইউরোপে যে-জ্ঞানোন্মাদনা—বিদ্যার পুনরুজ্জীবন—দেখা দিয়াছিল, স্বীয় প্রতিভাবলে মধুসূদন এ-দেশে বসিয়া তাহার অনুকম্পন অন্তরে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। রেনেসাঁস-এর ফলে ইতালীয় ও ফরাসী ভাষায় যে-কাব্যসম্পদ সৃষ্টি হইল, প্রত্যক্ষ সংযোগে তাহাকেও আত্মসাৎ করিতেও তাঁহার আগ্রহের অন্ত ছিল না। তাঁহার মতে, এক-একটি ইউরোপীয় ভাষায় অধিকারলাভ করা আর এক-একটি বিস্তৃত ভূখণ্ডের অধিকার লাভ করা সমান। তাঁহার ধারণা ছিল কোনও ভাষায় কবিতা রচনার ক্ষমতা না জন্মিলে তাহাতে প্রকৃত অধিকার জন্মিয়াছে, এ-কথা বলা যায় না। মাদ্রাজে

থাকিতে তিনি সংস্কৃত ও তামিল ভাষা শিক্ষায়ও মনোযোগ দিয়াছিলেন। এ হেন প্রস্তুতি লইয়া আর কোন কবি বাংলা ভাষায় কবিতা লিখিতে বসিয়াছেন? তাঁহার জীবনের সমস্ত অমিতাচার তাঁহার কাব্যচর্চার উচ্চাদর্শকে কোনোদিন ব্যাহত করিতে পারে নাই। পারে নাই যে তাহার কারণ তাহাদের উভয়ে একই বৃক্ষের ফল—ইউরোপীয় রেনেসাঁস। জ্ঞান ও কল্পনার প্রাচুর্য, শক্তি ও উপভোগের ঐশ্বর্য—সমুদ্রগামী নাবিকের সম্মুখে চির-অপসৃয়মান দিগন্তরেখার মতো, রেনেসাঁস-চিত্তকে নিরন্তর আকর্ষণ করিত! কোনো বাধাই অলংঘ্য, কোনো লক্ষ্যই অভেদ্য বলিয়া স্বীকার করা তখন ছিল চিন্তার অযোগ্য। তাঁহার মানসিক গঠনে এই রেনেসাঁস-বিভাবের সঞ্চারের ফলেই প্রায় অবাঙালী মধুসূদন বাংলা ভাষায় অভূতপূর্ব কীর্তি সাধনের দায় অংগীকার করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই।

প্রায়-অবাঙালী কিন্তু সম্পূর্ণ বিজাতীয় মধুসূদন ছিলেন না। কারণ কোনো ভাষায় উচ্চশ্রেণীর কাব্য রচনা করিতে গেলে অপরিহার্য প্রয়োজন সেই ভাষার প্রাণশক্তির সহিত সহজাত পরিচয়। বিদেশী ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া সাময়িক খ্যাতি ও পাঠকের বিস্ময় অর্জন করা যায়, স্থায়ী আসন অধিকার করা যায় এমন উদাহরণ পাওয়া যায় না। বর্তমান যুগে বৃহৎ-মাত্রায় আন্তর্জাতিক সংমিশ্রণের আনুকূল্যে হয়তো বিদেশী ভাষায় চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ বা ঘটনাপূর্ণ উপন্যাস লিখিয়া সফল হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, কিন্তু মধুসূদনের যুগে বাংলাদেশে সে-সম্ভাবনা ছিল অভাবিত। সে যুগে একমাত্র বাংলাভাষাই মধুসূদনের প্রতিভার উপযুক্ত বাহক হইতে পারিত। তাহার জন্য অবশ্য এ ভাষাকে ভাঙিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে হইবে। কারণ যে-ভাবাবেগের আধার হইতে হইবে এ-ভাষাকে, তাহা যে পূর্বতন আধেয় হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মধুসূদন জানিতেন যে তিনি একজন "সাহিত্যিক বিপ্লবী"। বিপ্লবের সাফল্যের জন্য বিপ্লবীকে গড়িয়া লইতে হয় নিজস্ব হাতিয়ার—অতীতের ঐতিহ্য তাহাকে ইহা উপহার দেয় না। আবার, প্রকৃত বিপ্লবী অতীতের ঐতিহ্যকে অবজ্ঞাভরে পদদলিত করে না, তাহাকে গ্রহণ করিয়া অতিক্রম করে। ইতিহাসের অনেক পর্বে এ-অতিক্রমণ হয় মৃদুগতি, কিন্তু এমন পর্বও আসে যখন তাহাতে আসে গুণগত পরিবর্তন, ক্রান্তিকালীন উল্লংঘন, যখন আধেয়ের প্রভাবে আধার হয় সাবলীল। আবেগের উপযুক্ত বাহন হইবার নির্দেশে ভাষা যেন নবকলেবর পরিগ্রহ করে, দেখা দেয় প্রায়-অচেনা মূর্তিতে, উৎপাদন করে নব নব বিস্ময়।

রেনেসাঁস-যুগে এহেন রূপান্তর ঘটিয়াছিল ইতালীয়, ফরাসী ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায়। মধুসূদনের প্রতিভা ভারতে নবাগত নূতন বুর্জোয়া চেতনার শঙ্খধ্বনি হইয়া বাংলাভাষার মজা খাতে বহাইয়া দিল নূতন প্রাণকল্লোল, সৃষ্টি হইল 'মেঘনাদবধ'-এর বহুধ্বনিত আরাব, মধুসূদনের অপূর্ব কীর্তি অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

॥ পাঁচ ॥

লক্ষ্য করিতে হইবে, মধুসূদনের ছন্দ-বিপ্লব বাংলা ভাষায় গতিবেগকে খরতর ও অগভীরতাকে গভীরতর করিয়া ধারণ-ক্ষমতাকে প্রগাঢ়তর করিল, কিন্তু তাহার দুই কূল প্লাবিয়া বহিয়া গিয়া অনাচারের তাণ্ডব ঘটিতে দিল না। পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের কাঠামোকে দৃঢ়মুষ্টিতে আঁটিয়া ধরিয়া তিনি তাহাতে ঢালিয়া দিলেন যতিস্থাপনের নানা কৌশল, ভাবস্পন্দনের অবাধ মুক্তি। বাংলা পয়ার তাহার চিরাচরিত একতাল ছাড়িয়া নানা তালে নাচিয়া উঠিল; পদ্যছন্দ তাহার মাত্রাজ্ঞান সম্পূর্ণ নিখুঁত রাখিয়া গদ্যছন্দের মতো কথ্যভাষার নিকটবর্তী হইয়া আসিল। এগুণ অর্জন করিতে না পারা পর্যন্ত অমিত্রছন্দ বৃহৎ কাব্য-রচনার, নাটক বা এপিক রচনার উপযুক্ত মাধ্যম হইতে পারে না। এই ছন্দ-বিপ্লবে ইংরেজীর ব্ল্যাংক ভার্স-ই ছিল মধুসূদনের মডেল। প্রতি লাইনে পাঁচ পর্বের কঠিন নিগড় পায়ে বাঁধিয়া তবে সে-ছন্দ অন্ত্যযমকের মোহ ভাঙিতে পারিয়াছিল। আর মেরুদণ্ড যে পরিমাণে শক্তিশালী থাকে সেই পরিমাণে যেমন জিমনাস্ট চমকপ্রদ শারীরিক কসরত দেখাইতে পারে, সেইরূপ শেকস্পীয়রের শেষ পর্বের নাটকগুলিতে এই পঞ্চপার্বিকতা ভাঙি' ভাঙি' করিয়াও একেবারে ভাঙিয়া পড়ে নাই। দ্রুত সংলাপশীল নাটক না লেখায় বাংলা অমিত্রছন্দের এ-সমস্যার সম্মুখীন না হইয়া মধুসূদন পাশ কাটাইতে পারিয়াছেন। চৌদ্দ অক্ষরের পয়ারকে কি করিয়া শেকস্পীয়রীয় নাটকের ভাষার উপযোগী করা যায়—বাংলার কোনো কবি আজও এ-কর্তব্যে মন দিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। নাটকীয় ভাষাকে কথ্য-রীতির অনুগামী করিতে হইলে, আমাদের সামাজিক সম্পর্কে সম্বোধনের যে তিনটি রূপ প্রচলিত আছে—আপনি, তুমি ও তুই—ইহাদের তিনটিকেই ব্যবহার করিতে হইবে, কোনো একটি বাদ দিলে ভাষা পঙ্গু অথবা ভাব প্রকাশ অপ্রাকৃত হইয়া পড়ে। অথচ, বাংলা নাটকে বা কাব্যে ছন্দে তুমি-র প্রচলনই সর্বাধিক সামাজিক সম্পর্ক নির্বিশেষে; তুই-ব্যবহার নিষিদ্ধ

না হইলেও যথাসাধ্য এড়াইয়া চলা হয় ; আর আপনি-র প্রয়োগ একেবারে নাই বলিলেই চলে। মধুসূদন যে এই সমস্যায় একেবারে অনবহিত ছিলেন না, তাহার অন্তত একটি উদাহরণ আমার স্মরণে আসিতেছে ঃ পঞ্চবটিবনে যোগী-বেশ রাবণকে সীতা বলিতেছেন,

অজিনাসনে বসি,
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরুমূলে ;

কিন্তু তাহার পরের ছত্রেই আছে ঃ

ত্বরায় আসিবে ফিরে রাঘবেন্দ্র যিনি,
সৌমিত্রী ভ্রাতার সহ।

এই উদাহরণ হইতে বোঝা যায়, বাংলা ভাষার প্রকৃতি লইয়া কত সন্তর্পণে মধুসূদন তাঁহার পরীক্ষা চালাইতেছিলেন। ছন্দ-বিপ্লবের নামে ভাষা লইয়া ছিনিমিনি খেলার দুরন্ত নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসে নাই—যেমন বসিয়াছিল ধনবাদী সমাজের ভাঙন দশায় ফ্রান্সে ও ইংলণ্ডে সাম্প্রতিকতার নামে সুর্-রেয়ালিস্ত্দের। ভাষার বোধ্যতা নির্ভর করে প্রধানত দুইটি জিনিসে ঃ তাহার মৌলিক শব্দভাণ্ডার, ও তাহার বাক্যের অন্বয়-শৃঙ্খলা, ইহাই স্তালিনের শিক্ষা। তিনি আরো শিখাইয়াছেন, ভাষায়-রচিত সাহিত্যে ঘটে বৈপ্লবিক পরিবর্তন শ্রেণীসংঘর্ষের ফলে ; কিন্তু ভাষার ঘটে কালগত বিবর্তন, যেহেতু ভাষা শ্রেণী-সংগ্রামের নিয়মাধীন নহে, যেমন নহে, বিজ্ঞানের ফরমুলা বা উৎপাদনের যন্ত্রাবলী। বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থা অবশ্য ইহাদিগকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করিতে পারে। মধুসূদনও প্রচলিত বাংলাভাষাকে ব্যবহার করিলেন তাঁহার বিপ্লবী কাব্যপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে ; তাহার শব্দসম্পদ যথাসাধ্য বাড়াইলেন কাব্যরসের প্রয়োজনে ; অন্বয়ের শৃঙ্খলাকে যথাসাধ্য বিচলিত না করিয়া নূতনত্ব আনিলেন গৌণভাবে। এই জন্যই মধুসূদনের বাংলাভাষা পুরাতন হইয়াও নূতন ; তাহা স্থানে স্থানে কঠিন হইলেও অবোধ্য নহে। অভিধান বা পুরাণের সাহায্যে তাহার অর্থবোধে বাধে না। সুর-রেয়ালিস্ত্দের ভাষার মতো, তাহা ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত ইংগিতে ও অনুষঙ্গে বিভ্রান্তিকর নয় ; তাহা পাণ্ডিত্যের সাজে সজ্জিত হইয়াও জনসাধারণের বোধ্য ভাষা হইবার দাবি করিতে পারে। ভাষার এই প্রসাদ গুণেই মধুসূদন গোষ্ঠীবিশেষের কবি নহেন, বাঙালী পাঠক সমাজের কবি। তবুও যে মধুসূদনের ভাষায় সেকালের বাঙালী এত নূতনত্বের আস্বাদ পাইয়াছিল, তাহার কারণ, ইহা ছিল এক নূতন সংস্কৃতির

ভাষা, নূতন চেতনার প্রকাশ। এই চেতনার বাহন হইয়া মধুসূদনের ভাষাপ্রয়োগ বঙ্গভারতীকে গ্রাম্য সাহিত্য হইতে নাগরিক সাহিত্যে, ও তথা হইতে বিশ্ব-সাহিত্যে আসনগ্রহণের গৌরবের পথে শুভযাত্রা করাইয়া দিল।

॥ ছয় ॥

বিশ্বসাহিত্য বলিতে ইদানিংকাল পর্যন্ত যাহা বোঝাইত তাহা হইতেছে বিশ্বব্যাপী ধনবাদের সাংস্কৃতিক রূপ। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'সাম্যবাদীর ঘোষণায়' লিখিত আছে ঃ

পুরাতন অভাবের স্থলে দেশের উৎপাদন দিয়া যাহা পূরিত হইত, আমরা এখন দেখি নূতন নূতন অভাব, যাহার পূরণের জন্য প্রয়োজন হয় দূর দেশে ও ভূখণ্ডে উৎপন্ন দ্রব্যের। পুরাতন আঞ্চলিক ও জাতীয় নিভৃতির ও স্বয়ং-পূর্তির স্থলে আমাদের সংযোগ হয় সর্বদিকে, আমরা পাই জাতিগুলির বিশ্বব্যাপী অন্যোন্য-নির্ভরতা। আর, পণ্য উৎপাদনে যে অবস্থা, মানস উৎপাদনেও তাহাই। জাতি-বিশেষের মানস-সৃষ্টি সাধারণ সম্পদ হইয়া উঠে। জাতীয় একদেশদর্শিতা ও সংকীর্ণতা উত্তরোত্তর অসম্ভব হইয়া পড়ে. এবং বহুসংখ্যক জাতীয় ও আঞ্চলিক সাহিত্য হইতে উদ্ভূত হয় এক বিশ্বসাহিত্য।

উৎপাদনের যন্ত্রগুলির দ্রুত উন্নতি দিয়া, সংযোগের উপায়গুলিকে অতিমাত্রায় সহজ করিয়া, বুর্জোয়া শ্রেণী সকল জাতিকে, এমন কি বর্বরতমকেও টানিয়া আনে সভ্যতার ক্ষেত্রে। পণ্যদ্রব্যের শস্তা দরকে ইহা ব্যবহার করে ভারি কামানের মতো সমস্ত চৈনিক প্রাচীরকে চূর্ণ করিতে, বিদেশীর নিকট পদানত হইতে অনুন্নত জাতির যে প্রগাঢ় দৃঢ়তাপূর্ণ ঘৃণা তাহাকে জোর করিয়া নোয়াইতে। ইহা সকল জাতিকে বাধ্য করে—অন্যথায় ধ্বংস—উৎপাদনের বুর্জোয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে, ইহা তাহাদিগকে বাধ্য করে, বুর্জোয়া মতে যাহা সভ্যতা তাহাকে নিজেদের মধ্যে প্রবর্তন করিতে, অর্থাৎ নিজেরা বুর্জোয়া হইয়া উঠিতে। এককথায় ইহা সৃষ্টি করে এক নূতন জগৎ, আপন মূর্তি অনুসারে।

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া বাংলা রচনায় প্রথম হাতেখড়ি দিবার সময় হইতেই কেন মধুসূদন বিদেশী আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন। এ কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত প্রবণতার চরিতার্থতা নয়, ভারতে নবাগত বুর্জোয়া অর্থনীতির ইহাই ছিল আন্তরিক দাবী। বাংলা রচনায় তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা নাটকে ও পূর্ণ পরিণতি এপিকে, তাহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই। নাটকে ও এপিকে জন্মগত যোগসূত্র আছে। একই সমাজব্যবস্থা উভয় প্রকারের সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল। ব্যাপক ও গভীর সামাজিক বিলোড়ন ব্যতিরেকে নাটকে বা এপিকে প্রাণসঞ্চার হয় না ; ইহাদের মহত্ত্ব রচয়িতার কলাকৌশলের উপর একান্ত নির্ভরশীল নয়। আর প্রকরণ হিসাবে নাটক ও

এপিকে সমগোত্রীয়তা গ্রীক আমল হইতে স্বীকার করা হইয়াছে। ট্র্যাজেডির সহিত এপিকের সম্বন্ধ-বিচার-প্রসঙ্গে আরিস্টোটল লিখিয়াছেন ঃ

হোমরই একমাত্র কবি যিনি এপিক কাহিনীর যথার্থ অনুপাত জানেন; কখন বর্ণনা করিতে হইবে, আর কখন চিত্রগুলিকে নিজের কথা নিজে বলিতে দিতে হইবে। অন্য কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজেরা গল্প বলিয়া যান সোজাসুজি, নাটকীয় অংশ থাকে খুব কম ও দূরে-দূরে ছড়ানো। হোমর, প্রায় ভূমিকা না করিয়াই, তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে মঞ্চে ছাড়িয়া দেন—নর ও নারী, যাহাদের প্রত্যেকের নিজস্ব চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আছে।

হোমর ছিলেন ইউরোপের লিখন-পূর্ব শ্রুত যুগের কাহিনীকার এপিক কবি। শ্রুত-এপিকের প্রধান উপজীব্য বীররস; ব্যক্তিগত বীরের সাহস ও খ্যাতি অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে-জগতে আর কিছুই ছিল না। বীরের ছিল না কোনো সামাজিক কর্তব্য, কোনো নীতিবোধেরও তাহার প্রয়োজন নাই। একমাত্র বীর্যই তাহার কাম্য। ইতিহাসের বিচারে এ-আদর্শ সেই সমাজেই সম্ভব যাহা আদিম কৌম জীবনের অনড় আচার-অনুষ্ঠান ভাঙিয়া বাহির হইতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে কষ্ট হয় না কেন হোমেরীয় এপিক মধুসূদনের কবি-জীবনে এত গভীর রেখাপাত করিতে পারিয়াছিল। বাংলাদেশের যে-যুগের তিনি বাণী-মূর্তি, তাহাও যে ছিল প্রচলিত সনাতন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিঘাতের যুগ। তবুও হোমেরীয় জীবনাদর্শকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব ছিল না। হোমরের পর ইতিহাসের ধারা বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্তনের সহিত বীরত্বের আদর্শেও ঘটিয়াছে পরিবর্তন। বীরত্বকে আর সামাজিক কর্তব্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। বীর তিনিই, যাঁহার শৌর্যবীর্য বৃহৎ রাষ্ট্রীয় গৌরব গঠনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত। বীরত্বের এই নূতন আদর্শ ভার্জিলের মহাকাব্যে প্রতিফলিত, রচনা হিসাবে যে মহাকাব্য আবার লিখিত-এপিকের আদর্শস্থল। লিখিত-এপিকে ঘটনার গ্রন্থন দৃঢ়তর ও ভাষার কারুকার্য অনেক বেশি আত্ম-সচেতন। বিশেষণের পুনরুক্তি প্রমুখ হোমেরীয় কাব্যলক্ষণ যাহা লিখিত-এপিকে বজায় রাখা হইয়াছে তাহার মূল কারণ প্রয়োজনীয়তা নয়, আদি-কবির প্রতি শিষ্যোচিত প্রণতি। ভার্জিলের শব্দ-চয়নে তীক্ষ্নদৃষ্টি ও বহুল-প্রযত্ন কারুশিল্প মধুসূদন অনুসরণ করিয়াছেন ও সেইসঙ্গে ভার্জিলের দৃষ্টান্তে মধুসূদনও হোমরকে অর্ঘ্য দিতে কার্পণ্য করেন নাই।

ইউরোপীয় রেনেসাঁস-এর ফলে নানাদেশে জাতীয় ভাষাগুলির বিকাশ শুরু হইল। ইতালীয় ফরাসী পর্তুগিজ ইংরেজী প্রভৃতি অর্বাচীন ভাষা গ্রীক ও লাতিনের কৌলিন্যকে সম্মান করিয়াও স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে লাগিল জাতীয় চেতনার বাহন হিসাবে। নূতন ভাষার কবিদের উপর ভার্জিলের প্রভাব ছিল অমেয়। হোমারের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইলেও, তাঁহার প্রভাব অনুভূত হইত ভার্জিলেরও পূর্বগামী হিসাবে। বীরত্বের যে সামাজিক আদর্শ ভার্জিল গৌরবিত করিয়াছিলেন তাহা ছিল রেনেসাঁস-সমাজের ভবিষ্যৎ-বিকাশের সহায়ক। কিন্তু ভার্জিলের কাল হইতে রেনেসাঁস যুগের মধ্যেও কয়েক শতাব্দীর ব্যবধান। ইতিমধ্যে ঘটিয়াছে ভূকম্পনকারী পরিবর্তন, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তর হইয়াছে প্যাট্রিসিয়ান শ্রেণী হইতে বুর্জোয়া শ্রেণীতে। ভার্জিলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারাই অনুকরণে নবীন যুগের মহাকবিরা নূতন যুগচেতনাকে কাব্যরূপ দিতে প্রস্তুত হইলেন। ঈনিয়াস-এর পুরাকাহিনীকে অবলম্বন করিয়া ভার্জিল গাহিয়া গিয়াছেন তাঁহার সমকালীন রোমক সম্রাট অগস্টাস-এর প্রশস্তি; তাস্‌সো ও মিল্টন ভার্জিলেরই মতো আপন আপন দেশের ও যুগের বীরত্ব কাহিনীকে মহাকাব্যাকারে অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাস্‌সো-র এপিক, 'জেরুসালেমের মুক্তি'র প্রকৃত উদ্দেশ্য খ্রীষ্টীয়দের সহিত অ-খ্রীষ্টীয়দের সংঘর্ষে খ্রীষ্টীয়দের বীরোচিত শিভালরি বর্ণনা করা। তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ফেরারা-র দ্বিতীয় আলফন্সোই তাঁহার মনোনীত নায়ক। কিন্তু তিনি ছিলেন অতিনিকটে বর্তমান। প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাকে নায়ক করিলে কল্পনার পক্ষকে ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠার গুরুভারে ভারাক্রান্ত করা হয়। তাই তাস্‌সো বিষয় হিসাবে নির্বাচন করিলেন প্রথম ক্রুসেডের স্বল্প-পরিচিত ইতিহাস যাহার বর্ণনায় কবির কল্পনা পাইবে অবাধ স্বাধীনতা, অথচ যাহাতে আলফন্সোর পূর্বপুরুষকে দেখানো যাইবে বর্তমানের অভীপ্সিত গুণাবলীর মূর্তিমান বিগ্রহের মতো।

ভার্জিলের অন্যতম শিষ্য মিল্টনও ছিলেন তরুণ বয়সে ক্রমওয়েল-এর উৎসাহী ভক্ত ও ইংলন্ডে পিউরিটান কমনওয়েল্‌থ প্রতিষ্ঠাপনের অতন্দ্রিত প্রহরী। ক্রমওয়েলীয় কমনওয়েল্‌থে তাঁহার অন্তরে যে আশা ও উদ্দীপনা জাগাইয়াছিল, ও তাঁহার ব্যর্থতায় রাজবংশের পুনরাগমনে জাগিয়াছিল যে ক্ষোভ ও হতাশা—প্যারাডাইস লস্ট রচনায় ইহারাই ছিল কবির অভিজ্ঞতা-লব্ধ উপাদান। এবং মিল্টন ইহাদেরই প্রক্ষেপণ করিয়াছিলেন স্বর্গমর্ত্য নরকের

পরিবেশে। মানবজাতির আদি-পিতার নৈতিক পতনের সহিত যুক্ত করিয়া তাঁহার মনোভাবকে দিয়াছেন বিশ্বব্যাপী সর্বজনীনতা। ঈনিয়াস যেমন রোম সাম্রাজ্যের, গফ্রে.দা খ্রীষ্টীয় শিভালরি-র, অ্যাডাম সেইরূপ সমগ্র মানব-জাতির প্রতিনিধি বলিয়া কল্পিত। হোমেরীয় এপিকে কাহিনীকার গল্প বলিয়াই পরিতৃপ্ত, তাঁহার সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে কাহিনীর নাটকীয়ত্ব ও সৃষ্ট চরিত্রের অসামান্যতার উপর। কিন্তু নূতন এপিকের দায়িত্ব হইল ইহার সহিত কালে-পযোগী শিক্ষার যোজনা করা। সে যোজনা স্পষ্ট হইয়া পড়িলে কবিত্বের হানি হয়। তাই লিখিত এপিকে প্রয়োজন হয় এমন অলংকরণের যাহাতে এই নীতিপ্রচার অরুচিকর না হয়। এইরূপ গোপনতায় কবিদের লজ্জার কিছুই নাই। তাস্সো লিখিতেছেন ঃ

যদি দেখি ছোট শিশু অসুখে পীড়িত,
ঔষধের পাত্র-মুখে লাগাই মিষ্টতা
যাহাতে লাঘব হয় স্বাদের তিক্ততা,
বঞ্চনায় পানে, থাকে বঞ্চনে জীবিত।

এই পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় প্রকরের এপিকের ভিতর ছিল একটি গভীর মিল—এপিক কাব্যে মনুষ্যচরিতের ক্ষুদ্রতার কোনো স্থান নাই, জীবনের বীরোচিত উন্নততর হর্ষ ও শোক, জয় ও পরাজয় প্রদর্শন করাই এপিক কবির মূল প্রেরণা। মধুসূদনের জীবনী পাঠে জানা যায় তাস্সো ও মিল্টনকে তিনি কি গভীর সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার চোখে দেখিতেন। উচ্চাশী কবি তিনি, তাঁহার ধারণা ছিল কবিত্বে তাস্সো-র সহিত প্রতিযোগিতা যদি বা সম্ভব হয়, মিল্টনের কবিতা স্বর্গীয়, নরলোকে তুলনা-রহিত। বনভূমির নিস্তব্ধ নির্জনতায় সিংহের গভীর গর্জনের সহিতই তুলনীয় ছিল, মধুসূদনের মতে, মিল্টনের কবিকণ্ঠ।

॥ সাত ॥

মিল্টনেরও কয়েক শতাব্দী পরে মধুসূদনের আবির্ভাব বাংলাদেশের কাব্য-ক্ষেত্রে। ইতিমধ্যে ইতিহাস ধাবিত হইয়াছে দ্রুততর বেগে, ধনবাদ আপন বিস্তারের তাগিদে হইয়া উঠিয়াছে, গারগান্তুয়া-র মতো, স্ফীতকায় ও উদর-পরায়ণ; উৎপাদক দেশের সীমানায় আর তাহাকে আঁটিয়া রাখা যায় না। চাই তাহার অবাধ বাণিজ্য ও অন্তহীন উদ্বৃত্ত-মূল্য, ও তাহারই সংরক্ষণে চাই পরদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা। একদিন যাহার কণ্ঠে ছিল মুক্তির উদাত্ত আহ্বান,

হস্তে ছিল ন্যায়ের শানিত খড়্গ, এখন তাহার বাণী হইল শাসনবিধি, হস্তে উঠিল রাজদণ্ড। ক্রমওয়েল-এর পর হইতে পলাশির যুদ্ধ পর্যন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাস বুর্জোয়া শ্রেণীর উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধির ইতিহাস। পলাশীর বিজয়ই তাহাকে সুযোগ দিল সূর্যাস্তহীন সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হইবার। ভারতের ভূমিতে ব্রিটিশ ধনিকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় উদ্ভব হইল এক জটিল পরিস্থিতির। একদিকে তাহা জাগাইয়া তুলিল দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার অচলায়তন হইতে মুক্তি পাইয়া উন্মুক্ত আকাশের তলে বিচরণ করিবার কামনা, ফরাসী বিপ্লবের ব্যক্তি-স্বাধীনতার বাণীও এদেশের তটে আসিয়া আঘাত করিতে লাগিল ; অন্যদিকে চাপিয়া বসিল বিদেশী শাসন ও শোষণ, ভারতের অন্তরাত্মা যেন দেশ ছাড়িয়া বিদেশে বন্দী। এই পরিস্থিতিকে যে কবি কাব্যরূপ দিবে তাঁহার পক্ষে একটি সুস্থ সবল অখণ্ডিত মনোভাবকে আত্মস্থ করা অসম্ভব। বাস্তব পরিবেশের খণ্ডিত অবস্থা তাহার সংবেদনশীল চিত্তকে খণ্ডিত না করিয়া পারে না। মধুসূদনের সমসাময়িক সমাজে তাই একদিকে ছিল উল্লাস—জাতিভেদ, বর্ণভেদ, নরনারীর অধিকারের বিভেদ প্রভৃতি চরাচরিত অনাচারের শাসন হইতে মুক্তির উৎফুল্ল প্রত্যাশা ; অন্যদিকে বিদেশীশাসকের ঔদ্ধত্য, নির্মম হৃদয়হীনতা, নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব প্রভৃতিতে জাতীয় আত্মসম্মানে প্রচণ্ড পদাঘাত। যে ইংরেজ কলেজে পড়ায় বাইরন ও মিল্টন, সেই ইংরেজ সামাজিক জীবনে বাঁচাইয়া চলে 'বাবু'-দের ছোঁয়াচ। দেশের শাসনযন্ত্রে শাসিতের নাই বিন্দুমাত্র অধিকার, জীবনের উন্নতি পথে প্রতিভার নাই কোনো স্বীকৃতি। সে যুগের শিক্ষিত বাঙালী বুর্জোয়া সংস্কৃতির আস্বাদনে মনোজগতে পায় বিস্তার আর বস্তুজগতে বন্ধনরজ্জু। তাই এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ঘোষণা করেন,

গাইব, মা বীররসে ভাসি, মহাগীত ;

যদিও তিনি অন্তরের অন্তরে জানেন যে ইহা প্রকৃতপক্ষে বীররসাত্মক হইতে পারে না। তাই তিনি তাঁহার বন্ধুকে পত্রযোগে জানাইতে কুণ্ঠিত নহেন, "ভয় পেয়ো না, বন্ধু, আমার পাঠককে আমি বীররস দিয়ে বিরক্ত করবো না।" এ হেন যুগাবস্থায় ইউরোপীয় মহাকাব্যের সম্পূর্ণতা অর্জন করা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এ-বোধ মধুসূদনের ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'মেঘনাদ-বধ'-কে এপিক না বলিয়া বলিতেন "ক্ষুদে এপিক" ; এবং ইহার অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও স্থির করিয়াছিলেন তিনি আর কখনো এপিক লেখার চেষ্টাও করিবেন না।

অনেক দরদী পাঠক, অনেক কৃতী সমালোচক 'মেঘনাদবধ' পড়িয়া যে অতৃপ্তি অনুভব করিয়াছেন ঘটনাগ্রন্থনে ও চরিত্রচিত্রণে কবির দ্বিধাগ্রস্তভাব দেখিয়া, তাহার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় কবিচিত্তের অস্থিরতায় বা কল্পনাশক্তির দারিদ্র্যে নয়; তাহা পাওয়া যায় বিদেশী শাসকের অনুকম্পায় ফিউডাল ভারতের ঘনঘোর অন্ধকারে বুর্জোয়া চেতনার স্তিমিত দীপশিখার প্রথম প্রজ্বলনের অনিশ্চিত শিহরণে। ভারতে নবাগত বুর্জোয়া-চেতনার অবস্থা তখন নবজাত শিশুর মতো, 'মেঘনাদবধ' তাহার প্রথম সবল চীৎকারধ্বনি। তাহার অসহায় পরনির্ভরতার মধ্যেও তাই ফুটিয়া উঠিয়াছে ইউরোপীয় নব জন্মের অদম্য আকুতি।

॥ আট ॥

'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "সাহিত্যের কেবল ভালোমন্দ বিচার করিয়াই ক্ষান্ত থাকা যায় না। সেই সঙ্গে তাহার একটা বিকাশের প্রণালী, তাহার একটা বৃহৎ কার্যকারণ সম্বন্ধ দেখিবার আগ্রহ জন্মে।" তিনি ইহাও বুঝিয়াছিলেন, "আমাদের ভাবের সৃষ্টি একটি খামখেয়ালী ব্যাপার নহে। ইহা বস্তুসৃষ্টির মতোই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন।" বলা বাহুল্য, এই মূল্যবান অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথেরও অর্জন করিতে হইয়াছিল বহু সাধনায়। তরুণ বয়সে 'মেঘনাদবধ' সম্বন্ধে তিনি যে উগ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার উগ্রতা সত্ত্বে তাহাতে তীক্ষ্ন সাহিত্যরুচির অবিসংবাদিত সাক্ষ্য ছিল। কিন্তু ছিল না তাহাতে এই পরিণত বিচারবুদ্ধি। কেবল রুচির উপর নির্ভর করিয়াই যে প্রকৃষ্ট সমালোচনা লেখা যায় না, উল্লিখিত উগ্র প্রবন্ধটি তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। বিচার বুদ্ধি বাড়িবার ফলে তিনি ইহাকে অকুণ্ঠভাবে প্রত্যাহার করেন —সাহিত্যিক সততার এই উদাহরণও আমাদের পক্ষে অবিস্মরণীয়। মেঘনাদবধের বৃহৎ ব্যঞ্জনা সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত পাওয়া যাইবে উক্ত 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধেই।

"মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবর্তন দেখিতে পাই। এ পরিবর্তন আত্মবিস্মৃত নহে। ইহার মধ্যে একটা বিদ্রোহ আছে। কবি পয়ারের বেড়ি ভাঙিয়াছেন এবং রাম-রাবণের সম্বন্ধে অনেকদিন হইতে আমাদের মনে একটা বাঁধাবাঁধি ভাব চলিয়া আসিয়াছে স্পর্ধাপূর্বক তাহারও শাসন ভাঙিয়াছেন। এই কাব্যে রাম-লক্ষ্মণের চেয়ে রাবণ-ইন্দ্রজিৎ বড়ো হইয়া উঠিয়াছে। যে-ধর্মভীরুতা সর্বদাই কোন্‌টা কতটুকু ভালো ও কতটুকু মন্দ তাহা কেবলই অতি সূক্ষ্মভাবে

ওজন করিয়া চলে, তাহার ত্যাগ দৈন্য আত্মনিগ্রহ আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। তিনি স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার মধ্যে আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্ম্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-হস্তী-অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পবান; ইহা স্পর্ধা দ্বারা দেবতাদিগকে অভিভূত করিয়া বায়ু-অগ্নি-ইন্দ্রকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; যাহা চায় তাহার জন্য এই শক্তি, শাস্ত্রের বা অস্ত্রের বা কোন কিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অভ্রভেদী ঐশ্বর্য চারিদিকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে, সামান্য ভিখারি রাঘবের সহিত যুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র-পৌত্র-আত্মীয়-স্বজনেরা একটি একটি করিয়া সকলেই মরিতেছে, তাহাদের জননীরা ধিক্কার দিয়া কাঁদিতে যাইতেছে, তবু যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়া কোনো মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাদম্ভের পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। যে শক্তি অতি সাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে তাহাকে যেন মনে মনে অবজ্ঞা করিয়া, যে-শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না বিদায়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল।

কাব্য হিসাবে 'মেঘনাদবধে'র মর্মকথা ইহা অপেক্ষা সুন্দর করিয়া বলা কাহারো পক্ষে সম্ভব নয়। মেঘনাদবধের মূল দ্বন্দ্ব যে ধর্মভীরুতার সহিত ধর্ম-বিরোধিতার, রবীন্দ্রনাথ তাহা স্পষ্ট করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। রাবণ ধর্ম-দ্রোহী বলিয়াই মধুসূদনের মতে চমৎকার লোক, গ্র্যান্ড ফেলো; রাম ও তাহার চেলাচামুণ্ডাদের তিনি ঘৃণা করিতেন, অন্য কোনো দোষে নহে, কেবল তাহারা দেবতাদের মুখাপেক্ষী ছিল বলিয়া। দেবতারাই যে ফিউডাল সমাজ-ব্যবস্থার কল্পনাপুষ্ট প্রতিনিধি। বস্তুবাদী সমালোচকের দৃষ্টিতে এই বিরোধ ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেরই ফল। ফিউডালদের সহিত বুর্জোয়াবাদের সংঘাত বাধিলেই শুরু হয় এই বিরোধিতা। মার্কসবাদের মতে, ধর্মের সমালোচনাই সকল সমালোচনার আদি উৎস। আবার, মধুসূদনের পক্ষে রাম-বিদ্বেষী হওয়ার অর্থ ব্যক্তিগত হিন্দুধর্মবিদ্বেষ বোঝায় না। হিন্দুধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া তবে তিনি খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। ইংলণ্ডে যাইবার প্রলোভনের কথা বাদ দিয়াও বলা যায়, খ্রীষ্টধর্মকে তিনি ভাবিতেন সভ্যতার বাহক—সিভিলাইজিং এজেন্সি। এই নূতন সভ্যতার আলোকে তিনি হিন্দু পুরাণের দেবদেবীদের একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া দেখিলেন নূতন চোখে—রেনেসাঁস যুগের ইতা-লীয় চিত্রকরেরা ও ভাস্করেরা যেমন দেখিতেন খ্রীষ্টান ধর্মের কাহিনীগুলিকে। ধর্মের আচ্ছাদনে ঐহিকতার প্রকাশে তাঁহারা ছিলেন অগ্রণী। হিন্দু পুরাণের প্রধান চরিত্রেরা তাই মধুসূদনের দৃষ্টিতে তখনকার সামাজিক জীবনের নানাশক্তির

আধার বলিয়া প্রতিভাত হইল। রাবণের রাজধানী সৌধকিরীটিনী লংকা ছিল তাঁহার কল্পনায় বুর্জোয়া সভ্যতার কেন্দ্র, রাম-পরিচালিত ফিউডালশক্তি যাহাকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে চাহিতেছে। পরাধীন দেশের কবি হিসাবে এই আক্রান্ত দেশের প্রতিটি চরিত্রের প্রতি তাঁহার অদ্ভুত মমতা। অপরদিকে রামের পক্ষের কাহারো প্রতি তিনি সুবিচার করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার যে টান ছিল না তাহা নহে, কিন্তু কেবল রামের অনুজ বলিয়াই সংকট মুহূর্তে তাহাকে হীনচিত্ত করিয়া আঁকিতে তাঁহার বাধে নাই। বিভীষণ তো দস্তুরমতো বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী। বাল্মীকি ও কৃত্তিবাসের কালে দেশাত্মবোধ বাংলাদেশের চেতনায় ছিল না; ছিল কেবল ধর্মে অনুরক্তি ও পারিবারিক বাধ্যবাধকতা। দেশাত্মবোধ একান্তভাবে বুর্জোয়া চেতনার ফল, যাহা মধুসূদনের যুগে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম উন্মেষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইন্দ্রজিৎ যে কবির প্রিয় চরিত্র ও তাঁহার কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র তাহার কারণ, একমাত্র তাহার চরিত্রই বিশুদ্ধ দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ। রাবণ পিতা হইলেও রাষ্ট্রাধিপতি, সুতরাং তাঁহার পাপপুণ্য ইন্দ্রজিতের বিচার্য নহে। এই সম্বন্ধ পিতাকে পরমং তপঃ বলিয়া ভাবা নয়। দেশ যখন শত্রুবেষ্টিত তখন রাষ্ট্রনায়কের নির্দেশ তর্কাতীত, এই নূতন মূল্যবোধ তাহার চরিত্রে সমুজ্জ্বল। প্রমীলার সহিত তাহার সম্বন্ধও ফিউডাল যুগের স্বামী-স্ত্রীর মতো নহে, রামসীতার মতো নহে। সীতা পতিপরায়ণতার আদর্শ নারী, পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গিতে। সীতা রামের সহধর্মিণী কিন্তু সহকর্মিণী নহেন। মেঘনাদ ও প্রমীলা, উভয়ের যোগ বিবাহের যোগের চেয়ে অনেক গভীর। এ-যোগের মূলে আছে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ পরস্পরের উপযোগিতায়; বীরের পত্নী বীর নারী। নারী হইয়া স্বাধীনা, মুক্তগতি, শৌর্যশালিনী, এ চিত্র বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম রূপায়িত হইল। এই জন্য মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর প্রভৃতি কয়েকজন বিচক্ষণ পাঠকের মতে 'মেঘনাদবধে'র তৃতীয় সর্গই তাহার শ্রেষ্ঠ অংশ, কবির কবিত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মেঘনাদের সহকর্মিণী ভাবিয়া কল্পনা করিয়াও মধুসূদন প্রমীলাকে পূর্বরূপে পারিবারিক বন্ধনমুক্ত করিয়া আঁকিতে সাহস পান নাই। তাহাকে স্বামীর সহগামিনী করিয়া রণক্ষেত্রে আনিতে পারেন নাই। ফিউডাল যুগের টান তাঁহাকে অতদূর অগ্রসর হইতে দেয় নাই। প্রমীলা-চরিত্রকে জীবন্ত ও যথার্থ করিবার মতো নারীর অস্তিত্বও তখনকার বাঙালী সমাজে সম্ভব ছিল না। তবুও বাংলা

সাহিত্যের পরবর্তী যুগে স্বাধীনা নারী-চরিত্রের সৃষ্টিতে প্রমীলাই ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শিকা। মেঘনাদ পুরুষ বলিয়া তাহার চিত্রণে মধুসূদনকে এ বাধা বোধ করিতে হয় নাই। আগামী কালে দেশের মুক্তিযুদ্ধে নিবেদিতপ্রাণ বাঙালী যুবকের আত্মাহুতির প্রথম সার্থকচিত্ত এই মেঘনাদে। মেঘনাদের মৃত্যুতে, যাহাকে অপমৃত্যুও বলা চলে, তাই মধুসূদনের হইয়াছিল সহনাতীত শোক; এই প্রসঙ্গ রচনার সময় তিনি প্রকৃতপক্ষে শারীরিকভাবেও অসুস্থ হইয়া পড়েন। মেঘনাদের মৃত্যুতে রাবণের শোক অপেক্ষা তাঁহার শোক ছিল মহত্তর। রাবণের শোক, বীরপুত্রের অকালমৃত্যুতে পিতার শোক; মধুসূদনের শোক, অতীতের ঐতিহ্যের নিকট ভবিষ্যতের আদর্শের হত্যা। আর একটি পার্শ্বচরিত্রে মধুসূদন বাল্মীকির বর্ণনা হইতে সরিয়া আসিয়া অতি অল্পকথায় নূতন চেতনাকে রূপায়িত করিয়াছেন। জটায়ুর সহিত রাবণের যুদ্ধ রামায়ণের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। কিন্তু বাল্মীকিতে দেখা যায়, অপহৃতা সীতা রাবণের রথ হইতে দূরে জটায়ুকে দেখিয়া শ্বশুরকুলের বন্ধু বলিয়া চিনিতে পারেন ও চীৎকার করিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করেন। এক্ষেত্রে জটায়ুর বীরত্বে সেই পুরাতন পারিবারিক সম্বন্ধের উপরেই জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু 'মেঘনাদবধে' দেখি সীতা সরমাকে বলিতেছেন ঃ

কতক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে
ভয়ঙ্কর! থরথরি আতঙ্কে কাঁপিল
বাজী-রাজি। স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে!
দেখিনু মেলিয়া আঁখি, ভৈরব-মুরতি
গিরি-পৃষ্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে
কালমেঘ। 'চিনি তোরে' কহিলা গম্ভীরে
বীরবর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ।
কোন কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্মতি?
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে
প্রেম-দীপ? এই তোর নিত্য কর্ম্ম, জানি।
অস্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি
বধি তোরে তীক্ষ্ন শরে! আয় মূঢ়মতি!
ধিক তোরে রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর
আছে কি রে তোর সম এ ব্রহ্মমণ্ডলে?

জটায়ুর এই হ্রস্ব উক্তিটিতে নির্যাসের মতো ঘনীভূত হইয়া আছে ইউরোপীয় শিভালরি-র নিঃস্বার্থ বীরত্বের উচ্চ আদর্শ—অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণপাত করা, কোনোরূপ দৈবী আদেশ বা পারিবারিক মর্যাদাবোধ হইতে নহে। সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যে এই একটিবার রাবণ চিত্রিত হইয়াছে এ ব্রহ্মমণ্ডলে অদ্বিতীয় নির্লজ্জ পামর রূপে। সীতা-হরণে রাবণের দায়িত্বের উল্লেখ মধুসূদন সযত্নে পরিহার করিয়াছেন। প্রথম সর্গে বীরবাহুর মাতা চিত্রাঙ্গদা এ প্রসঙ্গ তুলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে কেবল তাঁহার পুত্রশোকে রাবণের প্রবোধ দিবার অবাস্তব প্রচেষ্টাকে তীক্ষ্ন প্রতিঘাত করিবার প্ররোচনায়।

কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম্ম-ফলে,
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।

কিন্তু বীরবাহুর জননী এই বলিয়া আর কিছু না করিয়া "কাঁদি, সঙ্গে সখীদলে লয়ে, প্রবেশিলা অন্তঃপুরে।" এবং কবির পক্ষে ও রাবণের পক্ষে এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ এইখানে চাপা পড়িয়া গেল।

॥ নয় ॥

বস্তুত, রাবণের চরিত্রই মেঘনাদবধ কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্বলতা। স্বয়ং কবি ইহার সম্বন্ধে মন ঠিক করিতে পারেন নাই বলিয়া এই কাব্যে গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত একটি স্বতঃবিরোধিতা থাকিয়া গিয়াছে যাহা পাঠান্তে রসোপভোগে বাধা দেয়, একটি অখণ্ড অনুভূতিকে সমগ্রভাবে স্থায়ী হইতে দেয় না।

সীতাহরণ রামায়ণ কাহিনীর চরিত্রনিরূপক ঘটনা—ইহার সংশ্লেষেই নির্ধারিত হয় রাম বা রাবণের দোষগুণ। বাল্মীকি হইতে কৃত্তিবাস পর্যন্ত এই সংশ্লেষ নানাভাবে বিবর্তিত হইয়াছে। মহাপণ্ডিত য়াকোবী-র মতে রামায়ণ কাহিনীর আদিরূপ পাওয়া যায় "দশরথ-জাতকে"। এইক্ষেত্রে তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই। কারণ তাহাতে না আছে সীতাহরণ, না আছে হনুমান, না আছে রাবণ। সেখানে রাম ও সীতা বিবাহিত সহোদর-সহোদরা—ইজিপ্টের পটলেমি বংশীয়দের মতো। এইরূপ বিবাহ যখন লোকচক্ষে হেয় হইয়া ওঠে, তখনই সীতার জন্মবৃত্তান্তে আরোপ করা হয় অলৌকিকতা। রাজা জনকের লাঙলের ফলায় মাটি হইতে সীতাদেবীর আবির্ভাবের ইহাই নাকি, য়াকোবী-র

মতে, ঐতিহাসিক রহস্য। বাল্মীকির রাম, রবীন্দ্রনাথের মতে, গার্হস্থ্য-প্রধান হিন্দু সমাজের যত কিছু ধর্ম আছে তাহারই অবতার। রাম যে রাবণকে মারিয়াছিলেন, সে কেবল ধর্মপত্নীকে উদ্ধার করিবার জন্য—অবশেষে সেই পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেও কেবল প্রজারঞ্জনের অনুরোধে। আর কৃত্তিবাসের রাম, রবীন্দ্রনাথের মতে, ভক্তবৎসল রাম। তিনি অধম পাপী সকলকেই উদ্ধার করেন। রাবণও শত্রুভাবে তাঁহার কাছ হইতে বিনাশ পাইয়া উদ্ধার হইয়া গেল।

'মেঘনাদবধে' রাম-রাবণের সম্বন্ধ অনেক বেশি জটিল, নতুন সমাজ-চেতনার প্রভাবে। ফিউডালবাদের প্রতিনিধি রাম কবির চক্ষে হেয়, আর বুর্জোয়াবাদের প্রতিনিধি রাবণ তাঁহার প্রেয়। কবির অভিপ্রায় অনুসারে কাহিনী রচিত হইলে রাবণের হইত জয় ও রামের পরাজয়। এই ধরনের কাহিনী তিনি খুঁজিয়া পাইলে খুশি হইতেন ও তাঁহার কবিত্বের আবেগকে বিনা দ্বিধায় বীররসে আপ্লুত করিতে পারিতেন। তাঁহার দুঃখ এই যে এমন বিষয় তিনি না পাওয়ায়, যাহাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী সেই রাক্ষসদের গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তাঁহার কল্পনার উদ্দীপক হিসাবে। মেঘনাদবধ রচনার অব্যবহিত পরেই কলিকাতায় মহরম-এর কোলাহলের পর তিনি বন্ধু রাজনারায়ণকে পত্রযোগে জানাইতেছেন :

> "ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যদি কোন বৃহৎ কবির উদ্ভব হইত, হাসান ও তাহার ভ্রাতার মৃত্যুকে অবলম্বন করিয়া কি বিরাট এপিক লেখাই না তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল। সমস্ত জাতির অনুভূতিকে সে নিজের পক্ষে টানিতে পারিত। আমাদের এমন কোন বিষয় নাই।"

মধুসূদনের বিপদই ছিল এইখানে। তিনি জানিতেন তাঁহার প্রিয় রাবণের পক্ষে সমগ্র জাতি নাই। সীতার দুঃখে তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হয় কিন্তু তাহার জন্য লঙ্কাধিপতি রাবণকে সরাসরি দায়ী করিলে মেঘনাদবধ রচনায় যে নিগূঢ় সামাজিক উদ্দেশ্য তাঁহার কল্পনাকে পরিচালিত করিতেছিল তাহার কার্যকারিতা ব্যর্থ হয়। অথচ রামায়ণের গল্পকে অবলম্বন করিয়া তাহার মূল প্রতিপাদ্যকে একেবারে অবহেলা করা চলে না, রাবণকে তাহার কৃত পাপের ফলভোগী হইতেই হয়। এই উভয় সংকটে পড়িয়া কবি তাঁহার কল্পিত রাবণের বিরাট সম্ভাবনাকে খর্ব করিয়া তাহাকে নিয়তির ক্রীড়নকে পরিণত করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যাহা তাঁহার বুর্জোয়া-চেতনার সহিত একান্ত অসঙ্গত। প্রাক্-বুর্জোয়া যুগের

মহাকবি হোমরের প্রভাব এই প্রসঙ্গেই বেশি ফুটিয়াছে। অথচ হোমরের যাহা শ্রেষ্ঠ গুণ—আকিল্লেস, ওদিসেয়ুস, দিউমেদ প্রভৃতির মতো শক্তিমান চরিত্রও তাঁহার প্রিয় রাক্ষসদের মধ্যেও তিনি আঁকিতে পারেন নাই। বেশিরভাগ স্থানেই রাবণকে দেখানো হইয়াছে পুত্রশোকাতুর পিতার ভূমিকায়। হেক্টর-এর মৃত্যুতে প্রিয়াম-এর শোকের সহিত ইন্দ্রজিতের মৃত্যুতে রাবণের শোকের তুলনাও সংগত নহে। দুই কবির উদ্দেশ্য বিভিন্ন। ট্রয়বাসী বীরগণের শোকের গভীরতা দিয়া হোমর দেখাইতে চাহিয়াছেন গ্রীক-বীরগণের শৌর্যের পরাকাষ্ঠা। মধুসূদনের উদ্দেশ্য ঠিক তাহার বিপরীত, রাবণের শোকের মহত্ত্বে রামের বিজয়গর্বকে খর্ব করা। অথচ কোন হিসাবে রাবণ রামের চেয়ে বেশি সমাদরের পাত্র তাহা এই কাব্যে কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলা নাই। রাবণের পুত্রস্নেহের চেয়ে রামের ভ্রাতৃস্নেহ কোনো অংশে কম নহে। যাহার জন্য ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এত আয়োজন সেই সীতাকেও মধুসূদনের রাম পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত—নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি। বুর্জোয়াবাদের সহিত ফিউডালবাদের সংঘর্ষের কাহিনীতে বুর্জোয়াবাদের বিজয়ে যাহা হইতে পারিত বিশ্বসাহিত্যের উপযোগী এক বিরাট এপিক, তাহা হইয়া দাঁড়াইল দুইটি ফিউডালবাদী পরিবারের অকারণ কলহের চিত্র, যাহাকে মধুসূদন বলিয়াছেন এপিক্‌লিং। যাহা হইতে পারিত ঘটনাবহুল তাহা হইয়া রহিল বর্ণনাবহুল। বিশ্বব্যাপী বিপ্লবের যে তীক্ষ্ণ তরবারি উত্থিত হইয়াছিল ইউরোপীয় স্বাধীনদেশগুলির সামাজিক সমুদ্র-মন্থনে মেঘনাদবধ কাব্যে তাহার দ্যুতি আচ্ছাদিত গরিমায় প্রকাশ পাইয়া নিমজ্জিত হইল এক স্নেহপ্রবণ দুর্বৃত্তের শোকাশ্রু-সাগরে। পরাধীন দেশের প্রতিকূল পরিবেশে মধুসূদনের বিপ্লবী কবিপ্রতিভা অস্তমিত হইল এই করুণ পরিণতিতে।

॥ দশ ॥

তবুও তিনি চিরকাল পূজিত হইবেন নবচেতনার কবি বলিয়া। ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার সৃষ্টিতে নূতন বাঙালীকে তিনিই দিয়াছেন নূতন রসের অমৃতাস্বাদ। জাতীয় জীবনে উন্মাদনার যুগ শেষ হওয়ায় তাঁহার কবিতার প্রভাব পরিমিত হইয়া আসিলেও চিরদিন তিনি বাঁচিয়া থাকিবেন 'কবির কবি' রূপে। তাঁহার প্রভাবকে বাদ দিয়া বাংলা ভাষায় উচ্চসাহিত্য রচনা করা অসম্ভব। বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার ঐতিহাসিক স্থান ইংরেজী-সাহিত্যে মার্লোর অনুরূপ;

স্বইন্‌বার্ন-এর বিচারে, মার্লোই প্রথম ইংরেজী কবিতাকে আকাশগামী করিতে পারিলেন, তিনি প্রথম আনিয়া দিলেন সেই নূতন বিশালতা, যাহাকে বলা যায় সাব্‌লিমিটি। সমস্ত ইংরেজ কবিগণের মধ্যে তিনিই প্রথম পূর্ণবয়স্ক পুরুষ। তাই দেখি, চরিত্রচিত্রণে ও সমাজচেতনায় বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের অনুগামী; তাঁহাদের প্রকৃতিতে অবশ্য ছিল পার্থক্য, যেমন মার্লোর ছিল তাঁহার অনুগামী শেকস্‌পীয়রের সহিত। মার্লোর প্রবর্তিত ব্ল্যাংক ভার্স—বেন জনসন যাহাকে আখ্যা দিয়াছিলেন 'মাইটি লাইন'—তাহাই যে শেকস্‌পীয়র, মিল্টন, এমন কি টেনিসনেরও প্রয়োগ-নৈপুণ্যের মূলসূত্র, ইহা সমালোচকমহলে স্বীকৃত। আধুনিক বাংলা পয়ারছন্দের যে বিচিত্র ইন্দ্রজাল, বলা চলেনা কি যে মধুসূদনের অমিত্রছন্দই তাহার মূল প্রস্রবণ? মার্লো একাধারে পণ্ডিত ও কবি। তাঁহার কবিত্বের আবেগ ও পাণ্ডিত্যের স্পৃহা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেখানে তাঁহার পাণ্ডিত্যের সবচেয়ে বেশি প্রকাশ, তাঁহার কবিত্বের সবচেয়ে বেশি প্রকাশও সেইখানেই। মধুসূদনও ছিলেন তাঁহার যুগে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও অদ্বিতীয় কবি। কাব্যরচনায় তাঁহার অকুতোভয় উচ্চাদর্শ ও অনলস প্রস্তুতি, অনাগত যুগের কবিকুলের নিকট হইয়া থাকিবে অসীম বিস্ময়ের আধার। যে ফিউডালবাদের বিরুদ্ধে কবিতার মাধ্যমে মধুসূদন হানিয়াছিলেন প্রথম সবল আঘাত, আজিও তাহাকে শেষ আঘাত হানা হয় নাই। যে বুর্জোয়া-বিপ্লবের তিনি ছিলেন প্রথম কবি আজিও তাহা অসমাপ্ত। সে বিপ্লবের একান্ত পরিসমাপ্তি সমাজবাদের সংস্থাপনে। এই অবশ্যকর্তব্য বিপ্লবের পথে অগ্রগমনে আগামী-কালের কবিরা তাঁহার জ্যোতির্ময় প্রতিভায় পাইবে অবিনশ্বর অনুপ্রেরণা।

মার্কসবাদী বঙ্কিম-বিচার

॥ এক ॥

সমসাময়িক বাঙলা সাহিত্যের অগ্রগতির সহিত যাঁহাদের অল্পবিস্তর পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন যে সাহিত্য ও ললিতকলার বিচারে সম্প্রতি একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ইহার নাম, সংক্ষেপে বলা যায়, মার্কসবাদ।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশ্য উদ্ভবের পর হইতে মার্কসবাদকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে নানা প্রতিকূল বিরোধিতাকে অতিক্রম করিয়া। ইহার প্রাণশক্তি যে পুঁথিগত তত্ত্বকথায় নিবদ্ধ নহে, সমগ্র মানবসমাজের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্র-নৈতিক বিপ্লবী বিকাশে ইহার সক্রিয়তা যে অনন্যসাধারণ, তাহা অতি দ্রুত বাগ্‌বিতণ্ডার সীমানা পার হইয়া সাধারণ স্বীকার্যের পর্যায়ে উন্নীত হইতেছে। রুশিয়া, চীন ও নূতন গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে অতীত দারিদ্র্য ও দুর্দশার গুরু-ভার হইতে সবলে মুক্ত হইয়া স্বাধীন ও সুখী সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জনগণের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা ইহার অবিসংবাদিত প্রমাণ। ইহা সত্য যে এই প্রমাণকে মার্কসবাদীরা যেরূপ অকুণ্ঠচিত্তে বিশ্বাস করে, অন্যান্যের পক্ষে সেরূপ সম্ভব নয়। তবে একশত বৎসরের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে ইহা

আর অস্বীকার করা যায় না যে ধনবাদের বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠাকে সংকুচিত করিয়া মার্কসবাদের পরিধি প্রতিদিন ব্যাপকতর হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি পঞ্চশক্তির শান্তিচুক্তির প্রস্তাবের সমর্থনে স্বাক্ষর-সংগ্রহের অভিযানে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, জনসংখ্যার হিসাবে পৃথিবীর অধিকাংশ অধিবাসী মার্কসবাদের নির্দেশ মানিয়া লইতে প্রস্তুত।

অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এই অভাবিত সাফল্য সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, মার্কসবাদের বৃহত্তর দাবি এখনও পর্যন্ত অনেকাংশে উপেক্ষিত। মার্কসবাদের বৃহত্তর দাবি এই যে, ইহা একটি সামগ্রিক জীবন-দর্শন, এমন একটি জীবন-দর্শন যাহা প্রচলিত পূর্বতন ভাববাদী ও জড়বাদী দর্শনের চেয়ে পূর্ণতর, এবং যাহার ভিত্তি হইতেছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূল সূত্রগুলি। ইহাদের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণ মার্কসবাদিত্বের দাবি করা চলে না।

কিন্তু দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূলসূত্রগুলি মানিয়া লইলেই মার্কসবাদী সংস্কৃতি-কর্মীদের বিপদ কাটে না। মানবিক সংস্কৃতি নিত্য বিবর্তনশীল। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে অর্থনৈতিক সম্পর্কে প্রকারভেদে ইহার গতি দ্রুত অথবা বিলম্বিত। কারণ, অর্থনৈতিক সম্পর্কের বনিয়াদের উপরেই রচিত হয় সংস্কৃত-সৃষ্টির উপরিতল। জনগণের সংহতিবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে এই বনিয়াদের পরিবর্তন ঘটে বলিয়া ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। সাংস্কৃতিক ফলপুষ্পের ব্যক্তিগত উপভোগের সময় আমরা মূলের সহিত ইহাদের সম্পর্ক মনে না রাখিতে পারি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মূল্য বিচারে এই সম্পর্কের স্বরূপ-নির্ণয় অপরিহার্য হইয়া পড়ে। মনে রাখিতে হইবে, বনিয়াদের সহিত উপরিতলের সম্পর্ক মোটেই স্বচ্ছ বা প্রত্যক্ষ নহে। গ্রহমণ্ডলীর সহিত সূর্যের সম্বন্ধের মতো, নাক্ষত্রিক বিশ্বের সহিত সৌর জগতের সম্বন্ধের মতো, দৃষ্টি-অগোচর অণু-পরমাণুর সহিত বিশ্বধ্বংসী শক্তি-সঞ্চরণের সম্বন্ধের মতো, নিসর্গের আপাত-স্থিরতার সহিত ভৌগোলিক পরিবর্তনশীলতার সম্বন্ধের মতো, মানবসমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদের সহিত সাংস্কৃতিক উপরিতলের সম্বন্ধকেও বৈজ্ঞানিক পন্থায় অনুশীলন করিতে হয়। বলা বাহুল্য, এই পথ বিঘ্নসংকুল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকিলেও বিজ্ঞানীর সিদ্ধান্তমাত্রই বিজ্ঞানসম্মত না হইতে পারে, অন্য বিজ্ঞানীর গ্রহণযোগ্য না হইতে পারে। বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাংস্কৃতিক সমস্যার মার্কসবাদী

বিশ্লেষণেও তাই উদ্ভব হইতে পারে মতভেদের। তখন ইহার সমাধান খুঁজিতে হয় পরস্পর-আলোচনায়। মার্কসবাদীর সহিত অ-মার্কসবাদীর বিতর্ক হইতে ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ, এখানে আলোচনার সীমানা নির্ধারিত থাকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের মূলসূত্রগুলির দ্বারা। রোগীর চিকিৎসা লইয়া এলোপ্যাথিক ডাক্তারদের মধ্যে মতভেদ হইলে তাঁহারা হোমিওপ্যাথি বা কবিরাজির শরণাপন্ন হন না, নিজেদের অধীত বিজ্ঞানের সুষ্ঠুতর প্রয়োগের দিকে দৃষ্টি দেন। কয়েক বৎসর পূর্বে ফ্রান্সে সাংস্কৃতিক সমস্যা লইয়া যে গুরুতর মতভেদ হয় তাহার প্রতিধ্বনি আমাদের দেশেও জাগিয়াছিল। আমাদের দেশে এ-আলোচনা প্রকৃত মার্কসবাদীগণের ভিতর সীমাবদ্ধ না থাকায় নানা অবান্তর প্রশ্নের জটিলতায় তাহা বিফল অসমাপ্তিতে নির্বাণ লাভ করে। কিন্তু ফ্রান্সে তাহার পরিণতি হয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য কমরেড কাসানোভার সঠিক বিশ্লেষণ ও বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তে। আমাদের দেশে তাহার পর আসিল কমিউনিস্ট পার্টির অপ্রকৃতিস্থ হঠকারিতা, সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে যাহার অনিবার্য ফল হইল সাময়িক উদ্‌ভ্রান্তি ও অবসাদ। তাই সম্প্রতি ইংলন্ডে কডওয়েল-এর কৃতিত্ব সম্বন্ধে ইংরেজীভাষী মার্কসীয় পণ্ডিতমহলে যে-আলোচনা চলিতেছে, সে বিষয়ে আমাদের দেশেও উপযুক্ত আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু হইতেছে না। সোভিয়েৎ দেশেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক আলোচনার উদ্ভব হইয়াছিল মার্কসবাদী অধ্যাপক মার-এর ভাষাবিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় কয়েকটি সিদ্ধান্ত লইয়া; এই আলোচনার তীব্রতা এমন স্তরে পেঁছায় যে শেষ পর্যন্ত স্তালিনকে আসরে অবতীর্ণ হইতে হয় লেখনীহস্তে। প্রশ্নোত্তর-প্রণালীতে লিখিত স্তালিনের মন্তব্যগুলি মার্কসবাদী প্রয়োগের মহামূল্য নিদর্শন। কিন্তু ইহাদের লইয়া বাঙলা ভাষায় কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা আজও আমার চোখে পড়ে নাই।

॥ দুই ॥

বাঙালী মার্কসবাদীগণের এই আপেক্ষিক উদ্যমহীনতার মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার প্রণীত "বঙ্কিম-মানস" সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। লেখক তাঁহার এই রচনাটির উপহার দিয়াছেন "নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি নির্মাণের কাজে নিয়োজিত কর্মীবন্ধুদের করকমলে"। তিনি স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহেন যে তিনি নিজেও একজন রাজনৈতিক কর্মী, ও এই গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন

করিয়াছেন সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মের ফাঁকে ফাঁকে। ইহার পরে বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না কেন তিনি সাহিত্য-জিজ্ঞাসায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের প্রয়োগে বিশ্বাসবান। যে আলোচনাধারার মূলে প্রতিপাদ্য শিল্পরচনার প্রধান উদ্দেশ্য নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টি ও ইতিহাস-নিরপেক্ষ শাশ্বত রসবোধের প্রকাশ, লেখক তাহা হইতে নিজেকে সযত্নে পৃথক করিয়া রাখিয়াছেন। "আমি বঙ্কিমচন্দ্রকে সমকালীন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ, সংস্কৃতি ও সম্পর্কের মধ্যে স্থাপন করিয়া, কিভাবে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও সনাতন হিন্দু চিন্তাধারার বিরোধের মধ্য দিয়া তাঁহার মন ও শিল্প বিবর্তিত হইয়াছে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।"

তাঁহার সাহিত্য-জিজ্ঞাসার বিষয়বস্তু হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে নির্বাচন করিয়া লেখক তাঁহার সতর্ক মূল্যজ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া কথাসাহিত্যের, গতি-প্রকৃতি বুঝিতে হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদানের ও প্রভাবের আলোচনা সর্বপ্রথম করণীয় বলিয়া দাবি করিতে পারে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, দীনবন্ধুর গুরুত্বের লাঘব ইহাতে সূচিত হয় না। কেননা দীর্ঘকাল ধরিয়া একই সঙ্গে অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি ও তীক্ষ্নদৃষ্টি চিন্তানায়কত্বের যে-সংযোগ বঙ্কিমচন্দ্রে ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহার পূর্বগামী ও সহকর্মীদের ভিতরে দেখা যায় না। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র উপযুক্ত বংশধর। রামমোহনের গরিমা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তাহা সত্ত্বেও তিনি লিখিতেছেন ঃ

> 'রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে মুক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলি-মৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলা ভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থই মাতৃভূমি হইয়াছে! এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিয়াছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান ঘটে ১৩০০ সালের ৩০শে চৈত্র। শতাব্দীর শেষ দিনে বঙ্কিমচন্দ্রের দেহাবসান রবীন্দ্রনাথের নিকট একটি বিশেষ তাৎপর্যে ভরিয়া উঠে। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে লিখিত ও শোকসভায় পঠিত প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে তিনি আবেগের সহিত ঘোষণা করেন যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন তাঁহার ও তাঁহার সমকালীন লেখকদিগের গুরু।

'সেই বাংলা লেখকদিগের গুরু, বাংলা পাঠকদিগের সুহৃদ, এবং সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা বঙ্গভূমির মাতৃবৎসল প্রতিভাশালী সন্তানের নিকট বিদায় গ্রহণ করি, যিনি জীবনের সায়াহ্ন আসিবার পূর্বেই, নূতন অবকাশে নূতন উদ্যমে নূতন কার্যে হস্তক্ষেপে করিবার প্রারম্ভেই, আপনার অপরিম্লান প্রতিভারশ্মি সংহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যাকাশ ক্ষীণতর জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর হস্তে সমর্পণপূর্বক গত শতাব্দীর বর্ষশেষের পশ্চিম দিগন্তসীমায় অকালে অস্তমিত হইলেন।'

॥ তিন ॥

শ্রীযুক্ত পোদ্দারের গ্রন্থটি হাতে লইয়া পড়িবার পূর্বে পাতা উল্টাইয়া গেলেও তাঁহার মার্কসবাদী প্রবণতার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা পরিশিষ্ট ক-এ। এটি হইতেছে একটি কালানুক্রমিক তালিকা, "সমকালীন ঘটনার পরিবেশে বঙ্কিমজীবনী"। বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম যদিও ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে, পরিশিষ্টে তালিকা শুরু হইয়াছে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে—সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বৎসর যখন মার্কস ও এঙ্গেলস্ প্রণীত "সাম্যবাদী ঘোষণা" প্রকাশিত হইয়া সমগ্র মানবজাতির চিন্তায় ও কর্মে এক অভূতপূর্ব বিপ্লবের সূচনা করে। মার্কসবাদী ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে এইরূপ একটি পরিশিষ্টের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইত না। পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করিলে দেখা যায় লেখক আরম্ভ করিয়াছেন বঙ্কিমচন্দ্রের বংশতালিকা দিয়া নয়, কাল ও বিবর্তনের বিশ্লেষণ দিয়া। "বঙ্কিম-যুগের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের জন্য তাহার পূর্বগামী কালের পরিচয় আবশ্যক।" বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বগামী কালে যে গভীর সামাজিক বিক্ষোভ পরিলক্ষিত হয় তাহার ঐতিহাসিক পটভূমিকার বর্ণনা দিয়া বলিতেছেন ঃ

'শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন এই বিষয়-চেতনা স্থানকাল-চেতনা বিকাশ লাভ করিতেছিল, যখন আত্মপ্রকাশের চাঞ্চল্য সমাজের সর্বাঙ্গে অনুভূত হইতেছিল, এবং যে মুহূর্তে সামাজিক ভারসাম্য রীতিমত ক্ষুণ্ণ হইতে চলিয়াছে সেই যুগসন্ধিক্ষণে বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম ও সাহিত্য জীবনের সূত্রপাত।'

মার্কসবাদী হিসাবে লেখক বিবর্তনবাদকে মানিয়া চলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট সাহিত্যকে তাই তিনি তিনটি পর্বে ভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন কিভাবে তাঁহার প্রতিভা পর্ব হইতে পর্বান্তরে বিকাশ লাভ করিয়াছে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রেরণায়। ইহার আছে তিনটি পরিচ্ছেদ। "রূপায়িত মানুষ"—ভারতে ইংরেজ আগমনের ফলে আবির্ভূত হইল যে নূতন নরনারী, যাহাদের পরস্পরের সম্পর্ক নানা জটিলতায় সমৃদ্ধ ও যাহারা হইতেছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর প্রধান

উপজীব্য তাহাদের বিশেষত্বের বিশ্লেষণ; "স্বদেশ-ধর্ম"—বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সমগ্রতার মধ্যে যে নাদ প্রবলতম আবেগের সহিত স্পন্দিত তাহার প্রকৃত স্বরূপের আলোচনা; "ভাবীকালের ইশারা"—বঙ্কিমচন্দ্র স্বকীয় ঐতিহাসিক পরিবেশ দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়াও অনাগত সাহিত্যসাধকদের জন্য কী সম্পদের উত্তরাধিকার দিয়া গেলেন তাহার পরিমাপ। এই সংকীর্ণ সংক্ষিপ্তসার হইতেও বোঝা যাইবে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত পোদ্দার গতানুগতিক পথে পরিভ্রমণ করেন নাই। নূতন দর্শনের দীপ্তির আলোকে অপরিচিত পথে সত্যান্বেষণের অভিযান করিতে তিনি পশ্চাৎপদ নহেন। তাঁহার এ-অভিযান সর্বথা অভিনন্দনযোগ্য।

॥ চার ॥

শ্রীযুক্ত পোদ্দারের এই গ্রন্থখানি আকারে বৃহৎ না হইলেও ওজনে ভারী, তাঁহার নির্বাচিত বিষয়বস্তুর গুরুত্বে ও তাঁহার প্রযুক্ত বিচার-পদ্ধতির বিশেষত্বে। তাই পড়িতে বসিয়া যতটা আশা লইয়া আরম্ভ করা যায় তাহার পরিপূরণ না হওয়ায় দুঃখ লাগে। সাহিত্য-জিজ্ঞাসায় তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন, কিন্তু তাহার উপযোগী পরিভাষা যথাসম্ভব পরিহার করিয়া চলিয়াছেন। হয়তো তিনি ভয় পাইয়াছেন পরিভাষা কণ্টকিত রচনা সুখপাঠ্য হইবে না। হয়তো তিনি ভাবিয়াছেন ইহা দ্বারা তাঁহার থিসিস-এর পরীক্ষকগণকে অকারণ বিরূপ করা হইবে। ইহাতে তাঁহার আপাত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও স্থায়ী মর্যাদা রক্ষা হইয়াছে কি না সন্দেহ। মার্কসবাদের মতে সাহিত্য ও শিল্প-আলোচনাও বিজ্ঞান-সাধনার অঙ্গ। প্রত্যেক বিজ্ঞানের আছে স্বকীয় পরিভাষা, যাহা বাদ দিলে প্রকাশিত বক্তব্যে থাকিয়া যায় অস্বচ্ছতা, অস্পষ্টতা, অনুপযোগ। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা যখন নিজেদের আলোচ্য বিষয় সাধারণের বোধগম্য করার জন্য পরিভাষা বর্জন করিয়া লেখেন তখন তাহা আর বিজ্ঞান থাকে না। জীনস্ ও এডিংটন প্রভৃতির বিখ্যাত গ্রন্থগুলি তাহার উদাহরণ। মনে হয় শ্রীযুক্ত পোদ্দার অনুরূপ বিপদ এড়াইতে পারেন নাই। উদাহরণ স্বরূপ নেওয়া যাইতে পারে তাঁহার পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথমাংশ, যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন ইতিহাসের কালের গতির।

'কোন কালই আপনাতে আপনি সমৃদ্ধ অথবা স্বয়ম্ভু নয়। সমাজ-মানুষের স্বাভাবিক গতি ও বৈচিত্র্যের ন্যায় তাহারও জন্ম আছে, বিকাশ আছে, আবার তেমনি মৃত্যু আছে।

সুতরাং কোন কালকে জানিতে হইলে প্রয়োজন তাহার জাতপত্রের ; এই যুগের সার্থক পরিচয়ের জন্য কোন্ পরিবেশ, কোন্ কোন্ সামাজিক শক্তির ক্রিয়ার এবং ঘাতপ্রতিঘাতের তরঙ্গে ইহার আবির্ভাব, তাহা জানা অপরিহার্য। ইতিহাস অবিশ্রান্ত ধারায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, ঐতিহাসিক বিবর্তনের কোন স্তরেই স্থির নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া থাকা সম্ভব নয়। তাই, বিকাশের সহজ নিয়মেই কাল কালান্তরে পরিণত হয়। এই কালান্তরে প্রবেশের মুখে ইতিহাস কোন্ কোন্ শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে, ইহার গতিপথের স্বরূপ কি তাহা নিরূপণ করিতে পারিলে নূতন কালের বিকাশধারা এবং ইহার যুগ-বৈশিষ্ট্য অনুধাবন ও উপলব্ধি করা যায়। আবার কাল-প্রবাহের অমোঘ অনুশাসনে যখন এই কালেরও অন্তর্ধানের সময় আসিবে, তখন তিরোধানের লগ্নে সে কোন্ নূতন কালকে সৃষ্টি করিয়া যাইবে, কালের বর্তমান স্বরূপের মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ পাওয়াও সম্ভব।

সুতরাং প্রত্যেক কালই একই সময়ে অতীতে ও ভবিষ্যতে প্রসারিত। অতীত তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছে, পক্ষান্তরে সে ভবিষ্যৎকে সৃষ্টি করিবে। কালের এই পারম্পর্যের জন্যই প্রত্যেক কালকে তাহার অতীত এবং ভবিষ্যতের সহিত সম্পর্কিত করিয়া বিচার করিতে হয়।'

এই অংশটি লিখিবার সময় লেখকের মনে কি ছিল জানা যায় না, যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা মার্কসবাদের মূল ভিত্তি হইতে সরিয়া গিয়াছে অনেক দূরে। কালের গতি আছে, কালের বিবর্তন আছে, ইহা স্বীকার করিলেই মার্কসবাদ হয় না। 'বিকাশের সহজ নিয়মে', 'কালপ্রবাহের অমোঘ অনুশাসন' প্রভৃতি ফ্রেজগুলি মার্কসীয় দর্শন অপেক্ষা হেগেলীয় দর্শনের বেশি উপযোগী। এমন কি যেখানে সামাজিক শক্তির ক্রিয়া ও ঘাতপ্রতিঘাতের উল্লেখ আছে তাহাও মার্কসবাদের পক্ষে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। কারণ মার্কসবাদ সকল সামাজিক শক্তির সকল ঘাত প্রতিঘাতকে সমান মূল্য দেয় না। উক্ত উল্লেখ মার্কসবাদ অপেক্ষা পরিবেশ-বাদের নিকটতম, যে-মতবাদের প্রধান প্রবর্তক ফরাসী সাহিত্য-সমালোচক তেন আমাদের দেশে সুপরিচিত। কোন্ বিশিষ্ট সামাজিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত ইতিহাসকে গতিশীল করে, সমাজকে আলোড়িত করে, পুরাতন সমাজব্যবস্থার গর্ভ হইতে নূতন সমাজব্যবস্থার জন্মদান করে, তাহার সুস্পষ্ট সূত্র বজ্রকণ্ঠে বিঘোষিত আছে 'সাম্যবাদী ঘোষণার' প্রথম পর্বের প্রথম ছত্রে :

'এ পর্যন্ত বর্তমান সকল সমাজের ইতিহাস হইতেছে শ্রেণী-সংঘর্ষের ইতিহাস।'

মার্কসবাদীর দৃষ্টিতে শ্রেণী-সংঘর্ষের উল্লেখ বাদ দিয়া কোনো সামাজিক বিবর্তনের বাস্তব ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। শ্রীযুক্ত পোদ্দারের গ্রন্থে মাঝে মাঝে শ্রেণীর উল্লেখ আছে, কিন্তু শ্রেণী-সংঘর্ষের উল্লেখ বিরল ; আর শ্রেণী-সংঘর্ষের

ফলেই যে সামাজিক চেতনায় বিপ্লব ঘটে, যে-বিপ্লব প্রতিফলিত হয় সেই সময়কার জাতীয় বৃহৎ সাহিত্যে—অর্থাৎ মার্কসীয় পরিভাষায় যাহাকে বলা যায় 'বনিয়াদের সহিত উপরিতলের সম্পর্ক'—তাহার বিশ্লেষণ বিরলতর। একথা ঠিক, সমগ্র বঙ্কিম সাহিত্য জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ, কিন্তু লেখক তাহার উৎস খুঁজিয়াছেন শিল্পী বঙ্কিমের মানসিক দ্বন্দ্বে, তাঁহার চিত্তে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও সনাতন হিন্দু চিন্তাধারার বিরোধের মধ্যে।

'বঙ্কিমচন্দ্রের মন ছিল পশ্চাতে, কিন্তু চোখ ছিল সম্মুখে। পাশ্চাত্য দার্শনিকদের যুক্তিবাদ এবং বৈজ্ঞানিকদের নির্মোহ তত্ত্বানুসন্ধান প্রণালী তাঁহার বুদ্ধিকে প্রদীপ্ত করিয়াছিল। নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে তিনি সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, বিদেশীশাসনের স্বরূপ, সামাজিক বৈষম্যের উৎস ইত্যাদি উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাঁহার রাষ্ট্রচিন্তায় বলিষ্ঠতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাঁহার মন ছিল অতীতের মোহময় স্বপ্নময় ইন্দ্রপুরীতে। তাই বুদ্ধির কথার সঙ্গে মনের কথার অপরিহার্য বিরোধ দেখা দেয়। বঙ্কিম-মানসে এক ঘোরতর সংকট সমুপস্থিত। একদিকে যুক্তিহীন আবেগ, অপর দিকে নির্মোহ যুক্তিবাদ, এই দুই পরস্পরবিরোধী প্রবাহের ঘাতে-প্রতিঘাতে তাঁহার মন ভয়ংকর আলোড়িত হইতেছে।'

বঙ্কিম-মানসের যে-সংকটের চিত্র এখানে আঁকা হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু আংশিক সত্য। মার্কসবাদী সাহিত্যিক মাত্রেরই জানার কথা টলস্টয় সম্বন্ধে লেনিনের কতকগুলি বিখ্যাত প্রবন্ধ আছে। সাহিত্য জিজ্ঞাসায় দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী নীতির প্রয়োগের পথে এই প্রবন্ধগুলি আলোক-চিহ্ন-স্বরূপ। শ্রীযুক্ত পোদ্দারের গ্রন্থ পড়িয়া সন্দেহ হয় এইগুলির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। জানিতে ইচ্ছা করে তিনি লেনিনবাদকে মার্কসবাদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করেন কি না। টলস্টয়েরও ছিল মানস-সংকট, বঙ্কিমের অনুরূপ। ইহার সম্বন্ধে লেনিন লিখিতেছেন ঃ

'টলস্টয়ের মতামত ও চিন্তাধারায় স্ববিরোধ অকারণ আপতিক ঘটনা নহে, ঊনিশ শতকের শেষ তৃতীয়াংশে রুশ-জীবনে যে স্বতোবিরোধী অবস্থা ছিল, ইহা তাহারই প্রকাশ।'

এই উক্তিকে আরো পরিষ্কার করিয়া তিনি পুনরায় লিখিতেছেন ঃ

'টলস্টয়ের মতামতে বিরোধগুলি কেবলমাত্র তাঁহার স্বকীয় চিন্তার অভ্যন্তরস্থ বিরোধ নহে, তাহারা হইতেছে প্রতিচ্ছবি সেই সমস্ত অতি জটিল স্বতোবিরোধী অবস্থার, সামাজিক প্রভাবের ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের, যাহা রুশীয় সমাজের বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন শ্রেণীর মানসিক সংগঠনকে ছাঁচের মতো গড়িয়াছে, সংস্কারোত্তর কিন্তু প্রাক্‌-বিপ্লবী যুগে।'

বলা বাহুল্য, সংস্কার বলিতে লেনিন বুঝাইতেছেন ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীতদাস প্রথার অবলোপ, ও বিপ্লব বলিতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে জার-তন্ত্রের

বিরুদ্ধে রুশ জনগণের প্রথম অভ্যুত্থান। লেনিনের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে রাখিলে শ্রীযুক্ত পোদ্দার তাঁহার বঙ্কিম-আলোচনায় অনেক অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন।

॥ পাঁচ ॥

লেনিনের সূত্রের অনুসরণে বলা যাইতে পারে বঙ্কিম-রচিত সাহিত্য হইতেছে বাঙলা দেশের নানাশ্রেণীসমন্বিত সামাজিক সংস্থানের শিল্পকুশল প্রতিচ্ছবি এবং এই সংস্থানের দুই সীমা হইতেছে, একদিকে সিপাহী বিদ্রোহ ও অন্যদিকে স্বদেশী আন্দোলন। ইতিহাসের এই পর্ব অবশ্য তাহার পূর্বতন পর্বের উপর নির্ভরশীল, যাহার সূচনা পলাশীর রণাঙ্গনে ইংরেজের বিজয়ে ও ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রথম প্রতিষ্ঠায়। এই পরাধীনতার স্বরূপ না বুঝিলে আমাদের জাতীয় জীবনের কোনো ঘটনার বা আন্দোলনের সত্যনিষ্ঠ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। শ্রীযুক্ত পোদ্দার তাই উপযুক্তভাবেই শুরু করিয়াছেন সেই ঐতিহাসিক ছেদ হইতে যেখানে আরম্ভ হইল আমাদের সামাজিক জীবনে এক অভূতপূর্ব নূতন অধ্যায়। উপযুক্তভাবেই তিনি শুরু করিয়াছেন মার্কসের ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত প্রবন্ধে ভারতে ইংরেজ শাসনের দ্বৈত রূপের উল্লেখ করিয়া। কিন্তু ইহার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তিনি করিয়া বসিয়াছেন এক বিরাট অত্যুক্তি। তাঁহার মতে, ইংরেজ-শাসন "ভারতীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে **ধ্বংস করিয়াছে**," ইংরেজ-শাসনে ঘটিয়াছে, "পূর্বতন ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক শ্রেণীসমূহের **ক্ষমাহীন অবলুপ্তি**।" ভারতের ইংরেজ-শাসন যদি প্রকৃতই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোকে ধ্বংস করিত, তাহা হইলে আজ ভারতের সামাজিক চেহারা হইত একেবারে ভিন্নরূপ। কিন্তু তাহা ঘটে নাই, এবং ঘটিতে পারে না বলিয়াই ঘটে নাই। ইংরেজ ভারতে আসিয়া ধনবাদের পত্তন করে বটে কিন্তু সামন্তবাদকে সযত্নে জিয়াইয়া রাখিয়াছে। সামন্তবাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ধনবাদের উদ্ভব, সামন্তবাদ তাই ধনবাদের প্রত্যক্ষ শত্রু; সেই কারণে ব্রিটিশ ধনবাদ ভারতে সামন্তবাদের বিরোধিতা করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরাধীন দেশের বিদেশী শাসক ও শোষক হিসাবে ভারতীয় ধনবাদের উদ্ভব ও বিকাশকে অবদমিত করাও তাহার প্রত্যক্ষ স্বার্থ। ইহাই হইতেছে ভারতে ইংরেজ শাসনের মার্কস-বর্ণিত দ্বৈত রূপ। এই দ্বৈত রূপের ফলে ইংরেজের শাসনে ভারতে জনগণের উপর চাপিয়া বসিল নূতন

ধনবাদী শোষণভার ও তাহার অধীনে রহিল পুরাতন সামন্তবাদী নিপীড়ন—দুর্বলতর কিন্তু সজীব। এই দ্বৈত রূপের ফলে ভারতীয় চিন্তানায়কগণের সামাজিক চেতনাতেও দেখা যায় দ্বৈত রূপঃ একদিকে সমৃদ্ধতর ধনবাদী সংস্কৃতির উপর শ্রদ্ধা ও দেশীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি বিরাগ, অন্যদিকে বিজাতীয় শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও পরাধীনতার গ্লানির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদের আত্মপ্রকাশ।

ইংরেজ-শাসনের এই দ্বৈত রূপ প্রথম হইতেই স্থির ও নিরাকৃত হইয়া যায় নাই, কালের গতির সহিত তাহার উদ্ঘাটন হইয়াছে পর্বে পর্বে। এ যুগের বাঙালী সংস্কৃতিরও তাই ঘটিয়াছে পর্বে পর্বে রূপান্তর। কিন্তু ইহাদের মূলে আছে বিদেশ হইতে আনীত ধনবাদের প্রভাব। ভারতে ধনবাদের প্রবেশ বিশ্বব্যাপী ধনবাদের প্রসারের ইতিহাসে একটা অধ্যায় এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইংলণ্ডের আকাশে প্রথম উড়িল ধনবাদের জয়পতাকা, আর সেই ইংলণ্ডের সহিত স্থাপিত হইল ভারতবাসীর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। এই নূতন কুটুম্বিতায় বাঙলা ছিল অন্য প্রদেশের চেয়ে অগ্রগামী। বাঙালী সংস্কৃতি তখন সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির অগ্রজ-রূপ, প্রোটোটাইপ। বাঙলার পল্লীপ্রধান সংস্কৃতি এই ধনবাদের তাড়নে নব-কলেবর পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইল। এই নবজন্মের সংস্কৃতিতে তাই আমরা দেখিতে পাই সামন্তবাদী জীবনযাত্রার সুকঠোর সমালোচনা, শাস্ত্রের স্থলে বিজ্ঞান, গোষ্ঠীর স্থলে জাতি, ক্ষুদ্রের স্থলে বৃহৎ, গ্রামের স্থলে বিশ্ব, আচারের স্থলে বিচার, অন্ধ বিশ্বাসের স্থলে স্বচ্ছ যুক্তি, পরলোকে স্বর্গসুখের পরিবর্তে ইহলোকে জীবন-সম্ভোগের গভীর উন্মাদনা। সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিলে এ উন্মাদনাতে নূতনত্ব কিছু নাই। যখনই যে দেশে সামন্তবাদের বৈপরীত্যে ধনবাদের বিজয়বার্তা ঘোষিত হইয়াছে তখনই ফুটিয়াছে সেই দেশের সাহিত্যে বৃহৎ-ব্যক্তির অভিযানের কাহিনী, জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার আকুল আগ্রহ, ও মানব-মুক্তির জয়গাথা। তবে ইংরেজের শাসনাধীনে ইংরেজী সংস্কৃতির সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে এই নবাগত বাঙালী সংস্কৃতির উপর সমগ্রভাবে যেন ছাপ পড়িল প্রতিধ্বনি-শীলতার। সে-সাদৃশ্য সব সময়ে সচেতন অনুচিকীর্ষার ফল নহে। দেশভেদে ও কালভেদে পার্থক্য না থাকিয়া পারে না। তবুও মনে হয়, সার টমাস মোর-এর পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞানস্পৃহা ও উদার মানবিকতা রামমোহনে প্রতিফলিত, একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মসমাজের আদর্শই তাঁহার ইউটোপিয়া। মাইকেলে ফুটিয়াছে

মার্লোর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা, অসাধারণ কবিপ্রতিভা, ব্যক্তিত্বপ্রকাশের উদ্দাম আবেগ ও পুরাতন ভাষার ছন্দে নূতন ধ্বনিসৃজনের অপরূপ আঙ্গিক দক্ষতা। ইংলণ্ডে পিউরিটান আন্দোলনের প্রারম্ভে ছিল যে ব্যক্তিগত তেজস্বিতা ও শুচিতার প্রতি শ্রদ্ধা, বাঙলা দেশে বিদ্যাসাগর তাহার প্রতিভূকল্প। ধনবাদী বিপ্লবের ফলে নরনারীর মানবিক সম্পর্কগুলিতে যে অসংখ্য জটিলতার উদ্ভব হইল তাহার বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য রূপায়ণের জন্য শেকসপীয়রের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি। বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমের প্রতিভা শেকসপীয়রের সমগোত্রীয়, বালজাকের যেমন ফ্রান্সে। আর উনিশ শতকের ইয়োরোপীয় সাহিত্যে যে বহুমুখী প্রতিভাবান মানবিকতাবাদীগণের আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহাদের রচনার সহিত আমাদের পরিচয় প্রধানত ইংরেজী ভাষার কল্যাণে,—যেমন হুগো বা গ্যেটে—আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের প্রতিকল্প।

॥ ছয় ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান উপন্যাসগুলি নাটকধর্মী। তাই রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনায় তাহাদের আকর্ষণ প্রখ্যাত নাটকগুলির অপেক্ষা কোনো অংশে কম নহে। অথচ উপন্যাসকার হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাধারণত সার ওয়ালটার-স্কট্-এর সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। দুর্গেশনন্দিনীর সহিত 'আইভ্যান-হো'-র গল্পগত সাদৃশ্যই বোধহয় ইহার মূল ভিত্তি। বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানত 'আইভ্যান-হো'-র অনুকরণ করিয়াছিলেন কি না, সে প্রশ্ন অবান্তর ও অকিঞ্চিৎকর। আসল কথা এই যে উভয়েরই ঐতিহাসিকতার পিছনে যে অনুপ্রেরণা তাহাতে ছিল মূলগত পার্থক্য। স্কট্-এর অনুপ্রেরণা একান্তই পশ্চাদমুখী, তৎকালীন সমাজের বাস্তব চিত্রাঙ্কণের শিল্পগত দাবিকে উপেক্ষা করিয়া অতীতের কল্পনার মধ্যে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ। বঙ্কিমের অনুপ্রেরণা তাহার বিপরীত। সামন্তবাদের সহিত ধনবাদের সংঘর্ষে দেশের সামাজিক ব্যবস্থায় ও তাহার প্রভাবে সামাজিক মানসে যে নূতন চেতনার সঞ্চার হইয়াছিল বঙ্কিমচন্দ্রের অনুপ্রেরণা ছিল তাহাকে রূপায়িত করা। ধনবাদী সমাজের প্রধান লক্ষণ সমাজ-কাঠামোর প্রতিঘাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ধনবাদী সাহিত্য তাই প্রধানত, ব্যক্তিমানসের বিস্তারের চিত্রণ ও বিশ্লেষণ। আমাদের দেশে ধনবাদী সাহিত্যের এই প্রবণতার প্রথম সার্থক উদাহরণ বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'। ঐতিহাসিক অনুপ্রেরণার এই দিকটি শ্রীযুক্ত

পোদ্দার সুষ্ঠুভাবেই আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু ধনবাদী তরঙ্গের অভিঘাতে ব্যক্তিমনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে যখন তিনি লেখেন যে, "ব্যক্তিমনের এই বিস্তৃতির সহিত **সমান্তরাল ভাবে** সমাজ-মানসও বিস্তৃতি লাভ করে" তখন মনে হয় তিনি মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধি বজায় রাখিতে পারেন নাই।

মার্কসবাদের মতে, ব্যক্তি-মানসের সহিত সমাজ-মানসের সম্পর্ক সরল সমান্তরালতা নয়, তাহা জটিল ও দ্বান্দ্বিক। যে-কোন মহৎ শিল্পী তাঁহার সমসাময়িক সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক শ্রেণীসম্পর্কসঞ্জাত সামাজিক চেতনার অতিরিক্ত স্তরে উঠিতে পারেন না। এখানে সামাজিক চেতনা প্রথম, ব্যক্তিমন দ্বিতীয়। কিন্তু সামাজিক চেতনার নানা স্তরে নানা বৈচিত্র্য। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ চেতনার একই স্তরে অবস্থিত নহেন। এমন কি একই শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ বেশি সচেতন, বেশি সংবেদনশীল, বেশী প্রকাশক্ষম। এইখানেই ব্যক্তিমনের বিশেষত্ব, এইখানেই বৃহৎ ব্যক্তিদের সামাজিক ভূমিকা। তাঁহাদের চিন্তা, কর্ম বা শিল্প প্রথমত তাঁহাদের সমশ্রেণীর ব্যক্তিগণের হৃদয়-সংবেদ্য হইয়া উঠে ও ক্রমে সমাজদেহে পরিব্যাপ্ত হইয়া সর্বাঙ্গে জাগায় প্রাণচাঞ্চল্য। ব্যক্তির প্রতিভা তখন সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এইভাবে ব্যক্তিমানস ও সমাজমানসের মধ্যে অবিরত ঘাত প্রতিঘাত চলিতে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার বর্ণনা করিতে গিয়া যদি বলা যায়—যেমন বলিয়াছেন শ্রীযুক্ত পোদ্দার—একদিকে সৃষ্টিশীল মন, অন্যদিকে সৃষ্টিকারী পরিবেশ, এই দুই সত্যের পূর্ণ সঙ্গতির মধ্যেই একটি একক বিশেষ সত্য গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহা হইলে বস্তু ও মনের পরস্পর-নির্ভরতা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমতাও স্বীকার করা হয়। অর্থাৎ বস্তু ও মন উভয়ে তুল্যমূল্য। মার্কসবাদ এ ধারণা স্বীকার করে না। বস্তু ও মনের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কে মনের আছে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা, মন শেষ বিশ্লেষণে বস্তুর প্রকৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ। "মানবের চেতনা তাহার অস্তিত্বকে নিরূপিত করে না, পরন্তু তাহার সামাজিক অস্তিত্ব তাহার চেতনাকে নিরূপিত করে।" (মার্কস)

ধনবাদী সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দ্রুত পরিবর্তনশীল বলিয়া তাহার সাংস্কৃতিক উপরিতলেরও ঘনঘন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীতে শিল্পীতে মূল পার্থক্য এইখানে; কে সমাজ-মানসের বিবর্তনপ্রবাহের কোন্ গভীরতায় উপনীত হইতে পারিয়াছেন ও তাঁহার বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কল্পনার রঙে রঞ্জিত করিতে পারিয়াছেন। এই মার্কসবাদী সূত্র মানিয়া লইলে শ্রীযুক্ত

পোদ্দারের মতে বাংলা কাব্যপ্রবাহে যে "দ্বিমুখী সম্প্রসারণ"—চঞ্চল সমাজ-মানসের বিষয়গত স্ফূর্তি ঈশ্বর গুপ্তে এবং মাইকেলে তাহার আত্মগত স্ফূর্তি —তাহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। কারণ দেখা যাইতেছে 'মুখ' দুইটি নহে, একটি ; দুইজনেই সমাজ-মানসকে প্রতিফলিত করিতেছেন। তবে একজনের সমাজ-অনভূতি উপর-উপর, ভাসা-ভাসা, তাহাতে কল্পনার প্রভাব সামান্য। অন্যের প্রতিভা সমাজ-মানসের গভীরতায় প্রবেশ করিতে সমর্থ, তাহা কল্পনার প্রভাবে সমৃদ্ধ।

কল্পনা ও বাস্তব, ইহাদের মধ্যে কোনো আত্যন্তিক বিরোধ থাকিতে পারে না। আসল বিরোধ, কল্পনায় ও কাল্পনিকতায়। "কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে একটা মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের ধারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসংগতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প তাহারা সাহিত্যে প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় লইয়া থাকে—কারণ, ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অত্যন্ত লঘু।" (রবীন্দ্রনাথ) আর এই সূত্রানুযায়ী বিচার করিয়া দেখিলে শ্রীযুক্ত পোদ্দার বঙ্কিম-সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে যে 'কল্পনা ও বাস্তবের বিরোধ' লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা অনেকটা একপেশে হইয়া পড়ে। যে বিরোধ আছে তাহা বাস্তবের সহিত কাল্পনিকতার। বাস্তবের সম্যক জ্ঞান ও তাহার অকুণ্ঠ প্রকাশ যে-কোন শিল্পীর পক্ষেই সংকটময় পরীক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রতিভাবান শিল্পীও এই পরীক্ষায় সর্বদা সসম্মানে উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই, ইহা স্বীকার করাই সংগত। সেই সংগে ইহাও বলা দরকার, যেখানে তাঁহার শ্রেষ্ঠ সাফল্য সেখানে ঘটিয়াছে কল্পনা ও বাস্তবের অপূর্ব সমন্বয়।

॥ সাত ॥

'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকৃতি ও সত্তা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত পোদ্দার লিখিতেছেন ঃ

'ইহা ইতিবৃত্ত নয়, খাঁটি উপন্যাসও নয়—ইহা রোমান্স। উপন্যাসের উপজীব্য এমন কিছু যাহা আমাদের অন্তরের বাইরে, মনোজীবন হইতে স্বতন্ত্র। ইহা কাব্যের বিপরীতধর্মী। কাব্যের উৎস কবিমানসের একক কেন্দ্র, কবি বাহির বিশ্বকে আপনার অন্তরে আকর্ষণ করেন,

কিন্তু উপন্যাসের উৎস ঔপন্যাসিকের একক মানস-কেন্দ্র নয়; তিনি বাহির বিশ্বে নিজেকে বিস্তৃত করিয়া বহু উৎস হইতে রূপ ও রস সংগ্রহ করেন।...কিন্তু উপন্যাস যে অর্থে বাস্তব, রোমান্স সে অর্থে বাস্তব নয়; ইহাতে কাব্যের গুণ সুরক্ষিত। জীবনের গদ্য এবং কাব্য উভয় সুরের সংমিশ্রণে ও সমন্বয়ে ইহার সৃষ্টি।'

জানি না এই গুরুগম্ভীর উক্তিগুলি হইতে কোন্ পাঠক কতখানি অর্থ সুস্পষ্টভাবে উদ্ধার করিতে পারিবেন। এটুকু অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা যায় লেখক এখানে মার্কসীয় বিজ্ঞানের পরিভাষা পরিহার করিতে গিয়া মার্কসীয় প্রয়োগ-পদ্ধতি পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' রোমান্স, কারণ তখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজ-বাস্তবের প্রতিবেদন ছিল অসম্পূর্ণ, অস্পষ্ট, দুর্বল। তাই ইহাতে কল্পনার অপেক্ষা কাল্পনিকতার আতিশয্য; তাই ইহাতে ঐতিহাসিক পটভূমিকার এত বিস্তৃত সমাবেশ, যাহাতে প্রকৃত ইতিহাস-চেতনার সাক্ষাৎ দুর্লভ। অথচ ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, বঙ্কিমচন্দ্রের মানসে প্রতিভাত হইয়াছিল নূতন ধনবাদী সমাজ-চেতনার একটি অবশ্যম্ভাবী দিক,—নারীর স্বাধিকার তাহার প্রেমাস্পদকে নির্বাচন করিবার, শুধুমাত্র তাহার অন্তরের তাগিদে। আয়েষার নাটকীয় উক্তি—এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর—তাই জাগাইতে পারিয়াছিল প্রত্যেক সামন্তবাদ-বিরোধী চিত্তে আনন্দের শিহরণ। ওসমান মানুষ হিসাবে জগৎসিংহ অপেক্ষা কোনো অংশেই নিকৃষ্ট নয়; তবুও আয়েষা বাছিয়া লইল জগৎসিংহকে কোনো বুদ্ধির বিকৃতিতে বা বিচারের তারতম্যে নয়, কেবল হৃদয়াবেগের প্রেরণায়—ইহার সমর্থন সামন্তবাদী চিত্তে ছিল অসম্ভব। আর এই ধরনের উক্তি যদি বঙ্কিমচন্দ্র বসাইতেন কোনো সমসাময়িক ঘরোয়া বাঙালী বালিকার মুখে তাহা হইলে তাহাও হইত একান্ত অবাস্তব। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীমন প্রথম হইতেই এই অসংগতি অনুভব করিতে পারিয়াছিল। তাই অবাস্তবতাকে অতিক্রম করিবার জন্যই তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল এক অবাস্তব ঐতিহাসিক পরিবেশের সংযোজন। নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালী পাঠক তাই ঐতিহাসিক পরিবেশের সমস্ত অসংগতি উপেক্ষা করিয়া আয়েষার উক্তির যাথার্থ্যে মুগ্ধ হইল। নারীর ব্যক্তি-স্বরূপ এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে কথা কহিয়া উঠিল। ইহাতেই নিহিত 'দুর্গেশনন্দিনী'র যুগান্তকারী ভূমিকা।

নবীনচন্দ্র এক সময়ে পরিহাস-ছলে এক মন্তব্য করিয়াছিলেন যাহার নির্গলিতার্থ দাঁড়ায় এই: বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার নভেলগুলিতে কি আর এমন কাণ্ড

করিয়াছেন? আঁকিয়াছেন তো কতকগুলি প্রেমিকার ছবি, তাহাদের মধ্যে না আছে আদর্শ মায়ের চিত্র, না আদর্শ মেয়ের চিত্র। নবীনচন্দ্র জানিতেন না যে তিনি না বুঝিয়াই এক গভীর সামাজিক সত্যের দিকে অংগুলি নির্দেশ করিয়াছেন, বঙ্কিমের উপন্যাস যাহার সুরম্য প্রতিফলন। সামন্তবাদী সমাজে নারীর প্রেম যত নিপীড়িত এমন আর কিছুই নহে। সমাজে মাতার বা কন্যার স্থান আছে সম্মানের বা স্নেহের। পত্নীর স্থান আছে সহধর্মিণী হিসাবে—স্থান নাই কেবল নারীর স্বাধীন প্রেমের। তাহাকে হয় হইতে হইবে পরকীয়া, নয় যাইতে হইবে সমাজের বাহিরে। ধনবাদী সমাজেই প্রথম নারী পায় তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের ঐতিহাসিক সুযোগ। এমন কি মাতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থাতে তাহার এ সুযোগ ছিল না। কেননা সেখানেও ছিল কৌম সমাজ-ব্যবস্থার কঠিন নিগড়। ধনবাদী সমাজে উৎপাদনপদ্ধতিই নারীর স্বাধীনতার মূল ভিত্তি। যন্ত্রের মহিমায় উৎপাদনকারী শ্রমিক হিসাবে নারী ও পুরুষের ব্যবধান যত কমিতে থাকে, সমাজে নারীর প্রতিষ্ঠাও বাড়িতে থাকে সেই অনুপাতে।

কোনো সার্থক শিল্পী অবশ্য এই সব সমাজ-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত প্রথমে বুদ্ধি দ্বারা আয়ত্ত করিয়া পরে শিল্প রচনা করিতে বসেন না, বঙ্কিমচন্দ্রও করেন নাই। কিন্তু যদি কোনো প্রতিভাবান শিল্পীর সমকালে সমাজ-পরিবেশে গভীর আলোড়ন ঘটিতে থাকে তবে তাহা তাঁহার শিল্পসৃষ্টিতে মুকুরিত না হইয়া পারে না। "কোনো শিল্পী যদি প্রকৃতই বৃহৎ শিল্পী হন তাহা হইলে তাঁহার শিল্পসৃষ্টিতে বিপ্লবের কোনো না কোনো মূলগত দিক প্রতিফলিত হইবেই"—এ উক্তি লেনিনের।

বঙ্কিমের দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'য় তাই দেখিতে পাওয়া যায় এই পথে বৃহত্তর প্রয়াস। ইহাতে বঙ্কিমের কল্পনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে এমন একটি নারী-চরিত্র অংকন করিতে যাহা যথাসম্ভব প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত। অর্থাৎ যে নারী সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার পারিবারিক নাগপাশ হইতে মুক্ত। ধনবাদী অর্থনীতিতে যেমন দেখা যায় সমাজ-নিরপেক্ষ নিছক 'ব্যক্তির' অস্তিত্বের প্রত্যয়, এখানেও তেমনি বঙ্কিমের অভিপ্রায় সমাজশাসন-মুক্ত নিছক নারীত্বকে রূপদান। মানুষের যেটুকু সংস্পর্শ না থাকিলে কোনো বালিকার পক্ষে জীবনধারণ অসম্ভব, শুধু সেইটুকু মাত্রই পরিবেশিত হইয়াছে কাপালিক চরিত্রের মারফত। নবকুমারই কপালকুণ্ডলার জীবনে প্রথম প্রকৃত মানব ও

সামাজিক পুরুষ। নরনারীর বিবাহরূপ সম্বন্ধ যে নিতান্ত সামাজিক অনুষ্ঠান, দৈব বা প্রকৃতিগত বিধান নহে, ধনবাদী সমাজবিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত 'কপালকুণ্ডলা'য় ফুটিয়া উঠিয়াছে করুণ দীপ্তিতে, সত্য ও সৌন্দর্যের সার্থক সংমিশ্রণে।

মিরাণ্ডার সহিত কপালকুণ্ডলার তুলনামূলক বিচার সহজেই সকল পাঠকের মনে জাগে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায়, ইহাদের মধ্যে মিল অপেক্ষা গরমিলই বেশি। মিরাণ্ডা মোটেই প্রকৃতি-লালিতা মানবকন্যা নহে। পরমজ্ঞানী প্রসপেরো তাহার পিতা, এবং সেই সঙ্গে তাহার একমাত্র সঙ্গী, শিক্ষক ও প্রায় সর্বশক্তিমান ভাগ্যনিয়ন্তা। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপরায়ণ ধনবাদী সমাজের সমস্ত কদর্যতা হইতে কন্যাকে দূরে রাখিয়া পিতা তাহাকে প্রস্তুত করিতেছেন ভবিষ্যৎ সমাজের সুষমাময় পরিবেশের জন্য। ফার্ডিনাণ্ড-এর সহিত আকাঙ্ক্ষিত পরিণয়ে তাই এই নাটকের আনন্দময় পরিণতি। ধনবাদী ব্যবস্থার অবসানের পর ভবিষ্যতের স্বপ্নের আলোকে মিরাণ্ডার চরিত্র মণ্ডিত। কপালকুণ্ডলার ভাগ্যে ঘটিল ট্র্যাজেডি। সে শুধু দেখাইল প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শান্ত প্রতিবাদ। পরাধীন দেশে সামন্তবাদের আওতায় ধনবাদী চেতনা যখন জন্মগ্রহণ করিয়াও যৌবনের তেজ অর্জন করে নাই, কপালকুণ্ডলার ভাগ্য সেই কালের প্রতীক। প্রথমের সহিত শেষের যেটুকু মিল থাকে, তাহার অতিরিক্ত সাদৃশ্য, কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা এই দুই চরিত্রের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন।

ইহার পরের উপন্যাস 'মৃণালিনী'-তে দেখিতে পাওয়া যায় আখ্যায়িকার ঘটনা-গ্রন্থন জটিলতর হইতেছে। ঘটনার গতি নানা চরিত্রের প্রতিঘাতে আঁকাবাঁকা পথে ঘুরিতেছে। কিন্তু সমাজের বাস্তব-জটিলতার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় তখনও দৃঢ় না হওয়ায় তাঁহাকে সৃষ্টি করিতে হইয়াছে অলীক কাল্পনিকতায় ভরা এক ঐতিহাসিক পরিবেশ। তাহার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে ভবিষ্যতে তাঁহার সুগভীর জাতীয় পরাধীনতা-চেতনার অস্পষ্ট পূর্বাভাস। মাত্র সতেরো অশ্বারোহী লইয়া বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়—এই প্রচলিত ঐতিহাসিক কাহিনীকে বঙ্কিমচন্দ্র কখনও ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহার প্রতিবাদ-কল্পে বঙ্কিমচন্দ্র যে ঐতিহাসিকতার আমদানি করিলেন তাহা যেমন উদ্ভট তেমনি হাস্যকর। হেমচন্দ্রের মতো নায়ক যে কোনো স্বাধীনতা-সংগ্রামের নেতা হইতে পারে ইহা বিশ্বাস করা যায়

না। কিন্তু বঙ্কিম যে যুগে লিখিতেছিলেন তখন নূতন করিয়া পরাধীন বাঙলা দেশে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না স্বাধীনতা অর্জনের পন্থা সম্বন্ধে। ছিল কেবল পরাধীনতার বিরুদ্ধে আবেগ—যথা, স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায়। এই অজ্ঞান আবেগই 'মৃণালিনী'তে ঐতিহাসিকতার ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ঐতিহাসিক পরিবেশ বাদ দিলে 'মৃণালিনী'তে প্রধান আকর্ষণ, মনোরমা-র চরিত্র। ধনবাদী সমাজে নারীর স্বাধীন বিকাশের সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে নারী-চরিত্রে রূপান্তরও ঘটে। মনোরমা সেই জটিল নারী-চরিত্র অংকনে বঙ্কিমের প্রথম প্রয়াস। একদিকে প্রখর বুদ্ধি অন্যদিকে কোমল সারল্য তাহার চরিত্রে মিশ খাওয়াইবার চেষ্টা হইয়াছে। চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু সাফল্য হয় নাই। মনোরমার চরিত্র যেন দ্বিখণ্ডিত রহিয়াই গিয়াছে। একই পাত্রে তেল ও জলের মতো তাহারা পরস্পরের পাশাপাশি থাকিয়াও বিভিন্ন। তাই মনোরমার ব্যক্তিত্ব তাহার ঐতিহাসিক পরিবেশের মতো অলীক কাল্পনিকতার নিদর্শন। শুধু এইটুকু মাত্র বোঝা গেল যে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পপ্রতিভা একটি নূতন বাস্তবতার সন্ধান পাইয়াছে কিন্তু তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই।

॥ আট ॥

প্রত্যেক শিল্পীরই থাকে একটা শিক্ষানবিশির পর্ব, বঙ্কিচন্দ্রেরও ছিল। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সঙ্গেই দেখা গেল তিনি শিক্ষানবিশি ছাড়িয়া শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠক মাত্রেই জানেন যে স্বদেশ-বাসীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ ছিল কিরূপ তীব্র, পদ্ধতি কত বিবিধ ও মান কত উচ্চ। শিক্ষার বাহন হিসাবে তিনি উপন্যাস, প্রবন্ধ ও রস-রচনার মধ্যে কোনো মৌলিক প্রকারভেদ স্বীকার করিতেন না, পার্থক্য কেবল আকারে ও আঙ্গিকে। তবুও ইহা স্বীকার্য যে বঙ্কিমের উচ্চতম প্রতিষ্ঠা উপন্যাসকার হিসাবে, অন্য সমস্ত রচনা আনুষঙ্গিক, উপন্যাস ও উপন্যাসকারকে বুঝিবার পক্ষে সহায়ক। এমন কি 'কমলাকান্তের দপ্তর' পর্যন্ত এই আনুষঙ্গিকের পর্যায়ে পড়ে; শতগুণ সত্ত্বেও 'কমলাকান্ত' রস-রচনা, রূপসৃষ্টি নহে। হয়তো উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি এমন কোনো শিক্ষা দেন নাই, যাহা প্রবন্ধাকারে পাওয়া যায় না। তবু রূপসৃষ্টির অন্তরালে যে-শিক্ষা নিহিত থাকে তাহার প্রভাব গভীরতর। অসতর্ক পাঠকের

পক্ষে ইহাতে বিপদও কম নয়। প্রবন্ধের শিক্ষা সাধারণত স্পষ্ট, দ্রুতবোধ্য, সুতরাং সহজে-গ্রাহ্য অথবা সহজে-পরিত্যাজ্য। ঔপন্যাসিকও শিক্ষক, তবে সে-শিক্ষার প্রণালী প্রত্যক্ষ নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য মিথ্যার অপনোদন ও সত্যের উদ্ঘাটন। ঔপন্যাসিক তাঁহার কল্পিত কাহিনীর ভিতর দিয়া দেখাইয়া দেন তৎকালীন সমাজের গতি কোন মুখে, তাহার কোন্ শক্তিগুলি ক্ষয়িষ্ণু ও কোন্গুলি বর্ধিষ্ণু। মার্কসবাদের মতে শ্রেণীচেতনা বাদ দিয়া সত্যের উপলব্ধি হয় না। ইহার অর্থ এই নয় যে, লেখকের যে শ্রেণীতে জন্ম বা শিক্ষা, তাহা দ্বারাই তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসা সীমাবদ্ধ। সমাজের সকল শ্রেণীর জীবনযাত্রায় যে সকল মানসিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রবণতা প্রকাশ পায়, তাহাদের সকলের পর্যবেক্ষণ হইতে বিকশিত হয় প্রকৃত শ্রেণী-চেতনা। শিল্পসৃষ্টিতে তাই শ্রেণী-চেতনা নির্ধারিত হয় শিল্পীর আত্মগত অনুরঞ্জন দিয়া নয়, সামাজিক বাস্তবকে পরিগ্রহণের গভীরতা দিয়া। তাঁহার সমকালীন সমাজবাস্তবকে বঙ্কিমচন্দ্র কতখানি গভীরভাবে পরিগ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার অবিনশ্বর উপন্যাসগুলি—'বিষবৃক্ষে' যাহাদের আরম্ভ ও 'সীতারামে' শেষ।

বঙ্গদর্শনের প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা হইতেই বিষবৃক্ষের প্রকাশ সাধারণ পাঠকের জন্য। এবং সাধারণ পাঠক সবিস্ময়ে দেখিল, যে-লেখক এতদিন সুদূর ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া গল্প রচনা করেন নাই—তিনি এবার লিখিতেছেন এক সম্পূর্ণ অভিনব ধারায়, সমসাময়িক পারিবারিক জীবনকে অবলম্বন করিয়া। এই পথে চলিতে গিয়া সমসাময়িক পারিবারিক জীবনের প্রাত্যহিক গতানুগতিকতার যথাযথ চিত্রাঙ্কন বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল না। বঙ্কিমের উদাহরণ সত্ত্বেও এই পথে চলিলে কতদূর পেঁছানো যায় তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা'। স্বর্ণলতায় বর্ণিত সংসার-চিত্র, তাহার শেষ অংশটুকু বাদ দিলে, অকপট পর্যবেক্ষণের ফল, তাহাতে কল্পনার লীলা অতি সামান্য। শেষাংশে কাল্পনিক পরিস্থিতির প্রবর্তন করিয়া লেখক নিজের দুর্বলতারই পরিচয় দিয়াছেন। তাই স্বর্ণলতার যে নাটকাকার বাংলা রঙ্গমঞ্চে খুবই জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহাতে এই শেষাংশ পরিবর্জিত। ইহা এক বাস্তুভিটাবলম্বী নিতান্ত শান্ত বাঙালী পরিবারের কাহিনী। ইহাতে নূতন যুগের নবচেতনার কোনো ছায়া পড়ে নাই। অথচ এই নবচেতনাই নূতন যুগের বাস্তবতা। ইহাকে বাদ দিয়া কাহিনী রচনা

করিলে তাহা যথাযথ হইতে পারে, বাস্তব হয় না। সমাজ মানসে যে নবচেতনা তখনও উহ্য, যাহাকে প্রবল অনুভূতি দিয়া হৃদয়ঙ্গম, প্রখর কল্পনা দিয়া প্রাণময়, ও সুদক্ষ আঙ্গিক-কুশলতা দিয়া লোকগ্রাহ্য করিতে হয়, তাহারই চিত্রাঙ্কন করিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বিষবৃক্ষে'। বিষবৃক্ষের বিচারে ইহা বিধবাবিবাহ-সম্পর্কিত সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করিয়া একটি নির্দিষ্ট নৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে নির্দিষ্ট তত্ত্ব প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে রচিত, এই মত পোষণ করিলে শিল্পসৃষ্টি হিসাবে বিষবৃক্ষের গভীর তাৎপর্যকে নির্দয়ভাবে খণ্ডিত করা হয়। এই মত সত্য হইলে আধুনিক সমালোচকের বিচারে রমেশচন্দ্রের 'সংসার' ও 'সমাজ'-এর সাহিত্যিক মূল্যে 'বিষবৃক্ষ' অপেক্ষা উচ্চতর হওয়া উচিত। কারণ এই উপন্যাসদ্বয়ে বিধবাবিবাহ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র যে-মত অভিব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আধুনিক যুগের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত মতামত যাহাই হউক, বিষবৃক্ষ রচনায় তাঁহার শিল্পপ্রেরণা ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সামন্তবাদী সমাজে ধনবাদী চেতনা অনুপ্রবেশ করিয়া আমাদের পারিবারিক জীবনে যে জটিলতা-সৃষ্টি শুরু করিয়াছিল তাহারই প্রথম চিত্র বিষবৃক্ষ। নরনারীর পরস্পর আকর্ষণ সম্বন্ধে সামন্তবাদী সমাজে কতকগুলি বাঁধা নিয়ম আছে ধনবাদী চেতনা যাহাকে একান্তভাবে মানিতে পারে না। নগেন্দ্রনাথ ভাগ্যবান পুরুষ। তখনকার সমাজের সকল কাম্যই তাহার করতলগত। সূর্যমুখীর মতো স্ত্রী বহুলোকের বাঞ্ছিত। একথা ভাবিবার কোনো কারণ নাই যে, উপন্যাসের কাহিনী আরম্ভকালে স্বামী-স্ত্রীর প্রেমে ভাঁটা পড়িয়াছিল। যে নৌকাযাত্রার ফলে নগেন্দ্রনাথের সহিত কুন্দনন্দিনীর যোগাযোগ তাহার প্রাক্‌কালে ভার্যা সূর্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া স্বামীকে অনুনয় করিতেছে, আকাশে মেঘ দেখিলে নৌকা তীরে লাগাইও। এত সত্ত্বেও কুন্দকে নগেন্দ্রের ভাল লাগিল; ঘটনাচক্রে অনুকম্পায় আরম্ভ হইয়া সান্নিধ্যগুণে তাহা অচিরাৎ পরিণত হইল প্রেমে। তাহার বিবাহিতা স্ত্রী বর্তমান, এবং কুন্দকে বিবাহ করার পথে সামাজিক বাধা, এই সব কুণ্ঠা নগেন্দ্রের প্রেমের টানে লুপ্ত হইল; আর কুন্দের পক্ষে তাহার দেবোপম আশ্রয়দাতাকে পূজা করাই স্বাভাবিক, যে-পূজা ক্রমে দেবতারে প্রিয় বলিয়া ভাবিতে অভ্যস্ত হইল তাহার অন্তরের সমস্ত কুণ্ঠা সত্ত্বেও। একটি শান্ত সংসার উদ্বেলিত হইল নাটকীয় জটিলাবর্তে। কুন্দনন্দিনীর বৈধব্য উপন্যাসে ঘটনা হিসাবে অপ্রধান। আসল সমস্যা, বিবাহিত নগেন্দ্রনাথের

অন্য নারীর প্রতি আসক্তি। আধুনিক উপন্যাসে ইহার জন্য বিধবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বঙ্কিমের আমলে অবিবাহিতা বয়স্থা নারী ভদ্রসমাজে ছিল অতি দুর্লভ। কুন্দনন্দিনী বিধবা প্রাথমিক ঘটনা-সংস্থানের দাবিতে, বিধবা-বিবাহের সমর্থন বা খণ্ডনের জন্য নহে। মৌলিক ঘটনায় এইরূপ বাস্তবানুরূপ্য না থাকিলে সমস্ত উপন্যাসটি ব্যর্থ হইয়া যাইত। এই ঘটনা-সংস্থানের জন্য বঙ্কিম যে-পথ দেখাইয়াছিলেন, বহুকাল পরে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বিনোদিনী'তে ও শরৎচন্দ্র তাঁহার 'রমা'য় অনুসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। নগেন্দ্রনাথের পরিবারে কুন্দের আকস্মিক আবির্ভাব যে জটিলতার সৃষ্টি করিল তাহার সুচারু সমাধান করা তখনকার সমাজ-কাঠামোর সম্ভব ছিল না। তাই গল্পের সমাধান হইল কুন্দের অকাল অবসানে। যখন বহুবিবাহ নিন্দিত ও বিবাহবিচ্ছেদ কল্পনাতীত, তখন বিষবৃক্ষের অন্য কোনো পরিণাম হইত বাস্তবতা-বর্জিত। কুন্দনন্দিনী সমাজের হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে নাই, নগেন্দ্রনাথ আরম্ভ করিয়া মাঝ পথে ছাড়িয়া দিল, সত্য কথা। কিন্তু শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র কোমল কুন্দনন্দিনীকে দিয়া তাহার দেবতার পায়ে আপন স্নিগ্ধ-সুরভি বিসর্জন দেওয়াইয়া যে কঠোর প্রশ্নের অবতারণা করিলেন, কোন্ সহৃদয় পাঠক তাহার প্রচণ্ড আহ্বান হইতে আজিও মুক্ত হইতে পারেন? কুন্দের সমবেদনায় অগণিত পাঠকের অশ্রু অকরুণ সমাজবিন্যাস ভাঙার পথে প্রথম পাথেয়, যাহা সাহিত্যিক রূপসৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ পাইল।

। নয়

যে-সংগ্রাম কুন্দনন্দিনী করে নাই তাহার অনুবর্তিনী রোহিণী তাহা করিল। সে সচেতনভাবেই বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে সামাজিক বিরূপতাকে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত। হরলালকে সে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল প্রেমের খাতিরে নহে। কিন্তু ঘটনাচক্রে সে প্রকৃতই প্রেমে পড়িল গোবিন্দলালের সহিত। এক্ষেত্রেও রোহিণীর বৈধব্য ঘটনা-গ্রন্থনে উপলক্ষ্য মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়োজন ছিল এমন একটি নারী-চরিত্রের যাহার রূপ, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব গোবিন্দলাল-ভ্রমরের অনাবিল প্রেমে আবর্তের সৃষ্টি করিতে পারে। নূতন সমাজের জটিল সম্ভাবনা এইরূপ পরিস্থিতি শিল্পী বঙ্কিমের নিকট দাবি করিয়াছিল। এ-হেন নারী সংসার-অভিজ্ঞ না হইলে চলে না। তাই রোহিণী বয়স্থা ও বিধবা। রোহিণীর অভ্যুদয়ে কৃষ্ণকান্তের সংসারে যে-আলোড়ন সামান্য আরম্ভ হইতে বহুধা

বিস্তৃত হইয়া পড়িল তাহারও সুচারু সমাধান তখনকার প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় ছিল না। গোবিন্দলাল রোহিণীকে বিবাহ করিতে চাহিলেও ভ্রমরের মতো তেজস্বিনী রমণীর সহিত একত্র সহবাসে গল্পের হইত অপমৃত্যু। গোবিন্দলাল রোহিণীকে ভালবাসিয়াও তাহাকে স্থান দিতে পারিল না, সংসারে অথবা সমাজে। ফলে, রোহিণীর অপমৃত্যু। রোহিণীর অপমৃত্যু অবশ্য উপন্যাসের অপমৃত্যুকে সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত করিতে পারিল না। কিন্তু রোহিণী তাহার সচেতন বিরুদ্ধতা দিয়া কুন্দনন্দিনীর মূক প্রশ্নকে মুখর করিয়া তুলিল। বিধবাবিবাহের আচ্ছাদনে যে-প্রশ্ন তখন সমাজমানসে সঞ্চিত হইতেছিল তাহার প্রকৃত স্বরূপ বিধবাবিবাহের প্রবলতম সমর্থক বিদ্যাসাগরের চেতনাতেও ছিল না। সে-প্রশ্ন হইতেছে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধিকারের। ধনবাদী সমাজ এ-অধিকার স্বীকার করে কিন্তু পরিপূরণ করা তাহার ক্ষমতাতীত। তাই এমন কি স্বাধীন দেশের ধনবাদী সমাজে বিধবাবিবাহের প্রচলন থাকিলেও তাহা প্রথম বিবাহের সম্মান পায় না। সমাজবাদী সমাজে যখন নারী ও পুরুষের অর্থনৈতিক মর্যাদায় কোনো পার্থক্য থাকে না, তখনই কেবল বিধবাবিবাহ পৃথক সমস্যারূপে দেখা দেয় না, প্রথম বিবাহের তুলনায় তাহার সামাজিক মর্যাদা সমপর্যায়ে উন্নীত হয়। একথা আশা করা অসঙ্গত যে বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া এই সমস্যাকে সম্যক বুঝিতে পারিবেন। তিনি অন্তত এটুকু বুঝিয়াছিলেন যে বিধবাবিবাহে নারীর ন্যায়সঙ্গত অধিকার মানিয়া লইলেই সামাজিক সমস্যার সমাধান হয় না, তাহা নর-নারীর সম্বন্ধকে জটিলতর করিয়া সামাজিক ভারসাম্যকে বিচলিত করে। ধনবাদী সমাজে পারিবারিক বিচলনের চিত্রই তাঁহার এ-উপন্যাসে প্রতিফলিত হইয়াছে। বিধবা রোহিণী যতটা বিচলনের কারণ তাহার চেয়ে গভীরতর আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে গোবিন্দলালের ধর্মপত্নী ভ্রমর; ভ্রমর ভালবাসায় গোবিন্দলালের উপর একান্ত নির্ভরশীল, পল্লবিনী লতার মতো। কিন্তু যখন ভালোবাসার বাহিরে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মর্যাদার প্রশ্ন ওঠে, তখন আর ভ্রমর পল্লবিনী লতা নহে। নিজের অধিকারের উপর সবলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সে সদর্পে বলিতে পারে, স্বামী যতদিন ভক্তির যোগ্য ততদিনই সে স্বামী। স্বামী তাহার স্ত্রীর নির্বিচার আনুগত্য দাবি করিতে পারে না; স্ত্রী যেমন স্বামীর, স্বামীও তেমনি স্ত্রীর বিচারাধীন। স্বল্পভাষিণী ভ্রমরের এই মনোভাবের বিপ্লবী তাৎপর্য সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় পতি-পত্নীর-সম্পর্কের মর্মমূলে তীক্ষ্ন আঘাত করে।

'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর মধ্যবর্তী উপন্যাস 'চন্দ্রশেখর'-এ ঐতিহাসিক পটভূমিকা পূর্বের চেয়ে অধিকতর যত্ন ও সত্যনিষ্ঠার সহিত চিত্রিত হইলেও ইহা মুখ্যত পারিবারিক উপন্যাস। চন্দ্রশেখর, শৈবালিনী ও প্রতাপের পারিবারিক সম্পর্কই উপন্যাসটির প্রাণকেন্দ্র। প্রতাপ ও শৈবালিনীর পূর্বরাগ সমসাময়িক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে অংকিত করিতে বংকিমের বাস্তবতাবোধে আঘাত লাগায় প্রয়োজন হইয়াছিল এই ঐতিহাসিক আবরণ। পূর্বরাগ সত্ত্বেও বিবাহ হইল অসম্ভব, উভয়ের মধ্যে জ্ঞাতিত্ব-সম্বন্ধ থাকায়। প্রেমের প্রেরণায় মরিতে গিয়া তখনও অপরিণত শৈবলিনী ফিরিয়া আসিল। প্রতাপ কৈশোর হইতেই বীর, অনায়াসে প্রাণ দিল, কিন্তু রক্ষা করিলেন চন্দ্রশেখর। এই সূত্রে স্থিতধী পণ্ডিত শৈবলিনীর সুন্দর মুখের টানে তাহাকে বিবাহ করিলেন। এই বিবাহে সূত্রপাত হইল জটিল সমস্যার। বয়স বাড়ার সংগে সংগে শৈবলিনীর চিত্তে প্রতাপের স্মৃতি দৃঢ়তর হইয়া বসিল। বিবাহ হইলেই স্বামীকে ভালবাসিতে হইবে—হোন না কেন স্বামী যতই মহৎ—এই নীতি সে মানিতে পারিল না। শুধু তাই নয়, সে প্রতাপকে পুনরায় অধিগত করার চেষ্টায় অসাধ্যসাধনেও তৎপর হইল। রূপসীকে বিবাহ করার পরেও প্রতাপ তাহাকে ভুলিতে পারে নাই, এই স্বীকারোক্তি তাহার প্রেমের চরম পুরস্কার, কিন্তু এই পুরস্কারই পরিণত হইল তিরস্কারে। প্রতাপের মানদণ্ডে ব্যক্তিগত প্রেম অপেক্ষা কৃতজ্ঞতা ও ন্যায়নিষ্ঠা মহত্তর। তাহার প্রেমের পরিণতি নিঃস্বার্থ আত্মবলিতে বৃহত্তর মংগলের প্রচেষ্টায়। ধনবাদী আদর্শ অনুযায়ী বীরের চিত্র বাঙলা সাহিত্যে প্রতাপেই প্রথম প্রতিফলিত। কিন্তু শৈবলিনীর সমস্যার তাহাতে সমাধান হয় না। চন্দ্রশেখর তাহাকে মানসক্ষেত্রে দ্বিচারিণী জানিয়াও সসম্মানে গ্রহণ করিলেন। তিনি পণ্ডিত হইয়াও উদার; শাস্ত্র অপেক্ষাও হৃদয়বৃত্তি তাঁহার প্রবলতর। তাই শৈবলিনীর পলায়নে তিনি যেমন শাস্ত্র-গ্রন্থগুলি অগ্নিতে সমর্পণ করিয়া আপনার নিরুদ্ধ শোককে প্রকাশের মুক্তি দিয়াছিলেন, তেমনি আবার শাস্ত্রের সমস্ত শিক্ষা উপেক্ষা করিয়া অনুতাপক্লিষ্টা শৈবলিনীকে আপন অন্তরে গ্রহণ করিলেন। নূতন চেতনায় পুরাতন চেতনার রূপান্তর ঘটিল। শৈবলিনীর চিত্তশুদ্ধির জন্য বংকিমচন্দ্র যে বর্ণনাবহুল অতি-প্রাকৃতের প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাতে উপন্যাস হিসাবে চন্দ্রশেখর দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শৈবলিনীর চরিত্রে যে জটিলতার সঞ্চার তিনি করিয়াছেন তাহা ভবিষ্যৎকালে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে বিব্রত

করিতে ছাড়ে নাই। 'নষ্টনীড়ে'র চারু, 'চরিত্রহীনে'র কিরণময়ী ও 'গৃহদাহে'র অচলা-তে তাহা বর্তমান সমাজের জীবন্ত সমস্যা রূপেই চিত্রিত। এবং সে-সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত তাঁহাদের রচনাতেও পাওয়া যায় না।

বঙ্কিমের এই উপন্যাসগুলিতে যে বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ দেখা যায় তাহা নিশ্চয়ই অবিমিশ্র নহে। সচেতন বিপ্লবী ধারার সহিত ধর্ম ও নীতিগত মিথ্যা সংস্কার, অদ্ভুত ও অতি-প্রাকৃতে বিশ্বাস ও অন্যান্য পশ্চাৎমুখীনতার সচেতন বা অচেতন সমর্থনও মিশিয়া আছে। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সাহিত্যে ইহা না হইয়া পারে না। প্রাচীন (অর্থাৎ প্রাক্ সমাজবাদী) সংস্কৃতির মহৎ প্রতিনিধিগণের চেতনায় বিপ্লবী ও বিপ্লববিরোধী প্রবণতার বিজড়িত অবস্থান, ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া গৃহীত। বিপ্লবী আদর্শ সাহিত্যে ক্বচিৎ প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিতভাবে প্রতিফলিত হয়। পূর্বতন সমাজের বহুযুগস্থায়ী নীতিগুলি হইতে ভাঙিয়া বাহির হইবার সময় সাহিত্যিক ও শিল্পীরা তাঁহাদের সমকালীন সমাজে ইতিহাসের জটিল স্বতোবিরোধগুলির কোনো সমাধান খুঁজিয়া পান না। সেই জন্যই তাঁহারা নতি স্বীকার করেন ধর্মজ্ঞান অথবা সনাতন নীতিজ্ঞানের নিকট। এই লেনিনবাদী সূত্রগুলি স্মরণে রাখিলে বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলিতে তাঁহার দুর্বলতার দিকের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমানের সমৃদ্ধতর সামাজিক বিকাশের অভিজ্ঞতার পাদপীঠে দাঁড়াইয়া অতীতের মহৎ শিল্পীদের দুর্বলতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেই মার্কসবাদী সমালোচকদের কর্তব্য পালিত হয় না। কোনো শিল্পসৃষ্টির ঐতিহাসিক মর্ম কিভাবে উদ্ঘাটন করিয়া তাহার জীবিত অংশ হইতে মৃতকে পৃথক করিতে হয়, কেমন করিয়া নির্ধারণ করিতে হয় কোন্ ধারা ভবিষ্যৎ মুখে প্রবহমান আর কোন্ ধারা অতীতের মূঢ় অনুকরণ—ইহাই মার্কসবাদী সাহিত্য আলোচনার মূল নির্দেশক এবং এই বাস্তব আলোচনাতেই পাওয়া যায় শ্রেণী বিশ্লেষণের প্রকৃষ্ট প্রয়োগ।

॥ দশ ॥

"আনন্দমঠ" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বীণাযন্ত্রে আবার নূতন তার চড়াইয়াছেন। আর পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাস নয়, একেবারে রাজনৈতিক বিদ্রোহের কাহিনী। ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা প্রচার করিয়া থাকেন ভারতে জাতীয়তাবোধের উদ্ভব এদেশে ইংরেজি শিক্ষার সুফল। এটা

তাঁহাদের মন-গড়া রচা কথা। ভারতে জাতীয়তাবোধের উদ্ভব ইংরেজের শাসনে ও শোষণে। অন্ধভাবে ও অনিচ্ছায়, স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির তাড়নে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে সেই অবস্থার সৃষ্টি করে যাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে আধুনিক জাতীয়তাবাদ। বিদেশী শাসনের চাপ হইতে ভারতে কোনো শ্রেণীরই রেহাই ছিল না। ইহার প্রতিবাদে গড়িয়া উঠিল একজাতীয়ত্বের চেতনা। উনিশ শতকের ষষ্ঠ দশক হইতে ভারতে ধনতন্ত্র বিকাশের সূচনা। সপ্তম দশক হইতে তাহা ক্রমে স্পষ্ট হইতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনে হইল প্রাণ সঞ্চার। আনন্দমঠ সেই প্রাণসঞ্চারের সাহিত্যিক প্রকাশ। ইতিহাসের ক্ষীণ অস্পষ্ট সূত্র অবলম্বন করিয়া বঙ্কিম ছবি আঁকিলেন কি করিয়া স্বদেশের শত্রুর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ অস্ত্রশক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। কুখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ইহার পটভূমিকা, দেশমাতৃকার সন্তানেরা ইহার মূল চরিত্র। দেশাত্মবোধের এই মহৎ অনুপ্রেরণা এই উপন্যাসের বাস্তব ভিত্তি; বাকি অংশ কাল্পনিকতায় পূর্ণ। বাস্তব অভিজ্ঞতার অভাব বঙ্কিমকে এইভাবেই পূরণ করিতে হয় উপন্যাস রচনার আকর্ষণে। বঙ্কিমের সমকালে দেশের জাতীয় আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার হইলেও শক্তি সঞ্চার হয় নাই। হয় নাই তাহার কারণ, এ আন্দোলন তখন সীমাবদ্ধ ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিধিতে। ভারতীয় ধনতন্ত্র ও তাহার অনুচর উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তখন সমগ্র জাতির হইয়া আন্দোলন শুরু করিলেও সবচেয়ে শোষিত ও নিপীড়িত জনসাধারণ তখনও অচেতন। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে তাহাদের বিরাগ ও ক্রোধ বৃদ্ধি পাইতেছিল কিন্তু তখনও তাহারা সচেতন ও প্রণালীবদ্ধ সংগ্রামের স্তরে উঠিতে পারে নাই। "জাতীয় আন্দোলন সেই পরিমাণে শক্তিশালী হয় যে পরিমাণে তাহাতে যোগদান করে জাতির বিস্তৃততম স্তর, তাহার শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণী" (স্তালিন)। বঙ্কিমের যুগে ভারতে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হইলেও বাঙলায় তাহার অস্তিত্ব ছিল অতি সামান্য। আর কৃষক শ্রেণী সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় সমবেদনা থাকিলেও তাহার সংগ্রামী ভূমিকা তখনও প্রকাশ পায় নাই। জাতীয় আন্দোলনের এই দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থাতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় 'আনন্দমঠে'র অবাস্তবতার উৎস। তবুও তাহার মূলে প্রেরণার আধার ছিল বস্তুনিষ্ঠ তাই একথা অনায়াসে বলিতে পারা যায় যে উপন্যাস হইয়াও 'আনন্দমঠ' যেভাবে আমাদের জাতীয় জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে সে-গৌরব বাঙলা ভাষায় অন্য কোনো গ্রন্থের ভাগ্যে ঘটে নাই।

'আনন্দমঠে' জাতীয় আন্দোলনের মূল প্রেরণা প্রকাশ করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সংঘবদ্ধ আন্দোলনে নেতৃত্বের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। সন্তানদের স্বামীরা হঠাৎ-নেতা, কেবল দেশাত্মবোধের সুগভীর প্রেরণায়। তাহারা সর্বদাই আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত। কিন্তু কেবল আত্মবিসর্জন দিয়াই দেশ উদ্ধার করা যায় না! তাহার জন্য প্রয়োজন সাধনার ও শিক্ষার। 'দেবীচৌধুরাণী'তে বঙ্কিম জাতীয় আন্দোলনের এই অতি-প্রয়োজনীয় দিকটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। 'দেবীচৌধুরাণী'র ইতিহাস অংশ অতি দুর্বল, কাহিনীও অবান্তর চরিত্রে ও ঘটনায় অযথা দীর্ঘায়িত। তবুও একথা মানিতে হইবে ভবানী পাঠকই প্রথম দেখাইলেন নেতারা নেতা হইয়াই জন্মান না, তাঁহাদিগকে পরিশ্রম করিয়া নেতৃত্ব অর্জন করিতে হয়। আরো দেখাইলেন, উপযুক্ত গুণ থাকিলে নেতা যে-কোন শ্রেণী হইতে আসিতে পারেন, এমন কি নারী হইলেও আটকায় না। বঙ্কিমের যুগের পক্ষে এই ভবিষ্যৎদর্শিতা বিস্ময়কর। ভবানী পাঠক দেবীকে উপযুক্ত পাত্র ভাবিয়া শিক্ষা দিতে শুরু করিলেন। সে শিক্ষা নেহাৎ দল গড়িবার কারিগরি শিক্ষা নয়, তখনকার মানবিকতার উন্নততম আদর্শের অনুশীলন। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য মার্কসবাদের খবর কিছু কিছু জানিতেন। মার্কস-প্রবর্তিত প্রথম আন্তর্জাতিকের উল্লেখ তাঁহার রচনায় পাওয়া যায়। কিন্তু যে দেশে নির্বিত্ত শ্রেণীর সুস্পষ্ট উদ্ভব হয় নাই, সে দেশে বসিয়া মার্কসবাদী গ্রন্থ পড়িলে তাহার আক্ষরিক অর্থজ্ঞান হয় মাত্র, তাহার মূলতত্ত্ব উপলব্ধিকে এড়াইয়া যায়। তাই ভবানী পাঠক দেবীকে দীক্ষিত করিলেন নিষ্কাম কর্মযোগের গূঢ় সাধনায়। প্রায় সত্তর বৎসর আগে বঙ্কিমচন্দ্র নেতৃত্বের শিক্ষার যে উচ্চ আদর্শ দেশের কর্মীদের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণে আমাদের দেশের মার্কসবাদী নেতারা মার্কসীয় বিজ্ঞান সেই রূপ নিষ্ঠার সহিত আয়ত্ত করিলে দেশের বর্তমান দুরবস্থার অবসান হইত, চীন দেশের উদাহরণের পর তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

'সীতারামে' ফুটিয়াছে জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব সমস্যার ভয়ংকর বিপদের দিক। সীতারাম এক নূতন রাষ্ট্র স্থাপনের প্রতিভাশালী ও প্রভাবশালী নেতা, যাহার উদ্দেশ্য হইবে লোকহিত। কিন্তু সীতারামের নেতৃত্ব নিরংকুশ, দেবীর নেতৃত্বের আদর্শের মতো তাহা বিজ্ঞানসাধনায় সুসিদ্ধ নহে। বিজ্ঞানের স্থলে অহংজ্ঞান তাহার পরিচালক। তাই তাহার চরিত্রে দেখা যায় খেয়ালের এক

চরম হইতে অন্য চরমে দোল খাওয়া। এইরূপ নেতাকে শিক্ষার দ্বারা সংযত না করিয়া ব্যক্তিগত প্রভাবের বশে পরিচালিত করিতে গেলে কি বিপরীত ফল ফলে, শ্রী ও জয়ন্তীর ভূমিকায় তাহার প্রকাশ। নেতৃত্ব বিপথগামী হইলে আন্দোলনের ক্ষেত্রে কি বিষম ফল ফলাইতে পারে, সীতারাম তাহার বাস্তব চিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের আশঙ্কা যে অমূলক নয়, বাংলা দেশে পরবর্তী কালে রাজনৈতিক নেতৃমণ্ডলীর স্খলনের ইতিহাস যাঁহাদের জানা আছে তাঁহারা তাহা অস্বীকার করিতে পারেন না।

জাতীয় আন্দোলন-সংক্রান্ত এই তিনটি উপন্যাসে বিশেষ করিয়া বাঙালী জাতির কথাই বলা আছে। জাতি বলিতে বাঙালী জাতিই বঙ্কিমচন্দ্রের মানসনয়নে প্রতিভাত ছিল। কেননা, ভারতে জাতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত বাঙলা দেশেই। এই দেশকেই বঙ্কিম প্রত্যক্ষভাবে জানিতেন, ইহার ভাষা ও সাহিত্যের তিনি এক প্রধান স্রষ্টা। এ যুক্তিও যথেষ্ট নয়। আসল কথা, ভারতে জাতীয় আন্দোলনে ভারতের যে ঐক্য কল্পনা করা হয় তাহা বাস্তব সত্য নহে, তাহা ইংরেজ শাসনের শিকলে-বাঁধা ঐক্য। ভারত বহু জাতির দেশ, এবং প্রত্যেক জাতির স্বাতন্ত্র্যের অধিকার আছে। জাতি শব্দটি এখানে অবশ্য স্তালিনীয় অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতীয় জাতিগুলির সৌভ্রাত্রের ভিত্তির উপরেই নিখিল ভারতীয় ঐক্যের সৌধ গড়িয়া উঠিতে পারে। বঙ্কিমের বাঙালী জাতীয়তাবোধ তাই ভারতীয় ঐক্যের পরিপন্থী নহে, পূর্বশর্ত। যতদিন এই বহুজাতিকতা স্বীকার ও সংগঠন করা না হইবে ততদিন বাংলা ও ভারতের মুক্তি সংগ্রাম অসমাপ্ত থাকিবে।

ভাবিতে আনন্দ লাগে সীতারামের নৈরাশ্য-কালিমার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী-জীবনের অবসান ঘটে নাই। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রাজসিংহের পুনর্লিখিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ বঙ্কিমের শেষ এবং বৃহত্তম উপন্যাস। এই শেষ উপন্যাসই তাঁহার একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে ইতিহাসের গতিই হইতেছে মহানায়ক, ব্যক্তিগত চরিত্রগুলি তাহার অনুষঙ্গী মাত্র। বৃহৎ যূথবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর গতিশীলতা এই উপন্যাসে যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা মাঝে মাঝে টলস্টয়ের "যুদ্ধ ও শান্তি"-কে মনে পড়াইয়া দেয় তুলনায় অবশ্য টলস্টয়ের গ্রন্থ বঙ্কিমের অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের। টলস্টয়ের সময়ে রুশ দেশে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি চলিতেছিল তাহার আবেগ ও বিস্তার বঙ্কিমচন্দ্র কোথায় পাইবেন? তবুও তাঁহার শিল্পী-

প্রতিভা অনুভব করিয়াছিল যে ভারতের জাতীয় জীবনে এক অপূর্ব গতি-শীলতার সঞ্চার হইয়াছে। তাই তাঁহার শেষ উপন্যাস সাফল্যের ইতিহাস। রাজসিংহ এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অধিপতি হইয়াও প্রবলপরাক্রমশালী দিল্লীর বাদশাহকে পরাভূত করিতে সমর্থ। ইহার কারণ তিনি ধর্মযুদ্ধের নেতা, ন্যায় তাঁহার পক্ষে। বঙ্কিমচন্দ্রের অজ্ঞাত ছিল বর্তমান পৃথিবীতে ন্যায়যুদ্ধের অপরাজেয় নেতা শ্রমিক শ্রেণী ভারতের ভূমিতে ভূমিষ্ঠ হইয়া সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। তাহার প্রথম সংগ্রামী প্রকাশ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে, জাতীয় আন্দোলনের দেশমান্য নেতা তিলকের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের শ্রমিক-বিক্ষোভে। লেনিনের দূরদৃষ্টি তখনই এই ঘটনাকে এই বলিয়া অভিনন্দন জানাইয়াছিল যে ভারতে শ্রমিক শ্রেণী জাগ্রত হইয়াছে, ভারতের মুক্তি সংগ্রাম আসন্ন। পরাধীন দেশের মুক্তি সংগ্রামে বিভিন্ন শ্রেণীর সহযোগিতা চাই, কিন্তু নেতৃত্ব করিতে পারে কেবল শ্রমিক শ্রেণী, ইহাই মার্কসবাদের শিক্ষা। ইতিহাস-নির্দিষ্ট যে শক্তি বঙ্কিমের স্বপ্নকে করিবে সার্থক, দেশের মুক্তিকে করিবে সফল, তাহারই আবির্ভাবের আনন্দময় আগমনী বিধৃত হইয়া রহিল বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস 'রাজসিংহে'।

সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ ও সম্পূর্ণ বিচার একটি প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। এখানে কয়েকটি নীতিগত প্রশ্নের আলোচনা করা হইল। এই আলোচনাকে বাঙলা দেশের সংস্কৃতিবিদ্ মার্কসবাদীরা আরো ব্যাপক ও গভীর করিয়া তুলিতেন, ইহাই বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের একান্ত আশা ও কামনা।

"মার্কসবাদী বঙ্কিম-বিচার" প্রসঙ্গে

অরবিন্দ পোদ্দারের প্রতিবাদ

মাঘ মাসের (১৩৫৮) 'পরিচয়ে' শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা 'মার্কসবাদী বঙ্কিম-বিচার' নিবন্ধটি পাঠ করলাম। ঐ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য সম্পর্ক আলোচনা আমি করব না। তবে, প্রসঙ্গত, তিনি আমার সম্পর্কে এবং আমার 'বঙ্কিম-মানস' সম্পর্কে এমন দু-চারটে কথা বলেছেন, যাতে 'পরিচয়ে'র পাঠকগোষ্ঠীর নিকট আমার ভ্রান্ত বা বিকৃত পরিচয় পরিবেশিত হয়েছে বলে আমার আশঙ্কা। তাই, অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায়-পরিবেশিত পরিচয় সম্পর্কে 'পরিচয়ে'র পাঠকগোষ্ঠীকে দু'-চারটে কথা আমি জানাতে চাই। আশা করি, 'পরিচয়' পত্রের কোনও এক কোণে আমার এ ক'টি কথা স্থান পাবে।

শ্রীযুক্ত রায়ের প্রধানতম উক্তি, আমি 'বঙ্কিম-মানসে' মার্কসবাদী পরিভাষা নাকি ব্যবহার করিনি, আর সেজন্যই আমার আলোচনা মার্কসবাদী হয়নি। 'বঙ্কিম-মানসের' মূল আলোচনা আরম্ভ করার আগে কালের স্বরূপ ও বিবর্তন সম্পর্কে আমি কয়েকটি ছত্র জুড়ে দিয়েছিলাম নতুন সাহিত্য-জিজ্ঞাসার সহিত অপরিচিত অনভিজ্ঞ পাঠকদের সুবিধার জন্য। সেই ছত্রগুলি সম্পর্কে শ্রীযুক্ত রায় আপত্তি করে বলেছেন এগুলি 'মার্কসীয় দর্শন অপেক্ষা হেগেলীয় দর্শনের

বেশি উপযোগী।" আরও একটু অগ্রসর হয়ে তিনি জানিয়েছেন, "উক্ত উল্লেখ মার্কসবাদ অপেক্ষা পরিবেশ-বাদের নিকটতর…।" তিনি আমার এবং 'পরিচয়'-পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানিয়েছেন সাম্যবাদী ফতোয়ার প্রথম পর্বের প্রথম ছত্রের কথা—"এ পর্যন্ত বর্তমান সকল সমাজের ইতিহাস হইতেছে শ্রেণী-সংঘর্ষের ইতিহাস।"

শ্রীযুক্ত রায় মার্কসবাদী পরিভাষা সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করার সময় সম্ভবত খেয়াল করেন নি, অথবা সম্ভবত ভুলে গিয়েছেন, মার্কস-এঙ্গেলস্-লেনিন মানুষের সমাজ ও জীবন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-চেতনা-মনন সম্পর্কে বহুবিধ আলোচনা করে গিয়েছেন। এই বহুবিধ আলোচনার 'পরিভাষা' এক নয়; মার্কসীয় দর্শনের ক্ষেত্রে তা একরূপ, অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক তত্ত্বালোচনার সময় তা অন্যরূপ, সমাজতাত্ত্বিক সূত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও তা আর একরূপ। বিশুদ্ধ তত্ত্বালোচনার সময় তাঁরা যে-ভাষায় কথা বলেছেন, সেই তত্ত্বকে বাস্তব সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সময় সে-ভাষা তাঁদের পরিত্যাগ করে অন্যতর ভাষা ব্যবহার করতে হয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলসের এবং লেনিনের সর্ববিধ রচনার সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই তা স্বীকার করবেন। মানুষের কর্ম, সমাজ-বিবর্তন, ইতিহাসের গতি সম্পর্কে অজস্র উদ্ধৃতি দিয়ে এ-কথা প্রমাণ করা যেতে পারে। পাঠকদের সুবিধার জন্য দু' একটি উদ্ধৃতি এখানে পরিবেশন করতে বাধ্য হচ্ছি।

মানুষের কর্ম সম্পর্কে মার্কস: Man adapts his all-sided being in an all-sided manner, in other words, as a total man. Every one of his **human** relations with the world: seeing, hearing, melling, tasting, feeling, thinking, contemplating, willing, acting (শ্রীযুক্ত রায়ের যুক্তি মানিয়া লইলে মার্কসের পক্ষে acting না লিখে class-struggling লেখাই বোধ করি অধিকতর মার্কসবাদ-সম্মত হ'তো!) loving, in short, all the organs of his individuality as well as the organs which in their immediate form are common to all, are in their **objective** attitude or in their attitude to the object an adoption of the latter. (Literature and Art, Page 61. বড় হরফ মার্কসের)

সমাজ-বিবর্তন, ইতিহাসের গতি সম্পর্কে এঙ্গেলস: …all successive

historical situations are only transitory stages in the endless course of development of human society from the lower to the higher. Each stage is necessary, and therefore justified for the time and conditions to which it owes its origin. But in the newer and higher conditions which gradually develop in its own bosom, each loses its validity and justifications...... For it (dialectical philosophy) nothing is final, absolute, sacred. It reveals the transitory character of everything and in everything, nothing can endure before it except the uninterrupted process of becoming and of passing away, of endless ascendency from the lower to the higher. (Ludwig Feurbach)

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত রায়ের পরিভাষা-ব্যাকুল মনকে সন্তুষ্ট করার জন্য এঙ্গেলস্ শ্রেণী-সংগ্রামের 'পরিভাষা' এখানে ব্যবহার করেন নি। এঙ্গেলসের এই কথাগুলির সঙ্গে মিলিয়ে শ্রীযুক্ত রায় নিন্দিত "বঙ্কিম-মানসের" লাইন ক'টি পাঠ করতে অনুরোধ করি। শ্রীযুক্ত রায় আমাকে যে অপরাধে অপরাধী করেছেন, এঙ্গেলস্ও সেই অপরাধেই অপরাধী। মার্কসবাদের অন্যতম স্রষ্টা যদি হেগেল-বাদী বা দ্বৈতবাদী বলে নিন্দিত হতে পারেন, তো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাধারণ ডক্টরেট অরবিন্দ পোদ্দার কোন্ ছার।

শ্রীযুক্ত রায় আমার "একদিকে সৃষ্টিশীল মন, অন্যদিকে সৃষ্টিকারী পরিবেশ, এই দুই সত্যের পূর্ণ সঙ্গতির মধ্যেই একটি একক বিশেষ সত্য গড়িয়া উঠিয়াছে"—এই উক্তিটি সম্পর্কে বলেছেন, এতে নাকি "বস্তু ও মনের পরস্পর-নির্ভরতা স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সমতাও স্বীকার করা হয়।" আমার আশঙ্কা অধ্যাপক রায় "সৃষ্টিশীল" ও "সৃষ্টিকারী" বিশেষণ দু'টির তাৎপর্য সঠিক উপলব্ধি করতে পারেন নি। পরিবেশ শব্দটির আগে আমি ইচ্ছে করেই ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ না রাখার জন্য, সৃষ্টিকারী বিশেষণটি ব্যবহার করেছি; কারণ, পরিবেশই সৃষ্টি করে মানুষের চেতনা ও জ্ঞানকে। কিন্তু, এই সৃষ্টির প্রবাহে মানুষের মন বা ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্ক্রিয় থাকে না, এই প্রবাহের মধ্যে এরাও সক্রিয়, সজীব অংশ গ্রহণ করে। এ কারণেই মনের আগে

আমি সৃষ্টিশীল শব্দটি ব্যবহার করেছি। মানুষের এই সৃষ্টিশীল মনই তাকে নব নব রূপে, নব নব স্বভাবে, রূপান্তরিত হওয়ার জন্য কর্মব্যস্ত করে তোলে, পরিবেশের সঙ্গে নবতর সম্পর্কে আবদ্ধ করে। এই লাইনটি লেখার সময় আমার মনে ছিল মার্কসের কথা, 'The chief defect of all hitherto existing materialism…is that the thing, reality, sensuousness, is conceived only in the form of the **object** or of **contemplation** but not as **human sensuous activity, practice,** not subjectively,' (বড় হরফ মার্কসের) বস্তুর অস্তিত্ব মানুষের মন-নিরপেক্ষ নিশ্চয়ই, কিন্তু বস্তুর অস্তিত্ব তখনই আমাদের নিকট সত্য যখন আমাদের মন বস্তুকে অনুভব করে, তার সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, কর্মের মাধ্যমে তাকে জানে : অর্থাৎ, বস্তু বা বস্তু-জগৎ "exists for me". মার্কসবাদীরা সেজন্যই subjective-objective relation বলে থাকেন। অধ্যাপক রায় যান্ত্রিকভাবে মানুষের চেতনা ও জ্ঞানের বিকাশে মনের ভূমিকাকে যতটা খর্ব করতে চাচ্ছেন, মার্কসবাদী দর্শন তা স্বীকার করে না। তিনি ইচ্ছে করলে শিরোকোভের নেতৃত্বে রচিত A Text-book of Marxist Philosophy গ্রন্থের ১০৩ ও পরবর্তী কয়েকটি পৃষ্ঠাও পাঠ করে দেখতে পারেন। মার্কস-নির্দেশিত পথেই আমি ঐভাবে মন-পরিবেশ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছি। শ্রীযুক্ত রায় বৃথাই আমার বিরুদ্ধে মন ও পরিবেশকে "তুল্যমূল্য" বলে গণ্য করার অভিযোগ এনেছেন।

এমনি ধরনের আরও কয়েকটি অবান্তর অভিযোগ তিনি আমার সম্পর্কে করেছেন। জানি না, এর পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা। কারণ, "বঙ্কিম-মানসের" মূল দৃষ্টিকোণ এবং বক্তব্য সম্পর্কে তিনি বিশদ কেন, কোনরূপ আলোচনা করেছেন বলে মনে হল না। ঐ গ্রন্থের এখান-সেখান থেকে দুটো-চারটে লাইন তুলে তিনি প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন, ঐ লাইনগুলি তাঁর মতে মার্কসবাদ-সম্মত নয়। তিনি যদি সমগ্রভাবে আমার পুঁথিটিকে গ্রহণ করে আলোচনা করতেন, তা হলে 'পরিচয়'-পাঠক এবং আমি নিশ্চয়ই উপকৃত হতাম। কিন্তু তা না করায়, তাঁর অভিযোগগুলো শুধুই একপেশে নয়, ভ্রান্তও। ভ্রান্তির আলোচনায় 'পরিচয়'-এর মূল্যবান স্থান নষ্ট করতে চাইনে, তাই মাত্র দু' একটি উক্তির আলোচনা করেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

অধ্যাপক রায়, মনে হল, শুধু মার্কসবাদী উপবীত দিয়ে মার্কসবাদী ব্রাহ্মণকে চিনতে চান, গুণকর্ম দিয়ে নয়। কিন্তু ভেবে দেখার বিষয়, শুধু

উপবীতের জোরেই কি ব্রাহ্মণ হওয়া যায় ? মার্কস নিজেই কি মার্কসবাদের মর্ম গ্রহণে অক্ষম অথচ উপবীতধারী মার্কসবাদীদের (!) হাত থেকে মুক্তি কামনা করেন নি ?

আর, মূল বক্তব্য ও সমালোচনা-পদ্ধতির বিস্তৃত আলোচনা না করে, সমগ্রভাবে একটা পুঁথিকে বিচার না করে, একটা-দুটো শব্দ বা লাইন উদ্ধৃত করে লেখককে নিন্দিত করার চেষ্টা, মার্কসের উক্তি "O God, save me from those Marxists" উদ্ধৃত করে মার্কসকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টার মতোই অশোভন ও হাস্যকর।

নীরেন্দ্রনাথ রায়ের প্রত্যুত্তর

ডাঃ পোদ্দার লিখিয়াছেন, "শ্রীযুক্ত রায়ের প্রধানতম উক্তি, আমি 'বঙ্কিম-মানসে' মার্কসবাদী পরিভাষা নাকি ব্যবহার করি নি। আর সেই জন্যই আমার আলোচনা মার্কসবাদী হয় নি।" আমার মতে তাঁহার উক্তি সত্য নহে। তাঁহার বিরুদ্ধে আমার সর্বপ্রধান অভিযোগ, তিনি নিজেকে মার্কসবাদী হিসাবে দাবি করিয়াও তাঁহার আলোচনায় মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলি হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। পরিভাষার প্রশ্ন উঠিয়াছে প্রসঙ্গত, তাঁহার বিচ্যুতির অন্যতম কারণ হিসাবে। যে কোন বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতে গেলে দেখা যায় তাহার প্রামাণিক গ্রন্থগুলিতে পরিভাষার প্রাচুর্য। ইহা কি বিশ্বের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের ব্যক্তিগত খেয়াল ? অথবা সহজ বিষয়কে কঠিন করিয়া তুলিবার সংঘবদ্ধ ষড়যন্ত্র ? বিজ্ঞানে পরিভাষার উদ্ভব ও প্রয়োগ হইয়াছে বিজ্ঞান-সাধনারই তাগিদে। আমাদের সাধারণ প্রচলিত ভাষা বিজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট নহে বলিয়াই পরিভাষার প্রয়োজন হয়। মার্কসবাদের প্রকৃতি বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়া তাহারও পরিভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে।

বিভিন্ন বিজ্ঞানের প্রকৃতিভেদে তাহার পরিভাষার সহিত সাধারণ প্রচলিত ভাষার সম্বন্ধেও তারতম্য থাকে। বিশুদ্ধ গণিতের পরিভাষা সাধারণ ভাষা হইতে এতই স্বতন্ত্র যে তাহাকে ভাষা বলিতেই অনেকের আপত্তি হইতে পারে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের ভাষা আমাদের সাধারণ জ্ঞানচর্চা হইতে অতদূরে অবস্থিত নয় বলিয়া তাহার পরিভাষার সহিত সাধারণ ভাষার সম্বন্ধ নিকটতর।

তাহা সত্ত্বেও মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত পরিভাষা-বর্জিত জনবোধ্য ভাষায় প্রকাশ করা অতি দুরূহ ব্যাপার। এক্ষেত্রে দেবদূতেরাও পদক্ষেপ করেন অতি সন্তর্পণে। সর্বস্বীকৃত পরিভাষার ব্যবহারে বরং অনেক দুষ্ট চিন্তার প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা যায়। ডাঃ পোদ্দারের রচনায় এই দুষ্ট চিন্তার প্রভাবের জন্যই আমাকে পরিভাষার প্রসঙ্গ তুলিতে হইয়াছিল।

আমার ধারণায়, শ্রেণী-বিভক্ত মানবসমাজের অঙ্গীভূত যে-কোন বিষয়ের মার্কসবাদী আলোচনায় বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না শ্রেণী-সংঘর্ষের উল্লেখ বাদ দিয়া। ডাঃ পোদ্দারের ধারণা ভিন্নরূপ। নিজের সমর্থনে তিনি মার্কসের রচনা হইতে একটি উদ্ধৃতি পত্রস্থ করিয়াছেন,—Man adapts ইত্যাদি। এই উদ্ধৃতিটি প্রয়োগ করিবার সময় ডাঃ পোদ্দার খুব সম্ভব ভাবিয়া দেখেন নাই তিনি কোন্ মার্কসের রচনা ব্যবহার করিতেছেন। এটা সকলেরই জানা কথা, চিন্তার ক্ষেত্রে মার্কস মার্কসবাদী হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন নাই; তাঁহাকে স্বমতে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইয়াছিল হেগেলবাদের কঠিন আশ্লেষ বিদীর্ণ করিয়া। হেগেলের রচনাভঙ্গির সহিত যাহাদের প্রাথমিক পরিচয় আছে তাহারাই ইহাতে হেগেলের প্রভাব সহজেই ধরিতে পারিবে। এবং ইহা না হইয়া মার্কসের রচনাটির অন্য গতি ছিল না। কারণ ইহা রচিত হইয়াছিল ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ, যখন মার্কস হেগেলের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, যখন অর্থনৈতিক শ্রেণী-সংঘর্ষের গুরুত্ব সম্পূর্ণরূপে অধিগত করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার দার্শনিক চিন্তাধারা যে তখনই শ্রেণী-সংঘর্ষের দিকে ঝুঁকিতেছিল তাহার নিদর্শন এই রচনাটিতেও আছে। ডাঃ পোদ্দার যেখানটিতে তাঁহার উদ্ধৃতি শেষ করিয়াছেন তাহা হইতে সামান্য তিন চার ছত্র আগাইয়া গেলেই দেখিতে পাওয়া যায় মার্কস লিখিতেছেন: Private property has made us so stupid and one-sided that an object is ours only if we have it, that is, exists as capital for us or is used by us: immediately possessed, eaten, drunk, worn on our body, or lived in. Although private property looks on all these immediate embodiments of possession only as means of sustenance, the life which they serve is the life of private property, work and capital.

আরো একটু দূরে আছে ঃ

The abolition of private property means therefore the complete emancipation of all human senses and aptitudes; but it means that emancipation for the very reason that these senses and aptitudes have become human, both subjectively and objectively,

এই রচনাটিরই শেষভাগে মার্ক্‌স লিখিতেছেন ঃ

This is the process of develoment of practical humanism—or atheism is humanism brought about by abolishing religion, **communism is humanism brought about by abolishing private property.** Only by removing this interceding element—which however is a necessary pre-requisite—does positive, self-created humanism come into being. (বড় হরফ মার্ক্‌স-এর)। ইহার পরেও কি বলিতে হইবে যে এই রচনায় শ্রেণী-সংঘর্ষের উল্লেখ নাই?

ডাঃ পোদ্দার সমাজ-বিবর্তনে ইতিহাসের গতি সম্পর্কে এঙ্গেল্‌স-এর রচনা হইতে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি করিয়াছেন। নূতন সাহিত্য-জিজ্ঞাসার সহিত অপরিচিত অনভিজ্ঞ পাঠকদের সুবিধার জন্য গ্রন্থারম্ভে যে-কয়েকটি ছত্র জুড়িয়া দিয়াছেন, তাঁহার ধারণায় এই উদ্ধৃতি তাহার সমর্থক অথবা সমার্থক। কিন্তু এঙ্গেল্‌স্‌-এর লেখাটি পড়িলে যে-কোন পাঠক বুঝিতে পারেন যে তাঁহার মতে সমাজ পর্ব হইতে পর্বান্তরে পরিবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরে উন্নীত হইতেছে। অর্থাৎ সামাজিক গতিবেগের রেখাচিত্র হইতেছে, গাণিতিক পরিভাষায় যাহাকে বলা হয়, স্পাইরাল। এই ঊর্ধ্বমুখীনতা মার্ক্‌সবাদী সমাজ-বিজ্ঞানের প্রাণস্বরূপ ও ইহাতেই শ্রেণী-সংঘর্ষের ন্যায়ানুমোদিতা। কারণ শ্রেণী-সংঘর্ষের শেষই হইতেছে নিঃশ্রেণীক সমাজের প্রতিষ্ঠায়। ডাঃ পোদ্দারের বর্ণনায় এই ঊর্ধ্বমুখীনতার সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁহার মতে, বিকাশের সহজ নিয়মেই কাল কালান্তরে পরিণত হয়। তাঁহার কল্পিত "ইতিহাসের অবিশ্রান্ত ধারা" হেরাক্লাইটাস-বর্ণিত 'চিরন্তন বিলোড়নের' সমধর্মী, মার্ক্‌সবাদের নহে।

বস্তু ও মনের সমতা সম্পর্কে ডাঃ পোদ্দারের মতকে যদি আমি ভুল বুঝিয়া

থাকি তাহা হইলে আমি বিপথ-চালিত হইয়াছি তাঁহার 'সমান্তরাল' শব্দটির প্রয়োগে; "ব্যক্তিমনের এই বিস্তৃতির সহিত সমান্তরাল ভাবে সমাজ-মানসও বিস্তৃতি লাভ করে" এই বাক্যটি আমার প্রবন্ধে উদ্ধৃত করার সময় 'সমান্তরাল' শব্দটি বড় হরফে ছাপা হইয়াছিল, কারণ উহাতে ছিল আমার আপত্তি; এবং সে-আপত্তি আমি আমার প্রবন্ধে বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সংজ্ঞানুসারে দুটি রেখা সমান্তরাল হইলে তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ হয় তুল্যমূল্য, শুধু তাহারা পরস্পর-নির্ভরশীল নয়। এই প্রসঙ্গে উঠিয়াছে পরিবেশ ও মনের সম্পর্কের প্রশ্ন। ডাঃ পোদ্দার ইহার সহজ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন এই বলিয়া যে "মনকে বাদ দিয়া পরিবেশ সত্য নয়। আবার পরিবেশ বাদ দিয়া মনও সত্য নয়।" কিন্তু ব্যক্তি-মানসের সহিত সমাজ-মানসের সম্বন্ধের মতো সমাজ-মানসের সহিত সমাজ-পরিবেশের সম্বন্ধও সহজ পরস্পর-নির্ভরশীলতা নয়। সমাজ-মানস হইতেছে সমাজ-পরিবেশের প্রতিফলন, চলমান প্রতিফলন; কারণ সমাজ-পরিবেশও তাহার নিজস্ব নিয়মে নিয়ত চলমান। বস্তু ও মনের পরস্পর-নির্ভরশীলতা তো আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতা। তাহা সত্ত্বেও মার্কসবাদের মতে, বস্তুই হইতেছে প্রাক্, মন তাহার সৃষ্টি। বস্তুর বিবর্তন-প্রক্রিয়ার কোন এক সংযোগে মনের উদ্ভব। তাই মনে হয় মার্কসের রচনা হইতে ডাঃ পোদ্দারের দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটি—The chief defect of hitherto existing materialism ইত্যাদি—বর্তমানক্ষেত্রে লক্ষ্যভ্রষ্ট। মার্কস উহা লিখিয়াছিলেন যান্ত্রিক বস্তুবাদের বিপক্ষে, কেননা তাহা মনের সক্রিয়তাকে স্বীকার করে না। কিন্তু তাই বলিয়া মার্কস মন অপেক্ষা বস্তুর প্রাধান্যকে কখনও অস্বীকার করেন নাই। করেন নাই বলিয়াই তাঁহার মতবাদের দার্শনিক নাম—দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ।

ডাঃ পোদ্দারের পত্রে যেগুলিকে বলা যায় তত্ত্বগত অভিযোগ তাহাদের আলোচনা করা গেল। বাকি থাকে ব্যক্তিগত অভিযোগ: তাহাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

সাহিত্যবিচারে মার্কসবাদ

মার্কসবাদের প্রথম প্রস্ফুট প্রকাশ কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণাপত্রে। ১৮৪৮ সাল ইওরোপের ইতিহাসে 'বিপ্লবের বৎসর' বলিয়া খ্যাত। ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইওরোপের বিভিন্ন দেশে গণ-অভ্যুত্থানের তরঙ্গ বহিয়া যায়। ঘোষণাপত্রের তরুণ রচয়িতারা বিপ্লবের পরিণামে সমাজবাদের যে প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই। প্রত্যেক দেশেই বিপ্লব প্রতিবিপ্লবের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। তবুও আজ ঠিক একশত বৎসর পরে পৃথিবীর দেশে দেশে বিপ্লবী জনগণের মধ্যে ঘোষণাপত্রের শতবার্ষিকী প্রতিপালিত হইতেছে। ঘোষণাপত্রের প্রকাশ বিশ্ববিপ্লবের ইতিহাসে স্মরণীয়তম ঘটনার অন্যতম। যতদিন পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী ধনবাদের উচ্ছেদ ঘটাইয়া বিশ্বব্যাপী সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত না হয়েছে ততদিন পর্যন্ত এই ঘোষণাপত্রের কার্যকারিতা অব্যাহত থাকিবে, ইহা সহজেই অনুমান করা যায়।

একটি ক্ষীণকায় বিপ্লবী গোষ্ঠীর অব্যবহিত করণীয় পদ্ধতির বিশ্লেষণ আজ এই বৃহৎ গৌরব অর্জন করিল কেমন করিয়া; কেমন করিয়া সম্ভব হইল, শতবর্ষ পূর্বে ঘোষণাপত্রের অকস্মাৎ আবির্ভাবের কথা স্মরণ করিলে মনে পড়ে কবির উক্তি—পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ? তাহার কারণ, এই উচ্চতায়

অভিরোহণ করিতে মার্কস ও এঙ্গেলস্‌কে প্রথমে পৃথকভাবে ও পরে যুক্তভাবে যে অসামান্য প্রস্তুতির ভিতর দিয়া যাইতে হইয়াছিল তাহা তখন ছিল মেঘাবৃত, লোকচক্ষুর অন্তরালে ঢাকা। একশত বৎসরের ইতিহাস এই বিরাট যুগ্ম প্রতিভার বহুমুখীন কৃতিত্বের রহস্য ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়াছে, যাহার আয়োজনে ও সার্থকতায় লেনিন ও স্টালিনের নাম সর্বাগ্রগণ্য। তত্ত্ব হিসাবে আজ যাহা মার্কসবাদ বলিয়া পরিচিত তাহা প্রধানত এই চারি মহাপুরুষের অভূতপূর্ব প্রতিভার অবদান। এখন ইহা প্রায় সর্বত্র স্বীকৃত যে মার্কসবাদ মাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মপন্থায় নয়, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাজগতেও যুগান্তর প্রবর্তন করিয়াছে, যদিও এই পরিবর্তনের পরিমাণ সম্বন্ধে পণ্ডিত মহলে বিতর্কের অবধি নাই।

মার্কসবাদীর মতে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (মার্কসবাদের দার্শনিক অভিধা) একটি পরিপূর্ণ বিশ্ববীক্ষা। ইহাতে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক অভিব্যক্তির স্বতোবিরোধহীন এবং পরীক্ষা-নির্ভর বিবৃতি পাওয়া সম্ভব। ইহা হেগেলের বিশ্ববীক্ষা হইতে উদ্ভূত হইয়াও তাহার ঐকান্তিক নিরাকরণ। হেগেলের উদ্ভাবিত দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ইহাতে অঙ্গীকৃত, কিন্তু তাঁহার ভাববাদী সিদ্ধান্তগুলি ইহাতে অস্বীকৃত। বস্তুবাদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি মার্কসবাদে জড়বাদী বিজ্ঞানকে ও ভাববাদী দর্শনকে সমন্বিত করিয়াছে। মার্কসবাদ, এক কথায়, দার্শনিক বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দর্শন। এঙ্গেলস্‌, লেনিন, কড্‌ওয়েল ছিলেন বিজ্ঞানে পারদর্শী; আর লাঁজভ্যাঁ, কুরী, হলডেন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের প্রয়োগে বিশ্বাসবান।

যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে মার্কসীয় দর্শন সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবার পূর্বে একটি প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে যাহা সকল দর্শনের মূলপ্রশ্ন—কে আগে, জড় না চৈতন্য? অর্থাৎ চৈতন্য হইতে জড়ের উদ্ভব, না জড় হইতে চৈতন্যের? বলা বাহুল্য, নিছক তর্কের দ্বারা এ প্রশ্নের সমাধান হয় না। এই ধরনের তর্কযুদ্ধের একটি উপাদেয় বর্ণনা পাওয়া যায় আনাতোল ফ্রাঁস-এর একটি উপন্যাসে ঃ

One camp maintained that before there were apples there was The Apple ; that before there were jackanapes there was The Jackanapes ; there before there were lewd and greedy monks there were The Monks, Lewd-ness, and Greed . that

before there were feet to kick and backsides to be kicked, The Kick in the Arse existed from all eternity in the bosom of God.

The other camp replied that on the contrary apples gave man the idea of The Apple, jackanapes the idea of The Jackanapes, monks the idea of Monk, Greed and Lewdness, and that the kick in the backside existed only after having been duly given and received.

The players grew heated and came to fisticuffs. I was an adherent of the second party which satisfied my reason better.

আনাতোল ফ্রাঁস-এর মতো মার্কসবাদীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও যুক্তিপ্রয়োগের পক্ষ সমর্থন করে।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ যান্ত্রিক জড়বাদ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যান্ত্রিক জড়বাদ জড় ও চেতনের পরস্পর প্রভাবশীলতা স্বীকার করে না, ও তাহাতে বিবর্তনজনিত অভিব্যক্তির স্বীকৃতি নাই। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে, চৈতন্য জড় হইতে উদ্ভূত হইয়াও জড়ের উপর প্রতিঘাত ও তাহাকে পরিবর্তিত করিতে পারে। এই মতানুসারে জড়ের জড়-প্রকৃতি সনাতন নয়, তাহারও বিবর্তন আছে। অ্যাটমেরও আছে ইতিহাস। সে ইতিহাস অলৌকিক নয়। তাহাও বিবর্তনবিধির নিয়মাধীন। জড়েরও অন্তরে আছে দ্বন্দ্ব যাহা তাহাকে নিয়ত ঠেলিতেছে পরিবর্তনের অভিমুখে। এই গতিশীলতা, নিয়মানুগ পরিবর্তনশীলতা, মার্কসবাদীর মতে, ইহাই হইতেছে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের চরম সত্য।

মানবের সামাজিক ইতিহাসও বিবর্তনশীলতার সাক্ষ্য দেয়। মানুষ সামাজিক জীব। তাহাকে সমাজ বাঁধিতে হইয়াছে জীবিকা-নির্বাহের তাড়নায়। জীবিকা-নির্বাহের জন্য যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন। প্রকৃতিদত্ত আহার্য আহরণের পরিবর্তে মানুষ যেদিন যন্ত্র বা হাতিয়ারের সাহায্যে খাদ্য উৎপাদন করিতে শিখিল সেদিন হইল পশুত্ব হইতে পৃথক মনুষ্যত্বের সূত্রপাত। যন্ত্রের সাহায্যে সে শিখিল প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতে। প্রকৃতির সহিত এই সংগ্রামে সে শিখিল তাহার ইচ্ছার বাহিরে আছে প্রকৃতির নিজস্ব সত্তা। প্রকৃতিতে কেমন করিয়া ঘটনাদি ঘটে ও কেমন করিয়া তাহাদিগকে ঘটাইতে পারা যায়—ইহা লক্ষ্য করিতে করিতে সে চিনিতে শিখিল প্রাকৃতিক হেতুবিধির আন্বেতর অবশ্যম্ভাবিতা।

ক্রমে সে শক্তি অর্জন করিল প্রাকৃতিক বিধিকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োগ করিবার। প্রকৃতির দাস না থাকিয়া সে প্রকৃতির প্রভু হইয়া দাঁড়াইল।

উৎপাদনের জন্য এই যে পরিশ্রম আদিম যুগে তাহা ছিল সামূহিক, গোষ্ঠীবদ্ধ। অনেক হাতকে এক সঙ্গে খাটিতে হইত, তাহার জন্য প্রয়োজন হইল ইচ্ছাজ্ঞাপনের। পশুর মত চিৎকার তাহাতে যথেষ্ট না হওয়ায় মানুষের কণ্ঠস্বর হইল স্পষ্টতর ইচ্ছা-দ্যোতক। উৎপাদনের এই পদ্ধতি হইতে ভাষার উৎপত্তি। ভাষার শ্রেষ্ঠতম ব্যবহার কবিতার ছন্দ-স্পন্দে। তাহাও উৎসারিত হইয়াছে জীবিকা সংগ্রহের সামূহিক প্রচেষ্টা হইতে, বহু ভাষাবিজ্ঞানী ইহা স্বীকার করেন। মার্কসবাদী ভাষার ও ছন্দ-স্পন্দের অলৌকিক আবির্ভাবে বিশ্বাস করেন না।

ভাষা সাহিত্যের বাহন। ভাষা মানুষের ভাবপ্রকাশের ও জ্ঞাপনের মাধ্যম। ভাষার তারতম্যের উপরে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের গুণাগুণ নির্ভর করে। কিন্তু মার্কসবাদী সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে। তাহার মতে, সাহিত সৃষ্টি করিবার সময়, বা কেবলমাত্র সাহিত্যের রস সম্ভোগ করিবার সময়, কেহ সমাজতাত্ত্বিক না হইয়া নিছক সাহিত্যিক থাকিতে পারেন। কিন্তু যখনই উপভোগের সীমা পারাইয়া বিচারের ক্ষেত্রে উপনীত হইতে হয় তখনই প্রয়োজন হয় সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর। কোন কিছুকে বিচার করিতে গেলে তাহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হয়। সাহিত্য সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রচেষ্টার ফল, মুক্তা যেমন শুক্তির। তাই সাহিত্যের বাহিরে দাঁড়ানোর অর্থ, সমাজের ভিতরে আসিয়া দাঁড়ানো। এই সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই সাহিত্যের বিচার ব্যক্তিগত উপভোগ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। সাহিত্য বিচারে প্রয়োজন হয় মূল্যজ্ঞান নিরূপণের। কোনো ব্যক্তির পক্ষে সাহিত্যিক মূল্যজ্ঞানের পদ্ধতি তাহার বিশ্ববীক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রের মূল্যজ্ঞানের পদ্ধতি হইতে বিভিন্ন হইতে পারে না। তাই মার্কসবাদীর সাহিত্যবিচার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদেরই অঙ্গ—সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ।

মানুষের সমাজ স্থিতিশীল নয়, চলিষ্ণু। এই চলার মূলে আছে সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। বর্তমান কাল হইতে অতীতের যতদূর পর্যন্ত লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। শ্রেণীসংগ্রামই মানব-সমাজের গতিশীলতার প্রধান উৎপাদক। শ্রেণীসংগ্রাম নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহের উপায়স্বরূপ উৎপাদন-যন্ত্রাবলীর বিবর্তনের উপর। এগুলির উপর

কাহার কি পরিমাণ কর্তৃত্ব, তাহা দিয়াই শ্রেণী-সম্বন্ধ নির্ধারিত হয়। আদিম গোষ্ঠী-সমাজ প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে ভাঙিয়া যাইবার পর হইতে দেখা যাইতেছে সমাজের একটি অংশের স্বল্পসংখ্যক লোক জীবিকার্জনের হাতিয়ারগুলির উপর প্রভুত্ব করে ও সমাজের অপর অংশের বহুসংখ্যক লোক তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ পরস্পরবিরোধী না হইয়া পারে না। ইহার এক শ্রেণীর স্বার্থ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে অটুট রাখা, অপরের স্বার্থ ইহাকে বদলাইয়া স্ববশে আনা। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রেরণায় মানব-সমাজের ইতিহাসে নানা বিবর্তন ঘটিয়াছে। ক্রীতদাস-ও ভূমিদাস-সমাজব্যবস্থার পরিবর্তে বেতনদাসসমাজ আজ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে প্রচলিত রহিয়াছে। অবশ্য কয়েকটি দেশে সমাজবাদী সমাজেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মার্কসবাদীর মতে, যতদিন বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদী সমাজ—সমাজবাদী সমাজ যাহার প্রথম ধাপ—প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে ততদিন এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের একান্ত সমাপ্তি হইতে পারে না।

সাহিত্য সমাজ-মানসের ভাষাগত প্রকাশ। সমাজ-মানসের বিকাশও যুগে যুগে বিবর্তিত হইতেছে। তাই সাহিত্যেও নানা যুগধর্ম প্রকট। ট্রাইবাল যুগ, ফিউডাল যুগ, বুর্জোয়া যুগের সাহিত্যের পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। যাহা সহজে চোখে পড়ে না তাহা হইতেছে ইহাদের উপর শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রভাব। ইহার অভাবে সাহিত্যের মূল্যনিরূপণ ব্যক্তিগত রুচির স্তরে থাকিয়া যায়, বৈজ্ঞানিক বিচারের স্তরে উন্নীত হয় না। আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে উৎপাদনের শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার অর্থ জীবনধারণের উপায়গুলিকেও নিয়ন্ত্রিত করা। মানুষ সব সময়েই অর্থনৈতিক কার্যে নিযুক্ত না থাকিলেও তাহার সকল কার্যেরই মূলে আছে অর্থনৈতিক প্রভাব। তাহার সকল কার্যের অর্থনৈতিক ফলাফল আছে বলিয়াই তাহার শ্রেণীসংগ্রামে লিপ্ত না হইয়া উপায় নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ইচ্ছায় অনিচ্ছায় এই সংগ্রামে যোগ দিতেই হয়। যেখানে সংগ্রাম চলিয়াছে ন্যায়ের সহিত অন্যায়ের, সত্যের সহিত মিথ্যার, অথবা বিশুদ্ধির সহিত বিভ্রান্তির, কোন্ সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক তাহাতে যোগ না দিয়া পারেন? না দিলে কর্তব্যে অবহেলা করা হইবে, একথাও বলা যাইতে পারে। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে ন্যায়, সত্য, বিশুদ্ধি, অন্যায়, মিথ্যা, বিভ্রান্তি ইত্যাদি ভাবগুলি শ্রেণীদ্বন্দ্বের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; অর্থনৈতিক মানদণ্ড বাদ দিয়া ইহাদের বিচার করা চলে না। যে জীবন হইতে

তাঁহারা সৃষ্টি বা উদ্ভাবনার উপাদান সংগ্রহ করেন তাহা সর্বদাই শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রভাবে প্রভাবিত।

মানব-সমাজ বিবর্তিত হইতেছে মানিয়া লইলেই প্রশ্ন জাগে তাহা যে উন্নতির অভিমুখে যাইতেছে তাহার প্রমাণ কি? কোন্ নীতির মানদণ্ডে বিচার হইবে শ্রেণীহীন সমাজ শ্রেণীবিভক্ত সমাজের চেয়ে উন্নততর? উত্তরে বলা যায়, বিবর্তন ধারার সেই স্তরকে তাহার পূর্বগামী স্তর অপেক্ষা উন্নত বলা যায় যাহা পূর্বতন স্তরের গুণকে অধিগত করিয়াও নূতন গুণের বিকাশ ঘটাইতে পারে। জীবিত প্রাণীর জৈবিক প্রক্রিয়া সম্যক বুঝিতে গেলে কেবল অ্যাটম বা ইলেক্‌ট্রনের জ্ঞানই যথেষ্ট নয়। অথচ জীবদেহের অস্তিত্বের জন্য ইহাদের পূর্বাস্তিত্ব অপরিহার্য। মানুষের অস্তিত্ব না থাকিলেও অ্যাটম, ইলেকট্রন থাকিতে পারে, কিন্তু অ্যাটম-ইলেকট্রন না থাকিলে মানুষের অস্তিত্ব সম্ভব হইত না। জীবদেহ জড় জগৎ হইতে উদ্ভূত হইয়াও তাই জড় জগৎ হইতে স্বতন্ত্র। ইহা এক নূতন প্রকাশ। এ নূতনের অর্থ নয় পুরাতনের রদবদল, ইহা গুণগত উল্লম্ফন, চৈতন্যের আবির্ভাব। এই চেতন জীব আবার পর্যায়ক্রমে অচেতন জড়বস্তুকে পরিবর্তিত করে; ও সেই সঙ্গে আপন প্রকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটায়। এই বিচার অনুযায়ী দেখা যায় মানুষের সমাজও ক্রমিক উন্নতির পথে চলিয়াছে, চলিয়াছে তাহার চরম কাম্যের সার্থকতার পথে। মার্কসবাদীর মতে সামাজিক মানুষের চরম কাম্য এমন একটি সমাজব্যবস্থা যাহাতে ব্যক্তির সহিত গোষ্ঠীর বিরোধ বিলুপ্ত হইয়া সাযুজ্য স্থাপিত হয়, যাহাতে কর্মের প্রেরণা ও কর্তব্যের দাবির মধ্যে সংঘাত না বাধে, যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তিমানবের স্বকীয় গুণাবলীর চরম বিকাশ সার্বিক সমাজে অগ্রগতির অনুপন্থী হয়। এই সমাজের প্রধান লক্ষণ তাই অর্থের সমবণ্টন বা উপভোগের সুযোগের সাম্য নয়। তাহা তো হইত কেবল পুরাতনের রদবদল। ইহা সমাজ-জীবনে নূতন স্তরের প্রবর্তন, যাহাতে সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাবে মানুষের প্রকৃতিও বদলাইয়া যাইবে। ইহাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ পাইবে তাহার চরম পরিণতি সার্বিক কল্যাণবোধে। এই সমাজের আর্থিক ভিত্তি হইবে শ্রেণীশোষণের অবসানে, কল্পনাতীত উৎপাদন প্রাচুর্যে, যাহার মূলমন্ত্র— দাও নিজের যতটা শক্তি, নাও নিজের যতটা প্রয়োজন। এই কামনা প্রত্যেক মানুষের অন্তরে অনুস্যূত, অথচ ইহা ব্যর্থ হয় শ্রেণীসংগ্রামের প্রাদুর্ভাবে। যে-সমাজব্যবস্থা যে পরিমাণে এই আদর্শের অনুকূল, সেই সমাজব্যবস্থাকে সেই

পরিমাণে উন্নতিশীল বলা যায়। সর্বমানবের স্বোপলব্ধির এই স্বাধীনতার সম্ভাবনা ক্রীতদাস-সমাজ, ভূমিদাস-সমাজ ও বেতনদাস সমাজের ভিতর দিয়া বিস্তৃত হইয়া চলিয়াছে। এই পথ অতিক্রম না করিয়া সাম্যবাদী-সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই সাম্যবাদী-সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনার মানদণ্ডে মার্কসবাদী বিভিন্ন সমাজব্যবস্থার গুণাগুণ বিচার করে, উন্নতি-অবনতির পরিমাপ করে। পরলোকে স্বর্গের কল্পনায়, ইহলোকে ভগবৎ রাজত্বের কল্পনায়, যুগে যুগে ইউটোপিয়ার কল্পনায় এই কামনাই আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বাস্তবতাকে স্বীকার করিয়াও কোন্ পন্থায় সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায়, স্বপ্নকে রূপায়িত করা যায় অভিজ্ঞতায়, তাহার রহস্য মার্কসবাদ খুঁজিয়া পাইয়াছে বলিয়াই আজ তাহার প্রভাব দেশে দেশে বিস্তৃত। সাম্যবাদী সমাজ আজ আর চিন্তা-জগতের আকাশকুসুম নয়, কর্মজগতের স্থির লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আয়ত্ত-সাপেক্ষ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মার্কসবাদী কর্মপ্রবণ। তাই তাহার কর্মপ্রেরণা চিন্তাহীন ভীতিপ্রদ কর্মবিলাস হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

সামাজিক বিবর্তনের অমোঘ বিধানে যদি আজ সাম্যবাদী-সমাজ প্রতিষ্ঠা অবধারিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা হইলে আবার মার্কসবাদী কর্মোন্মাদনার প্রয়োজন কোথায়? যাঁহারা এই প্রশ্ন তোলেন তাঁহারা ইহাতে সমাধানহীন নৈয়ায়িক কূট প্রশ্নের সন্ধান পান। আসলে এই প্রশ্নটির বাস্তব ভিত্তি নাই, নিখাদ কল্পনা-বিলাস। একটা উদাহরণ লইয়া দেখা যাক। রোগী দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন—তোমার আরোগ্য অবধারিত, কিন্তু তোমাকে এই বিধিগুলি পালন করিতে হইবে। রোগী যদি তখন বলে—আমি তো সারিবই, তবে আর নিয়ম পালনের প্রয়োজন কি? তাহা হইলে ডাক্তার বলিবেন—তোমার সারিয়া ওঠা সুনিশ্চিত অন্যান্য কারণের মধ্যে আমার ঔষধ সেবনের ফলে। আমি জানি অসংখ্য লোকে রোগে পড়িয়া ঔষধ খাইয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। যাহারা বাঁচিতে চায় তাহারা ঔষধ খায়। ঠিক এমনি ভাবে শ্রেণী-দ্বন্দ্বে প্রপীড়িত জনসাধারণকে মার্কসবাদীরা বলে, যদি তোমরা শ্রেণী-শোষণের অবসান ঘটাইয়া শ্রেণীহীন সমাজ গড়িয়া তুলিতে চাও তাহা হইলে তোমাদিগকে আমাদের কর্মপন্থা অনুযায়ী চলিতে হইবে। তাহারা বিশ্বাস করে শোষিত জনসাধারণ তাহাদের কথা শুনিবে ও পরিণামে বিজয়ী হইবে। এ বিশ্বাস ত্যাগ করার সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে যদি কোনো বিকৃতমস্তিষ্ক

রোগীর মতো জনসাধারণ সামূহিক আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হয় তাহা হইলে অবশ্য ভিন্ন কথা।

শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা—বাচনিক প্রলাপ নয়। শাসক শ্রেণী তাহাদের হস্তগত প্রভূত শোষণশক্তি বিনাসংগ্রামে হস্তান্তর করে না। এই সংগ্রামের জন্য অপরিহার্য সংঘবদ্ধ কৃতসংকল্প কর্মীর দল। কমিউনিস্ট পার্টি এই আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাহারা বিপ্লবী চেতনার অগ্রদূত ও বিপ্লবী সাফল্যের পথকারক। বিপ্লব যখন আসে তখন আর নিরপেক্ষ বন্ধন-হীনতার অবকাশ থাকে না। শত্রু বা মিত্রপক্ষ বাছিয়া লইতেই হয়। সাহিত্যিক বা শিল্পী বলিয়া রেহাই কোথায়? এ বিপ্লব যে প্রত্যেক সামাজিক ব্যক্তির জীবন-মরণ সমস্যা। তাই বিপ্লবী পর্বে লেনিনের মতো মার্কসবাদী নেতা সাহিত্যিককে ডাকিয়া বলিতে একটুও কুণ্ঠিত নন যে তোময়া যদি জনগণের পক্ষ ও তাহার অগ্রগামী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন না করো তাহা হইলে অকাট্যভাবে প্রমাণ হইবে তোমরা শোষক শ্রেণীর স্বার্থবহ। বিপ্লবের গতি অসমান; সকল দেশে একই কালে বিপ্লব মাথা চাড়া দিয়া ওঠে না। কিন্তু যখনই যে দেশে শ্রেণীবিপ্লব দেখা দিবে, তখনই সে দেশের মার্কসবাদী বিপ্লবী নেতা লেনিনের অনুশাসনকে কর্মপন্থার সঠিক নির্ধারক বলিয়া মানিয়া লইতে দ্বিধা করিবে না। সাহিত্যিকের প্রতি মার্কসবাদীর এ অনুশাসন উদ্ভট কিছু নয়। সাহিত্য-সৃষ্টির সামাজিক প্রভাব চিরদিনই স্বীকৃত। তাই পরম সাহিত্যরসিক হইয়াও প্লেটো তাঁহার আদর্শসমাজ হইতে কবিকে সাগ্রহে বিতাড়িত করিয়াছেন। নহিলে যে তাহারা তাঁহার শাশ্বত সমাজে চাঞ্চল্যের কারণ হইতে পারে। তাঁহার শিষ্য তীক্ষ্ণতরদৃষ্টি আরিস্টোটল তাই ট্রাজেডিকে ব্যবহার করিতে চাহেন সমাজ-মানসের পরিশোধক রূপে, কবির আত্মতৃপ্তির জন্য নয়। গজদন্তমিনারে বাস করিয়া শ্রেষ্ঠ কবির পর্যায়ে উন্নীত হওয়া যায় না—সাহিত্যের ইতিহাসই তাহার লক্ষ্য। মেঘদূতের কবিও রাজসভার নিত্য-সহচর ছিলেন, আর বিরহী যক্ষের বিরহও স্বেচ্ছাবৃত নিঃসঙ্গতা নহে। আমরা বড় সহজে ভুলিয়া যাই যে তাহার সুদীর্ঘ বিলাপ প্রিয়াবিচ্ছেদের প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ততটা নয় যতটা স্বাধিকার-প্রমত্ত সামান্য অনবধানের ত্রুটিতে সুখের স্বর্গ অলকা হইতে নির্বাসনের জন্য প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে করুণ অভিযোগ। প্রভুশক্তিকে উচ্ছেদ করার সম্ভাবনা তখন দেখা দেয় নাই, প্রতিবাদ করার সামর্থ্যও তখন জাগে নাই, তাই পরোক্ষ অভিযোগ করিয়াই যক্ষকে ক্ষান্ত থাকিতে হয়। তবুও যে মেঘদূত আজও

আমাদের মনকে নাড়া দেয় তাহার কারণ রামগিরি প্রবাসী যক্ষের মতো আমরাও আমাদের কামনার স্বর্গ হইতে বঞ্চিত নিজেদের ব্যক্তিগত ত্রুটিবিচ্যুতিতে ততটা নয় যতটা বর্তমান নৈর্ব্যক্তিক প্রভুশক্তির প্রবল প্রতাপে। অতীতের ব্যর্থতার সুর বর্তমানের ব্যর্থতার তন্ত্রীতে অনুরণন জাগাইয়া তোলে। রাজসভার আড়ম্বরের মধ্যে থাকিয়াও জনগণের ব্যর্থতাকে বিস্মৃত হন নাই বলিয়াই কালিদাস মহাকবি।

সাহিত্যিকের নিকট মার্কসবাদীর দাবি তাই কমিউনিস্ট পার্টির কর্মপন্থার প্রচার নয়, তাঁহার বিশিষ্ট উৎকর্ষ সম্বন্ধে অবহিত থাকা। তাহার মতে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য চিরদিন জনবিপ্লবের সমর্থক। জনগণের জীবনকে, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার হর্ষশোক, তাহার সাফল্য-ব্যর্থতা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। লেনিনের মতে, আর্ট হইতেছে আত্মেতর বাস্তবের প্রতিফলন। সাহিত্যিকের মানস, মুকুরের মতো, সামাজিক বাস্তবকে প্রতিফলিত করে। নাটকের বৃত্তি সম্বন্ধে হ্যামলেট-এর উক্তির সহিত এ মতের আশ্চর্যরকম মিল আছে। এই প্রতিফলনে, এই অনুচিত্রণে যে সাহিত্যিকের মন যে পরিমাণে প্রকাশধর্মী, তিনি সেই পরিমাণে বড় সাহিত্যিক। কোন্ শ্রেণীতে তাঁহার জন্ম ইহাই বড় কথা নয়। আসল কথা, সামাজিক বাস্তবকে তিনি কি পরিমাণে যথাযথ রূপ দিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থ দিয়া তাহাকে বিকৃত করেন যাই। এই মাপকাঠির ব্যবহারে সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার অনেকখানি আত্ম-নিরপেক্ষ হইয়া পড়ে—আপরুচিত্বের পরিধি সংকুচিত হইয়া আসে। মনে রাখিতে হইবে, যে প্রতিফলনের কথা এখানে বলা হইতেছে তাহা একান্ত নিষ্ক্রিয় নয়, ফটোগ্রাফির ক্যামেরার মতো। তাহাতে সামাজিক শক্তিগুলি সম্বন্ধে সামাজিক ন্যায়-অন্যায়, ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্বন্ধে উপযুক্ত আবেগ থাকা চাই। নহিলে সাহিত্য পাঠককে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না, সামাজিক ফলপ্রসূ হয় না। হ্যামলেটও যে নাটকের পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহার উদ্দেশ্য ছিল কর্মপ্রেরণা। এই প্রতিফলনে বিম্বিত হয় সামাজিক সংস্থানের বিচার। ম্যাথু আর্নল্ড-এর সূত্রানুযায়ী ইহাকে বলা চলে জীবনের সমালোচনা, তাঁহার মতে যাহা কবিতার শ্রেষ্ঠ উপাদান। এই প্রতিফলন কথাসাহিত্যে যত স্পষ্ট, কাব্যে অবশ্য ততটা নয়। তাই বলিয়া কাব্যসাহিত্য এই মানদণ্ডের এলাকার বাইরে নয়। কবিতায় প্রথমত থাকে প্রকাশ্য আধেয়, তাহার বিজ্ঞাপিত বিষয়বস্তু। কিন্তু বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন, তাহাকে

অবলম্বন করিয়া কবি জীবনের সমালোচনা করেন, ইহাই তাহার নিহিত আধেয়। যে কবিতার বিষয়বস্তু দেখিতে বিরাট কিন্তু তাহাতে নিহিত আধেয় অতি সাধারণ, তাহা উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য হইতে পারে না। অথচ সামান্য বিষয়বস্তু অবলম্বন করিয়া ব্যঞ্জনায় গভীর নিহিত আধেয় প্রকাশ করিয়া ছোট একটি গীতি কবিতাও মহৎ সাহিত্যের আসন পাইতে পারে। কবিতাকে, বিশেষ করিয়া গীতি কবিতাকে, এই দিক দিয়া স্বপ্নের সহিত তুলিত করা যায়। স্বপ্নের বাহ্য বিষয়বস্তুর সহিত তাহার নিহিত অর্থের প্রচুর ব্যবধান। তা সত্ত্বেও স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ নিষ্কাশন করা সম্ভব, ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির ইহাই বিরাট কৃতিত্ব। আত্মেতর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন—এই সূত্রানুযায়ী মার্কসীয় পদ্ধতিতে বিচার করিলে সাহিত্যের, অর্থাৎ কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতির মূল্যবিচার অনেকখানি নির্ভরযোগ্য হইয়া ওঠে। যে কোনো ঐতিহাসিক কালে সামাজিক বাস্তবতার স্বরূপ কি, শ্রেণীদ্বন্দ্বের ভিত্তিতে তাহা নির্ধারণ করা আজ আর কোন্ বিশেষ কাব্যে তাহা কি ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহার বিচারেও একান্ত আত্মমুখীন হইবার প্রয়োজন নাই। এই পদ্ধতিতে যে সমস্ত মতভেদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে তাহা দাবি করা হইতেছে না। বলা হইতেছে এই পথে সাহিত্য-আলোচনা সমালোচকের আপ্তবাক্য না হইয়া বিজ্ঞানপন্থী হইয়া উঠিবে। বিজ্ঞানেও মতভেদ হয়। পরবর্তী সিদ্ধান্ত আসিয়া পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তকে সংশোধন করে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রণালীর পরিবর্তন হয় না। বৈজ্ঞানিক যে আত্মেতর পরিবর্তনশীল সত্য বিশ্বাস করেন, বৈজ্ঞানিক প্রণালী তাহার সমস্ত ভ্রম ও সংশোধনের ভিতর দিয়া তাহারই নিকটবর্তী করিয়া তুলিতেছে মানুষের জ্ঞানকে। তাই বিজ্ঞানের নিকট অজ্ঞাত অনেক কিছুই আছে, কিন্তু অজ্ঞেয় কিছুই নাই। আত্মেতর অথচ পরিবর্তনশীল সত্যের অস্তিত্বে বিশ্বাস ও তাহার ক্রমিক নিকটগম্যতা—ইহাই হইল বিজ্ঞানের বাস্তবতা।

কিন্তু বিজ্ঞান ও কাব্য এক নয়। বিজ্ঞান চায় সত্যের অনুধাবন কিন্তু কাব্যের কাম্য সুন্দরের প্রকাশ। ইহা সত্য কথা। কিন্তু মার্কসবাদ মানে না যে সুন্দর বলিতে বুঝায় কাণ্ট-উদ্ভাবিত একটি আত্মিক প্রত্যয়, আত্মেতর বাস্তবতায় যাহার মূল প্রোথিত নাই। মার্কসবাদ ইহাও মানে না যে সুন্দরের সহিত মননের কোনো সম্বন্ধ নাই, সুন্দর কেবলই বস্তুনিষ্ঠ, মানবের কর্মকুশলতার কোনো ঐতিহাসিক প্রভাব যাহার উপর পড়ে নাই, এবং যাহা মানুষের

সংবেদনের ও অনুভূতির অতীত। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সুন্দর হইতে পারে, নাও হইতে পারে। মানুষের মনে সৌন্দর্য অনুভূতির বিকাশ হয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রভাবে, উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আমরা যে পরিমাণে প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছি সেই অনুসারে আমাদের সৌন্দর্যবোধও বিবর্তিত হইয়াছে। পর্বতমালাকে মানুষ যখন অধিকার করিতে পারে নাই তখন পর্বতের দৃশ্য ছিল মানুষের নিকট ভয়ের ও ঘৃণার কারণ। সাহিত্যের ও দৃশ্যচিত্রের ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ, ও সেই সঙ্গে সামাজিক জীবনের বিকাশ—ইহারই ফলে মানুষ পৃথক করিতে শিখিল কোন্‌টি সুগঠিত কোন্‌টি কদাকার ; তাহা হইতে আসিল সৌন্দর্য, সুষমা ও সমন্বয়ের বোধ। এক্ষেত্রেও মার্কসের প্রতিজ্ঞা প্রযোজ্য যে মানুষ বাহ্য প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিতে গিয়া নিজের প্রকৃতিকেও বদলাইতেছে। দেখা যাইতেছে যে সুন্দর ও কুৎসিত এই বোধ শুধু চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখ বা বস্তুজগতের স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া হইতে জন্মায় নাই। তাহার জন্য প্রয়োজন হইয়াছে যুগযুগান্তের কর্মশীলতা ও শিক্ষাদীক্ষা। এই সৌন্দর্যবোধের বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইতেছে শিল্পের বিকাশ, ফলিত ও লোকশিল্প হইতে যাহাকে বলা হয় 'বিশুদ্ধ' শিল্প তাহা পর্যন্ত। কারণ সমস্ত শিল্পের মূলে আছে জনসাধারণের উৎপাদনী শ্রমশীলতা।

মার্কসবাদ তাই ফলিত ও স্থায়ী সাহিত্য, বা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও গণ-সাহিত্যের আত্যন্তিক বিভেদ স্বীকার করে না। ফলিত সাহিত্য তাহাই যাহা সমাজ-বাস্তবের উপরের স্তরের সত্যকে প্রতিফলিত করে বলিয়া মাত্র সাময়িক আনন্দ দিতে পারে, গভীর ভাবে নাড়া দিতে পারে না। সাহিত্যের প্রধান বৃত্তি—শিক্ষা দেওয়া, আনন্দ দেওয়া। নাড়া দিতে পারা, বিচলিত করিতে পারা, ইহাই মহৎ সাহিত্যের লক্ষণ। সমাজ-মানবের অন্তরে আছে যে গভীর দ্বন্দ্ব, যাহা বাস্তবজগতের শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফল, তাহাকে যিনি রূপায়িত করিতে পারেন তিনিই পারেন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, মহৎ সাহিত্য, স্থায়ী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে। সে রূপায়ণ অবশ্য কাব্যরীতিসম্মত হইতে হইবে। আঙ্গিকের কোন্‌ পদ্ধতি অবলম্বন করিলে কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি সামাজিক জ্ঞাপন-শীলতা অর্জন করে, যাহা ছিল একের তাহা হইয়া উঠে সাধারণের, তাহার নির্বাচনে অথবা উদ্ভাবনে কবির ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিচয়। সাহিত্যের

ইতিহাসে যে কোনো যুগে শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব হয় না। তাঁহারা আসেন সেই সব যুগে যখন সমাজ-বিন্যাসে এক স্তর ভাঙিয়া গিয়া অন্য স্তর উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। তখনকার শ্রেণীদ্বন্দ্বের ফলে সমাজজীবনের গূঢ় অন্তস্তলে যে সকল সমস্যা দেখা দেয় শ্রেষ্ঠ কবির অন্তরে সেগুলি মুকুরিত হয় ব্যারোমিটারের মতো। তাহাকে যখন তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে কাব্যে রূপায়িত করেন তখন তাহা সমদরদী পাঠকের নিকট পথপ্রদর্শক হইয়া ওঠে সামাজিক সত্যের উপলব্ধির পথে। তাহার প্রভাব যত বাড়িতে থাকে, সমাজ-বিবর্তনে সচেতন কর্মোদ্যম তত দ্রুত হইতে থাকে। শ্রেষ্ঠ কাব্য তাই সমাজবিপ্লবের শক্তিমান সহায়ক, ও শ্রেষ্ঠ কবি বিপ্লবী চেতনার জনক বলিয়া জনসাধারণের পূজার্হ। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মর্যাদা এই নয় যে তাহা মুষ্টিমেয় জনকয়েকের মাত্র বোধগম্য হইবে। বর্তমান সমাজে তাহাই সাধারণত ঘটিয়া থাকে। তাহার কারণ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের স্বাভাবিক দুর্বোধ্যতা নয়, জনসাধারণের শিক্ষার অভাব। জনশিক্ষার মান যতই উন্নত হইবে, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আদর ততই বাড়িবে, সে সাহিত্য সমকালের হোক বা অতীত কালেরই হোক। সমাজবাদী রাষ্ট্রে ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এখন স্পষ্ট করিয়া জানা দরকার সমাজবাদী সংস্কৃতি বলিতে কি বোঝায়। ইহা শূন্য হইতে উদ্ভূত উদ্ভট কিছু নয়, যাঁহারা নিজেকে সমাজবাদী সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ বলিয়া ভাবেন এইরূপ জনকয়েকের মস্তিষ্কপ্রসূতও নয়। মানবসমাজ ধনবাদী, সামন্তবাদী প্রভৃতি অতীত সমাজের শাসনের ভিতর দিয়াই যে জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়াছে সমাজবাদী সংস্কৃতি তাহারই ঐতিহাসিক পরিণতি। অতীতের ও বর্তমানের সমস্ত পথ এই লক্ষ্যেই চলিয়াছে ও চলিতেছে এবং চলিতে থাকিবে। অবশ্য তাহাদিগকে যাচাই করিতে হইবে সমাজবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী হইতে।

এই যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অন্যান্য শিক্ষিত সমালোচক ও মার্কসবাদীর মধ্যে ঘটিয়া যায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। ধনবাদের গতিবিধির বিশ্লেষণ করিয়া মার্কস দেখাইয়াছিলেন কি ভাবে অতীতের সমাজব্যবস্থা অনিবার্য গতিতে ধনবাদ প্রতিষ্ঠার অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। আর ধনবাদের প্রগতির যুগে বাস করিয়াও তাঁহার জ্ঞাননেত্রে উদ্ভাসিত হইয়াছিল সেই বিরামহীন বিবর্তন-ধারা যাহা ধনবাদেরও অবসান ঘটাইয়া সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা করিবে। শুধু শ্রেণীদ্বন্দ্ব মানিলেই মার্কসবাদী হওয়া যায় না, কারণ শ্রেণীদ্বন্দ্বের স্বীকৃতি

মার্কসের পূর্বেই হইয়াছিল। মার্কসবাদের বিশিষ্ট লক্ষণ শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্যের স্বীকৃতি যাহাই কেবল শ্রেণীদ্বন্দ্বের উচ্ছেদ করিয়া সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। এই সূত্রের উপর নির্ভর করিয়াই লেনিন রুশবিপ্লবকে সমাজবাদী সাফল্য দিতে পারিয়াছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বগ্রাসী ফাশিস্টবাদের পরাজয়ের ফলে এই একাধিপত্যের রূপান্তর ঘটিয়াছে। এখানকার একাধিপত্য শ্রমিক কৃষক ও বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের সম্মিলিত একাধিপত্য ; প্রত্যেক ধনবাদী দেশে ইহারাই হইতেছে সবচেয়ে বিপ্লবী সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী। সকল রকম সামাজিক অসাম্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে ইহারাই আজ অগ্রণী। ইহারাই আজ সমাজবিপ্লবের পতাকা-বাহক। এই পরিস্থিতি সম্ভব হইয়াছে অতীতের খ্যাত অখ্যাত লক্ষ লক্ষ বিপ্লবীর প্রচেষ্টায় ও আত্মত্যাগে। যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো যুগে সামাজিক অন্যায় ও অত্যাচারের সকল রকম প্রকাশকে ঘৃণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি তখন তাঁহার বিশেষ সামাজিক ব্যবস্থায় বিপ্লবী শ্রেণীর প্রতিনিধি, শ্রেণীদ্বন্দ্বের পরিচালক। সাহিত্যের মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া তাই মার্কসবাদী সমালোচক খুঁজিয়া বাহির করেন জনসাধারণের সেই সব প্রবৃত্তিগুলিকে যাহার সাহিত্যিক প্রকাশ হইয়াছে প্রভুশক্তি ও দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীভাবে ; ধর্মের বন্ধ্যাত্ব, নৃশংস অত্যাচার অথবা সুমার্জিত অপমানের প্রতিভাষণে। এই শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিশ্বসাহিত্যের বিচার করার অর্থ তাহাকে খণ্ডিত করা নয় বরং এই পন্থাতেই আমরা পাইতে পারি আমাদের ঐতিহ্য-লব্ধ বিপুল উত্তরাধিকারের অন্তর্নিহিত মর্ম ও নির্ণয় করিতে পারি কোথায় তাহার মহত্ব। সেই সঙ্গে বর্তমানের স্পষ্টতর শ্রেণীদ্বন্দ্বের আলোকে আমরা দেখিতে পাইব তাহাতে কোথায় আছে বিচ্যুতি, অবসাদ বা অনিশ্চয়তার দোলানি। ইতিহাসের যে কোনো যুগের সাহিত্যের বিচারে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রভাব স্বীকার না করায় অন্যান্য শিক্ষিত সমালোচকের সহিত মার্কসবাদী সমালোচকের মতভেদ অনিবার্য।

এই বিভেদ প্রখরতর হইয়া ওঠে আধুনিক সাহিত্যের পর্যালোচনায়। ক্ষয়িষ্ণু ধনবাদের সহিত আজ চলিয়াছে বর্ধিষ্ণু সমাজবাদের দুনিয়াজোড়া লড়াই। দেশে দেশে আজ এই প্রশ্ন সকল কর্মপ্রচেষ্টার মূলে, কোন্ শ্রেণীর হাতে থাকিবে রাষ্ট্রশক্তির ব্যবহার, চিরশোষিত নির্বিত্তের না চিরাতৃপ্তলোভ মহাবিত্তের। এই সংগ্রামে কাহার জয় হইবে তাহাতে মার্কসবাদীর মনে

বিন্দুমাত্র সংশয় নাই এবং তাহার বিশ্বাস এ বিজয় সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার নহে। এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশে দেশে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে একই সংগ্রাম চালাইতেছে। তাহাদের সকল চিন্তা, সকল কর্ম একই লক্ষ্যে কেন্দ্রিত। তাই তাহারা পাইতেছে বিশ্বব্যাপী শোষিত জনসাধারণের উত্তরোত্তর বিবর্ধমান সমর্থন। তাহাদের শক্তির তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন দেশে সংস্কৃতিরও রূপান্তর ঘটিতেছে। তাহারাই সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধতর করিতেছে জাতীয় আধারে সমাজবাদী আধেয়ের প্রবর্তনে। যে দেশে সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা প্রাণবান—যেমন পরাজিত ও পুনর্মুক্ত ফ্রান্সে—সেখানে সংস্কৃতিজীবীর পক্ষে তিনটি মাত্র পথ খোলা থাকে—কমিউনিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হওয়া, তাহার সহিত মৈত্রীভাবে চলা, ও তাহার প্রবল বিরোধিতা করা। বিখ্যাত লেখক ফ্রাঁসোয়া মরিয়াক্-এর কমিউনিস্ট বিদ্বেষ বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু হিটলারী শাসনের যুগে তিনিও স্বীকার করিয়াছিলেন—লাঞ্ছিত পদদলিত ফ্রান্সের প্রতি আনুগত্য কেবল তাহার শ্রমিক শ্রেণীই দেখাইতে পারিয়াছে। শিল্পের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার দাবি পিকাসো-র চেয়ে উচ্চকণ্ঠে আর কেহ করিয়াছেন কি? সেই পিকাসো ফরাসী কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য ও তাঁহার মতে—চিত্রকলা হইতেছে শত্রুর সহিত আক্রমণ ও আত্মরক্ষণ যুদ্ধের হাতিয়ার। লুই আরাগঁ বিপ্লবের পূর্বযুগে ছিলেন আত্মকেন্দ্রিক সুর-রিয়ালিস্ট্ কবি। পরে তিনি সমাজবাদে আকৃষ্ট হন ও মৈত্রীভাবে চলেন। হিটলারী লাঞ্ছনার ফলে তিনি হন কমিউনিস্ট পার্টির গুপ্তনেতাদের অন্যতম। কবিতার ক্ষেত্রে আজ তিনি ফরাসী দেশে সবচেয়ে আঙ্গিক-কুশলী ও সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি, ইহা আপতিক ব্যাপার নহে। ফরাসী সংস্কৃতির ঐশ্বর্যবান ঐতিহ্যকে আয়ত্ত করিয়া তাহার রূপান্তর সাধনের উজ্জ্বল উদাহরণ লুই আরাগঁ।

ইংলণ্ডে শ্রেণীসংগ্রাম এখনও তেমন প্রবল হয় নাই; তাহার সাহিত্যের স্রোতেও তাই আর তেমন জোয়ার নাই। অথচ এই ইংলণ্ডেই ফিউডাল সমাজ-বিন্যাস ধ্বংস করার প্রথম সফল প্রচেষ্টা রূপায়িত হয় বিশ্বের বিস্ময় এলিজাবেথিয় সাহিত্যে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী যুগের ইংরাজ কবিরা ক্ষীণকণ্ঠ, কায়াহীন, হতাশা ও বিভ্রান্তির মোহগ্রস্ত। যে সামাজিক পরিবেশে তাঁহারা স্থাপিত তাঁহাকে সানন্দে গ্রহণ করিতে তাঁহাদের ন্যায়বোধ ও সৌন্দর্য-বোধ হয় পীড়িত, অথচ যে পথে তাহার প্রতিকার তাহা গ্রহণ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত। তাই তাঁহাদের কাব্যে না পাওয়া যায় দীপ্ত বুদ্ধির প্রখর প্রকাশ,

না পাওয়া যায় দৃপ্ত মনুষ্যত্বের অপরাজেয় বাণী। ইহার ব্যতিক্রম পাওয়া যায় অন্ততঃ একটি কবির কাব্যে—জন কর্নফোর্ড, যে একুশ বছরেরতরুণ কমিউনিস্ট প্রাণ দিল স্পেনের গৃহযুদ্ধে।

কর্নফোর্ড-এর উল্লেখ স্বভাবতই মনে পড়ে আমাদের দেশের সুকান্ত-র কথা, যে কুড়ি বছরের তরুণ কমিউনিস্ট দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রাণ দিল যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতালে। যে কবির লাগি বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ কান পাতিয়া ছিলেন, সুকান্তকে বলা যাইতে পারে তাহার প্রতিভূকল্প। অস্ফুট যৌবন হইতে শুরু করিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনে বাংলা দেশের সমাজ-মানসের চেতনা বিবর্তনের ইতিহাস পুঞ্জীভূত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, বাণীমূর্তি দিয়াছেন অতুল কাব্য-সম্পদে। কিন্তু ১৯১৯-এর পর হইতে যে সমাজবাদী চেতনা বাংলা দেশে বীজরূপে উপ্ত হইয়া ক্রমশ প্রসারলাভ করিল রবীন্দ্রনাথ তাহাকে স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। বোধ হয় সে বয়সে তাহা কাহারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবুও একটা মৌলিক পরিবর্তন যে আসিতেছে তাহার অনুভূতি তাঁহার কবি-চিত্তকে আলোড়িত করিতে ছাড়িত না। তাই তাঁহার শেষ বয়সের কাব্যে পাওয়া যায় এক নূতন আকুতির সুর যাহা তাঁহার পূর্বজীবনের জীবনদেবতার লীলা সম্বন্ধে আকুতি হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। বাংলাদেশের সমাজবিপ্লবীরা বৃদ্ধ কবির এই সংবেদনশীলতাকে শ্রদ্ধা করে, যেমন তাহারা পূজা করে তাঁহার কাব্যসাধনার পূর্বতন অক্ষয় অবদানকে। কিন্তু যে সমাজ-চেতনা বৃদ্ধ কবির পক্ষে ছিল আয়াস-লভ্য রবীন্দ্রনাথেরই উত্তরাধিকারী হিসাবে সুকান্ত-র ছিল তাহা জন্মগত প্রাপ্তি। ইহাতে বলা হয় না সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের সমতুল্য কবি। বলা হয় রবীন্দ্রযুগের পর বাংলা কাব্য যখন মোড় ঘুরিতেছিল তখন সুকান্ত-র কবিতা তাহার দিক্-নির্ণায়ক। ভবিষ্যতের বাংলা কবিতার ধারা কোন্ খাতে বহিবে সুকান্তের কবিতা তাহারই পূর্বাভাস, যেমন বলা যাইতে পারে বিহারীলালের কবিতা ছিল রবীন্দ্রনাথের। হয়ত এ প্রাক্-উক্তি হঠকারিতা নয় যে ভবিষ্যতের যুগ-ভাস্কর ইংরাজ কবি কর্নফোর্ডকে ও বাংলার কবি সুকান্তকে, আপন আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় সশ্রদ্ধে স্মরণ করিবে কাব্যগগনে পুরশ্চাররূপে। তাহাদের অকাল মৃত্যুতে কাব্যজগৎ ক্ষতিগ্রস্ত। ইহা শোকের কথা সন্দেহ নাই। তবুও কেমন করিয়া ভুলিতে পারা যায় ইহাই চিরকাল বিপ্লবের মূল্য। যে বিপ্লবের ফলাফলের উপর সারা

পৃথিবীর পূর্ণ মুক্তি নির্ভর করিতেছে, তাহার সাফল্যের তুলনায় কি এই মূল্য খুবই বেশি ? "এই সংগ্রামের উপর সমগ্র পৃথিবীর মুক্তি নির্ভর করিতেছে। এবং এতটুকু নিরপরাধ রক্তক্ষয় না করিয়া কি এতবড় পুরস্কার লাভ করা যায় ?" —ফরাসী বিপ্লবের নিহত নিরপরাধ গুণীজনের সম্বন্ধে মহামতি জেফারসনের এই অভিমত কি বর্তমান বিপ্লবে মার্কসবাদীকে সমর্থন করে না ?

২৭. ৫. ৪৮

বাংলা প্রগতি সাহিত্যের পটভূমিকা

মার্কসবাদী সাহিত্যিকগণের চেতনা হইতে সংস্কারবাদের মোহ উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে 'পরিচয়'-কে উপলক্ষ্য করিয়া রবীন্দ্র গুপ্ত যে গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন,* তাহাতে প্রগতিশীল সংস্কৃতিবিদ মাত্রেই কৃতজ্ঞতা বোধ করিবেন। সাহিত্যের ও বিশেষ করিয়া বাংলা সাহিত্যের বিচারে কি ভাবে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করিয়া সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইবে—এই প্রশ্ন কিছুকাল ধরিয়া মার্কসবাদী সাহিত্যিকগণকে চিন্তান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধকে কেন্দ্র করিয়া আলোচনা করিলে ইহার মীমাংসা অনেকখানি সহজ হইয়া আসিবে। কিন্তু অসুবিধা হইতেছে এই যে, রবীন্দ্র গুপ্ত এই একটি প্রবন্ধে সাহিত্য, ইতিহাস ও সমাজ-বিপ্লব সম্বন্ধে এতগুলি আলোচনা-সাপেক্ষ উক্তি ও সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়াছেন যে, একটি প্রবন্ধে তাহাদের প্রত্যেকের উল্লেখ ও বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। তাই আমি বাছিয়া লইব মাত্র কয়েকটি উক্তি

* অধুনালুপ্ত 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় ১৯৪৯ সালে বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা করিয়া রবীন্দ্র গুপ্ত ও প্রকাশ রায়ের লেখা দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই দুইটি প্রবন্ধকে ভিত্তি করিয়া সে-সময়ে সাহিত্যিক মহলে বিস্তৃত আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছিল। বর্তমান প্রবন্ধটি রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধের জবাবে লেখা।

যেখানে আমি বিশেষ বাধা পাইয়াছি। আমার বিশ্বাস, সেইগুলি গ্রহণে আমার বাধা দূর হইলে অন্যগুলিতে অসুবিধা হইবে না।

(ক) ভারতে ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে মার্কস-এর অভিমত

রবীন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন:

"ভারতের ইতিহাসে রামমোহন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ যে ধারাকে পরিপুষ্ট করেছেন তা প্রগতিশীল ধারা নয়, বরং তার উল্টো ধারা। ভারতের ইতিহাসে ইংরেজ-শাসন প্রগতির সূত্রপাত করেছিল—একথা যদি সত্য হয়, তবেই এদের ধারাকে প্রগতিশীল বলা যায়।...কিন্তু মার্কস কখনও একথা বলেন নি যে ভারতে ইংরেজ-শাসন একটি প্রগতিশীল শক্তি।"

এই উক্তি গ্রহণে আমার বাধা আছে। আমার ধারণা, এ উক্তিতে ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রকৃত ভূমিকা সম্বন্ধে মার্কসের সিদ্ধান্তকে আংশিকভাবে প্রতিফলিত করা হইয়াছে, সম্পূর্ণভাবে নয়। সেইজন্য মার্কস ১৮৫৩ সালে এই বিষয়ে যে দুটি বিখ্যাত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—যাহা এখনও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত—তাহাদের পুনরায় সম্পূর্ণভাবে স্মরণ করা আবশ্যক।

ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব কেমন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইল, এই প্রশ্নের উত্তরে মার্কস বলিতেছেন যে, মোগল সম্রাট, মোগল সুবেদার, মারাঠা ও আফগান-শক্তির পরস্পর-বিরোধিতার ফলে, শুধু হিন্দু-মুসলমান নয়, জন্মগত-জাতিগুলিরও (Castes) পরস্পর-বিরোধিতার ফলে, তখনকার ভারতীয় সমাজ এমনই শতধা-বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে তাহার পক্ষে বিজিত না হইয়া অন্যরূপ ভাগ্য সম্ভব ছিল না। ["Such a country and such a society, were they not the predestined prey of conquest?... India then could not escape the fate of being conquered.] তাই মার্কস-এর মতে, প্রশ্ন এই নয় যে, ভারতকে জয় করার ন্যায্য অধিকার ইংরেজের ছিল কি না। প্রশ্ন এই যে, ইংরেজের বদলে যদি অন্য কোনো জাতি—যথা, তুরস্ক, পারস্য অথবা রুশিয়া—ভারতজয় করিত, তাহা আমরা পছন্দ করিতাম কি না। মার্কস বলেন, না—তাহা আমরা করিতাম না। মোগল প্রভৃতি অন্য জাতিরা পূর্বে ভারত জয় করিলেও তাহারা বিজিত ভারতীয়দের উন্নততর সভ্যতার দ্বারা নিজেরাই বিজিত হয়, কিন্তু ইংরেজ শাসকেরাই প্রথম

ভারতে আনিল উন্নততর সভ্যতা, যা ভারতীয় সভ্যতার নাগালের বাহিরে ছিল। ইংরেজ আসিয়া ভারতে বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রতিষ্ঠিত অর্ধ-অসভ্য অর্ধ-সভ্য গ্রাম্য গোষ্ঠীজীবনকে শিথিল ও তাহার আর্থিক ভিত্তিকে চূর্ণ করিয়া দিল। ইহার ফলে যাহা ঘটিল তাহাকে মার্কস বলিতেছেন, "এশিয়ার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, এমন কি সত্য কথা বলিতে গেলে, **একমাত্র সামাজিক** বিপ্লব।" (বড় হরফ মার্কস-এর)। ["...dissolved these small semi-barbarian semi-civilised communities by blowing up their economical basis and thus produced the greatest, and to speak the truth, the *only social* revolution ever heard of in Asia,"]

ইহা হইতে কি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে না যে মার্কসের মতে ইংরেজের ভারত-বিজয় কেবল একদেশ কর্তৃক অন্য দেশ বিজিত হওয়ার মতো নিছক রাজনৈতিক ঘটনা নয়, ইহার তাৎপর্য ব্যাপকতর ও গভীরতর? তাই তিনি ইহাকে **এশিয়ার একমাত্র সামাজিক বিপ্লব** আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই অভূতপূর্ব বিপ্লব সাধনে ইংরেজ শাসকবর্গের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য কত নীচ ছিল ও তাহারা কি ভীষণ পাশবিক প্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিল, তাহা মার্কস্-এর দৃষ্টি এড়ায় নাই। কিন্তু তবুও তিনি বলিতেছেন, ইহাই আসল প্রশ্ন নয়। তাঁহার মতে আসল প্রশ্ন এই যে, এশিয়ার সামাজিক জীবনে আমূল বিপ্লব না ঘটিলে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ত সফল হওয়া সম্ভব কি-না। তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে ইংলণ্ড যত পাপই করুক না কেন, সে এই বিপ্লব ঘটাইয়া নিজের অজ্ঞাতসারে ইতিহাসের কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। ["England, it is true, in causing a social revolution in Hindustan was actuated only by the vilest interests, and was stupid in her manner of enforcing them. But that is not the question. The question is, can mankind fulfil its destiny without a fundamental revolution in the social state of Asia? If not, whatever may have been the crime of England, she was the unconscious tool of history in bringing about that revolution."] ইহার পরে কি করিয়া বলা চলে যে, মার্কস কখনও বলেন নাই যে ভারতে ইংরেজ-শাসন একটি প্রগতিশীল শক্তি।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখিতে হইবে মার্কসবাদের শিক্ষা যে, ইতিহাসে

প্রগতির ধারা কখনও একটি রেখা বাহিয়া অগ্রসর হয় না, তাহার গতি দ্বান্দ্বিক, পুরাতন ও নূতনের অন্তর্বিরোধের ভিতর দিয়াই তাহার আত্মপ্রকাশ। ভারতে ইংরেজ-শাসনের প্রকৃতি সম্বন্ধে মার্কস তাই স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিয়াছেন—ভারতে ইংলণ্ডের করণীয় কাজ দ্বিবিধ। একটি ধ্বংসাত্মক, অন্যটি নবসৃজনশীল ; একটি প্রাচীন এশিয়াব্যাপী সমাজ-ব্যবস্থার একান্ত উচ্ছেদ ; অন্যটি এশিয়াতে পাশ্চাত্য সমাজ প্রতিষ্ঠার বাস্তব ভিত্তি স্থাপন। ["England has to fulfil a double mission in India : one destructive and the other regenerating : the annihilation of old Asiatic society and the laying of the material foundation of western society in Asia."]

ইংরেজ-শাসনের ধ্বংসশীলতা সত্ত্বেও কোনগুলিকে মার্কস ভারতে নব-জীবনের লক্ষণ মনে করিতেন তাহাও তিনি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ঃ

(১) ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য—বিখ্যাত মোগলদের আমলে যে ঐক্য হইয়াছিল তাহার চেয়েও বিস্তৃতর ও দৃঢ়তর—ইহা হইতেছে ভারতের নবজীবনের প্রথম শর্ত। এই ঐক্য ইংরাজের তরবারি ভারতের উপর চাপাইয়া দিয়াছে কিন্তু এখন ইহাকে শক্ত ও স্থায়ী করিবে ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ। (২) ভারতীয় সেনাবাহিনী—ইংরেজ ড্রিল-সার্জেণ্টের অধীনে শিক্ষিত ও সংগঠিত হইয়া ভারতীয় আত্মমুক্তির অপরিহার্য অঙ্গ হইবে। (৩) স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র—ভারতীয় ও ইংরেজের যৌথ-পরিচালনায় এশিয়ার সমাজে প্রথম প্রবর্তিত হইয়া ভারতের পুনর্গঠনে হইবে নূতন ও শক্তিশালী হাতিয়ার। (৪) ভারতের অধিবাসীগণের ভিতর হইতে কলিকাতায় ইংরেজের তত্ত্বাবধানে, অনিচ্ছায় ও কৃপণভাবে শিক্ষিত হইয়া উদ্ভূত হইতেছে **একটি নূতন শ্রেণী** যাহারা ইওরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশশাসনের উপযুক্ত শক্তি অর্জন করিতেছে। ["From the Indian natives, reluctantly and sparingly educated at Calcutta under English superintendence, *a fresh Class* is springing, endowed with the requirements of Government and imbued with European science."] (বড় হরফ আমার)

বলা বাহুল্য, এই শেষ লক্ষণটি একান্ত প্রযোজ্য কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্যতম রামমোহন ও হিন্দুকলেজের বিস্ময়কর প্রতিভাশালী তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিওর অনুবর্তীগণের পক্ষে। ভারতের নবজীবন সৃজনে

রামমোহন ও ডিরোজিওর প্রভাব প্রগতিশীল নয়, প্রতিক্রিয়াশীল—এই মন্তব্য মার্কসবাদ-সম্মত বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা পাইতে হয়।

ইংরেজ-শাসনের এই নবসৃজনশীল সুফল সত্ত্বেও ইহাতে যে ভারতীয়গণের দুঃখদুর্দশার অবসান হইবে না, যতদিন না ভারত ইংরেজের অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হয়—ইহাও মার্কসের অজানা ছিল না। তিনি জানিতেন, ব্রিটিশ ধনতন্ত্র ভারতের উৎপাদন-শক্তি বাড়াইয়া দিলেও তাহার ফলোপভোগে ভারতবাসীকে বঞ্চিত রাখিবে। ইহাই ধনবাদের ধর্ম। তবুও ব্রিটিশ বুর্জোয়া ভারতের ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার পথ সুগম না করিয়া পারিবে না। ধনবাদের নিকট ইহার চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা করিলেই ভুল হইবে।

ভারতে বুর্জোয়া আদর্শে অনুপ্রাণিত রামমোহনপ্রমুখ চিন্তানায়কগণের বিরুদ্ধে আজ যে অভিযোগ উঠিয়াছে তাহার আসল উৎস এইখানে। ইহা নিশ্চিত, ভারতে ব্রিটিশ-শাসনকে মার্কস যে দ্বান্দ্বিকভাবে দেখিয়াছিলেন, রামমোহন তাহা পারেন নাই। মার্কস-এর প্রতিভা রামমোহনের ছিল না এবং রামমোহনের মৃত্যু হয় ১৮৩৩ সালে—মার্কসবাদের প্রথম প্রামাণিক গ্রন্থ "কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো" প্রকাশের বছর পনের পূর্বে। একথা ঠিক যে, রামমোহন ভারতে ইংরেজ শাসনের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু একথা ঠিক নয় যে, তাঁহার মনে বা তাঁহার পরিচালিত আন্দোলনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বা পরাধীনতার গ্লানি ছিল না। তাঁহার অক্ষমতা এই যে, বুর্জোয়া সভ্যতার প্রাচুর্যে ও ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাহার অসম্পূর্ণতা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন নাই—যেমন পারিয়াছিলেন বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রতিষ্ঠাতারা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই, স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি মার্কস এংগেলস্-এর পূর্বে অন্য কাহারও নিকট আশা করা অযৌক্তিক। তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষমতা এই যে ইংরেজের দু'টি রূপ—নিজের দেশে প্রগতিশীল ইংরেজ ও পরাধীন দেশে শাসকরূপে ইংরেজ—ইহাদের পার্থক্য তিনি ধরিতে পারেন নাই। তাঁহার দুরাশা ছিল এই যে, ইংরেজ যেমন তাহার নিজের দেশে ক্রমশ বিস্তৃততর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছে, ভারতেও তাহারা অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করিয়া ভারতকে উন্নত করিয়া তুলিবে, ইংরেজের শিক্ষায় ভারত স্বাধীন হইবে। ভারতের স্বাধীনতার জন্যই ইংরেজীর মারফত গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ভারতবাসীর বহুদিন ধরিয়া পাওয়া দরকার। আজ এ দৃষ্টিভংগীকে সহজেই প্রতিক্রিয়াশীল বলিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু ভুলিলে চলিবে না—১৮৫৩ সালে মার্কস-এরও এই ধারণা

ছিল যে, ভারতে ইংরেজ-শাসন স্বল্পকালস্থায়ী ব্যাপার নয়, তাহার উচ্ছেদের জন্য দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন হইবে। কি ভাবে ভারত স্বাধীন হইতে পারে—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া মার্কস লিখিতেছেন যে, ব্রিটিশ বুর্জোয়া ভারতীয় সমাজের নানা অংশে যে-নূতন উপকরণ আনিয়া দিল, তাহার সুফল ভারতীয়েরা ততদিন উপভোগ করিতে পাইবে না যতদিন না ইংলণ্ডের তখনকার বুর্জোয়া শাসকেরা শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা উৎপাটিত হইবে; কিংবা যতদিন না ভারতীয়েরা এত শক্তিশালী হইয়া উঠিবে যে তাহারা নিজের শক্তিতে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ করিতে পারিবে। তিনি বলিতেছেন—ভারতের নব-জাগরণ ঘটিবেই, যদিও তাহার জন্য **কমবেশী দীর্ঘ সময়** লাগিবে। ["The Indians will not reap the fruits of the new elements of society scattered among them by the British bourgeoisie, till in Great Britain itself the now ruling classes shall have been supplanted by the industrial proletariat, or till the Hindus themselves shall have grown strong enough to throw off the English yoke altogether. At all events we may safely expect to see *at a more or less remote period* the regeneration of that great and intersting country."]। (বড় হরফ আমার)

দেখা যাইতেছে যে, মার্কস-এর অলৌকিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এখানেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। ইংলণ্ডে লেবর পার্টি শাসক-শ্রেণীত্বে উন্নীত হইলেও যে সামাজিক বিপ্লব মার্কস-এর ধ্যান-দৃষ্টির গোচর ছিল, তাহা সাধিত হয় নাই। ভারতের সমাজ-বিপ্লবও এখনও স্থগিত হইয়া আছে। মার্কসবাদের সূত্রানুসারে যে-শক্তি ভারতে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটাইতে পারিবে, তাহা হইতেছে ভারতের নবজাগ্রত শ্রমিক-শ্রেণী, অবশ্য কৃষক ও মধ্যবিত্তের সহযোগিতায়। সেই শ্রমিক-শ্রেণী এখনও ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে শ্রেণী-সচেতন ও সংঘবদ্ধ হইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই যে "স্বাধীনতা" ভারতে চালু করা হইয়াছে, তাহা মার্কসবাদী স্বাধীনতা নহে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এখনও অসমাপ্ত।

কিন্তু ইংরেজ যখন ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া অবাধ বাণিজ্য ও অবারিত লুণ্ঠনের তাগিদে ভারতের ভূমিতে রেলগাড়ির লাইন পাতিতে বসিল তখনই, মার্কস বলিতেছেন, সে বাস্তব ব্যবস্থা করিয়া দিল ভারতে নূতন শক্তি উদ্ভবের।

ইংরেজ আমলে ভারতে যে নূতন শ্রমশিল্পের প্রবর্তন হইল—যাহার গর্ভে প্রসূত হইবে ভারতীয় বুর্জোয়া ও ভারতীয় প্রলেটারিয়েট—রেলগাড়ি হইতেছে তাহার অগ্রদূত। এই বিরাট দেশে নানাদিকে রেলগাড়ি চালাইতে গেলে শুধু রেল চালাইবার জন্য প্রয়োজন যে শ্রমশিল্প, কেবল তাহারই ব্যবস্থা করিলে চলে না, পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রমশিল্পেরও ব্যবস্থা করিতে হয়। অর্থাৎ ভারতের সনাতন সামন্তবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করিয়া ধনবাদী শিক্ষা-দীক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থার পত্তন করিতে হয়। হইলও তাহাই। ভারতের শ্রমশিল্পের সবটাই ইংরেজের করায়ত্ত রহিল না, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভারতীয় বুর্জোয়ারও সৃষ্টি হইল। ইহাদের নেতৃত্বে ১৯১৯-২২ সালে ভারতে যে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভ পরিচালিত হয়, ১৯২৮ সালে কমিণ্টার্নের ষষ্ঠ বিশ্ব-কংগ্রেসের রিপোর্টে তাহা "প্রথম বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন" ["This first great anti-imperialist movement in India (1919-1922)" বলিয়া অভিনন্দিত হইয়াছে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মানুসারে বুর্জোয়ার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক-শ্রেণীও জন্ম নিতে বাধ্য। বুর্জোয়া বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও বিকাশ হয়, যদিও উভয়ের গতিবেগ একই মাত্রা মানিয়া চলে না। প্রথমে বুর্জোয়ারা হয় শক্তিমান, শ্রমিকের শক্তি আসে পরে। ভারতীয় বুর্জোয়ার জন্মকাল মোটামুটি ধরা হইয়া থাকে ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে, যদিও তাহার প্রথম প্রকৃত উদয় ১৮৭৫ সালে। আর ভারতীয় শ্রমিকের শক্তির প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ বিশ শতকের প্রথম দশকে। যে সামাজিক শক্তিপুঞ্জ অবশেষে ইংরেজ শাসনের অভিশাপ হইতে ভারতবাসীকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করিতে সমর্থ, তাহার স্বরূপ বুঝিতে এই সুবিদিত সময় নির্ঘণ্ট মনে রাখা দরকার।

(খ) সিপাহী-বিদ্রোহের শ্রেণী-চরিত্র

এই মার্কসীয় নিরিখে ইংরেজ-শাসিত ভারতে সমাজ-বিপ্লব ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের শ্রেণী-বিশ্লেষণ ও তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার করা যায়। ইংরেজ ভারতে লইয়া আসিল সুধা ও বিষ, সামাজিক অগ্রগতি ও রাজনৈতিক দাসত্ব—এই তাহার দ্বৈতরূপ। পরাধীনতা বাদ দিয়া যদি ভারতের সামন্তবাদের অচলায়তন ধ্বংসের জন্য তাহারই ভিতর হইতে ইংলণ্ডের প্রভাবে বুর্জোয়া ধনবাদ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত, যেমন হইয়াছিল ইওরোপের নানা দেশে, তাহা হইলে ভারতে সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাসের ধারা হইতে অনুরূপ। ষোড়শ ও

সপ্তদশ শতকের ধর্মান্দোলন অনড় সামন্তবাদের অভ্যন্তরে যে গতিবেগের সঞ্চার করিতেছিল, তাহার স্পন্দন ছিল অতি মৃদু, কারণ উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের কোনো স্তরে তাহার ভিত্তি গাঁথা ছিল না। তাহা হইতে স্বতঃ-উৎসারিত ভাবে কোনো ভবিষ্যৎ যুগে ধনবাদের উদ্ভব হইতে পারিত কি-না, ইহা এখন পুঁথিগত গবেষণার বিষয় ব্যতীত অন্য কিছু হইতে পারে না। কারণ ইতিহাস এই শম্বুকগতি বিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে নাই। পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া ইংরেজ ভারতে তথা এশিয়ায় ধনবাদের বুনিয়াদ রচনার প্রথম প্রস্তর স্থাপিত করিল, ভারতে ইংরেজ-শাসনের সূত্রপাত হইল, যাহাতে ভারত তাহার পূর্বতন অতীত ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ["......separates Hindusthan, ruled by Britain from all its ancient traditions and from the whole of her past history."]

কিন্তু পরাধীন দেশে সমাজ-বিপ্লব অব্যাহত ভাবে প্রবাহিত হইতে পারে না —পরাধীনতার শৃংখলই তাহার মস্ত বাধা। ধনবাদের প্রকৃত ধর্ম সামন্তবাদের উচ্ছেদ। কিন্তু এমন কি স্বাধীন দেশেও ধনবাদী শাসকেরা এ ধর্ম পূর্ণ পালন করে না। অর্ধেক পথ অগ্রসর হইয়াই সামন্তবাদের সহিত আপস করে নির্বিত্ত-শ্রেণীর অগ্রগমনে ভীত হইয়া। এই প্রবৃত্তি ঔপনিবেশিক দেশে আরও প্রবল হইবার কথা। ভারতের ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। ধনবাদী ইংরেজ পরাধীন ভারতে সামন্তবাদকে পরাভূত করিয়াও উচ্ছেদ করিল না, পদানত করিয়া রাখিল। এবং তাহার প্রভাবে শ্রমশিল্পের উদ্ভব বিলম্বিত ও প্রসার স্থগিত করিয়া রাখিল আপন স্বার্থের সংরক্ষণে। যে-নির্জীব সামন্তবাদকে, দেশীয় নবাব-রাজা-মহারাজাগণকে জীয়াইয়া রাখা হইল, তাহারাই হইল—মার্কসের মতে—ভারতে ইংরেজ-শাসনের প্রধান স্তম্ভ, যদিও ইহাদের হতমান করিয়াই ইংরেজ ভারতে রাজ্যাধিকার পাইয়াছিল। এই স্তম্ভগুলিকে উৎপাটিত করিতে না পারিলে ভারতে ইংরেজ-রাজত্বের অবসান ঘটানো অসম্ভব।

তাই ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামেরও দুইটি রূপ, দুইটি ধারা এবং দুইটি ধারাই বিপ্লবী। একটি ধারা—প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিঘাত, সিরাজের চেষ্টা সফল হইলে এই ধারার প্রয়োজন থাকিত না। তাই ইংরেজের বিরুদ্ধে সিরাজের সাময়িক সাফল্য মার্কস-এর চোখে মহীয়ান। এই ধারার শেষ অধ্যায় সিপাহী-বিদ্রোহ। নীল, সন্ন্যাসী, সাঁওতাল, ওয়াহাবি প্রভৃতি

আন্দোলনের কোনটিই বিক্ষোভের অতিরিক্ত বিদ্রোহের পর্যায়ে উঠিতে পারে নাই, সিপাহী-বিদ্রোহের সহিত তুলিত হইতে পারে না। সিপাহী-বিদ্রোহ ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে শেষ সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান। ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ইহার গৌরবময় ভূমিকা কোনো মার্কসবাদী সাহিত্যিক কোনদিন অস্বীকার করা দূরে থাকুক, কখনও অশ্রদ্ধা করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। তাঁহারা জানেন—মার্কসের মতে—এখানেও আসল প্রশ্ন এই নয় যে বিদ্রোহের নেতৃত্ব কাহার হাতে ছিল। মূল কথা এই যে, ভারতীয় জনগণের একাংশ হিন্দু-মুসলমান সৈনিক ও কৃষক, বিদেশীর শোষণে ক্ষিপ্ত হইয়া তাহাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া লড়িয়াছিল বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য। তাহাদের বীরত্বের কাহিনী ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। এই জন্যই মার্কস ইহাকে "বিরাট জাতীয় বিদ্রোহ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে 'জাতীয়' কথাটি স্টালিন-নির্দিষ্ট অর্থে প্রযোজ্য নহে, কারণ, স্টালিন দেখাইয়াছেন, আধুনিক ধনতন্ত্রের উদ্ভবের পূর্বে কোনো দেশে আধুনিক 'জাতি' গড়িয়া উঠিতে পারে না। বৃহৎ জনগোষ্ঠীগুলি—'পিপল্‌স্‌'—জাতি অথবা 'নেশন'-এ পরিণত হয় ধনতন্ত্রের বিকাশের তাড়নায়। তবুও মার্কস ইহাকে 'জাতীয়' বলিয়াছেন এই জন্য নয় যে, ইহাতে ভারতের সমগ্র জনসাধারণ—এমন কি তাহার বহুলাংশও যোগ দিয়াছিল। 'জাতীয়' এই জন্য যে, ইহাতে ভারতীয় সমাজের দুইটি বিরোধী অঙ্গ—হিন্দু ও মুসলমান ও তখনকার সমাজের সবচেয়ে শোষিত অংশ—কৃষক ও সৈনিক—মিলিত হইয়া রাজ্যলোলুপ বিদেশী শোষণের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছিল।

কিন্তু 'সোভিয়েট ল্যান্ড'-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যে, মার্কস ইহাকে "কৃষক-বুর্জোয়া" বিপ্লব, বা "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক" বিপ্লবের প্রথম ধাপ বলিয়াছেন। বস্তুত "কৃষক-বুর্জোয়া"—এই কথাটি, আমার বিশ্বাস, বিশেষ সুপ্রচলিত নহে। সুতরাং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইহাকে অকস্মাৎ প্রয়োগের পূর্বে ইহার সংজ্ঞা নির্ধারণ করার প্রয়োজন ছিল। আর পূর্বে উল্লিখিত সময় নির্ঘণ্ট মনে রাখিলে কি করিয়া সিপাহী-বিদ্রোহকে "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক" বিপ্লব বলা যায়? "বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক" শব্দটি মার্কসীয় সাহিত্যে সুপরিচিত, তাহার অর্থ নেহাৎ অস্পষ্ট নয়। যে বিদ্রোহে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের কোনো নিদর্শনই পাওয়া যায় না, তাহাকে বুর্জোয়া-বিপ্লবের অন্তর্গত ভাবিতে পারা খুবই কঠিন। ১৮৫৭ সালে ভারতে বুর্জোয়া

তথা প্রলেটারিয়েটের জন্ম হইয়াছিল, এ কথা ইতিহাস লেখে না। স্বাধিকারচ্যুত ফিউডাল সামন্তগণের একাংশ ও দিল্লী-মীরাট-কানপুর-লক্ষ্নৌ অঞ্চলের কৃষক-সৈনিক, ইহাদের সম্মেলনে এই বিদ্রোহ। বাংলা দেশে এই বিদ্রোহের সূচনা হইলেও বাংলার কৃষক ইহার সমর্থনে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্ষুব্ধ হয় নাই। মার্কস বিদ্রোহ পরায়ণ কৃষক-সৈনিকশ্রেণীর বীরত্বের গুণগান করিয়া তাঁহার লেখনীর সমস্ত বিষ ঢালিয়া দিয়াছেন ফিউডাল সামন্তবর্গের বিরুদ্ধে, যাহারা জনসাধারণের বিক্ষোভের বিরোধিতা করিয়া বিদেশী শাসক ইংরেজের সহায়তা করিয়াছিল।

কিন্তু ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের অপর বিপ্লবী শক্তি—যে শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ ফিউডালবাদের উচ্ছেদে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, যে শক্তি ছিল বিপ্লবী বুর্জোয়া ভাবধারার বাহক—তাহাকে বিচার করিয়া মার্কস "প্রতিক্রিয়াশীল" আখ্যা দিয়াছিলেন, এমন কথা 'সোভিয়েট ল্যাণ্ডের' উক্ত প্রবন্ধে দেখা যায় না। বুর্জোয়া শ্রেণী পরিণামে যতই প্রতিক্রিয়াশীল হউক না কেন, প্রথম যুগে তাহাদের ভূমিকা থাকে প্রগতিশীল—'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র প্রকাশের সময় হইতে এই তথ্য মার্কসবাদীদের সুপরিচিত। রামমোহন ও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা ছিলেন এই বিপ্লবী ধারার সঞ্চালক। তাঁহারাই সুগম করিতেছিলেন ভারতে স্বাধীন চিন্তার পথ, সূচনা করিতেছিলেন প্রাচীন ভূমি-ব্যবস্থার বিলোপে শ্রমশিল্পের প্রবর্তনের অনুকূল পরিবেশ। বুর্জোয়া ব্যবস্থা এদেশে স্বাধীনভাবে না আসায় এই বিপ্লবী ধারাও শীর্ণকায় ও অপরিস্ফুট হইতে বাধ্য—ইওরোপীয় বিপ্লবের তুলনায়। তবু তাহাদের একই গোত্র। তাই, বিশ্বপ্রসারী বুর্জোয়া সভ্যতার বিচিত্র প্রকাশে রামমোহনের এত খরদৃষ্টি। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের তুলনায় এই বিপ্লবী ধারায় হাতে হাতে ফল পাইবার আশা করা যায় না বটে, তবে এই খাতেই বহিয়া গিয়াছে ইতিহাসের মূল ধারা। সিপাহী বিদ্রোহের কৃষক-সৈনিকের বীরত্ব স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মানিতে হয় যে তাহার ব্যর্থ পরিণামও ছিল অবধারিত। বুর্জোয়া ও তৎপ্রসূত গণশক্তির আবির্ভাবের পূর্বে ইংরেজ অধিকারকে উৎপাটিত করার ক্ষমতা ভারতে ছিল না। সিপাহী-বিদ্রোহের সুযোগে ভারত আমেরিকা হইতে পারিল না। ইহাতে হুতোম বিক্ষুব্ধ হইয়া বাঙালী বাবুদের বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু মার্কস ঠিকই বলিয়াছিলেন, ভারত হইতেছে "এশিয়ার আয়র্লণ্ড", আমেরিকা নহে। আমেরিকা যখন ইংলণ্ডের করচ্যুত হয় (১৭৭৬ সাল) সে ইংলণ্ড ও

১৮৫৭ সালের অপ্রতিহত বলশালী ইংলণ্ড একই পদার্থ নহে। আর ভারতের মতো আয়র্লণ্ডেও বুর্জোয়া-শক্তির উদ্ভব না হওয়ায় ওদেশ আজিও রাজনৈতিক ভাবে বাহ্যত স্বাধীন হইলেও অর্থনৈতিক ভাবে কার্যতঃ বৃটিশ ধনবাদের তাঁবেদার।

সিপাহী বিদ্রোহ যখন সংঘটিত হয়, তখন মার্কস যেগুলিকে বলিয়াছেন ভারতের ইংরেজ শাসনের নবসৃজনশীল শক্তি, সেগুলি সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। ১৮৪৯ সালে জোর করিয়া পাঞ্জাব দখলের পর বলা যাইতে পারে—আসমুদ্র-হিমাচল সমুদয় ভারতবর্ষ ইংরেজের শাসনাধীনে ঐক্যবদ্ধ। রেল ও টেলিগ্রাফের জাল দ্রুত প্রসারিত হইতেছে। দেশীয় সৈন্যবাহিনী তাহাদের উপর হৃদয়হীন অত্যাচার সত্ত্বেও বৃটিশ শৃংখলে আবদ্ধ—যাহার ফলে সিপাহী-বিদ্রোহ সিপাহীদের মধ্যেও সীমাবদ্ধ রহিয়া গেল অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ গণ্ডীতে। ভারতে স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে, যাহার মহিমায় হুতোম-ও স্বীকার করেন যে তিনি মুখ খুলিয়া কথা কহিতে পারেন। আর প্রস্তুত হইয়াছে একটি নূতন শ্রেণী—ইওরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানে দীক্ষিত ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়। সিপাহী বিদ্রোহের সমসাময়িক কালেও ভারতীয় ইংরেজ শাসকের মধ্যে অনেকে এই শ্রেণীকে ইংরেজ শাসনের বৃহত্তর অন্তরায় মনে করিত, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এম্, আর, গাবিন্স্ (M. R. Gubbins) প্রণীত An Account of the Mutinies in Oudh নামক গ্রন্থে। বইটির তৃতীয় সংস্করণ লণ্ডনে প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। গাবিন্স্ বলেন—"আমার বিবেচনায় ভারতে আমাদের রাজত্ব করার পথে, অযথা পিছাইয়া যাওয়া অপেক্ষা অনেক বেশি ভয় করার আছে ভবিষ্যতের শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অত্যধিক অগ্রসর হওয়াতেই।" ["I think that our rule in India has more to fear from future excessive innovation in matters of education etc. than from any improper retrogation."] ইংরেজী শিক্ষাই তাহাদের চিত্তে জাগাইয়া দিতেছিল গভীর স্বদেশপ্রীতি ; প্রমাণ—ডিরোজিও'র বিখ্যাত ইংরেজী কবিতা "ভারতমাতার প্রতি। ইহারা ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রে অধিকার স্থাপনে অতিমাত্রায় ব্যগ্র কেবল কতকগুলি বড়ো চাকুরি পাইবার মোহে নহে ; ফরাসী বিপ্লবের মূল শিক্ষার অন্যতম—যাহার প্রতিভা আছে তাহার পথ খুলিয়া রাখিতে হইবে—তাহাদের জীবনমন্ত্র ! এই মানবিক অধিকারের দাবিতে তাহারা ভারতের শাসনযন্ত্রে ভারতবাসীর অনধিকারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালাইয়া-

ছিল। তাহারা ছিল তখনকার দিনের বস্তুবাদী—মিল, বেন্থ্যাম, কোঁৎমায় অ্যাডাম স্মিথ তাহাদের আচার্য স্থানীয়। তাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে এক ধর্ম হইতে অন্য ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া নয়, ভারতের পুঞ্জীভূত স্থিতি-শীলতাকে সবেগে আঘাত করার জন্য। হিন্দু মুসলমানের প্রশ্ন তখন তাহাদের মনে জাগে নাই, কারণ তখন সে প্রশ্নই ছিল নিরর্থক; তখন দুইটি মাত্র বিরোধী শক্তি—ভারতীয় ও ইংরেজ। দেশের দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাহারা খড়্গহস্ত, দেশের দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিতে বেদনার্ত, তাই তাহাদের সমর্থন ধর্মাধর্ম-নির্বিশেষে শোষিত কৃষকের পক্ষে, অশুচি চণ্ডালের পক্ষে। আচারে-বিচারে, কর্মে-বিশ্বাসে, পুরাতনকে পরিত্যাগ ও নূতনকে গ্রহণ মার্কসীয় বিজ্ঞানসম্মত প্রগতির এই চিরন্তন উৎস হইতে বাংলাদেশে তথা ভারতে বুর্জোয়া সাহিত্যের প্রথম উদ্ভব। ঔপনিবেশিক পরিবেশে এই উৎস স্বভাবতই স্বল্পপ্রাণ, তথাপি ইহার ছিল গুণগত উৎকর্ষ ভবিষ্যতে প্রসারিত হইবার অমোঘ নিয়তি। এবং ইহারই শিল্পগত প্রকাশ, বাংলাদেশের বুর্জোয়া সাহিত্য। তাই যতই তাহার অসম্পূর্ণতা থাকুক না কেন, তাহাকে প্রগতিশীল বলিয়া স্বীকার না করা, তাহাকে সমগ্রভাবে "প্রতিক্রিয়াশীল" বলিযা নিন্দা করা—মনে হয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মার্কসীয় বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ।

(গ) সাহিত্য বিচারে মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিজ্ঞানের মূল সূত্র

ইংরেজ শাসনের অব্যবহিত ফল হিসাবে বাংলাদেশে যে সাহিত্যের জন্ম, রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যাহার বিস্তার, তাহাকে বাংলা সাহিত্যের "স্বর্ণযুগ"* বলা যাক বা না যাক, মার্কসীয় পদ্ধতিতে তাহার বিচার করিতে গেলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সাহিত্য বিচারের মূলসূত্র: সাহিত্য হইতেছে সামাজিক বাস্তবের প্রতিফলন। সমাজের স্তরে স্তরে শ্রেণী সংঘর্ষের প্রভাবে নিত্য সে আলোড়ন চলিতেছে, বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিভিন্নভাবে তাহাতে সাড়া দেয়। এই শ্রেণীদ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া নির্ধারিত হয় সমাজের বিন্যাস কি ভাবে পরিবর্তিত হইবে ও সমাজের গতি হইবে কোন্ দিকে। সাহিত্য এই শ্রেণীচেতনা হইতে সৃষ্ট হইয়া সামাজিক

* 'মার্কসবাদী'-তে প্রকাশিত প্রবন্ধে শ্রীপ্রকাশ রায় এই শব্দটিতে প্রবল আপত্তি জানাইয়াছিলেন।

—প্রকাশক।

পরিবেশের উপর প্রতিঘাত করে। মার্কসীয় মতে ফিউডাল হইতে বুর্জোয়া ও তাহা হইতে সমাজবাদ এই অভিমুখে পরিবর্তন ঘটাই সামাজিক প্রগতির লক্ষণ। রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ পর্বের সাহিত্য বিচারে আমাদের সর্বদা এই কথা মনে রাখিতে হইবে যে তাহা এই অভিবর্তনে সহায়তা করিতেছিল কি না, এই সাহিত্যের প্রভাব ছিল শ্রেণী সংগ্রামের কোন্ পক্ষে। ইহা কি পুরাতন মনোভাব জীয়াইয়া রাখিতেছিল, না নূতনের জন্য পথ কাটিয়া দিতেছিল। এই ভাবেই সাহিত্যে বিচারকে ব্যবহার করা চলে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার রূপে।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের এই বিচারে রবীন্দ্র গুপ্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন নিরিখ স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এই সাহিত্যের শ্রেণী-বিচারের একমাত্র নিরিখ হইতেছে, তাহা **প্রত্যক্ষভাবে** ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আক্রমণ বা তাহার অত্যাচারকে উদ্ঘাটন করিয়াছিল কিনা (বড় হরফ আমার)। বলা বাহুল্য এ বিচার সাহিত্যিক নহে, রাজনৈতিক। সেই সঙ্গে ইহাও জোর করিয়া বলা দরকার, এই খণ্ডিত মাপকাঠি দিয়া সাহিত্যের গুণবিচার একদেশদর্শী না হইয়া পারে না। সাহিত্য যাহার প্রতিফলন সেই সমাজ-মানস রাজনৈতিক চেতনার চেয়ে গূঢ়তর এবং সমাজবিপ্লব রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা ব্যাপকতর। কোনো বিশেষ আন্দোলন, বিক্ষোভ বা সংগ্রাম, তাহার প্রতি কোন্ সাহিত্যিকের কি অভিমত, তাহা দিয়া সাহিত্য বিচার করিলে, বিশেষ করিয়া বিগত যুগের সাহিত্য সৃষ্টির বিচার করিলে—নিঃসন্দেহে বিড়ম্বিত হইতে হয়। সাহিত্য বিচারে লেনিনবাদের স্বরূপ বিবৃত করিতে গিয়া প্রখ্যাতনামা সোভিয়েট সমালোচক মিখাইল লিফ্‌শিৎস বলেন—"অতীত সংস্কৃতির মহৎ প্রতিনিধিগণের চেতনার বিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারা পরস্পরকে জড়াইয়া থাকে। ইহা একটি প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য। বিপ্লবী আদর্শ কদাচিৎ **প্রত্যক্ষ ও সরাসরিভাবে** সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।" ["The confusion of revolutionary and reactionary tendencies in the consciousness of the great representatives of the old culture is an established historical fact. Revolutionary ideals have seldom been reflected *directly and immediately* in literature."] (বড় হরফ আমার)।

অতীতের মহৎ লেখক, শিল্পী ও মানবিক চিন্তানায়কগণের রচনায় কেন এই দ্বৈতভাব থাকে, তাহার কারণ দেখাইয়া লিফ্‌শিৎস্ বলেন, তখনকার দিনের সমসাময়িক গণ-আন্দোলনের অপরিপক্কতা ও ইতিহাসের ধারায় তাহাদের

দ্বান্দ্বিক বিকাশ, ইহার মধ্যেই উক্ত দ্বৈতভাবের চমৎকার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ["The immaturity of mass movements and their contradictory growth in the course of history explain excellently the contradictions in the works of great writers, artists and humanists of the past."]

কি করিয়া এই সাহিত্যের বিচার করিতে হইবে, এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন: লেনিনবাদ শিক্ষা দেয় কেমন করিয়া কোনো শিল্পসৃষ্টিতে তাহার ঐতিহাসিক মর্ম খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়, কেমন করিয়া পৃথক করিতে হয় তাহার মধ্যে মৃত হইতে জীবন্তকে, কেমন করিয়া স্থির করিতে হয় কোন অংশ ভবিষ্যতের অভিমুখী ও কোন্ অংশ অতীতের দাসত্বে চিহ্নিত। এইরূপ বাস্তব বিচারেই আছে প্রকৃত শ্রেণীগত বিশ্লেষণ। ["Leninism teaches us how to discriminate the historical content of works of art, how to separate the living from the dead in them, how to determine what belongs to the future and what is the mark of a slavish past. In this concrete critique lies a real class—analysis."]

শ্রেণীসংঘর্ষ কি ভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তাহা বুঝাইতে গিয়া লিফ্‌শিৎস বলেন—সাহিত্যে শ্রেণী-সংগ্রাম হইতেছে জনগণের প্রবৃত্তির সংগ্রাম, প্রভুত্ব ও দাসত্বের ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে, ধর্মগত বন্ধ্যাত্বের বিরুদ্ধে, নির্মম নৃশংসতার বিরুদ্ধে, সভ্য অপমান ও মিষ্ট ভণ্ডামির বিরুদ্ধে। ["The class struggle in literature is the struggle of the people's tendencies against the ideology of domination and slavery, against religious sterility, against cruelty, against polite insolence and suavity."]

ব্যক্তির মনে শ্রেণী-চেতনা কি ভাবে উদ্ভূত ও সঞ্চারিত হয় এই প্রশ্নের আলোচনায় মেনশেভিকদের ধারণা ছিল যে তাহা নির্ভর করে জন্মের উপর। এই ধারণাকে খণ্ডন করিয়া লেনিন প্রমাণ করিয়াছিলেন: কোনো লোকই কোনো বিশেষ শ্রেণীর ভাবাদর্শ লইয়া জন্মায় না, তাহাকে গড়িয়া উঠিতে হয়। প্রলেটারিয়ান ভাবাদর্শ অর্থাৎ মার্কসবাদ শ্রমিকের চেতনার সহজ গাঢ়করণ মাত্র নয়, তাহার কারখানার স্বতোপ্রসূত ফলাফল নয়। প্রকৃত শ্রেণীচেতনা বিকশিত হয় কেবল মাত্র সমাজের **সকল শ্রেণীর জীবনের সকল রকম প্রকাশের—**

মানসিক, নৈতিক, রাজনৈনিক—প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ হইতে। ["Lenin proved that class consciousness does not originate automatically. No one is born an ideologist of a definite class; he becomes one. Proletarian ideology i. e. Marxism is not a simple deepening of the psychology of the workers, not a spontaneous consequence of factory conditions. Real class consciousness develops only from observation of the life of *all classes in all its manifestatians mental, moral and political.*"] (বড় হরফ আমার)।

রবীন্দ্র গুপ্তের প্রবন্ধ সম্পর্কে এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহাতে কি লেনিন-বাদী সাহিত্য বিচারের এই মূল সূত্রগুলি মানা হইয়াছে? ইংরেজ আগমনের পূর্বে বাংলাদেশের সাহিত্য, এমন কি ভারতচন্দ্র ও আলাওল পর্যন্ত, ও ইংরেজী আমলের সাহিত্য রামমোহনে যার শুরু, ইহাদের গুণগত পার্থক্য কি তাহাতে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে? বাংলা সাহিত্যের ছাত্রমাত্রেই জানেন যে সাহিত্য হিসাবে ইংরেজী আমলের সাহিত্যের তুলনায় তাহার পূর্বের যুগের সাহিত্যের উৎকর্ষ একান্ত নিষ্প্রভ। এই নূতন সাহিত্যের যেমন বৈচিত্র্য তেমনি বিস্তার। এবং এই উৎকর্ষের মূল উৎস নূতন ধনবাদী গণতান্ত্রিক সামাজিক চেতনা। দেশের অগণিত জনসাধারণ শিক্ষার সুযোগ না পাওয়ায় এই নূতন চেতনার অংশভাক্ হইতে পারে নাই, নূতন সাহিত্যের আস্বাদ পায় নাই, তবুও তাহাদের অন্তরের কথা অনেকাংশে এই সাহিত্যে রূপায়িত। বিশিষ্ট লেখক-গণের রচনায়, বিষয় নির্বাচনে ও লিখনভঙ্গিতে ব্যক্তিগত ঝোঁকের প্রকাশ থাকিলেও এই যুগের লেখকেরা একই 'স্কুল-এর' লেখক—যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বাইরন, শেলী, কীটস, কোলরীজ, স্কট—ইঁহাদের প্রত্যেকের রচনায় অবিসং-বাদিত পার্থক্য সত্ত্বেও ইঁহারা সকলেই উনিশ শতকের প্রথম পাদের রোমান্টিক কবি। তাই বুর্জোয়া বাংলা সাহিত্যের বিচারে দীনবন্ধু-কালীপ্রসন্ন একদিকে এবং বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে, এইরূপে মূলগত বিভেদের রেখা টানার চেষ্টা সাহিত্যক বিচারে ঘাতসহ নয়। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী পাঠক 'নীলদর্পণ' ও 'হুতোম'-এর সাংস্কৃতিক মূল্য কোনোদিন অস্বীকার করে নাই, যেমন অস্বীকার করে নাই 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরানী', 'মুচিরাম গুড়' ও 'কমলাকান্তের' সাংস্কৃতিক মূল্য। বাংলানাটকের ইতিহাসে, রচনার শৈথিল্য

সত্ত্বেও, 'নীলদর্পণের শীর্ষস্থান ও স্থানে স্থানে সুরুচির ব্যত্যয় সত্ত্বেও ব্যঙ্গ রচনায় 'হুতোমের' শীর্ষস্থান বাঙালী পাঠকের নিকট মোটেই নূতন আবিষ্কার নহে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, ইংরেজী আমলের বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু-কালীপ্রসন্নই কি বাঙালীর সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন? এই অসুবিধাজনক প্রশ্ন রবীন্দ্র গুপ্তের মনে জাগিয়াছিল। তাই প্রকাশ রায়ের প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা ঢাকিবার জন্য তিনি মধুসূদনকে এই দলে টানিয়াছেন তাঁহার "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" এই প্রহসনের জোরে, যাহাতে 'মেঘনাদবধ'কেও প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের তালিকাভুক্ত হইতে না হয়। কিন্তু এখানেও প্রশ্নের অবসান হয় না। প্রশ্ন এই—তাহা হইলে কি বাঙালী পাঠককে শিখিতে হইবে যে 'বুড়ো শালিক' 'মেঘনাদবধ' অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর সৃষ্টি, মাইকেলের অমরত্বের জন্য কেবল 'বুড়ো শালিক' লিখিলেই চলিত, "মেঘনাদবধ" লেখার প্রয়োজন ছিল না? এ প্রশ্নও রবীন্দ্র গুপ্তের সচেতন মন এড়াইতে পারে নাই। তাই 'মেঘনাদবধ'-এর সপক্ষে তিনি রায় দিতেছেন ইহা প্রগতিশীল বিপ্লবী সাহিত্য, কেন না মধুসূদনের "কাব্যগ্রন্থগুলি দুদিক থেকে প্রাচীন সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। প্রথমত পুরাণের দেবদেবীর চরিত্র নিয়ে মানুষের মত করে আধুনিক যুগের ভাবধারায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে; দ্বিতীয়ত কাব্য রচনার প্রাচীন বাঁধা ধরা অনুশাসন অগ্রাহ্য করে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেছেন।" এই মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ আমার ধারণায়, রবীন্দ্র গুপ্ত মধুসূদনের কাব্যাবলীর সম্বন্ধে সত্য বিচার করিতে গিয়া নিজের অজ্ঞাতসারে আত্মবিরোধিতা দোষে দুষ্ট হইয়াছেন।

রবীন্দ্র গুপ্তের মন্তব্য হইতে আমরা কি এই কথা বুঝিব যে, মাইকেলের কবি-কৃতিত্ব কেবল ছন্দ-শিল্পী হিসেবে নূতন ছন্দ প্রবর্তন করায়? এ বিচার আংশিক সত্য হইলেও অত্যন্ত ভাসাভাসা। কারণ সাহিত্যে প্রকাশের, আঙ্গিকের কোনো বৃহৎ পরিবর্তন ঘটে না বক্তব্যেরও বৃহৎ পরিবর্তন না ঘটিলে। নূতন 'কণ্টেণ্ট'ই কেবল পারে নূতন 'ফর্ম' উদ্ভাবন করিতে। আর পুরাণের দেব-দেবীতে মানুষীভাব আরোপ করা একান্তই মাইকেলের বিশেষত্ব নহে; মঙ্গলকাব্যে, চণ্ডীতে, বৈষ্ণব পদাবলীতে তাহার অসংখ্য উদাহরণ আছে। মাইকেলের যাহা প্রকৃত বিশেষত্ব, রবীন্দ্র গুপ্ত তাহা ঠিকই ধরিয়াছেন—তাহা হইতেছে, আধুনিক যুগের ভাবধারার উপযুক্ত প্রকাশ।

মূল প্রশ্নটি এইখানেই—আধুনিক যুগের ভাবধারা" বলিতে আমাদের কি

বুঝিতে হইবে। রবীন্দ্র গুপ্তের সমগ্র প্রবন্ধের লক্ষ্য প্রমাণ করা যে, ইংরেজী আমলের বাঙলাদেশে একটিমাত্র আধুনিক ধারা আছে যাহাকে প্রগতিশীল বলিয়া স্বীকার করা কর্তব্য ; তাহা হইতেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রত্যক্ষ সমর্থন। কিন্তু যে কাব্যাবলীর মহত্ত্বে মধুসূদন আধুনিক বাঙালী কবিদের আদিগুরু—'মেঘনাদবধ', 'তিলোত্তমা', 'বীরাঙ্গনা', 'ব্রজাঙ্গনা', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'—ইহাদের কোনোটিতে কি তাহার সন্ধান মেলে? না, মেলে না। তাই রবীন্দ্র গুপ্তের সূত্রানুযায়ী স্ব-বিরোধী না হইয়া মাইকেলকে বৃহৎ বিপ্লবী কবি বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য বিচারেও রবীন্দ্র গুপ্তকে অনুরূপ বিভ্রাটে পড়িতে হইয়াছে। তাঁহার মতে, রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে প্রগতিশীল সাহিত্যিক রচনা—"বৌঠাকুরাণীর হাট"—সাহিত্যের বিচারে হয়ত যাহার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু 'বলাকা'কেও তিনি প্রগতির শিবির হইতে ছাড়িতে রাজি নন। বাংলা কাব্য সাহিত্যে 'বলাকা'র শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীত। কিন্তু 'বলাকা'র কোন্ কবিতায় আছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সমর্থন? তখনকার সমসাময়িক জড়বিজ্ঞানে যে ব্রহ্মাণ্ড গতির, 'কস্‌মিক মোশন'-এর কথা প্রচারিত হইতেছিল, 'বলাকা' সেই আধুনিক ভাবধারার কাব্যময় প্রকাশ। এখানেও স্ববিরোধী না হইয়া 'বলাকা'-কে প্রগতিশীল বলা চলে না।

অথচ প্রকৃত লেনিনবাদী সাহিত্য-বিচারে এই দোটানায় পড়িতে হয় না, দোফাঁদে পা দিতে হয় না। লেনিনবাদী সাহিত্য বিচারে প্রথম বিচার্য, অতীতের যে সাহিত্যিকের রচনা বিচার হইতেছে তাঁহার সাহিত্যিক উৎকর্ষ, রাজনৈতিক মতামত নয়। লিফশিৎসের বিরুদ্ধে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সমালোচক নুসিনভ বলিয়াছিলেন : "লিফশিৎস-এর মতে মনে হয়—কাভেলিন, আকসাকভ ফেৎ প্রভৃতি লেখকেরা শোষিত শ্রেণীর ভাবাদর্শের প্রকাশক ছিলেন না।" উত্তরে লিফশিৎস বলেন : "মোটেই তা নয়। কাভেলিনেরা নিশ্চয়ই ছিলেন শোষিত শ্রেণীর সমর্থক লেখক। কিন্তু তোমরা যদি আমার পূর্বোক্ত মতকে খণ্ড করিতে চাও, তাহা হইলে তোমাদিগকে প্রথমে প্রমাণ করিতে হইবে যে কাভেলিনেরা ছিলেন অতীতের বৃহৎ লেখক-শিল্পী-মানবিকগণের অন্যতম। তোমরা যদি কাভেলিন প্রভৃতিকে পুশকিন, গোগোল ও টলস্টয়ের শ্রেণীতে বসাইতে চাও, তাহা হইলে কেহই তোমাদের কথা শুনিবে না। ইহার জন্য আমি দুঃখিত।' ["This is not so. Of course the Kavelins

were ideologists of class exploitation. But if you wish to refute my foregoing passage, demonstrate first the Kavelins were great writers, artists and humanists of the past. But when you lump together with the Kavelins such writers as Pushkin, Gogol and Tolstoy as ideologists of the exploited classes—I am sorry, but no one will listen to you."]

বাংলা সাহিত্যের বিচারে এই নীতি প্রয়োগ করিতে গেলে আমাদের প্রথম প্রশ্ন হওয়া উচিত এই যে, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ অতীতের মহৎ লেখক-শিল্পী-মানবতাবাদী ছিলেন কি-না। মনে হয় না, এ প্রশ্নের উত্তরে পাঠক মহলে দ্বিমত ঘটিতে পারে। এখন প্রশ্ন ওঠে যে, শিল্পী হইলেই কি তাঁহাকে প্রগতিশীল বিপ্লবী শক্তির আধার হইতে হইবে? এই প্রশ্নের শেষ উত্তর দিয়া গিয়াছেন স্বয়ং লেনিন। তিনি বলেন, **কোনো শিল্পী যদি প্রকৃতই মহৎ হন, তাহা হইলে তাঁহার রচনায় বিপ্লবের কোনো না কোনো মর্মগত অংশ প্রতিফলিত না হইয়া পারে না।** ["An artist truly great must have reflected in his work at least some essential aspects of the revolution."]

সুতরাং রামমোহন, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ যদি অতীতের মহৎ লেখক-শিল্পী-মানবিক হন, তাহা হইলে তাঁহাদের রচনায় ইংরেজী আমলের বাংলা দেশে যে বিরাট সমাজবিপ্লবের সূচনা হইয়াছে তাহার আংশিক প্রকাশ নিশ্চয়ই থাকিবে। তাঁহাদের রচনায় প্রতিক্রিয়াশীল অংশও নিশ্চয়ই থাকিবে এবং নিশ্চয়ই আছেও। কিন্তু রবীন্দ্র গুপ্ত কেবল এই দিকটিতে জোর দেওয়ায় তাঁহার সিদ্ধান্ত একপেশে হইয়া পড়িয়াছে। অতীতের আচার্যগণের বিচার সম্বন্ধে লেনিনবাদের মূল শিক্ষাই হল এই যে তাঁহাদের কৃতিত্বের অভ্যন্তরে যে স্বতোবিরোধিতা আছে, তাহা হইতে নিষ্কাশিত করিয়া টানিয়া বাহিরে আনিতে হইবে তাহার বিপ্লবী মর্ম ও তাহাকে ব্যবহার করিতে হইবে শ্রেণী সংগ্রামের উপাদান হিসাবে। বুর্জোয়া লেখকগণের দুর্বল দিককে বুর্জোয়া শাসকেরা নিশ্চয়ই তাহাদের কাজে লাগায়। কিন্তু তাহাদের বিপ্লবী প্রেরণা তাহাতে লুপ্ত হইয়া যায় না। বিসমার্ক হেগেলের দর্শনকে পররাষ্ট্র-গ্রাস জার্মান সাম্রাজ্যবাদের দর্শন হিসাবে ব্যবহার করিতেন। তাই বলিয়া কি হেগেলের বিপ্লবী প্রেরণা অস্বীকার করিতে হইবে? গ্যেটে ছিলেন ভাইমার

রাজের সভাকবি। তিনি এমন কি ফরাসি বিপ্লবেরও বিরোধিতা করিয়াছিলেন আর করিয়াছিলেন জার্মান-বিজয়ী ফরাসী বীর নেপোলিয়নকে সাদর অভিনন্দন। অথচ দেখিতেছি সোভিয়েট রাষ্ট্রে তাঁহার দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিশাল উৎসবের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আজিকার দিনের পৃথিবীতে যে আন্দোলন মার্কসবাদী মহলে সবচেয়ে বিপ্লবী বলিয়া গৃহীত, সেই বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের সমর্থনে গ্যেটের নাম সোভিয়েট দেশে সশ্রদ্ধায় স্মরণ করা হইতেছে। আমাদের দেশের নেহরু সরকার রবীন্দ্রনাথের রচনাকে, হিন্দু মহাসভাপন্থীরা বঙ্কিম বিবেকানন্দের রচনাকে ও দর্শনকে তাহাদের কাজে লাগাইলে তাই আমাদের বিচলিত হইবার কিছু থাকে না। যে সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ হিসাবে রবীন্দ্র গুপ্ত সমস্ত প্রগতিশীল সংস্কৃতির একমাত্র মাপকাঠি ধরিতে চাহেন, তাহার সম্বন্ধে হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা বিনায়ক সাভারবরেরএকটিবিখ্যাত পুস্তক আছে, যাহার নাম—১৮৫৭ সালে ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ ("The war of Indian Independence of 1857")। স্যার ভ্যালেণ্টাইন চিরোল তাঁহার 'ভারতীয় বিক্ষোভ' ("Indian Unrest") নামক গ্রন্থে সাভারকরের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিতেছেন, ইহা মিউটিনির ইতিহাস সম্বন্ধে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। ইহাতে ঘটনার বিকৃতি সত্ত্বেও প্রচুর গবেষণা আছে, আর আছে বর্বরতম ঘৃণার সহিত উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিক ক্ষমতার সংযোগ। ["B. Savarkar's 'The war of Indian Independence of 1857' is in its way a very remarkable history of the Mutiny, combining considerable research with the grossest perversion of facts and great literary power with the most savage hatred."] তাই বলিয়া কি সাভারকরকে আজ আমাদের "বীর" বলিয়া পূজা করিতে হইবে ?

আমাদের কাজ হওয়া উচিত বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথপ্রভৃতির অন্তরস্থ মূল বিপ্লবী প্রেরণা উদ্ঘাটিত করিয়া প্রতিক্রিয়ার শিবিরকে দুর্বল করা, তাঁহাদিগকে "মূলতঃ প্রতিক্রিয়াশীল" ঘোষণা করিয়া প্রতিক্রিয়ার শিবিরকেই সবল করা নয়। আমাদের ভুলিলে চলিবে কেন, বুর্জোয়া সভ্যতার শেষ প্রগতিশীল পর্যায়, উদ্ধত জাতীয়তার বিরুদ্ধে উদার মানবিকতার আহ্বান টমাস মান ও রোমাঁ রোঁলার মতো রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছে। আমাদের ভুলিলে চলিবে কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের মানসসৃষ্টি ভ্রমর, শৈবলিনী, আয়েষা, শান্তি, প্রফুল্ল

—এখনকার স্বাধীনতাকামী বাঙালী রমণীর মানস-জননী। আমাদের ভুলিলে চলিবে কেন, দেশের জনসাধারণের ক্লৈব্যে ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতিকারার্থে বিবেকানন্দ যখন দেশের যুবক সমাজকে শোনান—"তোমার জন্মভূমি বীর সন্তান চাহিতেছেন, তুমি বীর হও"—তখন তিনি নিজের অজ্ঞাতসারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামশীল অগ্নিযুগের যোদ্ধাদের গুরুর পর্যায়ে উপনীত হন। ইহাও আমরা ভুলিব না যে রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের বেদান্তভাষ্য, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের গীতাভাষ্য—ইহাদের গভীর উদ্দেশ্য হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ততটা নয় যতটা অন্ধ বিশ্বাস ও অলৌকিকতার ক্ষেত্রে আধুনিক যুক্তিবাদ ও আদর্শ মানবিকতাবাদের প্রতিষ্ঠা। আর হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যই যদি প্রগতিশীলতার চরম পরীক্ষা হয়, তাহা হইলে রামমোহনের চেয়ে প্রগতিশীল কাহাকে আধুনিক ভারতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়?

(ঘ) সাহিত্যের ক্ষেত্রে ডিমোক্রাটিক ফ্রণ্ট সংগঠন

ইহার পরেও প্রশ্ন উঠিতে পারে, অতীতে যাহাই হউক বর্তমানে মার্কসবাদীরা শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিনিধি; তাহাদের বর্তমান কর্তব্য শ্রমিক শ্রেণীর সাহিত্য, শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতি গড়িয়া তোলা। বুর্জোয়ারা শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান শত্রু সুতরাং এই শ্রেণী-শত্রুর রচনা সম্বন্ধে, তাহাদের স্বতোবিরোধী ঐতিহ্য সম্বন্ধে এত মাথা ঘামাইবার কি প্রয়োজন? আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া বর্তমান অভিজ্ঞতা হইতে নূতন করিয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিব।

এ প্রশ্ন এদেশে নূতন হইলেও ইতিহাসে নূতন নহে। নবজাত সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাহিত্যিক-গোষ্ঠী "প্রলেটকাল্ট" (১৯১৭-১৯২২) ঠিক এই প্রশ্নই তুলিয়াছিল এবং তাহারও উত্তর দিতে হইয়াছিল স্বয়ং লেনিনকেই। তখন লেনিন একটি প্রবন্ধে লেখেন—"ধনবাদ আমাদিগকে যে সংস্কৃতি দিয়া গিয়াছে, তাহা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহার ভিতর হইতে গড়িয়া তুলিতে হইবে সমাজবাদ। সব রকমের বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, সব রকমের সাহিত্য ও শিল্প অবশ্যই লইব।" ["All the culture which capitalism has left us must be taken and socialism built out of it. All science, engineering, all knowledge and art must be taken."]

ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় কংগ্রেসের বিখ্যাত বক্তৃতায় (২রা অক্টোবর, ১৯২০) লেনিন বলেন—"সমগ্র মানবজাতির বিকাশের ধারা বাহিয়া যে সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, আমরা যদি তাহার সঠিক স্বরূপ স্পষ্ট বুঝিতে না পারি, এই সংস্কৃতিকে যদি আমরা পুনরায় প্রয়োগ করিতে না শিখি, তাহা হইলে আমাদের পক্ষে প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতি গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে না। ইহা না বুঝিলে আমরা আমাদের সমস্যার সমাধান করিতে পারিব না। প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতি একটা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যাপার নয়। প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতিতে বিশেষজ্ঞ বলিয়া দাবি করেন, এমন কয়েকজন ব্যক্তির মস্তিষ্ক-প্রসূত উদ্ভাবনাও তাহা নয়। এই ধারণাগুলি একদম বাজে। আমলাতন্ত্রী সমাজ, সমাজতন্ত্রী সমাজ, ধনতন্ত্রী সমাজ—ইহাদের শাসনের মধ্যেও মানবসমাজ যে জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়াছে প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতি হইবে তাহারই স্বাভাবিক বিকাশের পরিণতি। ["Unless we clearly understand that only by an exact knowledge of the culture created by the whole development of mankind, that only by re-working this culture, is it possible to build proletarian culture, unless this is understood, we shall not be able to solve this problem. Proletarian culture is not something that has sprung nobody knows whence; it is not an invention of those who call themselves experts in proletarian culture. This is all nonsense. Proletarian culture must be the result of a natural development of the stores of knowledge which mankind has accumulated under the yoke of capitalist society, landlord society and bureaucratic society."] সুতরাং দেখা যাইতেছে, সোভিয়েট দেশে শ্রমিক সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া লেনিন "রূপান্তরের দাবি" করিতেছেন, পূর্বতন সংস্কৃতিকে "ধ্বংস ক'রে ক'রে তার স্থানে" (রবীন্দ্র গুপ্তের ভাষায়) অন্য সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার দাবি করিতেছেন না।

লেনিনগ্রাদ লেখকদের সভায় কমরেড জ্দানভ্-এর ১৯৪৬ সালের বক্তৃতা হইতে প্রকাশ রায় যে অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার প্রবন্ধ শুরু করিয়াছেন, তাহার প্রকৃত লক্ষ্য তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। জ্দানভের সমগ্র প্রবন্ধটি

সতর্কভাবে পড়িলে স্পষ্টই বোঝা যায়, তিনি এখানে সকল দেশের সকল কালের বুর্জোয়া সাহিত্যের বিচার করিতেছিলেন না। সোভিয়েট দেশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসাদে সমাজবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও তাহার শক্তিবৃদ্ধি হইয়াছে ; সেখানে নূতন উন্নততর সংস্কৃতি সোভিয়েট লেখকেরা ও শিল্পীরা গড়িয়া তুলিতেছেন, সোভিয়েট জনসাধারণের অতুলনীয় শৌর্য ও আত্মত্যাগ যাহার বাস্তব ভিত্তি। ইওরোপের প্রাচীন দেশগুলিতে ধনবাদ ক্ষয়িষ্ণু, সেখানে এই যুগে সৃষ্টি হইতেছে এক মুমূর্ষু সংস্কৃতি। তা সত্ত্বেও সোভিয়েট দেশে এমন কয়েকজন লেখককে পাওয়া গেল যাঁহারা এখনও এই অস্তমিত পশ্চিমের দিকে আকুল নয়নে তাকাইয়া আছেন। ইহাদের সমালোচনা করিতে গিয়া জ্দানভ্ অংগুলি নির্দেশ করেন **বর্তমানে** ইওরোপের গলিতবিকৃত বুর্জোয়া সংস্কৃতির দিকে, যাহাকে অস্বীকার করা ও আক্রমণ করা সোভিয়েট লেখকদের কর্তব্য। এই মন্তব্যকে **সমগ্র** বুর্জোয়া সাহিত্য-বিচারের মূলসূত্র হিসাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ করিলে জ্দানভের বিচক্ষণতার প্রতি অবিচার করা হয়।

আমাদের দেশে বুর্জোয়া সংস্কৃতির আলোচনা করিতে গিয়া আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, রামমোহন-রবীন্দ্রনাথ যুগের যে মূল সামাজিক সমস্যা ছিল, আমরা তাহা হইতে কিছুটা দূরে সরিয়া আসিয়াছি। তাঁহাদের যুগে সামাজিক বিপ্লবের অগ্রগামী পদাতিক ছিল ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। আমাদের যুগে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগে সংগে সমাজবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাও দেখা দিয়াছে। এবং এই নূতন বিপ্লবী আন্দোলনের প্রধান নেতা শ্রমিক শ্রেণী। তাই শ্রমিক শ্রেণীকে বাদ দিয়া আজ আমাদের দেশে সংস্কৃতি-আন্দোলন অসার্থক। কিন্তু লেনিন শিখাইয়া গিয়াছেন, শ্রমিক শ্রেণী কেবল তাহার জন্মের মাহাত্ম্যেই নেতৃত্ব করিতে পারে না। তাহাকেও মার্কসবাদে সুশিক্ষিত হইতে হইবে। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত এই শিক্ষাদানের ভার ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের হাতে। তাহাতে শিক্ষা দিতে গিয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা। তাই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষকগণকে নিজেদের শ্রেণীচেতনার উপরে উঠিয়া শ্রমিক শ্রেণীর চেতনায় প্রবেশ করিতে হইবে। তাহার জন্য প্রয়োজন শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার সহিত, তাহাদের সুখ-দুঃখের সহিত, তাহাদের শক্তি ও দুর্বলতার সহিত, তাহাদের মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়। শ্রমিক শ্রেণী সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, শ্রমিকের সহযোদ্ধা কৃষকের বেলাতেও এই কথাগুলি খাটে। এই ঘনিষ্ঠ

পরিচয় বাদ দিয়া এখন কোনো সাহিত্যিক রচনাই সবল, সুন্দর ও সত্য হইয়া উঠিতে পারে না। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রমিক-কৃষকের চেতনায় প্রবেশ করিতে পারে একটি মাত্র উপায়ে—মার্কসবাদের সম্যক অনুশীলন ও তাহার সঠিক প্রয়োগে। কারণ মার্কসবাদ ষোল আনা গ্রহণ করিতে পারিলে আর মধ্যবিত্তে ও শ্রমিক-কৃষকে জন্মগত প্রভেদের অর্থ থাকে না। তখন উৎকর্ষের একমাত্র মাপকাঠি হয়—কাহার আছে কি পরিমাণে মার্কসবাদে দখল ও প্রয়োগদক্ষতা। শ্রমিক-কৃষকের রচনা অথবা তাহাদের সমগ্র শ্রেণীর বোধগম্য রচনা না হইলে প্রলেটারিয়ান সংস্কৃতি হয় না—এ ধারণার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। শ্রমিক-শ্রেণীর অধিনায়ক হইয়া প্রকাশ রায় 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত যে-তিনটি প্রবন্ধের সুখ্যাতি করিয়াছেন—'সোভিয়েট বায়োলজি', 'বুদ্ধিবিলাসীর ডায়লেক্‌টিক্‌স্‌', 'মার্কসবাদের নয়াভাষ্য'—ইহাদের কোন্‌টি বর্তমানে ভারতীয় শ্রমিক-শ্রেণীর বোধগম্য?

মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর আর একটি প্রধান কর্তব্য, মৃতপ্রায় লোক-সংস্কৃতিকে পুনর্জীবিত করা। বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রকৃতিগত প্রবণতাই এই যে, তাহা পূর্বতন লোক-সংস্কৃতির কণ্ঠরোধ করিয়া নিজেকে বিস্তার করে। মার্কসবাদী সংস্কৃতি-কর্মীর কর্তব্য, এই লুপ্তপ্রায় লোক-সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইয়া তাহার পুরাতন কাঠামোয় নূতন আবেগের সঞ্চার করিয়া তাহাকে উন্নত করিয়া তোলা। সমাজবাদী সোভিয়েট প্রাচ্য ধনবাদের বাধা দূরে হওয়ায় লোক-সংস্কৃতির অভূতপূর্ব জাগরণ দেখা দিয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, সেখানেও তাহার সহিত শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া সংস্কৃতির আন্তরিক শত্রুতা নাই। বুর্জোয়া যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকেরা সেখানে আর স্বল্পসংখ্যক শিল্প-রসিকের সম্পত্তি নন, নূতন শিক্ষিত বিরাট জনসমাজের নিত্য আনন্দের উৎস।

আমাদের দেশে সমাজবাদী আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ হইলেও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের যবনিকা পতন হয় নাই। সাম্রাজ্যবাদের কৃপায় ভারতে সামন্তবাদ এখনও প্রবল। ইহার জন্য অপরিহার্য ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে "ডিমোক্রাটিক ফ্রণ্ট" সংগঠন। ঔপনিবেশিক দেশসমূহে এই ফ্রণ্ট সংগঠনের কৌশল হিসাবে কমিণ্টার্নের ষষ্ঠ বিশ্ব-কংগ্রেসে যে-নির্দেশ দিয়াছিলেন, তাহার কার্যকারিতা এখনও বাতিল হইয়া যায় নাই। তাহাতে বলা হইয়াছে, পরাধীন দেশে মার্কসবাদীগণের অন্যান্য করণীয়ের মধ্যে একটি প্রধান করণীয়ঃ

বিভিন্ন উপজাতিগুলির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নরনারীর সমান

অধিকার দাবি ; রাষ্ট্র হইতে ধর্মকে পৃথক করা ; জন্মগত জাতিভেদের বিলোপ ; রাজনৈতিক শিক্ষার এবং গ্রামে ও নগরে জনসাধারণের শিক্ষার স্তরকে উন্নত করা ; ইত্যাদি। [Establishment of equal rights for national.ties and of sex-equality ; (equal rights for women) ; separation of church and state and abolition of caste-distinctions ; political education and raising of the general cultural level of the masses in town and country ; etc.]

আমাদের দেশ স্বাধীনতা-সংগ্রামের এখনও চূড়ান্ত সাফল্য না হওয়ায় মার্কসবাদীগণের এই সকল কর্তব্য এখনও অসমাপ্ত রহিয়াছে। এই কর্তব্য সম্পাদনে শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রচলিত বুর্জোয়া সাহিত্যকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা যায় ; কারণ, এই করণীয়গুলির প্রত্যেকটি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাহাতে আগত বিপ্লবের বিরোধিতা না করিয়া বরং সহযোগিতা করা হয়। কমিন্টার্নের এই সঠিক নির্দেশ বিস্মৃত হইলেই হয় মার্কসবাদ খণ্ডিত ও ডিমোক্রাটিক ফ্রন্ট বিকলাঙ্গ।

৪. ১১. ৪৯

কবিতায় বক্তব্য

নিউটন সম্বন্ধে নানা প্রচলিত গল্পের মধ্যে একটি এই : 'প্যারাডাইস লস্ট' আগাগোড়া শোনার পর তিনি নাকি প্রশ্ন করিয়াছিলেন—এতে শেষ পর্য্যন্ত কি প্রমাণ হোল ? (আফটার অল, হোয়াট ডাজ ইট প্রুভ ?)

যুগপ্রবর্ত্তক বৈজ্ঞানিকের এই সাহিত্যিক মূঢ়তায় হয়ত হাস্য সংবরণ করা দুঃসাধ্য। সারা জীবন অংক কষিয়া কি তাঁহার ধারণা হইয়াছিল কোনো কিছু প্রমাণ করা ছাড়া মানুষের প্রতিভার করণীয় কিছু থাকিতে পারে না ? গণিতের নিকট যে দাবী করা চলে, কবিতাকেও কি তাহাই মানিয়া চলিতে হইবে ? প্রমাণ-অতিরিক্ত বক্তব্য থাকা কি বুদ্ধির অপব্যবহার ?

কিন্তু নিউটনকে ব্যঙ্গ করিবার পূর্বে আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে নিউটন মিলটনের নিজের উক্তিকেই মানিয়া লইয়াছিলেন, মিলটনকে ওজন করিতেছিলেন কবির স্বনির্বাচিত তুলাদণ্ডে। এই মহাকাব্যের উদ্বোধন-অংশে কবি নিজেই বলিতেছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য—প্রমাণ করা যে মানবের প্রতি ঈশ্বরের ব্যবহার সর্বদাই ন্যায়নিষ্ঠ। সুতরাং নিউটনের মনে গ্রন্থ পাঠান্তে যদি প্রশ্ন জাগে যে মহাকবি রাশি রাশি কথা জড় করিয়াও আসল কথাটি চাপিয়া গিয়াছেন, নিজের বক্তব্য প্রমাণ করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে এমন কি

অপরাধ হয়? এবং অবৈজ্ঞানিক পাঠকও স্বীকার করিবেন, নিউটনের এ অভিযোগ একান্ত ভিত্তিহীন নয়।

তবে কি মিলটনের মহাকাব্য নিরর্থক সংগতিহীন কথার বাঁধুনি? তার অবিসংবাদিত আকর্ষণ ও প্রভাবের কারণ কি শুধুই তার ছন্দের গাম্ভীর্য্য ও উপমার চমৎকারিত্ব? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রয়োজন নাই। কোন মহাকাব্যই কেবল ছন্দ ও উপমার জোরে দাঁড়াইতে পারে না। দাঁড়াইবার জন্য চাই শক্ত মেরুদণ্ড যাহাকে ছন্দ দেয় রক্তমাংসের আবরণ ও উপমা যোগায় নানা বিচিত্র আভরণ। সেই মেরুদণ্ড হইতেছে কবিতার ভিতর দিয়া কবির উপলব্ধিগত বক্তব্য। যে কবির জীবনে এমন কোন উপলব্ধির অভাব আছে যে উপলব্ধি অন্যের কাছে প্রকাশের উপযোগী নয় তাঁহার পক্ষে সার্থক কবি হইবার সম্ভাবনা সুদূর।

কবির প্রথম ও প্রধান কাজ আত্মপ্রকাশ। যিনি নিজের উপলব্ধিকে ভাষায় প্রকাশ করিতে না পারেন, তাঁহার আন্তরিক উপলব্ধি যত বিরাট হউক না কেন, তিনি কবিত্বের দাবী করিতে পারেন না। তাহাতে 'কবিত্ব' শব্দের সংজ্ঞারই ব্যতিক্রম হয়। 'নীরব কবি' বা 'মিউট্ ইন্‌গ্লোরিয়াস মিলটন' স্বতো-বিরোধী প্রত্যয় বা মিথ্যাজল্পনা। কবি মাত্রেই প্রকাশধর্ম্মী।

কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করিতে চাহিলেই কিছু নিজেকে প্রকাশ করা যায় না। আত্মপ্রকাশ দক্ষতাসাপেক্ষ। এ দক্ষতা কবিকে অর্জ্জন করিতে হয়। আপনাকে প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। এ প্রবৃত্তির মূলে আছে আদিম যুগ হইতে মানবগোষ্ঠীর যৌথ-জীবন। হাতিয়ার ও ভাষা,—এ দুয়ের উদ্ভব ও ব্যবহারের ফলেই মানুষ প্রাণীজগতের নূতন স্তরে পেঁছিাইল। যৌথ-জীবনের প্রভাবেই নৃত্য, গীত ও কবিতার উৎপত্তি।* কবিতার ভাষা তাই ছন্দোময়—যে ছন্দের তালে তালে অনেকের চিত্ত একই গতিতে নিয়ন্ত্রিত হয়। কবি তাই নিরবচ্ছিন্ন একক নহেন, তিনি অনেকের মধ্যে এক। কবিতার পূর্ণ ব্যঞ্জনা তাই ঘরের কোণে বসিয়া মনে মনে একলা পড়ায় নয়। কবিতার পূর্ণ উপভোগ আবৃত্তিতে, যাহাতে কবি শ্রোতৃবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া আপন আবেগ

* এই প্রসঙ্গে অনুসন্ধিৎসা থাকিলে নিম্নলিখিত বইগুলি দ্রষ্টব্য:

Christopher Caudwell—Illusion & Reality;

George Thomson—Æschylus & Athens,

—Marxism & Poetry.

সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারেন। কিন্তু এ আবেগ সঞ্চার করা সম্ভব হয় না যদি কবি ও শ্রোতার ভিতর অনুরূপ উপলব্ধির সংযোগসূত্র বর্ত্তমান না থাকে। ভাষা, ছন্দ ও অংগভংগীর সাহায্যে আপন অন্তর হইতে কবি যাহাকে রূপ দিয়া বাহিরে প্রকাশ করিলেন তাহা শ্রোতার বোধগম্য না হইলে কবির প্রয়াস ব্যর্থ হইল, কেননা যৌথজীবনে ছেদ ঘটিল। কবির প্রয়াস সেখানেই সার্থক যেখানে যৌথজীবনের অন্তরের কথাটি কবি তাঁহার নিজের অন্তরেই আবিষ্কার করেন ও স্বাভাবিক দক্ষতার সহিত অন্যের কাছে প্রকাশ করেন। যে শক্তির সহায়তায় কবি আপন অন্তরে যৌথজীবনের অন্তরের কথাটি ধরিতে পারেন, তাহাকে বলা যায় অনুপ্রেরণা, এবং অনুপ্রেরিত কবিই তাঁহার পাঠক বা শ্রোতৃবর্গকে অনুপ্রেরিত করিয়া তুলিতে পারেন। মিলটন নিঃসন্দেহ অনুপ্রেরিত কবি। তবুও যে নিউটন তাঁহাকে বুঝিতে পারেন নাই তাহার কারণ তিনি মিল্টনের আসল বক্তব্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। মিলটনের কাব্যোক্তিকে তিনি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা সতর্ক ছিলেন কবি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করেন কি না। কিন্তু যে গভীর বক্তব্য কবি তাঁহার সমস্ত মহাকাব্যের ভিতর দিয়া ফোটাইয়া তুলিলেন তাহা বৈজ্ঞানিকের তীক্ষ্ম দৃষ্টিকে এড়াইয়া গেল।

ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম প্রকাশ্য বৈপ্লবিক কবি মিলটন—ভাবে ভাষায় অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক। ইংলণ্ডের ইতিহাসের যে যুগে মিলটনের আবির্ভাব সে যুগে এক বিরাট বিপ্লব সে দেশে সংসাধিত হইতেছিল। নবোদ্ভূত বুর্জোয়া-শ্রেণী প্রাচীন ফিউডাল শৃংখল বিচূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নূতন সামাজিক বিন্যাস রচনায় রত ছিল। ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজশক্তি প্রথম পর্বে এই বিপ্লবের সহায়ক হওয়ার পর শেষে প্রতিক্রিয়াপ্রবণ ভূস্বামীবর্গের সহিত মিতালী করিয়া বিপ্লবের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়াইল। ফলে ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ ও রাজশক্তির সাময়িক অবসান। প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ ও ক্রমওয়েলের অভ্যুত্থান। পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম প্রবল রাজশক্তি সংঘবদ্ধ জনশক্তির নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রকৃতিই এই যে তাহা কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া আর আগাইতে চাহেনা। কেননা তখন বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থের সহিত তাহার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী নির্বিত্তশ্রেণীর স্বার্থের সংঘাত বাধে। বিপ্লবকে তাহার ন্যায়সংগত পরিণতিতে পরিচালিত করিতে গেলে প্রয়োজন হয় বুর্জোয়াশ্রেণীর আপন অস্তিত্বের উচ্ছেদ। স্বভাবতঃই তাহারা ইহাতে ভয় পায়। তাই তখন

রব উঠে বিপ্লব 'মাত্রা' ছাড়াইয়া যাইতেছে, তাহার প্রতিরোধ করিতে হইবে। ইতিহাসের যে বিধি অনুসারে বিপ্লবের রঙ্গমঞ্চে রোবস্পিয়ারের পর নেপোলিয়নের আগমন হয়, সেই বিধি অনুসারেই ক্রমওয়েলের পর আসিলেন জেনারেল মনক্ ও দ্বিতীয় চার্লস্। প্রজাশক্তি পরাভূত হইয়া আবার রাজশক্তির আসন সুদৃঢ় করিল।

মিলটন এই বিপ্লবের দুই পর্ব্বেরই জীবিত সাক্ষী। তিনি ছিলেন ক্রমওয়েলের সহকর্মী। জন্মাবধি আপন কবিত্বশক্তির প্রাচুর্য্য সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তাই বলিয়া দেশে যখন রাজশক্তির বিরুদ্ধে জনশক্তির মুক্তির সংগ্রাম চলিয়াছে তখন জন্মগত কবিত্বের খাতিরে তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিতে হইবে, এই অদ্ভুত উন্নাসিক ধারণা তাঁহার মস্তিষ্কে কখনও প্রবেশ করে নাই। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে বিশ বছরের রাজনৈতিক কর্ম্মতৎপরতা ব্যর্থ হইল। বিপ্লবের শেষ পর্ব্ব তাহার প্রথম পর্ব্বের সমস্ত প্রতিশ্রুতির ব্যত্যয় করিয়া বসিল। পিউরিটান কবি মিলটন আবার আপন কোটরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন মহাকাব্য রচনার বাসনায়। 'প্যারাডাইস লস্ট' তাই ফুটিয়া উঠিয়াছে দরিদ্র নিপীড়িত পিউরিটান সমাজের দুর্দ্ধর্ষ বিপ্লবী মনোবৃত্তি ও তাহার চরম আশাভঙ্গ। ধর্ম্মভীরু মিলটনের রচনায় তাই দেখিতে পাওয়া যায় এই প্যারাডক্স্, তাঁহার ঈশ্বরে পড়িয়াছে স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারী স্টুয়ার্টরাজের প্রতিচ্ছায়া, ও তাঁহার শয়তান বিপ্লবী নেতৃত্বের সমস্ত বিভূতিতে বিভূষিত। 'প্যারাডাইস লস্টের' প্রকৃত বিষয়বস্তু তাই, বাইবেল-কথিত অপরাধে ঈডেন উদ্যান হইতে আদিম নরনারীর বিতাড়ন নহে, তাহা হইতেছে সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের বিরুদ্ধে আদর্শ জননেতা শয়তানের বিদ্রোহ। শয়তানের অভ্রভেদী মহিমার অন্তিম অধোগতিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে পিউরিটান সমাজের মুখপাত্র মহাকবির মনে বুর্জোয়া বিপ্লবের অন্তহীন সম্ভাবনা ও আশাভঙ্গের মর্ম্মভেদী বেদনা। এই বিদ্রোহ ও তাহার পরিণামের কাহিনী অমর অক্ষরে বর্ণনা করিতে পারায় মিলটনের প্রতিভা যুগে যুগে মুক্তিকামী মানবের নমস্য কীর্তি বলিয়া ঘোষিত হইতেছে।

বাংলার মিলটন মাইকেল, আধুনিক কবিদের আদি গুরু, বাংলা ভাষায় প্রথম বৈপ্লবিক কবি, ভাবে-ভাষায় অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক। বাংলার ইতিহাসের যে যুগে তাঁহার জন্ম তখন সে দেশেও এক প্রচণ্ড বিপ্লব সংসাধিত হইতেছিল। বাংলাদেশে ইংরাজ-রাজের পত্তন শুধু এক রাজশক্তির পরিবর্তে অন্য রাজশক্তির

প্রতিষ্ঠা নয়, সামাজিক বিন্যাসের এক পর্য্যায় হইতে নূতনতর পর্য্যায়ে অভিবর্ত্তন, সমাজ-চেতনার নিম্নতর স্তর হইতে উন্নততর বিস্তৃততর স্তরে উদ্বর্ত্তন। এই যুগে সামাজিক মূল্যজ্ঞানেরও রূপান্তর না ঘটিয়া পারে না। তাই মেকলের স্বপ্নলোকের "কালা ইংরাজ" মাইকেল বলিতে একটুও কুণ্ঠিত নহেন যে রাম ও তাঁহার চেলাচামুণ্ডাদের তিনি ঘৃণা করেন। সমগ্র হিন্দু ঐতিহ্যের বিরোধিতায় তাঁহার সমস্ত সৃজনী-সহানুভূতি রাবণ ও ইন্দ্রজিতের দিকে, ভগবানের অবতার রাম বা তাঁহার পদাঙ্কগামী লক্ষ্মণের দিকে নহে। মূল্যজ্ঞানের এই যে বৈপরীত্য, ইহা কি কেবল বিজাতীয় ভাবাপন্ন কবির ব্যক্তিগত খাম-খেয়াল? তাহাই যদি হইবে তাহা হইলে সমস্ত শিক্ষিত বাঙালী পাঠক-সমাজ, এমন কি প্রাচীনপন্থী বিদ্যাসাগর বা ভূদেব পর্য্যন্ত, তাঁহার সৃষ্টিকে যুগান্তকারী কীর্ত্তি বলিয়া গ্রহণ করিলেন কিরূপে? জনসমাজের এই সমর্থনকে আপন অন্তরে উপলব্ধি না করিতে পারিলে মাইকেল কি সার্থক কবি হইতে পারিতেন? কবির সহিত পাঠকের কোথায় ছিল সেই সামাজিক যোগসূত্র যাহার সুনিপুণ ব্যবহারে মাইকেল প্রাচীন ধ্যান-ধারণার উপর এই নির্ম্মম বলাৎকার বাঙালীকে দিয়া সানন্দে স্বীকার করাইয়া লইলেন?

ইংরাজ বণিক-রাজের অপ্রতিহত অগ্রগমনে বাংলায় ফিউডাল সমাজবিন্যাস বিধ্বস্ত হইতে বসিল, কিন্তু বিশ্বব্যাপী নূতন বুর্জোয়াযুগের অন্তর্ভুক্ত হইতে চলিল। ইংরাজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া বাংলা সাহিত্যে ঘটিল নবজন্ম। নূতন সাহিত্যের উপজীব্য আর দেবদেবীর লীলাখেলা বা কলহ-কোন্দল নহে, পার্থিব নরনারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা কামনা-বাসনা। কবি তাই আঘাত করিতে লাগিলেন মানুষেরই অন্তরের দ্বারে দ্বারে তাহার ভাবসম্পদ আহরণের জন্য। 'মেঘনাদ বধে' মাইকেলের সৃষ্ট চরিত্রাবলী তাই আর পৌরাণিক চরিত্র নহে, বিভিন্ন মানবীয় গুণের আধার। রাম কতখানি দেবতা, বা রাবণ কতখানি রাক্ষস এ বিচার আর চলে না; তাহারা সকলেই দোষে-গুণে মানুষ, মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা দিয়াই তাহাদের বিচার করিতে হইবে—পাঠকের নিকট ইহাই ছিল মাইকেলের অন্তরের দাবী। এই মানদণ্ডের প্রয়োগে মাইকেলের চিত্ত রাম অপেক্ষা রাবণের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছিল, তাহার কারণ, ইংরাজের অধীনে আমাদের পরাধীনতা। এ অধীনতাবোধ সে যুগে রাজনৈতিক প্রতিরোধের কর্মসূচীর ভিত্তিতে আন্দোলিত হইয়া না উঠিলেও বিজাতীয় প্রভুশক্তির সর্ব-গ্রাসী কবল হইতে জাতীয় আত্মার বৈশিষ্ট্যকে সংরক্ষিত করিবার সুস্পষ্ট প্রয়াস

বিদ্যাসাগরের তালতলার চটিতে, ভুদেবের বলিষ্ঠ আচারনিষ্ঠায় ও রাজণারায়নের সংস্কৃতি-দীপ্ত চরিত্রবত্তায়। মাইকেলের নোঙর-ছেঁড়া জীবনে এই তিনটি স্থিতধী মনস্বীর প্রতি শ্রদ্ধা ছিল অকৃত্রিম ও অপরিসীম। ইংরাজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্যে যতই বিমুগ্ধ হউন না কেন, কোন শিক্ষিত বাঙালী পরাধীনতাকে কখনও স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বরং ইংরাজী সাহিত্যে স্বাধীনতার বাণী আমাদের চিত্তে অনুরূপ প্রেরণা জাগাইয়া পরাধীনতাবোধকে আরো দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছে। ডিরোজিও-র চমকপ্রদ ব্যক্তিত্ব ও কবিপ্রতিভার প্রভাব তাঁহার শিষ্য-অনুশিষ্যগণের উপর মোটেই ব্যর্থ হয় নাই। মাইকেলের সমকালে ও অব্যবহিত পরে হেম-নবীন-রঙ্গলালের কবিতায় যে স্বাধীনতার স্পৃহা স্থূল অথচ স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, মাইকেলে তাহার প্রকাশ পরোক্ষ। পরোক্ষ কিন্তু গভীরতর। রাম দেবতা হইতে পারেন, রাবণ রাক্ষস হইতে পারেন, তবু রাম অভিযানকারী। রাবণ স্বদেশ-রক্ষণশীল। মাইকেলের অন্তরস্থ জাতীয়তাবোধ তাই কিছুতেই রামের দিকে পক্ষপাত দেখাইতে পারে না। এই কারণেই একিলিস বা আগামেমনোন অপেক্ষাও হেকটর ও প্রায়াম তাঁহার প্রিয়তর ছিল, গ্রীক কবির অনভিপ্রেত হওয়া সত্ত্বেও। পুরাণে যাহা বলে বলুক, পরলোকে যাহা ঘটে ঘটুক তবু মাইকেলের বিচারে, ইহলোকে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদায় রাবণ, ইন্দ্রজিত, প্রমীলা, মন্দোদরী প্রভৃতি সকলেই রাম, সীতা, লক্ষ্মণ প্রভৃতি অপেক্ষা মহত্তর। বিভীষণ সে-হিসাবে দেশদ্রোহী, ও হতভাগিনী সরমা বিশ্বাসঘাতকের সহধর্ম্মিণী। এই বিচার যে বিজাতীয় বিচার নয়, জাতীয়তাবোধেরই অংগ তাহা স্পষ্ট হয় যখন শুনি বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবোধের আদি পুরোহিত বংকিমচন্দ্র বলিতেছেন, যে-দেশে বিভীষণ ধার্মিক সে-দেশের উন্নতি সুদূর-পরাহত। সুতরাং মাইকেলের অন্তর্নিহিত জাতীয়তা-বোধ বাদ দিলে 'মেঘনাদ বধের' বক্তব্য সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয় না।

সামাজিক উপলব্ধির এই প্রাধান্য শুধু মহাকাব্যে সীমাবদ্ধ নহে, গীতি-কবিতার বিচারেও তাহাকে পরিহার করা যায় না। উনিশ শতকের প্রথম পাদকে ইংরাজী গীতিকবিতার স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। যদি কোন একটি কবিতাকে এই গরিমাময় যুগের প্রতিভূকল্প বলিয়া বাছিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে, বহু পণ্ডিতের মতে, সে গৌরবের উপযুক্ত পাত্র, কোলরিজের 'প্রাচীন নাবিকের ছড়া'। নৈর্ব্যক্তিক কল্পনার এরূপ সুদূর প্রসার, যাহাকে

শেকস্‌পিয়ারের ভাষায় বলা যায়, 'বায়বীয় অবস্তু' তাহাতে 'নামরূপ' আরোপ করিবার এহেন অপরূপ সাফল্য কোনো দেশে আর কোনো কবি অর্জন করিয়াছেন কি না সন্দেহ। অথচ এ কবিতা একান্ত একাকীত্বের কবিতা। কোলরিজের 'প্রাচীন নাবিক' ডিফো-র রবিনসন ক্রুসো অপেক্ষাও নিঃসঙ্গ—যে ক্রুসোকে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বিচারে সমাজবিহীন একক ব্যক্তির মডেল বলিয়া ধরা হয়। ক্রুসোর অসভ্য অনুচর ফ্রাইডে-র কথা বাদ দিয়াও বলা যায়, ক্রুসো তবু যে জগতে বাস করিত তাহা অপরিচিত হইলেও অজ্ঞাত নয়। কিন্তু 'প্রাচীন নাবিক' কিছুদিনের জন্য যে জগতের অধিবাসী হইয়াছিল তাহার বাস্তব অস্তিত্ব কোন দিন ছিল না, হইবেও না। তাহা উদ্ভূত হইয়াছিল কোলরিজের কুহকী কল্পনা হইতে, ফেনক-বুদ্‌বুদের মতো। তাহার বাস্তবতা স্বপ্ন-জগতের মায়াময় বাস্তবতা। স্বপ্ন যতক্ষণ চলে ততক্ষণই তার বাস্তবতা, যাহা ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে অনস্তিত্বে বিলুপ্ত হয়।

ফেনক-বুদ্‌বুদের লঘু ভনিমাকে মনে হয় যেন জড়-নিয়মাতীত, বস্তুভার-হীন; অথচ আধুনিক পদার্থ-বিজ্ঞান তাহাতেই খুঁজিয়া পাইয়াছেন ক্রমবিবর্ধমান বিশ্বজগতের প্রত্যক্ষ প্রতীক। আধুনিক মনোবিজ্ঞান আবিষ্কার করিয়াছে, উদ্ভটতম স্বপ্নেরও অগোচরে থাকে দ্রষ্টার বাস্তব অভিজ্ঞতা। কোলরিজের এই অতি-প্রাকৃত সাহিত্যিক সৃষ্টির অন্তরেও ছিল তাঁর তীব্র সামাজিক উপলব্ধি। যৌবনে ফরাসী-বিপ্লবের উন্মাদনার পর, আদর্শ সাধারণতন্ত্র গঠনের ব্যর্থ তারুণ্য-চাঞ্চল্যের পর, স্বদেশে বাস্তব পারিপার্শ্বিকের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনোভাব কিরূপ হইতে পারে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে ১৮০২ সালে রচিত কবিভ্রাতা ওয়ার্ডস্‌ওয়াথের একটি সনেটে ঃ

O Friend ! I know not which way I must look
For comfort, being, as I am opprest
To think that now our life is only drest
For show ; mean handiwork of carftsmen, cook,
Or groom !—We must run glittering like a brook
In the open sunshine, or we are unblest ;
The wealthiest man among us is the best ;
No grandear now in Nature or in book
Delights us. Rapine, avarice, expense,

This is idolatry ; and these we adore ;
Plain-living and high-thinking are no more ;
The homely beauty of the good old cause
Is gone ; our peace, our fearful innocence,
And pure religion breathing household laws.

যে চিত্র এই সনেটে ফুটিয়াছে তাহা উনিশ শতকের ইংলণ্ডে যান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্যে শোচনীয় সমাজব্যবস্থার চিত্র। সমগ্র জাতির ক্রমবর্ধমান মূলধন জমা হইতেছে একটি সংখ্যাল্প ধনিকশ্রেণীর দৃঢ় মুষ্টির অভ্যন্তরে। আর দেশের জনসাধারণের দুর্গতির অন্ত থাকিতেছে না। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-কোলরিজের মুক্তিকামী কবিচিত্ত এই রূঢ় পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় নির্ভরযোগ্য আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। শেষে ওয়ার্ডসওয়ার্থ আশ্রয় পাইলেন পরিচ্ছন্ন প্রকৃতির শান্ত সাহচর্যে আর কোলরিজ অহিফেন-সঞ্জাত উদ্ভট স্বপ্নবিলাসে। মনোজগতে তাই তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, একাকী। কোলরিজের বেলায় খাটে নিউটনের উল্লেখ-প্রসঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থ লিখিয়াছিলেন যে স্মরণীয় লাইনটি—

Voyaging thro' strange seas of thought, alone.

'প্রাচীন নাবিকের' একাকী অবস্থান,

Alone, alone, all, all alone,
Alone on a wide wide sea,
And never a saint took pity on
My soul in agony

কোলরিজেরই মানসিক অবস্থার প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এই করুণা-ভিখারী জ্বালাময় একাকীত্ব স্বাভাবিক নহে, প্রতিবাদ-প্রসূত। দুর্লভ কবিত্বশক্তির অধিকারী হইয়াও কোলরিজ দেখিলেন তাঁহার কল্পনাকে পরিপুষ্ট করার উপযোগী বিষয়বস্তু বাস্তব পরিবেশে অসম্ভব। সে পরিবেশকে তিনি মানিয়া লইতেও পারেন না, তাহাকে রূপান্তরিত করার পথও তাঁহার অজ্ঞাত। তাই কল্পনার প্রসারের একমাত্র প্রশস্ত পথ, বর্তমান বাস্তব হইতে দূরে প্রস্থান। এই মহাপ্রস্থানের প্রচেষ্টায় কোলরিজের মনীষা কত যে অপ্রচলিত বিদ্যার দুস্তর সাগর পার হইয়াছিল, তাঁহার স্মৃতি কত যে তুচ্ছ খুঁটিনাটির শুক্তিমুক্তা আহরণ করিয়াছিল যাহাদের অদৃশ্য ব্যঞ্জনায় এই নাতিদীর্ঘ মোজইক-কঠিন কবিতাটির চারিপাশে সৃষ্ট হইয়াছে একটি অবর্ণনীয় বর্ণাঢ্য বায়ুমণ্ডল, তাহার হদিস

পাওয়া যায় বিখ্যাত সমালোচনা-গ্রন্থ 'দি রোড টু জানাডু' পড়িলে। আর এই নিষ্ক্রমণের সুদূরত্বের পরিমাপেই বুঝিতে পারা যায় তাঁহার প্রতিবাদের প্রগাঢ়তা? 'প্রাচীন নাবিকের ছড়া'-র অবাস্তব অভিযানের ইহাই বাস্তব ব্যাখ্যা।

যত দূরেই যান, কবিকে তবু সমাজের নিকট ফিরিতে হইবে। সমাজের এই দাবী কোন কবি উপেক্ষা করিতে পারেন না। বিশেষ করিয়া কোলরিজের মতো কবি, যাঁহার ছিল ভাষার অলৌকিক ক্ষমতা, 'স্ট্রেঞ্জ পাওয়ার অব স্পীচ' তাই এই অতি প্রাকৃত অভিযান-কাহিনীতে আছে একটিমাত্র বাস্তব ঘটনা যাহাতে কবির নীতিবোধ সুপ্রকট। প্রাচীন নাবিকের যাহা কিছু শাস্তি ও দুর্ভোগ তাহার মূলে আছে একটি নিরপরাধ খেলার সাথী পাখীকে অকারণ হত্যা। কবির বিধানে, এই অপরাধের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হইল এই যে তাহার হৃদয়হীন বর্ব্বরতার কাহিনী প্রাচীন নাবিককে আদ্যোপান্ত প্রচার করিতেই হইবে। তাহার শারীরিক যন্ত্রণার একমাত্র প্রতিষেধক হিসাবে সে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়, নিশার মতো; আর শোনাইবার উপযুক্ত মানুষের মুখ দেখিলেই তাহার উপর আপন যাদু বিস্তার করে। তাহাকে এই শিক্ষা দেয় যে, মানুষের জীবনে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, ভগবানের নিকট মহত্তম প্রার্থনা হইতেছে কার্য্যতঃ ভালোবাসার পরিধিকে বিস্তৃত করা। শুধু দেশবাসীকে ভালোবাসিলে চলিবে না, সমগ্র মানবসমাজকে ভালোবাসিতে হইবে (নীতির দিক দিয়া ইহাকে বলা যায় ফরাসী-বিপ্লবের মহার্ঘ্যতম বাণী); সেখানেও থামিলেও চলিবে না, মানুষের ভালোবাসাকে মূক প্রাণীজগতে, পশুপক্ষীতেও বিস্তৃত করিতে হইবে —এই সামাজিক নীতির আদর্শকে যেন খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে স্থান দেওয়ায় কোলরিজের স্পর্শকাতর শিল্পীমন চিরদিন খুঁতখুঁত করিত, ইহাকে তিনি প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। জনৈক মহিলা-পাঠকের সমালোচনার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার কবিতায় নীতি-প্রচারে মাত্রাধিক্য ঘটিয়া গিয়াছে। কোলরিজ বুঝিতে পারেন নাই, কবি হিসাবে এই সামাজিক দায়িত্ব এড়াইবার পথ ছিল না। এড়াইলে, কবিত্বের যে উচ্চাসনে তিনি আজ প্রতিষ্ঠিত, সেখানে তাঁহার ঠাঁই মিলিত না। সামাজিক উপলব্ধির প্রকাশ ব্যতীত তাঁহার কবিতা হইত দুর্ব্বল, রক্তহীন, ক্ষীণায়ু। যে-সমাজে নরনারীর প্রাত্যহিক ব্যবহারে রুচিজ্ঞান লোপ পাইতেছে, ধর্ম্মাচরণ উপেক্ষিত হইতেছে, যে-সমাজে রীতিনীতির সবকিছুই পণ্যদ্রব্যে পরিণত, যে-সমাজে মানুষে মানুষে একমাত্র

বন্ধন হইতেছে টাকার বন্ধন—সাম্যবাদী ঘোষণার ভাষায় যাহাকে বলা যায়, উলঙ্গ, অনুভূতিহীন, টাকার বন্ধন,—কোলরিজের সংবেদনশীল বিপ্লবপ্রবণ অন্তরাত্মা ইহার বিরুদ্ধে প্রতিঘাত না করিয়া পারে নাই। সেইজন্য বিশুদ্ধ শিল্পী হিসাবে যে কথা বলা কোলরিজের অভিপ্রেত ছিল না, বৃহৎ কবিপ্রতিভার দায়িত্ব নিজের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে দিয়া সেই কর্ত্তব্য পালন করাইয়া লইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার অদ্বিতীয় গীতিকবি। তাঁহার অসংখ্য গীতিকবিতার কোনটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা জনমতের ভিত্তিতে নির্ধারণের জন্য কিছুকাল পূর্ব্বে একটি পরীক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। দেখা গেল, অধিকাংশ পাঠকের ভোট পাইয়াছে, 'সোনার তরী' কবিতাটি। একথা নিশ্চয়, অনেক বিদগ্ধ পাঠক এই মতে সায় দিবেন না। সেই সঙ্গে ইহাও মানিতে হইবে, এই কবিতাটির জনপ্রিয়তা তর্কাতীত। সাধারণ বিচারে মনে হয়, জনপ্রিয় সেই কবিতাই হইতে পারে যাহা সহজ; অর্থাৎ যাহার অর্থবোধে কোন গোলমাল নাই। অথচ, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, এই জনপ্রিয় কবিতাটির অর্থ লইয়া পণ্ডিত মহলে যত তর্কবিতর্কের অবতারণা হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের দুর্ব্বোধ বলিয়া চিহ্নিত অন্য কোন কবিতায় তাহা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এই কবিতাটির অর্থ লইয়া কবিকে অনেক জবাবদিহি করিতে হইয়াছে, স্বয়ং কবিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যাহার জন্য স্পষ্টবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে ছাড়েন নাই। তবুও প্রশ্নটি থাকিয়া যায়, এত অনর্থপাত সত্ত্বেও কবিতাটি এত জনপ্রিয় হইল কি করিয়া। বলা যাইতে পারে, কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের শিল্পকৃতিত্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, ছন্দ-নৈপুণ্যে ও পদলালিত্যে অনুপম। এ-উত্তর তথ্যের দিক দিয়া টেঁকে না। 'ভরা ভাদরে' 'সোনার তরী'র সমকালেই রচিত, একই গ্রন্থে প্রকাশিত। কবিতা দুইটি ছন্দোবন্ধনে অবিকল এক, পদলালিত্যে তারতম্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তথাপি কেন একটি হইয়া রহিল মাত্র সুপরিচিত কবিতার অন্যতম, আর অন্যটি হইয়া উঠিল জনপ্রিয়তায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ?

রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার পাঠক-সাধারণের সামাজিক সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা করিলে হয়ত এই সমস্যা-সমাধানের ইঙ্গিত পাওয়া যাইবে। 'ভরা ভাদরে' কবিতাটি কবির একটি ব্যক্তিগত মুড-এর প্রকাশ। এক 'অম্লান উজ্জ্বল' 'বৃষ্টি-অবসান' দিনে কবির মন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। কত কি তাঁহার মনে পড়িতেছে, তিনি ভাবিতেছেন, 'কার আঁখি দুটি কালো; তাঁহার

সাধ যাইতেছে নিজেকে শতখান করিয়া ছড়াইয়া দিতে, শরতের সমস্ত শোভা তাঁহাকে বিকল করিয়া তুলিতেছে। কিন্তু 'সোনার তরী'-র 'আমি' কবি নিজে নহেন। কল্পনায় তিনি বাংলার এক চাষীর সহিত একাত্ম, যে চাষী একখানি ছোট খেতে একেলা খাটিয়া সোনার ফসল ফলাইয়াছে। বাস্তব জীবনের জমিদার রবীন্দ্রনাথ নিজের অন্তরে চাষীর সহিত যোগসূত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এ আবিষ্কার রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিজ্ঞান-দৃষ্টির ফল নয়, ইহা যৌথ-জীবনের মর্ম্মস্থলে উপনীত হইবার কবির সহজাত ক্ষমতা। 'সোনার তরী'র যুগে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশে যে নামে পরিচিত ছিলেন আজ তাহা বিস্মৃতপ্রায়। তিনি তখন 'রবিবাবু'। রবীন্দ্রনাথ মুখ্যতঃ এই বাবু-শ্রেণীর কবি ; 'শেলী-গ্যেটে-কোলরিজ'-পড়া উচ্চশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের অন্তর্যামী বাণী-রূপ। যে বংশে তাঁহার জন্ম তাহা ধনী হইলেও অভিজাত নহে। ব্রাহ্মণ্যের কৌলীন্য তাহাতে কলঙ্কিত ; দেশীয় জায়গীরদারের প্রাচীনত্বও তাহার অনায়ত্ত। দ্বারকানাথ 'প্রিন্স' হইতে পারেন, মহারাজা নহেন। তাঁহার বিশাল ভূসম্পত্তি ও অর্থসম্পদ বৈশ্য-সুলভ ব্যবসায়লব্ধ। দেবেন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সত্যনিষ্ঠার ফলে যে উত্তরাধিকার সানুজ দ্বিজেন্দ্রনাথ পাইয়াছিলেন, ভাগাভাগি করিলে হয়ত রবীন্দ্রনাথকে অন্য পাঁচজন শিক্ষিত বাঙালীর মতো স্বোপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিতে হইত। মধ্যমভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ আমরণ সরকারী বৃত্তিভোগ করিয়াছেন ; এবং কবি নিজেও ব্যারিস্টারীর জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সমস্ত বাঙালী শিক্ষিতসমাজ আজ বাংলাদেশের ভাগ্যদেবতাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবে যে সে ব্যবস্থা সফল হয় নাই, রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে কবিত্ব সাধনার নিরঙ্কুশ সুযোগ ঘটিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের যৌবন হইতেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমশঃ স্পষ্টতর রূপ পরিগ্রহণ করিতেছিল, যে আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন ইংরাজীশিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। ইংরাজের শাসনে ও শোষণে দেশের মর্ম্মে তখন যে প্রগতির প্রেরণা ও মুক্তির আকুতি জাগিতেছিল, মধ্যবিত্তেরাই তখন তার ধারক, পথিকৃৎ। বিশুদ্ধ কবিত্ব-সাধনার অজুহাতে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে এই বিপুল ভাবাবেগ হইতে বিচ্ছিন্ন রাখেন নাই, অনেক সময় আনুষ্ঠানিক-ভাবেও রাজনীতিতে যোগ দিয়াছেন। কিন্তু কবি হিসাবে তাঁহার বিশিষ্ট দায়িত্ব ছিল—দেশের অন্তরে প্রবেশ করা, তাহার দুঃখবেদনার সহভাক্ হওয়া। দেশ বলিতে তখন প্রধানতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেই বোঝায়, কারণ

বাংলাদেশের জনসাধারণ, তাহার বিশাল সংখ্যাগুরু চাষী শ্রেণী, তখন মোহাচ্ছন্ন, ভাষাহীন। শহরের সহিত গ্রামের সম্বন্ধ ক্রমেই বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিয়াছে, যদিও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই জমি হইতে কোন না কোন রূপ উপস্বত্বে লাভবান ছিলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে। চাষীর জগত ও শিক্ষিতের জগত ঘুরিয়া বেড়ায় বিভিন্ন কক্ষায়। ছুটির দিনে বা কার্যব্যপদেশে শিক্ষিত ভদ্রলোক চাষীর জীবনকে দেখিতে পান যেন দূরে হইতে, কল্পনার মাধ্যমে। যেটুকু সম্বন্ধ গ্রামে ছিল, তাহা লেনদেনের সম্বন্ধ, তাহাতে হৃদয়ের ব্যবহার ছিল অল্পই। রবীন্দ্রনাথও এইভাবেই তাঁহার জমিদারীর কাছারী হইতে বা পদ্মাবক্ষের নৌকা হইতে বাংলাদেশের বৃহৎ জনসমাজের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা তাঁহাকে তাঁহার সামাজিক কর্তব্য হইতে রেহাই দেয় নাই। বাংলাদেশের কৃষিজীবনের সমস্ত ব্যর্থতা তাঁহার অন্তরে পুঞ্জীভূত হইল। এ-দৃশ্য তাঁহার অপরিচিত থাকার কথা নয়, রৌদ্রে-বৃষ্টিতে সারা বৎসর খাটিয়া চাষী ক্ষেতে সোনার ধান ফলায়, আর নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবসায়ীর নৌকা আসিয়া তাহার সমস্ত ফসল উজাড় করিয়া লইয়া যায়। পড়িয়া থাকে কেবল শস্যহীন রিক্ত ক্ষেত্র, চাষীর মন হাহাকার করিয়া উঠে; এতদিন যাহা লইয়া সে ভুলিয়াছিল সবই যে থরেবিথরে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখন কি লইয়া তাহার দিন কাটিবে? যে তরীতে তাহার সোনার ধান সাজানো হইয়াছে সেথায় ত তাহার ঠাঁই নাই। মহাজন শ্রমফলকে চায়, শ্রমিককে তাহার কি প্রয়োজন? সে কৃপা করিয়াও চাষীকে লইতে রাজী নয়, ঠাঁইয়ের এই অপব্যয় তাহার সহিবে কেন? কাজেই সোনার তরী চাষীর যাহা কিছু ছিল লইয়া চলিয়া যায়। চাষী 'শূন্য নদীর তীরে' পড়িয়া থাকে, আর 'শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘ' তাহারই সমবেদনায় ঘুরিতে ফিরিতে থাকে।

এই কবিতায় যখন 'রাশি রাশি ভারা ভারা ধানকাটা' সারা হইয়াছে তখন শ্রাবণ মেঘের অবতারণা করায় রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণশক্তির প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে এবং বাহিরের দিক হইতে এ অভিযোগ যথার্থ। ইহাও জানা কথা, রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি কোন শ্রাবণ দিনে লেখেন নাই, যখন 'গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা'। কিন্তু তাঁহার অন্তরে শ্রাবনের ঘন ম্লানিমা চাষীর বঞ্চিত জীবনযাত্রার ঘন কারুণ্যের সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছিল। কাজেই একটিকে অন্যটির পশ্চাদ্‌পট হিসাবে ব্যবহার করিতে তাঁহার শিল্পবোধে বাধে নাই। বরং

আপন শক্তিতে দুর্জয় বিশ্বাস না থাকিলে এরূপ দুঃসাহস সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই দুঃসাহস সম্ভব হইয়াছিল এই নিগূঢ় বোধ হইতে যে ব্যর্থতার চিত্র আঁকিতে যাইতেছেন, তাহা কেবল কোন বিশেষ চাষীর বাৎসরিক বঞ্চনার চিত্র নয়, তাহা বাংলাদেশের সমগ্র শিক্ষিত সমাজের ব্যর্থতার প্রতীক। প্রতীক হইতেছে সেই রূপক যাহার আবেদন প্রত্যক্ষ ও পর্য্যাপ্ত, যাহাতে বহু চিত্তের অস্পষ্ট অনুভূতি একত্র সমাহিত হইয়া ভাবযোগ্য হইয়া উঠে। বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জীবনে ব্যর্থতা বহুপ্রকারের। সার্থকতাও কিছু কিছু আছে তবুও একথা মানিতে হইবে ব্যর্থতাই তার মূল সুর। চাষীর জীবনের ব্যর্থতার বর্ণনায় এই মূল সুরে ঘা পড়ে। এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ ব্যর্থতা, আমাদের দেশে আর কোন্ শ্রেণীর জীবনে আছে ? আর এ ব্যর্থতা এমনই ব্যাপক যে শিক্ষিত জীবনের খণ্ডিত ব্যর্থতা ইহার মধ্যে অনায়াসে নিজেকে নিমজ্জিত করিতে পারে। তাই 'সোনার তরী'তে প্রকাশ্য বিষয়বস্তু ও তাহার পশ্চাৎপটের আবেগময় স্বতো-বিরোধ বাঙালী পাঠকসমাজ যেন ইচ্ছা করিয়াই লক্ষ্য করে নাই ; কবিতার ছন্দের ও মিলের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছে ; আর আপন আপন ব্যর্থতার প্রকাশ কবিতাটিতে খুঁজিয়া পাইয়া কবিকে সকৃতজ্ঞ-চিত্তে বলিতে চাহিয়াছে,—ইহা ত আমাদেরই অন্তরের কথা : আমারও ত নিঃস্ব, খাটিয়া মরি, কিন্তু তাহার কতটুকু ফল পাই ; নির্ম্মম নিয়োগকর্তা আমাদের শ্রমের ফলটুকু আদায় করিয়া লইয়া অনাদরে হেলাভরে চলিয়া যায়, আর আমরা সংসার সাগর-তীরে শূন্য প্রেক্ষণে চাহিয়া থাকি। তোমার এ কবিতার মধ্যে আমরা নিজেদেরই খুঁজিয়া পাইলাম। তুমি আমাদের মুখে ভাষা দিয়া আমাদের অন্তরের ভার লাঘব করিলে।

আপন মানস-কবির মুখ দিয়া গোটে বলিতেছেন—

প্রকৃতি দিয়েছে মানুষকে অশ্রু আর যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ
যখন মানুষ আর সইতে পারে না ;
আর আমাকে দিয়েছে সবচেয়ে বেশী মাত্রায় ভাষা ও সুর—
যন্ত্রণার পরিপূর্ণ গভীরতা, যাতে আমি বলতে পারি ;
মানুষ যখন তার বেদনায় মূক, তখন আমারই আছে বিধির দান,
অন্তরে যা ভোগ করি বাইরে তা প্রকাশের শক্তি।

মনে হয় না কি এ বর্ণনা 'সোনার তরী'-র রবীন্দ্রনাথেও প্রযোজ্য ?

জনপ্রিয়তার যে নির্ব্বাচনে প্রথম স্থান পায় 'সোনার তরী' তাহাতে দ্বিতীয়

হয় 'উর্ব্বশী'। এই কবিতাটির উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিদগ্ধতম রবীন্দ্র-পাঠক মহলেও দ্বিধা থাকিতে পারে না। ইহাতেও বোধ হয় সন্দেহ নাই, সাধারণ পাঠক বাদ দিয়া শুধু উচ্চশিক্ষিত পাঠকের মত লইলে 'উর্ব্বশী' 'সোনার তরী'-র উপরেই স্থান পাইবে। এই সুবিখ্যাত কবিতাটির গুণ ব্যাখ্যানের প্রয়োজন নাই এ প্রবন্ধে। কিন্তু কি করিয়া এ কথা ভোলা যায় যে এই কবিতাটির সম্পূর্ণ রূপ কি হইবে, তাহা লইয়া কবির মনে বহুদিন অনিশ্চয়তা ছিল। গীতিকবিতার রূপায়নে মূল সূত্র হইল তাহার অবিচ্ছেদ্য ঐকিকতা। ভাবে ভাষায় মিলিয়া গীতিকবিতা একটি অখণ্ড প্রকাশ। যদি তাহার কোন অংশ বিনা ক্ষতিতে বাদ দেওয়া যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে কবিতাটির প্রকাশের পিছনে যে মানসিক ধারণা আছে কবির ধ্যাননেত্রে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই; তিনি নিজেই জানেন না কবিতাটিতে তিনি কি বলিতে চাহেন। আমরা জানি, এ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ প্রথম রচনা করেন আটটি স্তবকে। পরে শেষ দুইটি স্তবক বাদ দেওয়া হয়, বহুদিন ধরিয়া ছয়টি স্তবকই প্রচলিত ছিল। শেষকালে প্রাচীন বয়সে কবি আবার বিচ্ছিন্ন স্তবক দুটিকে পুনর্যোজিত করেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান কি সাহিত্যামোদী পাঠকের কর্ত্তব্য নয়?

যে সময়ে 'উর্ব্বশী' রচিত হয় তখন কবির সহিত ঘনিষ্ঠ প্রীতির সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন লোকেন্দ্রনাথ পালিত। যাঁহারা ইঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তাঁহারাই সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি ছিল যেমন বিস্তৃত, রসবোধ ছিল তেমনই গভীর। এ হেন পাঠকের সহিত অন্তরঙ্গতা যে যে-কোন কবির পক্ষে সৌভাগ্য তাহা দুই বিভিন্ন প্রকৃতির কবি-প্রতিভা, রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। লোকেন্দ্রনাথের মার্জ্জিত রুচি যাহা শ্রেষ্ঠ ইয়োরেপীয় সাহিত্যের পরিশীলনে সুসমৃদ্ধ ছিল, 'উর্ব্বশী' পড়িয়া তাহা উল্লাসে অভিভূত হয়। অথচ তাঁহারই বিচারানুসারে রবীন্দ্রনাথ শেষ দুইটি স্তবক বাদ দিতে সম্মত হন। কাব্যোপভোগে কবির উপর পাঠকের প্রভাবের ইহা একটি মূল্যবান নিদর্শন। এই সংশোধনের কারণ কি কেবল ব্যক্তির উপর ব্যক্তির প্রভাব, না ইহারও পশ্চাতে আছে সামাজিক বিবর্ত্তনের অগোচর সক্রিয়তা?

এই বিযোজনে 'উর্ব্বশী'-র অঙ্গহানিত্ব ঘটিয়াছিল কি না, নির্ভর করে এই কবিতায় কবির কি বক্তব্য ছিল তাহা নির্ধারণের উপর। যদি সে বক্তব্য ছয় স্তবকেই সম্পূর্ণরূপে বলা হইয়া গিয়া থাকে তাহা হইলে মাধুর্য্য সত্ত্বেও

বাকি অংশ নিশ্চয়ই অতিরিক্ত, কবির পক্ষে সময়োচিত সংযম-প্রয়োগের শক্তিহীনতার দ্যোতক।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথের কল্পিত উর্ব্বশী পুরাণের বা কালিদাসের উর্ব্বশী নয়, যদিও উত্তরাধিকারী হিসাবে আধুনিক কবি প্রাচীন যুগের সমস্ত সুরভি আত্মসাৎ করিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই। কেবলমাত্র পুরাতন কাব্যসম্পদের অটুট রক্ষণকারী হইলে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ভাবা সম্ভব হইত না.

আপাতত এই আনন্দে গর্ব্বে বেড়াই নেচে,
কালিদাস ত নামেই আছেন আমি আছি বেঁচে।
তাঁহার কালের স্বাদগন্ধ আমি ত পাই মৃদুমন্দ
আমার কালের কণামাত্র পাননি মহাকবি।

যে আধুনিক বিনোদিনীরা কবির যৌবনে বেণী দুলাইয়া চলিতেন 'উর্ব্বশী' তাঁহাদেরই আদর্শীকৃত রূপনা। আর যে নন্দনে রবীন্দ্র-কল্পিত উর্ব্বশীর বসবাস তাহা বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার সীমা-বিমুক্ত সংস্করণ। পৃথিবীর কোনো দেশে নিখুঁত বুর্জোয়া ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই, ইহা সত্য। তবু বুর্জোয়া ব্যবস্থার আন্তরিক অভিপ্রায় ফিউডাল-তন্ত্রের বিলোপ সাধন। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, বিশেষ করিয়া নারীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, ফিউডাল সমাজে অজ্ঞাত ছিল। যে নারী মাতা নহে, কন্যা নহে, বধূ নহে, ফিউডাল সমাজে তাহার স্থান ছিল না। স্বর্গের অপ্সরীদেরও স্থান ছিল স্বর্গীয় সমাজ-ব্যবস্থার প্রান্তদেশে। উর্ব্বশী যতই সুন্দরী রূপসী হউক না কেন, ইন্দ্রাণীর গৌরবের নিকট তাহাকে মাথা নত করিতে হইত। পুরুষের সহিত নারীর যে সম্বন্ধ নিছক প্রত্যক্ষ, যাহা সমাজের অন্যান্য দাবী হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহার সগৌরব স্বীকৃতি অতীত যুগে অসম্ভব ছিল। তখন সমাজ-ব্যবস্থা ছিল স্থিতিশীল, প্রসার-বিরোধী। ব্যক্তির যেমন স্বাধীনতা ছিল না বৃত্তিনির্ব্বাচনে, তেমনই ছিল না প্রিয়া-নির্ব্বাচনে। কে কাহাকে ভালবাসিবে তাহা ঘটক-কারিকার নিয়ম-শৃংখলে শাসিত ছিল। রোমাণ্টিক প্রেম বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থার মুখ্য ফল। যান্ত্রিক সভ্যতা ও রোমাণ্টিক সাহিত্য সহগামী, সমোৎস-সম্ভূত। আমাদের দেশে ইংরাজ আগমনের সঙ্গে যান্ত্রিক সভ্যতার প্রবর্ত্তন না হইলে উর্ব্বশীর এই নব্যরূপ কল্পনা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হইত না। উর্ব্বশী নব্যনারীত্বের উন্মুক্ত রূপ, যে নারী শুধু পুরুষের প্রিয়া, আর কেহ নহে।

'যুগযুগান্তর হতে' সে যে 'শুধু বিশ্বের প্রেয়সী'। তাহার আত্মীয়-স্বজন, পিতামাতা কেহ নাই, তাহার বিকাশ 'বৃন্তহীন পুষ্পসম'। অমৃত ও গরল পরিবেশনে তাহার সমান দক্ষতা। তাই উর্ব্বশীর বাল্য নাই, জরা নাই, আছে কেবল অনন্ত যৌবন। 'যখন জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা—পূর্ণ প্রস্ফুটিতা'। সমাজের কোনো বন্ধনে সে আবদ্ধ নয়, মিথ্যা লজ্জা-শরমের তাহার প্রয়োজন নাই, অসম্বৃতা সে, তাহার মেখলা আচম্বিতে দিগন্তে টুটিয়া গেলেও সে ভ্রূক্ষেপ করে না, কারণ সে জানে পুরুষের বক্ষোমাঝে যেখানে রক্তধারা নাচিয়া চলিয়াছে সেখানে তাহার স্থান কোথায়।

মুক্তকেশী বিবসনে, বিকশিত বিশ্ব-বাসনার—
অরবিন্দ মাঝখানে পাদপদ্ম রেখেছে তোমার

নারীর এই রূপকে ফিউডাল জগতে কল্পনা করাও যাইত না। বুর্জোয়া যুগে তাহাকে কল্পনায় রূপায়িত করা যায়, কারণ তাহার আংশিক প্রকাশ জগতে প্রত্যক্ষ। কিন্তু পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য বাস্তবের সীমানা ছাড়াইয়া প্রবেশ করিতে হয় স্বপ্নের রাজ্যে। তাই রবীন্দ্রনাথের উক্তি ঃ

অখিল মানস-স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিনী,
হে স্বপ্নসঙ্গিনি !

লোকেন্দ্রনাথের মতে কবিতাটির শেষ এইখানেই। পুরাতন কাহিনীর নারীর নবতম রূপের যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা ইহাতেই সম্পূর্ণ। পরের দুটি স্তবকে আছে উর্ব্বশীর বাস্তবতার অভাবে কবির ক্রন্দন। সুতরাং উর্ব্বশীর চিত্রণে তাহা কোন নূতন রেখাপাত করিয়া নূতন ব্যঞ্জনার ঐশ্বর্য্য ফোটাইয়া তোলে না। কীটস্-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি, 'ওড্ টু দি গ্রীসিয়ান আর্ণ'-এর সহিত পরিচিত পাঠক সহজেই এ যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিবেন। রবীন্দ্রনাথও নিজের রচনার প্রতি সুগভীর মায়া পরিত্যাগ করিয়া নিজের রচনাকে খণ্ডিত করিতে সম্মত হইলেন। অযথা আধিক্যকে বর্জ্জন করিতে পারাতেই সাধিত হয় শিল্পের সম্যক্ পর্য্যাপ্তি।

পরে যে রবীন্দ্রনাথ স্তবক দুটিকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন তাহাতে বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ বক্তব্য লোকেন্দ্রনাথ ধরিতে পারেন নাই। শিক্ষায় দীক্ষায় লোকেন্দ্রনাথ ছিলেন একান্ত বিজাতীয়, ইয়োরোপীয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের কঠিন মাত্রাজ্ঞানে অভ্যস্ত। তাই শেষের দুটি স্তবক তাঁহার রসজ্ঞানে ঠেকিয়াছিল

অসংলগ্ন। বিশুদ্ধ সাহিত্যের বিচারে এ সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করা যায় কিনা জানি না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'উর্ব্বশী' দুটি বিপরীত আবেগের একত্র সমাবেশ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার নিকট উর্ব্বশী ত কেবল ধনতান্ত্রিক যুগে উদ্‌বর্ত্তমান নারীত্বের পূর্ণাংগ প্রতিমা নয়, সে যে অতীত হিন্দু-ভারতের সমস্তজাগতিক উপভোগের নির্ব্বিকল্প প্রতীক। স্বর্গের অপ্সরী উর্ব্বশী যে হিন্দু নৃপতি পুরুরবাবিক্রমের স্মৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্ব যে মহাভারতের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সভ্য জাতি পরাধীন হইলে তাহার অতীত গৌরবের কাহিনী কখনই বিস্তৃত হইতে পারে না। বরং অতীত সম্বন্ধে অত্যধিক চেতনা পরাধীন জাতির স্বাধীনতা-কামনার অগ্রদূত। ভবিষ্যতের দুর্ম্মর আশার সহিত অতীতের জন্য করুণ দীর্ঘশ্বাস তাহার কবিতায় ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় তাহার আধার আধেয়কে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। উর্ব্বশীকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমানের কল্পনাকে রূপ দিতে গিয়া কবি অতীতের জন্য আক্ষেপকে পরিহার করিতে পারেন নাই। মাটির পৃথিবী হইতে উর্ব্বশীর স্বর্গলোকে চিরপ্রয়াণ, এ যেন বর্ত্তমান ইতিহাসের কঠিন বাস্তব হইতে দেশপ্রেমের কল্পলোকে ভারতের হিন্দু-ঐতিহ্যের স্বপ্নোজ্জ্বল অবসান। কবির মনে তাই প্রশ্ন জাগে,

আদি যুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর,—
অতল অকূল হতে সিক্ত-কেশে উঠিবে আবার ?

তৎকালীন ক্ষীণধারা মুক্তি-আন্দোলনের আশা-আশংকামিশ্রিত উত্তর কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয় বন্ধনহীনা উর্বশীর উদ্দেশ্যে রচিত শেষ স্তবকে ঃ

ফিরিবে না ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
অস্তাচল বাসিনী উর্ব্বশী !

তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ উচ্ছ্বাসে
কার চির-বিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে।
পূর্ণিমা নিশীথে যবে দশ দিকে পরিপূর্ণ হাসি,
দূর-স্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুলকরা বাঁশি,
ঝরে অশ্রু-রাশি।
তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে
অয়ি অবন্ধনে॥

মুক্তিকামী কবির সুদীর্ঘ জীবনেও এই আশা সফল হয় নাই। তাঁহার পুত্রস্থানীয়দের জীবদ্দশায় এই সাফল্যের কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে কি? শেষ দুটি স্তবকের ব্যঞ্জনার কি আজিও অবসান ঘটিয়াছে?

'পরিচয়'-এর ভূমিকা*

সভ্যতাবৃদ্ধির অনুপাতে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি হয় কিনা, এ প্রশ্ন আজিও তর্কাধীন, কিন্তু জটিলতা যে বাড়ে, সে-বিষয়ে পণ্ডিতেরাও একমত। পাণ্ডিত্য বাদ দিয়াও দেখা যায়, এক পরিচয়-প্রথাই সভ্যসমাজে কতরকম ছোটবড় জটিলতার সৃষ্টি করে। দুবেলাই চোখাচোখি হয়, অথচ একজন সাধারণ বন্ধুর অভাবে আলাপ করার জো নাই—এমন কে আছেন যাঁহাকে এ-অবস্থায় পড়িতে হয় নাই? পরিচয়ের অভাবে এক-গাড়ি লোক পরস্পরের দৃষ্টি এড়াইয়া নিস্তব্ধভাবে চলিয়াছে—এ-দৃশ্য এদেশেও বিরল নয়।

কিন্তু সভ্যতার আদবকায়দার বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও মানুষের আদিম পরিচয়-স্পৃহাকে ঠেকইয়া রাখা যায় না। হঠাৎ সিগারেটের জন্য দেশলাইয়ের দরকার হয়, পাশের লোকের রিস্টওয়াচ দেখিয়া সময় জানিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া ওঠে, ট্রেনে কে কোথায় নামিবে এ-বিষয়ে অদম্য কৌতূহলকে চাপিয়া রাখা চলে না—সভ্যতার বাঁধন কিছু আলগা হয়, আর এই ক্ষণিকের ফাঁক দিয়া—অনেক সময় স্থায়ী বন্ধুত্বের সূত্রপাত হইয়া যায়। সঙ্গলোভী মানুষ অন্যের সংস্পর্শ পাইয়া নিজেকে সম্পূর্ণতর বোধ করে।

"পরিচয়ের"-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৩৮ —সম্পাদক

এই সঙ্গলোভই মানুষকে দিয়া সমাজ গড়ায়, শিল্প রচায়, সাহিত্য সৃষ্টি করায়। সুপ্রসিদ্ধ কবি-অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষের স্মৃতি-সভার অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, তাঁহার মনে হয়, সাহিত্য কথাটার মূলে আছে 'সহিত'। যে-মানুষ কাহারও সহিত বাস করে না সাহিত্য সৃষ্টির কোনো তাগিদ সে অনুভব করে কিনা সন্দেহ। সাহিত্যের বাহন যে ভাষা, তাহা সমূহের সৃষ্টি। একা-মানুষের ভাষার প্রয়োজন নাই বলিলেই হয়। হয়তো এমন জ্ঞান আছে যাহা একান্ত নির্জন সাধনা-সাপেক্ষ; সে-জ্ঞান হয়তো এমন নিগূঢ় ও মৌলিক যে তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিলে অন্য সবপ্রকার জ্ঞানই সুগম হইয়া আসে—যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ—তখন ভাষা বা সাহিত্যের কোনো প্রয়োজনবোধই থাকে না। কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষ সে-জ্ঞানের সাধক নয়। নিজেকে জানিবার, নিজের পরিচয় পাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহার কম তীব্র নয়; সমস্ত কর্ম ও চিন্তার মধ্য দিয়া, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, এই আত্ম-পরিচয় লাভই তাহার উদ্দেশ্য; কিন্তু সমাজবদ্ধ মানুষের এইটাই অভিজ্ঞতালব্ধ উপলব্ধি যে, অপর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া স্ব-রূপ জানা যায় না। স্ব-কে জানিবার জন্য অপরের প্রয়োজন; আত্ম ও পর কুঞ্জনুঞ্জের মত অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত। তাই সে অপরের সান্নিধ্য চায়, তাই সে সাহিত্য চায়। কারণ, সাহিত্যের মধ্য দিয়া যে-পরিচয় তাহা চাক্ষুষ পরিচয়ের চেয়েও প্রত্যক্ষ। দেশ ও কালের বিস্তীর্ণ ব্যবধানের সমুদ্রকে উপেক্ষা করিয়া এই সাহিত্যজগতেই সমধর্মী মন পরস্পরের সহিত করকম্পন করে, বিপরীতমুখী ঝটিকাবর্তের মধ্যেও তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে পারে। এমন একদিন মহামানবের অন্তরের কাহিনী ছন্দিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এই শুভদিনের আবির্ভাবকে ত্বরিত করিতে হইলে আজ মানুষের প্রধান কাজ—ভাষাসংকটের দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির যুগযুগসঞ্চিত পরিশীলন-সম্পদের সহিত পরিচিত হওয়া। এই পরিশীলন-পরিচয়ই জাতিগত দ্বেষ-হিংসা ও অবজ্ঞাকে, সংকীর্ণ-চিত্ততার রন্ধ্রগত শনিকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ।

বাংলাদেশে 'পরিচয়' আজ এইভারই লইতে চাহে। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য, প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাব-গঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙালী পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী, কখনো মূল ভাষার অনুসরণে আলোচনা করিয়া, কখনো বা ভাষান্তরের সাহায্য লইয়া; কখনো

সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করিয়া, কখনো বা মূলানুগ অনুবাদ করিয়া। এই সঙ্গে মাতৃভাষার সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকেও 'পরিচয়' তাহার দৃষ্টি সদাজাগ্রত করিয়া রাখিবে। কবিতা, কথা-শিল্প, নাটক, কলানুশীলন, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সমাজতত্ত্ব—পরিশীলনের সকল বিভাগগুলিই যাহাতে উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ওঠে, এ-বিষয়ে 'পরিচয়' সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। 'পরিচয়' জানে যে তার সাধ যত, সাধ্য তার বহু পশ্চাতে। কিন্তু তাহার একান্ত বিশ্বাস, তাহার এই স্বীকৃত অক্ষমতাই দেশের সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে, ও তাঁহাদের স্বতঃ-প্রণোদিত সহযোগিতা তাহার রুক্ষ বিঘ্ন-বন্ধুর পথকে শ্যামশোভন ও সহজ-চারণ করিয়া তুলিবে। এই বিশ্বাসই তাহার দুরারোহিণী-আশার মূলে জলসেচন করিয়া আজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিয়াছে। এখন ইহাকে লালনের ভার পড়িল তাঁহাদের উপর—বাংলাভাষার অতীতকে যাঁহারা শ্রদ্ধা করেন, বর্তমানকে দরদ দিয়া দেখেন ও ভবিষ্যতের আলোকিত প্রসার সম্বন্ধে যাঁহাদের বিশ্বাস অকুণ্ঠ।

শেলির "One word is too often Profaned" শীর্ষক কবিতার অনুবাদ

[নীরেন্দ্রনাথ রায় কবিতাটির অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে সংশোধনের জন্য পাঠান। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ যে কবিতা ও পত্র প্রেরণ করেন তাহা মূল অনুবাদ সহ নিম্নে প্রদত্ত হইল]

নীরেন্দ্রনাথ রায়ের অনুবাদ

একটি কথা লোকে এত করে কলুষিত,
আমি তাহা করিব না আর ;
একটি অনুভূতি এত বৃথাই হেলিত,
তারে হেলা অযোগ্য তোমার ;
একটি আশা নিরাশার এ-হেন আত্মীয়,
বিবেচনা রোধে না ক তায় ;
তব অনুকম্পা মোর তারো চেয়ে প্রিয়,
প্রেম যদি দেয় অপরায়।

লোকে যারে প্রেম বলে নাহি দিব আমি ;
করিবেনা তুমি কি গ্রহণ
হৃদয়ের যে-অর্চ্চনা ঊর্দ্ধলোকগামী,
দেবতাও করেনা বর্জ্জন ;
দূর তরকার লাগি পতঙ্গের তৃষা,
ঊষা লাগি নিশার কামনা,
বেদনিত বিশ্ব হতে বহু দূরে মিশা
যে-মাধুরী তার আরাধনা ?

রবীন্দ্রনাথের পত্র ও কবিতা

······রেলগাড়ীতে বসে নাড়া খেতে খেতে খেতে শেলির সেই তর্জমাটি নিয়ে নাড়াচাড়া করচি। তুমি যে লাইন ক'টি দিয়েছিলে তার উপর ভূমিকম্প হয়ে গেল—তাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেছিলেম কিন্তু তার ছন্দটির বহর খাটো বলে তার মধ্যে পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া গেল না। মূলের ভাবটাকে বাংলায় যথাসাধ্য বোধগম্য করিতে গেলে একেবারে ঠিক তার মাপসই করে আঁট করা চলে না। তাই প্রতিরূপ না হয়ে কতকটা অনুরূপ হয়েচে। মূল কবিতার সঙ্গে যাদের পরিচয় নেই, এটা যে তারা জলের মতো বুঝবে এমন আশা নেই, কিন্তু সে জন্যে আমি বা বাংলা ভাষাই একমাত্র দায়ী তা মানতে পারিনে। বস্তুত প্রথম শ্লোকের শেষ দুটো লাইন ঠিক যেন জায়গা পায়নি—যেন আরেক জনের কেদারার হাতার উপর বসেচে।—সময় আয়ত্তে নেই অতএব ইতি
জুলাই ২০, ১৯৩১

একটি কথা বারেবারেই পেয়েছে লাঘবতা,
তাহারে লঘু করিবনাকো আর।
দিনে দিনেই সয়েছে হেলা একটি মনোব্যথা,
অবমাননা কোরোনা তুমি তার।
একটি আশা নৈরাশ্যেরি নিকট আত্মীয়,
তারেও দলি' করিবে খান্ খান্ ?
তোমার অনুকম্পাটুকু যেমন মোর প্রিয়
তেমন নহে আর কাহারো দান॥
প্রেমের নামে লোকে যা দেয় দিব না তাহা আমি,

লবে না কিগো আমার নিবেদন—
নিম্ন হতে যে-অর্চ্চনা ঊর্দ্ধলোকগামী—
দেবতা যারে করেনা বর্জ্জন ;
তারার লাগি পতঙ্গ যে-আশায় মরে ঘুরে,
ঊষার লাগি নিশার যে-সাধনা—
পীড়িত এই মর্ত্ত্য হতে যা আছে বহুদূরে
তাহারি লাগি যে-পূজা আরাধনা ?

*   *   *   *

One word is too often profaned
For me to profane it,
One feeling too falsely disdain'd
For thee to disdain it.

One hope is too like despair
For prudence to smother,
And Pity from thee more dear
Than that from another.

I can give not what men call love ;
But wilt thou accept not
The worship the heart lifts above
And the Heavens reject not :
The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something afar
From the sphere of our sorrow ?

P. B. Shelley.

শেকসপীয়র প্রসঙ্গে

॥ এক ॥

শেকসপীয়র-এর জীবনকাহিনী ও সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ও পুষ্ট-কলেবর গ্রন্থের বাংলা ভাষায় প্রণয়ন নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই দুর্গম পথে প্রথম দুঃসাহসিক পদক্ষেপের ঐতিহাসিক সম্মান শ্রীঋষি দাসের অবশ্য প্রাপ্য।*

ভাবিতে অবাক লাগে ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে কোনো বাঙালী লেখক এই প্রচেষ্টায় অগ্রণী হন নাই। কারণ, শেকসপীয়র সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর উন্মাদনা ও উৎসাহ সাম্প্রতিক ব্যাপার নহে। শেকসপীয়র ইংরেজি সাহিত্যের মুকুটমণি। যদি কোনো ইংরেজকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে ভারতসাম্রাজ্য ও শেকসপীয়র, এ দুটির মধ্যে কোন্‌টি সে বাছিয়া লইবে তাহা হইলে, কার্লাইল বলিতেন, যে শেকসপীয়রেরই জয় হইবে। এই সিদ্ধান্তের বাস্তবতা কতটুকু তাহা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু ইহা নিশ্চিত সত্য যে ভারতবাসীকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া প্রতিদানে যে উপকারটুকু ইংরেজ নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও করিয়াছিল, শেকসপীয়রের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় তাহার শ্রেষ্ঠাংশ। মনে পড়ে ছাত্র বয়সে মধুসূদনের অংক কষিবার আপ্রাণ প্রয়াস—সহপাঠীদের নিকট প্রমাণ করিতে হইবে, শেকসপীয়র নিউটন অপেক্ষাও বড়,

* শ্রীঋষিদাস প্রণীত শেকসপীয়র।

তিনি ইচ্ছা করিলে নিউটন হইতে পারিতেন, কিন্তু নিউটনের পক্ষে শেকসপীয়র হওয়া অসম্ভব। মধুসূদন ছিলেন ডি. এল রিচার্ডসনের ভক্তিমুগ্ধ শিষ্য, গুরুর হাতের-লেখাটি পর্যন্ত অনুকরণ না করিলে তিনি স্বস্তি পাইতেন না। রিচার্ডসনের শেকসপীয়র পাঠন লর্ড মেকলে-কেও বিস্মিত করিয়াছিল, আর হিন্দু কলেজে গ্যালারীতে (এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গ্যালারীটিকে ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে বর্তমান হিন্দু স্কুলের স্থান সংকুলানের জন্য !) বসিয়া মধুসূদন সেই শিক্ষকতার প্রেরণা দিনের পর দিন লাভ করিতেন। ইংরেজি সাহিত্য অধ্যাপনার যে উচ্চ আদর্শ রিচার্ডসন স্থাপন করেন তাহার প্রভাব ছিল শতাব্দীব্যাপী। বাংলা দেশে শেকসপীয়র-অধ্যাপনার শ্রেষ্ঠ অবদান চট্টগ্রামের কৃষ্ণকায় সন্তান, এইচ. এম. পার্সিভাল। বহু বৎসর ধরিয়া বাঙালী ছাত্রদের নিকট শেকসপীয়রের নাট্যরস তিনি যেভাবে পরিবেশন করিতেন সে ধারা এখনও মোটামুটি অব্যাহত আছে। তাঁহার অনেক উক্তি গুরুপরম্পরাক্রমে আজিও অধ্যাপক মহলে সুপ্রচলিত। শেকসপীয়রের প্রতি উপেক্ষা নয়, তাঁহার অভ্রংলিহ প্রতিভা সম্বন্ধে ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধাই শিক্ষিত বাঙালীকে এই বিষয়ে লেখনী ধারণে বিরত রাখিয়াছে।

তবুও স্বীকার করিতে হইবে এই সুদীর্ঘ শেকসপীয়র-চর্চা বাংলাদেশে অনেকাংশে বন্ধ্যা। শেকসপীয়র জাতিতে ইংরেজ হইলেও তাঁহার রচিত নাটকাবলী বিশ্বমানবের উত্তরাধিকার। সকল সভ্য দেশেই শেকসপীয়র সম্বন্ধে আলোচনা ও গবেষণা সযত্নে পরিচালিত হয়। শেকসপীয়র সম্বন্ধে যে বিপুল সাহিত্য গড়িয়াছে তাহা প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক। কিন্তু এই মুক্তদ্বার জ্ঞানযজ্ঞে বাঙালী অধ্যাপকের আসন খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। যুগ যুগ ধরিয়া বাঙালী পাঠক শেকসপীয়রের বাক্যাবলী মুখস্থ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার নাট্য-প্রতিভার রহস্যকে আয়ত্ত করার উদ্যম করে নাই, বা করিতে সাহস করে নাই।

বাংলাদেশে শেকসপীয়র চর্চার বন্ধ্যাত্বের অন্যতম নিদর্শন, বাংলা নাট্য-সাহিত্যের দীনতা। আধুনিক যুগের বাংলা নাট্যকারেরা সকলেই শেকসপীয়রের সহিত সমধিক পরিচিত। মাইকেলের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। দীনবন্ধু, গিরীশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল ও রবীন্দ্রনাথ—নাট্য রচনায় ইঁহারা কি এমন কোনো নাটক রচনা করিতে পারিয়াছেন যাহা শেকসপীয়রের নাটকের সহিত তুলিত হইবার যোগ্য? অথচ গ্যেটে, হুগো, পুশকিন ও ইবসেন সসম্মানে এ গৌরব দাবি করিতে পারেন। তাহার কারণ, ফ্রান্স, জার্মানি,

রুশিয়া প্রভৃতি দেশে শেকসপীয়র-সাহিত্য জাতীয় সংস্কৃতির অপরিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের সাহিত্যে শেকসপীয়রের অনুকরণ আছে, অনুসরণ আছে, নাই সাঙ্গীকরণ। শেকসপীয়রের রচিত সাহিত্য অতি গুরুভোজ। তাহাকে জারিত করা আমাদের মন্দাগ্নি জাতীয় জীবনের পক্ষে ছিল সাধ্যাতীত। তাই শেকসপীয়রকে আমরা শ্রদ্ধা করিয়াছি দূরে হইতে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সমগোত্রীয় হইবার আস্পৃহা আমাদের জাতীয় জীবনে জাগে নাই।

শেকসপীয়রকে সাঙ্গীকরণের প্রকৃষ্ট উপায় তাঁহার রচনাবলীর, বিশেষ করিয়া তাঁহার নাটকাবলীর, উপযুক্ত অনুবাদ। বিভিন্ন স্বাধীন সভ্য দেশের সাহিত্য শেকসপীয়রের অনুবাদের সমৃদ্ধ। কর্তব্যের খাতিরে কোনক্রমে একটি অনুবাদ করিয়াই এই সব দেশ ক্ষান্ত হয় নাই, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন লেখক দিয়া বিভিন্ন পদ্ধতিতে অনুবাদ করিয়া শেকসপীয়রের প্রতিভাকে নিজ মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে প্রতিফলনের চেষ্টা অবিরাম চলিয়াছে। আর আমাদের দেশে যেখানে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় হইতে শেকসপীয়র-রচনার কিয়দংশ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য, সেখানে একটি নির্ভরযোগ্য গদ্য অনুবাদও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। ইহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত শিক্ষা মানেই ইংরেজি শিক্ষা। যে বাঙালী ইংরেজি জানে না সে কেবল একটি বিশেষ ভাষার জ্ঞান হইতে বঞ্চিত তাই নয়, সমস্ত জ্ঞানের দ্বারই তাহার নিকট অবরুদ্ধ। কলেজ ইত্যাদিতে শেকসপীয়র পঠন-পাঠন হয় পরিপূর্ণ ইংরেজিতে। সুতরাং সাধারণ বাঙালী পাঠক বলিয়া যদি কেহ থাকে তাহার উপকারার্থে শেকসপীয়রকে যথাযোগ্য ভাবে অনুবাদ করার দায়িত্ব এ পর্যন্ত অবহেলিত হইয়া রহিয়াছে। ফলে বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ বিভাগ অতি অবজ্ঞেয়।

জাতীয় সংস্কৃতির আর একটি প্রধান বিভাগ জাতীয় রঙ্গমঞ্চ। বাংলা কাব্যসাহিত্যে আধুনিক ভাবগঙ্গার ভগীরথ মাইকেল মধুসূদন এ সম্বন্ধে যে কিরূপ আগ্রহবান ছিলেন তাহা সকলেরই জানা। কিন্তু তাঁহার চেষ্টার পরিণাম হইল পেশাদারী থিয়েটারে, শিক্ষাভিমানী বাঙালী যাহাকে কখনই মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারে নাই। বাংলা দেশে নাটকের পাঠন ও অভিনয় দুইটি ভিন্ন খাতে বহিয়া চলিল, ফলে দুইটি স্রোতই হইল ক্ষীণপ্রাণ, শেকসপীয়রের নাটক পঠিত হইতে লাগিল কাব্যরূপে, ব্যক্তিগত উপভোগের উৎসরূপে। নাটকের যাহা প্রাণবস্তু—সমবেত প্রচেষ্টা, বাস্তব রূপায়ণ, দর্শক ও অভিনেতার প্রত্যক্ষ

সংযোগ—তাহারা হইল উপেক্ষিত। স্কুলে-কলেজে উৎসব উপলক্ষে ছেলে-মানুষি আবৃত্তি ও খণ্ডিত দৃশ্যাবিশেষের অপটু অভিনয়ে চলিল দুধের স্বাদ মেটানো। আর রঙ্গমঞ্চে চলিল শেকসপীয়রের কোনো কোনো চরিত্র বা ঘটনা সংস্থানের আত্মসাৎ প্রচেষ্টা, যাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পর্যবসিত হইল নাটক না হইয়া নাটুকে-পনায়। ম্যাকবেথ ও ওথেলো বাংলা অনুবাদে মঞ্চস্থ হইয়াও জনপ্রিয় হইতে পারিল না, ইহা লজ্জার কথা হইলেও বিস্ময়ের কথা নহে। বিস্ময়ের কথা এই যে তখনকার পরিবেশে এইরূপ প্রচেষ্টার দুঃসাহস কাহারো পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল। বিস্ময়ের কথা এই যে শেকসপীয়রীয় নাটকের যথা-যোগ্য অভিনয় ও প্রযোজনা এ দেশে বসিয়া দেখিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াও শিক্ষিত বাঙালী সিনেমার পর্দায় লরেন্স ওলিভিয়ারএর হ্যামলেটকেও বিনা সমালোচনায় গ্রহণ করে না, অরসন ওয়েলস্-এর ম্যাকবেথ দেখিয়া প্রশ্ন করে শেকসপীয়রের মাহাত্ম্য কি ইংরেজি-ভাষী জগৎ হইতে বিলুপ্ত হইতে চলিল। ঋষি দাসের সম্প্রতি প্রকাশিত জীবনী-গ্রন্থও প্রমাণ করে যে বাঙালীর সাহিত্য-বিবেক সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ও নির্বাক নয়।

॥ দুই ॥

এযুগে শেকসপীয়র আলোচনায় নূতন প্রবেশার্থীকে প্রথমেই কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়—বিশেষত ঋষি দাসের মতো যিনি এমন ভাষায় লিখিতেছেন যাহাতে পূর্বে এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা হয় নাই। শেকসপীয়র এখন আর ব্যক্তিবিশেষ নহেন, তিনি একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান। সাহিত্য জগতে তিনি এমন একজন দেবতা, যাহাকে কেবল পূজা করাই চলে, বিচার করা অশাস্ত্রীয়। স্ট্রীণ্ডবার্গ তাই একবার বলিয়াছিলেন,—ঈশ্বরকে অস্বীকার করা যায়, শেকসপীয়রকে অসম্ভব। কত ভক্তের জীবনব্যাপী সাধনায় শেকসপীয়রীয় সাহিত্য সমৃদ্ধ। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ, উভয়বিধ সাধনার কত না পদ্ধতি, কত না প্রকরণ। কেহ বা খুঁজিয়াছেন বিগ্রহের জীবন বৃত্তান্তের তুচ্ছতম খুঁটিনাটি, কেহ বা তাঁহার রচিত সাহিত্যের দিন-ক্ষণ-তারিখ নির্ধারণ, কেহ বা তাঁহার যুগের সাহিত্যিক ও সামাজিক পরিবেশের তথ্যসংগ্রহ, কেহ বা তাঁহার শব্দ ও ছন্দ প্রয়োগের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য, কেহ বা তাঁহার অভূতপূর্ব প্রতিভার পরিমাপ। সুতরাং লিখিতে বসিয়া নূতন প্রবেশার্থীকে উপকরণের অভাব অনুভব করিতে হয় না। শেকসপীয়র নামের বানান ঠিক কি হইবে এই সম্বন্ধে

এত গবেষণা হইয়াছে যে তাহা লইয়াই একটি ছোটখাটো পুস্তিকা রচনা করা যাইতে পারে। শেকসপীয়রের জীবনীতে এইরূপ অনেক সমস্যার আলোচনা করিতেই হয়। বস্তুত তাঁহার জীবনচরিত অনেকাংশে জীবন-কাহিনী মাত্র; ভক্তির আতিশয্যে সামান্য তথ্যের বা তথ্যাভাবের উপর নির্ভর করিয়া অনেক প্রকাণ্ড সিদ্ধান্তের ইমারৎ গড়া হইয়াছে। শেকসপীয়রের নাটকাবলী সম্বন্ধেও, একদিকে যেমন সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন সমালোচকের অভিমত ও বিশ্লেষণ আছে, অন্য দিকে তেমনই আছে উদ্ভট উদ্ভাবনা ও উম্মত্ত বাগাড়ম্বর। এই ঘন অরণ্যানীর ভিতর দিয়া নিজের পথ কাটিয়া গন্তব্যে পৌঁছিতে পারাই নূতন লেখকের প্রধান সমস্যা।

আনন্দের কথা, ঋষি দাস এই সমস্যা সম্বন্ধে অমনোযোগী নহেন। তিনি জানেন জীবনীকার হিসাবে তাঁহার প্রধান কর্তব্য, তাঁহার বর্ণিত ব্যক্তিকে অসংখ্য তথ্যবহুলতার অস্পষ্টতায় না হারাইয়া, সুনিপুণ নির্বাচনের সহায়তায় একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রতিকৃতিতে ফোটাইয়া তোলা। আধুনিক জীবনীকারের সহিত আধুনিক পোর্ট্রেট-চিত্রকরের এইখানে যথেষ্ট মিল। নির্বাচন খুবই কঠিন হইয়া উঠে যদি জীবনীকারের বিষয়বস্তু হন এমন ব্যক্তি যিনি কেবল একক-মানুষ নহেন, যুগমানব। এই যুগমানব কবি বা শিল্পী হইলে জীবনীকারের কর্তব্য হয় আরো সুকঠিন। কারণ তখন তাঁহার পক্ষে কেবল ঘটনার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিলেই চলে না, কাব্য ও শিল্প সমালোনাতেও তাঁহাকে পারদর্শী হইতে হয়। সমালোচনা জীবন-দর্শনের অঙ্গ; একটি পরিপূর্ণ জীবনদর্শন না থাকিলে সমালোচক বৈজ্ঞানিক আলোচনার স্তরে উঠিতে পারেন না, তাঁহার মতামত কেবল ব্যক্তিগত মতামতই থাকিয়া যায়। শেকসপীয়রের নাটক সম্বন্ধে যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন ও করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই এই জীবনদর্শন সম্বন্ধে অচেতন। কোলরিজ, গোটে, ব্র্যাডলি-প্রমুখ যাঁহারা শেকসপীরীয় সমালোচক হিসাবে শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই মানসিক সংগঠন ছিল দার্শনিক। চিন্তারও ইতিহাস ও বিবর্তন আছে। হেগেলের পর তাহার শিষ্য হিসাবে মার্কস ও এঙ্গেলস গুরুর দর্শনকে ঢালিয়া সাজিয়া দার্শনিক জগতে যুগান্তর ঘটাইয়াছেন। বর্তমান কালে মার্কসবাদকে পরিহার করিয়া কোন কাব্য সমালোচনা সম্পূর্ণ ও সার্থক হইতে পারে না। আনন্দের কথা, ঋষি দাস এ সম্বন্ধে সম্যক অবহিতচিত্ত। তিনি একই সঙ্গে শেকসপীয়র-সাহিত্যেও সুপঠিত। সিডনে লী, ও এডমণ্ড চেম্বার্স হইতে জ্যাক লিণ্ডসে, জর্জ ও

টমসন ও সোভিয়েট অধ্যাপক স্মিরনভ-এর মতামতের সহিত তিনি ঘনিষ্টভাবে পরিচিত। তিনি জানেন যে শেকসপীয়রের কবিপ্রতিভাকে একদল একদেশদর্শী সমালোচক এমনভাবে চিত্রিত করেন যে শেকসপীয়র যেন দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ দৈবী ঘটনা, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নীতি যেন তাঁহার ক্ষেত্রে কোনক্রমেই প্রযোজ্য নহে। তাঁহাকে বলা হয় "চিরন্তন" মানুষের কবি যে "চিরন্তন" মানুষের প্রত্যয়কে ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অস্বীকার করে। তাই তিনি স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত নহেন যে ঃ

"অর্থনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই, কলার জন্যই কলা, এই সব কথা যাঁরা প্রচার করেন শেকসপীয়রের রচনার বিরুদ্ধ সুর না বাণীকে তাঁরা আদৌ বুঝতে পারেন না। হয় অনেক সময় শেকসপীয়রের রচনাকে শেকসপীয়রের রচনা বলতে তাঁরা ভয় পান ও নানারূপ অংশীদারি ও প্রক্ষেপের মনগড়া কাহিনী বানিয়ে তোলেন, নয়, শেকসপীয়রের সমগ্র রচনাকে একটা তালগোল পাকানো মহা সাহিত্য-পিণ্ড ভেবে ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠেন। আমরা কলার জন্য কলায় বিশ্বাস করি না। সুতরাং আর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিপ্রেক্ষিতেই শেকসপীয়রকে আমাদের বিচার করতে হবে। তাই ঐতিহাসিক সুবিস্তৃত পটভূমিকাকে শেকসপীয়রের জীবনে এমন অনিবার্যভাবে স্থান দিতে হল।

"রাণী এলিজাবেথ এবং রাজা জেমসের রাজত্বের ইতিহাসের পটভূমিকাতেই কেবল আমরা শেকসপীয়রের জীবন ও সাহিত্যকে বিচার করতে পারি। এই পটভূমিকা থেকে বিচ্যুত করে যাঁরা শেকসপীয়রকে দেখতে চাইবেন, বিচিত্র বর্ণায়িত শেকসপীয়রের সাহিত্যাকাশ তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য ও কুয়াশাচ্ছন্ন রয়ে যাবে।"

॥ তিন ॥

ঋষি দাস অগ্রসর হইয়াছেন আরম্ভ হইতে এই মূল প্রতিজ্ঞা সামনে রাখিয়া। তাঁহার পুস্তকের প্রথম পাঁচটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ, বলা যাইতে পারে এই পটভূমিকার বর্ণনাতেই ব্যাপৃত। প্রায় চারশত বছর আগের ইংলণ্ডের অবস্থা, নায়কের বাল্যজীবন, বিবাহ ও জন্মস্থান ত্যাগ, লণ্ডনে আসিয়া শিক্ষানবিশী, রাজধানীর রাষ্ট্রনৈতিক পরিবেশ, প্রাথমিক রচনাগুলির সময়-ক্রম,

সনেটের 'কৃষ্ণা মহিলা', নাট্যমঞ্চ ও নাটুকে দলগুলির পরস্পর সম্বন্ধ, 'মিন্ট্রী', 'মিরাকল্', 'মরালিটি' হইতে গ্রীন ও মার্লো পর্যন্ত পূর্বগামীদের প্রভাব, শেকসপীয়রের জীবনী রচনায় এই সব প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বিশেষ নিপুণতার সহিত সংগ্রথিত হইয়াছে। সর্বত্রই গ্রন্থকারের বিচারনিষ্ঠ মননশীলতার প্রয়োগের প্রয়াস দেখা যায়। সকললেই জানেন, যে যুগে শেকসপীয়রের জন্ম ও প্রতিভার বিকাশ, সে যুগের প্রধান লক্ষণ হইতেছে, সামন্তশ্রেণীর আধিপত্যের অবসান ও বণিক শ্রেণীর প্রভাবের প্রারম্ভ। ফিউডাল বুর্জোয়া এই দুই যুধ্যমান শ্রেণীর নিরন্তর সংঘর্ষই এই যুগের বৈশিষ্ট্যের প্রধান ও প্রকৃত নিয়ামক। শ্রেণী-সংগ্রামের এই পর্বে ইংলণ্ডের জনসাধারণের অবস্থা কি ছিল ও তাহাদের প্রতি শেকসপীয়রের মনোভাব ছিল কিরূপ, ইহা লইয়া অনেক সমালোচক মাথা ঘামাইয়াছেন। এই সম্পর্কে ঋষি দাসের মন্তব্যগুলি সুচিন্তিত ও উপভোগ্য।

"বুর্জোয়া সমালোচকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, শেকসপীয়রকে জনসাধারণের প্রতি বিরূপ ভাবাপন্ন বলে প্রতিপন্ন করতে। শেকসপীয়রের প্রথম যুগের ষষ্ঠ হেনরী নাটকের কৃষাণ বিপ্লবী জ্যাক কেডের বিদ্রূপাত্মক চরিত্র, বা টেমিং অব দি শ্রু নাটকের মাতাল ভবঘুরে শ্রমিক খৃস্টফার স্লাই-এর চরিত্র, বা করিওলেনাস নাটকে জনসাধারণের চরিত্রকে তাঁরা তাঁদের যুক্তির ব্রহ্মাস্ত্ররূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা যে কেবল সুবিধামত শেকসপীয়রের পরম জ্ঞানী 'ফুল'এর চরিত্রগুলিকে, হ্যামলেট নাটকের কবর-খোঁড়া শ্রমিক ও দ্বিতীয় রিচার্ড নাটকের মালীর চরিত্রগুলিকে কিংবা শেকসপীয়রের শেষ যুগের নাটক পেরিক্লিসের ধীবরদের চরিত্রগুলিকে এড়িয়ে গেছেন তাই নয়, তাঁরা করিওলেনাস নাটকের জনসাধারণের চরিত্রকেও বিকৃতভাবে করেছেন ব্যাখ্যা। তাঁদের মতে, করিওলেনাসের ট্র্যাজিডির আসল উদ্দেশ্য হল জনসাধারণকে খাটো করে দেখানো অথচ বাস্তবিকপক্ষে যাঁরা দুই চোখ খুলে করিওলেনাস নাটকখানি পড়বেন, তাঁরাই লক্ষ্য করবেন ঐ নাটকের জনসাধারণ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, রাজনীতিক চেতনা তাদের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বর্তমান। করিওলেনাস নাটকের জনসাধারণ বা নাগরিকরা আর্থনীতিক ও রাজনীতিক বিচার-বুদ্ধিতে সুসম্পন্ন। ধনিক সভ্যতার দ্বন্দ্বশীল রূপ সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ সচেতন। করিওলেনাস নাটকের প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে আমরা প্রথম নাগরিককে মন্তব্য করতে শুনি, ধনীর ঐশ্বর্য ও দারিদ্রের নিঃস্বতার নিবিড় সম্পর্ক সম্বন্ধে

...The leanness that affects us, the object of our misery, is an inventory to particularise their abundance; our sufferance is a gain to them, তাই শ্রেণী সংগ্রামের অমোঘ সত্যকে সে প্রকাশ করে ঃ Let us revenge this with our pikes ere we become rakes; for the gods know I speak this in hunger for bread not in thirst for revenge. জনসাধারণের প্রতি ধনীদের মনোভাবটা কেমন তাই সে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে ঃ They never cared for us yet. Suffer us to famish, and their store-houses are crammed with grain; make edicts for usury, to support usurers; repeal daily any wholesome act established against the rich, and provide more piercing statutes daily, to chair up and restrain the poor. If the wars eat us not up, they will; and there's all the love they bear us। এ উক্তি যে ইংলণ্ডের ধনিকদের লক্ষ্য করেই শেকসপীয়র করেছিলেন, তা বলাই বাহুল্য।"

গ্রন্থকার অন্যত্র লিখিতেছেন ঃ

"জ্যাক কেড বা জুলিয়াস সীজারের কয়েকটি দৃশ্যে শেকসপীয়র জনসাধারণকে যে রাজনীতিক বুদ্ধিতে অবিচক্ষণ করে চিত্রিত করেছিলেন, তা তাঁর সমকালীন পরিপার্শ্বে প্রগতিশীলতারই লক্ষণ ছিল। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে কৃষকদের অসন্তোষের বিস্ফোরণকে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়াররূপে ব্যবহার করেছিল। তাই জনসাধারণের রাজনীতিক বুদ্ধি সম্পর্কে শেকসপীয়র প্রগতির প্রতিনিধিরূপে অসহিষ্ণু না হয়ে পারেন নি। জনসাধারণের রাজনীতিক বুদ্ধির অপরিপক্কতা সম্পর্কে শেকসপীয়রের এই অসহিষ্ণুতা শেকসপীয়রকে জনসাধারণের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ বলে প্রমাণ করে না। শেকসপীয়র কৃষাণ ও শ্রমিকের বিপ্লবী শক্তির প্রতি আস্থাবান না হলেও, তাদের প্রতি তাঁর যেমন ছিল স্নেহ ও সহানুভূতি, তেমনি ছিল তাদের প্রগাঢ় জ্ঞান ও প্রশান্ত প্রজ্ঞা সম্পর্কে তাঁর সচেতন সতর্কতা।"

জনসাধারণের রাজনীতিক বুদ্ধি সম্পর্কে শেকসপীয়রের উচ্চ ধারণা না থাকার কারণ হিসাবে ঋষি দাস বলেন, "যে শ্রমিক শ্রেণী একদা বিপ্লবের নেতৃত্ব করবে, শেকসপীয়রের কালে সেই শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম হয়নি; সুতরাং আজকে আমরা শ্রমিক শক্তির যে বিপ্লবী প্রচণ্ডতাকে অতি সহজে উপলব্ধি করছি,

শেকসপীয়রের মত অসামান্য প্রতিভার পক্ষেও তা সেদিন সম্ভব ছিল না। এ-টি শেকসপীয়রের কালের নির্ভুল প্রকাশ মাত্র।”

॥ চার ॥

শেকসপীয়রের জীবন-চরিত লিখিতে বসিয়া তাঁহার জীবনের নানাবিধ কার্যাবলী ও তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে নানাবিধ বহিরঙ্গ প্রশ্নের বিচার না করিয়া উপায় নাই। তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে শেকসপীয়রের আলোকসামান্য প্রতিভার ও নাট্যকার হিসাবে তাঁহার অসাপত্ন্য প্রতিষ্ঠার মর্মকথা বিশ্লেষণ না করিলে মূল কর্তব্য অসম্পাদিত থাকিয়া যায়। বস্তুত এইখানেই শেকসপীয়র আলোচকের প্রকৃত পরীক্ষা। অনেক মার্কসবাদী এই পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সাফল্য অনেকাংশে তর্কাধীন। আলোচ্য গ্রন্থে ঋষি দাসও এমন অনেক উক্তি ও সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যাহা বিনা-বিচারে গ্রহণ করা কঠিন। এই বৃহদাকার গ্রন্থে তাঁহার যতগুলি উক্তিতে আপত্তি করা যায়, তাহাদের সকলের বিচার একটি প্রবন্ধে সম্ভব নহে। কিন্তু কয়েকটি মূল প্রস্তাবের আলোচনা না করিলে তাঁহার গ্রন্থের প্রতি অবিচার করা হইবে।

“শেকসপীয়রের মানসিক গঠনটা ছিল আধাগ্রাম্য, আধা-শহুরে, আধা-বণিক, আধা-চাষাড়েঃ part-bourgeois, part-peasant। আবার, শেকসপীয়রের মানসিক গঠনের এই বণিক-নাগরিক দিকটাও ছিল দ্বিধা-বিভক্তঃ একভাগে ছিল অর্থলিপ্সুতা, অর্থপ্রিয়তা, কুশীদজীবিতা; অন্যদিকে ছিল উদার মানবিকতা, অর্থতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিপুল বিক্ষোভ, শোষক ও শোষিতের দ্বিধা বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রতি প্রগাঢ় ঘৃণা ও দুর্বার আক্রোশ। শেকসপীয়রের মধ্যে ধনলিপ্সু, ক্ষমতালিপ্সু উচ্চাকাঙ্ক্ষী এই বুর্জোয়ার দিকটা তাঁর নাটকগুলিতে জারজ ফিলিপ ফকনব্রীজের মধ্যে শুরু হয়ে হ্যারি পার্সি বা হটস্‌পারের মধ্যে দিয়ে ম্যাকবেথের চরিত্রের মধ্যে পরিণতি লাভ করেছিল। এই চরিত্রগুলি যে শেকপীয়রের আত্মার অতীব আত্মীয় তা স্পষ্টই বোঝা যায় ঐ চরিত্রগুলির প্রতি তাঁর অপরিমিত স্নেহ ও করুণা দেখে। অপর পক্ষে অর্থতন্ত্রের প্রতি ঘৃণাপরায়ণ বুর্জোয়া মানবিকতার দিকটা শেকসপীয়রের নাটকে রোমিও এবং বিষণ্ণ জেকসের মধ্যে জন্মলাভ করে হ্যামলেটের মধ্যে দিয়ে টিমন অব আথেন্সর উন্মত্ত বিদ্রোহে এবং টেম্পেস্ট নাটকের বুর্জোয়া সমাজ-

বিরোধী পলায়নের মধ্যে গিয়ে অব্যর্থ পরিণতি লাভ করেছিল।…বস্তুত পক্ষে শেকসপীয়রের এই বিপরীতধর্মী দুইটি দিকই শেকসপীয়রের আসল পরিচয়। তিনি স্বার্থলোভী, অর্থগৃধ্ন বুর্জোয়া, এবং সেই সঙ্গে তিনি অর্থবিদ্বেষী উদার মানবিকতার পূজারী।…চিন্তায় মৃগয়ার প্রতি ঘৃণা এবং কার্যত মৃগয়া-প্রবলতা শেকসপীয়রের দ্বিধাবিভক্ত সত্তার অন্যতম উদাহরণ। **শেকসপীয়রের মধ্যে এই স্বভাবসিদ্ধ বিরুদ্ধতাই তাঁকে শ্রেষ্ঠ নাট্যকারে একদা পরিণত করেছিল।"** (বড় হরফ আমার)

এই মূলসূত্র অবলম্বনে ঋষি দাস বুঝাইতেছেন, শেকসপীয়রের নাটকগুলি প্রধানত তাঁহারই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার, ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিচ্ছায়া। যেমন, আর্ল অব এসেক্স ছিলেন শেকসপীয়রের গুণগ্রাহী পৃষ্ঠপোষক। তাই তার ব্যর্থ বিদ্রোহ ও শোচনীয় মৃত্যুই একদা শেকসপীয়রকে তাঁর হ্যামলেট রচনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, এবং "শেকসপীয়র হ্যামলেট নাটকে সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে মানবিকতাবাদী শক্তিহীন ব্যর্থ বুর্জোয়ার যে আস্ফালন চিত্রিত করেছিলেন, আর্ল অব এসেক্স-এর জীবনকে তারই prototype বলা যায়।" "শেকসপীয়র ছিলেন এসেক্স সাদাম্পটন প্রভৃতি শ্রেণীচ্যুত সামন্ত বুর্জোয়াদের মুখপাত্র। এবং মানবিকতাবাদের যুগে বস্তুতপক্ষে এসেক্স, সাদাম্পটন প্রভৃতি ব্যক্তিরাই ছিলেন আদর্শ নায়ক।" শেকসপীয়র তাঁর "অধিকাংশ নাটকে দুই শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। কতকগুলি সামন্ততান্ত্রিক এবং কতকগুলি বুর্জোয়া গুণসম্পন্ন।" তাঁহার মতে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রগুলি 'নেগেটিভ', তাহাদের ভাষা আড়ম্বরপূর্ণ, আঁকাবাঁকা, তা যেন সত্যকে সহজে স্পর্শ করে না। অন্য পক্ষে উদীয়মান বুর্জোয়া গুণসম্পন্ন চরিত্রগুলি 'পজিটিভ', তাহাদের ভাষা সরল ও সংযত।

এই যুক্তিধারা অনুসরণে ঋষি দাস এমন কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যাহা সাহিত্যের ছাত্র হিসাবে আমাদিগকে সচকিত করিয়া তোলে। তাঁহার মতে, শেকসপীয়রীর নাটকে 'ফুল' বা ক্লাউনের চরিত্রগুলি **সর্বদাই** 'পজিটিভ', সেগুলি শেকসপীয়রের **সর্বশ্রেষ্ঠ** মুখপাত্র। অর্থাৎ আমাদিগকে বুঝিতে হইবে শেকসপীয়রের মনের কথা, ব্রুটাস, হ্যামলেট বা প্রসপেরো-র চরিত্রে তেমন প্রকাশ পায় নাই যেমন পাইয়াছে টাচস্টোনে বা লিয়রের 'ফুল'-এ। অ্যাজ উই লাইক ইট নাটকের বিচারে তিনি বলিতেছেনঃ "শেকসপীয়রের জীবনের একটি নিগূঢ় অংশের সঙ্গে জেকসের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল, তা

নিঃসংশয়ে স্বীকার করতেই হয়। জেক্‌স-এর All the world's a stage ইত্যাদি কথাগুলি শেকসপীয়রের মুখেই শোভা পায়। যে চরিত্রের প্রতি শেকসপীয়রের সমর্থন বা সহানুভূতি নেই, সেই সব নেগেটিভ চরিত্রের মুখে তিনি কখনো **এমন সুন্দর উক্তি** দিতেন না।" অথচ শেকসপীয়রের কাব্যপাঠক কলেজের ছাত্ররা পর্যন্ত জানে যে, এই "সুন্দর উক্তি" মোটেই শেকসপীয়রের স্বগতোক্তি নহে, ইহার মধ্যে মানবিকতার নাম-গন্ধ নাই; ইহা হইতেছে একজন স্বেচ্ছাচারী লম্পটের ব্যর্থ জীবনের সমাজবিরোধী, সিনিক্যাল, মক্ষিকা-বৃত্তিসুলভ উক্তি। বস্তুত ঋষি দাস জেকুইজ-এর চরিত্রটি, এমন কি সমগ্র নাটকখানিকে আগাগোড়া ভুল বুঝিয়াছেন। এই নাটকে মানবিকতার প্রতিরূপ জেকুইজ নহে,—রোজালিণ্ড, ওর্লাণ্ডো ও কিছুটা পরিমাণে জ্যেষ্ঠ ডিউক। অনুরূপভাবে, তিনি ইয়াগো ও ক্লিওপাট্রা চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণ বিকৃত করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহার বিচারে ইয়াগো কেবলমাত্র স্বার্থলোভী, সংকীর্ণচেতা, ধূর্ত ও ভণ্ড। ইয়াগো-চরিত্রের সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ এখানে করা চলে না। তবে একটি প্রশ্নই বোধ হয় যথেষ্ট। শেকস-পীয়রের কল্পনায় ইয়াগো যদি কেবলমাত্র ধূর্ত ও ভণ্ড হইত তাহা হইলে ওথেলোর ট্রাজেডি অত করুণ হইত কি? ক্লিওপাট্রা সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত আরো চমকপ্রদ। "অ্যাণ্টনি যে ক্লিওপাট্রার কাছে বাঁধা পড়েছিল, তার জন্যে ক্লিওপাট্রার কোনো বিশেষ শক্তি বা গুণ দায়ী ছিল না, তার জন্যে দায়ী ছিল মার্ক অ্যাণ্টনির নিজের চরিত্রগত দুর্বলতা। শেকসপীয়র এই কথাই বলতে চেয়েছিলেন। এবং তাঁর যুক্তিকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করার জন্যেই তিনি ক্লিওপাট্রাকে **সাধারণ রমণী মাত্র** করে চিত্রিত করেছিলেন। প্লুটার্কের সেই 'rare Egyptian'-কে তিনি রূপায়িত করেননি।"

কিং লিয়র নাটক সম্বন্ধে তাঁহার বিচারও কম কৌতুকপ্রদ নহে। "শেকস-পীয়র রাজা জেমসের নাট্যদলেই অভিনয় করতেন। তাঁকে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের কালের বুর্জোয়া সমাজের স্বার্থপরতা ভণ্ডামি ও স্বেচ্ছাচারের অংগমাত্র ভাবতে শেকসপীয়রের বাধলো। তিনি সম্ভবত ভাবলেন, কিছু হিতোপদেশ কিছু সতর্কবাণী দিয়ে রাজা জেমসকে তাঁর পারিপার্শ্বিক পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে আদর্শ রাজায় পরিণত করতে। এমনি যখন শেকপীয়রের মনোভাব তখনই তিনি লেখেন তাঁর কিং লিয়র নাটক। নাটকের গোড়াতে দেখা যায় রাজা লিয়র তাঁর বার্ধক্যজনিত খেয়াল বশে তাঁর রাজ্যকে খণ্ডিত করছেন।

এটি এক দিকে যেমন অশক্ত শোষকের স্বৈরাচারিতাকে প্রকাশ করে তেমনি শেকসপীয়রের যুগের অখণ্ড রাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদী আদর্শকেও করে বিনষ্ট। সুতরাং গোড়ার দিকে লিয়র লেখকের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি লাভ করেন না এবং আমাদের বিরক্তি ও বিরুদ্ধতাকে জাগিয়ে তোলেন। তখন তিনি সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়ার প্রতিনিধি। কিন্তু রাজ্য বণ্টনের পরে রাজ্যহীন লিয়রের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে গুণগত একটি পার্থক্য ঘটে। তিনি সাধারণতম মানুষের, তাঁর দরিদ্রতম প্রজার সগোত্র হয়ে পড়েন। এই ভাবে লিয়র শীঘ্রই শেকসপীয়রের মুখপাত্রে পরিণত হন ;" [সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি]

উপরের উদাহরণগুলি হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় না কি যে শেকসপীয়রের বিশ্ববন্দিত নাটকগুলির যে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা গ্রন্থকার দিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যা নহে,—অপব্যাখ্যা ? আসলে তাঁহার বস্তুবাদী বিচার পদ্ধতিতে থাকিয়া গিয়াছে প্রকাণ্ড গলদ। সুতরাং তাহার আলোচনা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

॥ পাঁচ ॥

সাহিত্য বিচারে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থনে ঋষি দাস একটি সুন্দর উপমায় বলিতেছেন, "সাহিত্য যেন বিমানপোত ; আকাশ পথে তার আনাগোনা ঘটে, কিন্তু তার তেলের ডিপোটা থাকে মাটিতে।" কিন্তু প্রশ্ন এই যে তেলের ডিপোটার সন্ধান জানিলেই কি বিমানপোতের আনাগোনার রহস্যভেদ করা যায় ? ভূমণ্ডলের মহাকর্ষ অতি বাস্তব ব্যাপার। তাহাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। মানুষ দীর্ঘ সাধনার ফলে এই আকর্ষণের প্রকৃতিকে করায়ত্ত করিয়া তবে তাহার আকাশে উড়িবার যুগযুগান্ত সঞ্চিত বাসনাকে চরিতার্থ করিতে পারিয়াছে। তাই বিমানপোতের উধর্বগতিকে বুঝিতে হইলে বিজ্ঞান-সাধনার মাধ্যমে মানুষের চেতনার ইতিহাসকে বুঝিতে হইবে। শেকসপীয়রের প্রধান নাটকগুলি বিমানপোতের মতই আকাশচারী। তাহাদের তেলের ডিপো নিশ্চয়ই তাহাদের সমকালীন আর্থনীতিক ও রাজনীতিক পরিপার্শ্ব, কিন্তু সেই যুগের চেতনার আলোড়নকে না বুঝিলে, নূতন চেতনার স্থিতি ও গতির রীতিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে করায়ত্ত না করিলে, শেকসপীয়রের নাট্য-প্রতিভার পরিমাপ করা যায় না।

যে যুগে শেকসপীয়রের জন্ম ও কর্মজীবন তাহাকে ইতিহাসে বলা হইয়া থাকে নবজাগৃতির যুগ, বা রিনেসাঁস। এ যুগের সাহিত্যিক চেতনার পূর্ণতম

বিকাশ শেকসপীয়রে। এই নবজাগ্রত চেতনার ব্যাপকতম বিশেষত্বগুলি কিভাবে শেকসপীয়রের রচনায় প্রতিফলিত, বস্তুবাদী পদ্ধতির সহায়তায় তাহার বিশ্লেষণ মার্কসবাদী সমালোচকের প্রধান কর্তব্য।

মাকর্স ও এঙ্গেলস তাঁহাদের বিবিধ গ্রন্থে নবজাগৃতির যুগের বৈপ্লবিক ভূমিকা বর্ণনা করিয়াছেন। ফিউডাল সামন্তবাদের গর্ভ হইতে কি ভাবে বুর্জোয়া ধনবাদ উদ্ভূত হইল, এই নূতন প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা কী ধরনের নূতন শ্রেণী-সংগ্রামের সৃষ্টি করিল, এই নূতন শ্রেণীসংগ্রাম সমাজব্যবস্থায় কিরূপ গতিবেগের সঞ্চার করিল, এই গতিবেগ কোন্ কোন্ বস্তুনিষ্ঠ নিয়মের শাসনাধীন, এই নিয়মগুলির প্রভাবে সামাজিক জীবনে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির ও শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর মিলন ও বিরোধের কিরূপ বঙ্কিম ও বন্ধুর পথ রচিত হইবে, যে পথের অবসান হইবে নূতনতর সমাজসৃষ্টির কর্মোদ্যমে ও নূতনতর সমাজের প্রতিষ্ঠায়—এইসব প্রশ্ন ছিল তাঁহাদের মানসজীবনের মূল লক্ষ্য। তাঁহাদের শিক্ষা হইতে জানা যায় যে "বিকাশের কোনো বিশেষস্তরে সমাজের আর্থনীতিক ব্যবস্থাই তাহার বনিয়াদ, আর তাহার উপরিতল হইতেছে রাজ-নৈতিক, কানুনিক, ধর্মাচারিক, শিল্পাচারিক ও দার্শনিক সমাজগত মতামত, এবং তাহাদের উপযোগী রাজনৈতিক, কানুনিক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি। প্রত্যেক বনিয়াদের উপযুক্ত উপরিতল আছে। ফিউডাল সমাজের বনিয়াদের উপযুক্ত উপরিতল ছিল,—তাহার রাজনৈতিক, কানুনিক ও অন্যান্য মতামত এবং তদুপযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ। ধনবাদী সমাজেরও নিজস্ব উপরিতল আছে, সমাজবাদী সমাজেরও আছে। বনিয়াদের পরিবর্তন বা অপসরণ ঘটিলে তাহার প্রভাবে উপরিতলেরও পরিবর্তন বা অপসরণ ঘটে; নূতন বনিয়াদের প্রতিষ্ঠা হইলে তাহার প্রভাবে নূতন উপরিতল আবির্ভূত হয়।" (স্টালিন) ["The foundation is the economic structure of society at the given stage of its development. The superstructrure is the poltitcal, legal, religious, artistic, philosophical views of society and the political, legal and other institutions corres-ponding to them. Every foundation has its own corressponding superstructure. The fouudation of the feudal system has its own superstructure, its political, legal and other views, and the corresponding institutions; the capitalist foundation has

its own superstructure, so has the socialist foundation. If the foundation changes or is eliminated, its superstructure changes or is eliminated in its wake, if a new foundation comes into being a superstructure corresponding to it arises in its wake." (Stalin)]

মার্কস ও এঙ্গেলস একাধিকবার নির্দেশ দিয়াছেন যে বনিয়াদ ও উপরি-তলের সম্বন্ধ মোটেই প্রত্যক্ষ নহে ; তাহার অস্তিত্ব নির্ধারণ করিতে হয় গভীর আলোচনায়, তাহা দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়—"শেষ বিশ্লেষণে।" সাহিত্য হইতেছে মূলত উপরিতলের ব্যাপার। যে সাহিত্য যত শ্রেষ্ঠ, সে-সাহিত্য সেই অনুপাতে বনিয়াদ হইতে ঊর্ধ্বে, সে-সাহিত্যে এই সম্বন্ধ নির্ণয় করা ততই দুরূহ। সাহিত্য হইতেছে সামাজিক চেতনার রূপময় প্রকাশ। সাহিত্যিকের মানস কেবল মুকুরের মত বাস্তবতাকে যথাযথ প্রতিবিম্বিত করে না, তাহাকে নানাবর্ণে রঞ্জিত করে, প্রিজম্-এর মতো। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সমাজ চেতনাকে যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে উপলব্ধি করেন, ও তাহাকে আঙ্গিকের কৌশলে এমনভাবে বিচিত্র-বর্ণে রূপায়িত করেন যে তাহা পাঠকের চিত্তে অনুরূপ সমাজ-চেতনার সঞ্চার করে। যে সাহিত্যিকের সমাজ-চেতনা দুর্বল তিনি আঙ্গিককুশলী হইলেও সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তি অর্জন করিতে পারেন না। আবার যাঁহার প্রবল সমাজ-চেতনা আঙ্গিকের শাসন মানে না, যিনি নিজের অনুভূতিকে পাঠকের চিত্তে সঞ্চার করিতে অসমর্থ, তাঁহার রচনাও সাহিত্য পদবাচ্য হইতে পারে না। সাহিত্যের মূল্যজ্ঞান এই দুইটি মেরুর মধ্যে সর্বদা আন্দোলিত হইতে থাকে। ইহার কোনো একটি মেরুকে বাদ দিলে আলোচনা অবৈজ্ঞানিক হইয়া পড়ে।

পণ্যোৎপাদন-পদ্ধতিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তনের ফলে সামন্তশ্রেণীর শক্তি-ক্ষয় ও বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তিবৃদ্ধি,—রিনেসাঁস ইংলণ্ডের ইহাই ছিল সামাজিক বনিয়াদ। এই বনিয়াদকে প্রত্যক্ষ ভাবে শেকসপীয়রের সাহিত্যে প্রতিফলিত দেখিবার দাবি করিলে মার্কসবাদের মূল প্রতিপাদ্যকে যান্ত্রিক ভাবে প্রয়োগ করা হয়। শেকসপীয়রের নাট্যপ্রতিভার বিকাশের ক্রমনির্ধারণ করিতে গিয়া ঋষি দাস লিখিতেছেন ঃ

"শেকসপীয়রের সমগ্র সাহিত্য-জীবনকে সংক্ষেপে বিচার করলে মোটামুটি কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় ঃ প্রথম যুগে, কমেডি ও ইতিহাসের যুগে, তিনি বুর্জোয়া অভ্যুত্থানের পক্ষে সামন্ততান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ;

দ্বিতীয় যুগে (ট্র্যাজেডির যুগে) তিনি একই সঙ্গে সামন্ততন্ত্র এবং বুর্জোয়া ভণ্ডামী ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান; তৃতীয় যুগে তিনি 'সিম্বেলাইন' ও 'উইণ্টার্স টেল'-এর রচনাকালে শত্রুপক্ষের সঙ্গে কতক পরিমাণে আপোস করেন, আক্রমণের তীব্রতাকে কমিয়ে ফেলেন ; কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন না. তাই অবশেষে 'টেম্পেস্টস' রচনার যুগে সংগ্রাম ত্যাগ করে তিনি অবসন্ন হতোৎসাহ সৈনিকের মত স্বপ্নবিলাসী হয়ে ওঠেন।

ঋষি দাস এই বক্তব্য সংগ্রহ করিয়াছেন স্মিরনভ-এর প্রবন্ধ হইতে। কিন্তু স্মিরনভ-এর এই বক্তব্য মার্কসবাদ-সম্মত কি না সে বিচারের প্রশ্ন তাঁহার মনে জাগে নাই। অথচ স্পষ্টতর দেখা যায় স্মিরনভ-এর বক্তব্যে শেকসপীয়রের নাট্যজীবনের বিকাশে নবজাগৃতির চেতনা-বিপ্লবের কোনো আভাসমাত্র পাওয়া যায় না। স্মিরনভ বনিয়াদের প্রশ্নকে উপরিতলের প্রশ্ন হইতে পৃথক রাখিতে পারেন না, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহার বিশ্লেষণ-অনুযায়ী বিচার করিলে কিছুতেই বোঝা যায় না কেন তিন শতাব্দীর উপর ধরিয়া বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা শেকসপীয়রের প্রভাবে প্রভাবিত ও তাঁহার মহিমাস্তবে অকুণ্ঠ।

॥ ছয় ॥

সামাজিক বনিয়াদে বিপ্লব ঘটিলে তাহার উপরিতলেও বিপ্লব না ঘটিয়া পারে না। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির বিরুদ্ধে ধনবাদী অর্থনীতির সংঘর্ষে মানব-সমাজের অগ্রগতির ইতিহাসে যে প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটিল, জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহার বিরাট অভিনবত্বকে বলা হইয়া থাকে নবজাগৃতি বা রিনেসাঁস। রিনেসাঁস-এর যুগ, বিপুল বৈপ্লবিক আলোড়নের যুগ। অধ্যাপক মারোজভ-এর ভাষায় বলা যায়, এ যুগ হইতেছে "মধ্যযুগে প্রচলিত মানবিক আচরণের অনড় প্রতিমানের বিরুদ্ধে মানবিক ব্যক্তি-সত্তার বিদ্রোহের যুগ।" [It was a rebellion of the human personality against the compulsory standards of behaviour prevalent in the Middle Ages.] নীতিশাস্ত্রের যে সমস্ত আদর্শ বহু শতাব্দী ধরিয়া চিরন্তন ও অক্ষয় বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল, ভূমিকম্পের মত এ যুগ তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিল। মানবিক প্রচেষ্টার বিভিন্ন ক্ষেত্রে—বিজ্ঞান ও শিল্পের ক্ষেত্রেও—অনেক মহাপুরুষ জন্মিলেন এই রিনেসাঁস যুগে, শেকসপীয়র তাঁহাদের অন্যতম। শেকসপীয়রের নাটকেই

ইয়োরোপীয় রিনেসাঁস-এর প্রকৃষ্টতম সাহিত্যিক প্রকাশ ; তাই শেকসপীয়র-সাহিত্য বিশ্ব-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ সাধনার ধন।

ইয়োরোপীয় রিনেসাঁস ইংলণ্ডের পরিবেশে একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। শেকসপীয়রের অনুরূপ প্রতিভা লইয়া কোনো কবি অন্য দেশে জন্মিলে তাঁহার পক্ষে শেকসপীয়রীয় নাটকাবলী রচনা করা সম্ভব হইত না। ইংলণ্ডের জাতীয় ইতিহাসই শেকসপীয়রের প্রতিভাকে উপযুক্তভাবে লালন করিতে পারিয়াছিল।

একটি অর্থনৈতিক বনিয়াদ উৎপাটিত করিয়া পরিবর্তে নূতন অর্থনৈতিক বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হইলে, এই নূতন বনিয়াদও তাহার নিজস্ব নিয়মে গতিশীল হইয়া উঠে। ধনবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই গতিশীলতার বিধিগুলিকে আবিষ্কার করিয়া তাহার স্বরূপকে বুঝিবার জন্য বৈজ্ঞানিক পন্থাকে মার্কস ও এঙ্গেলস ভবিষ্যৎ বংশীয়দের হাতে দিয়া গিয়াছেন। এই পন্থানুযায়ী বিচারে দেখা যায় রিনেসাঁস যুগের নূতন চেতনারও কতকগুলি বিশিষ্ট বিধি আছে। এই বিধিগুলি এ যুগের নানা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্তের মধ্যে যোগসূত্ররূপে নিহিত। শেকসপীয়র দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন কবি, সামাজিক সত্যতার সম্যক প্রতিফলনশীল অকপট বস্তুনিষ্ঠ কবি। এই সামাজিক সত্যতা যখন যেভাবে তাঁহার সংবেদনশীল মনে ছাপ ফেলিয়াছে তাকে তিনি আশ্চর্য শিল্পকুশলতার সহিত চিরদিনের মতো নাম-রূপের বন্ধনে বাঁধিতে পারিয়াছেন—ইহাই তাঁহার অনুপম কৃতিত্ব।

শেকসপীয়রের প্রথম পর্বের কমেডিগুলিতে দেখা যায় যৌবনসুলভ উচ্ছলতা। এ উচ্ছলতা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত যৌবনাবেগের প্রকাশ নহে, সমগ্র ইংরেজজাতি তখন যৌবন-বেদন-রসে ভরপুর, মাতাল বলিলেই হয়। মানুষের স্পর্ধিত বিক্রমের সামনে সম্ভব-অসম্ভবের সমস্ত ভেদ-রেখা যেন বিলীয়মান। কাল্পনিকতা ও কল্পনা—ফ্যান্সি ও ইম্যাজিনেশন—ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া আছে। তাই এই যুগের কমেডিগুলিতে দেখা যায় কাল্পনিকতাপ্রসূত আজগুবি পরিস্থিতির প্রাচুর্য ও অতিরঞ্জিত চরিত্রের আধিপত্য : লাভস্ লেবর লস্ট, কমেডি অব এররস, টু জেণ্টলমেন অব ভেরোনা, মিডসামার নাইটস ড্রীম প্রভৃতির কথা আপনা হইতেই মনে পড়ে। এই কমেডিগুলিতে আরো দেখা যায়, ভাষার প্রয়োগে লেখকের অসংযম। ল্যাটিনের শৃঙ্খলমুক্ত ইংরেজি ভাষা যেন আপন প্রকাশ-শক্তির উৎকট চাতুর্য-প্রদর্শনীতে প্রমত্ত। তাই এ পর্বের

প্রধান চরিত্রগুলি কথায় কথায় কথার খেলায় মাতিয়া ওঠে, সাধারণ গদ্যের চেয়ে এমন কি নাটকের মূল মাধ্যম অমিত্রাক্ষর ছন্দের চেয়ে, জটিল ছন্দোবন্ধ ভাষায় আপনাদিগকে প্রকাশ করিতে উদ্‌গ্রীব,—যদিও অনেক সময় এ প্রকাশ অপ্রকাশের নামান্তর হইয়া পড়ে।

কমেডিগুলির ঘটনা সংস্থানে জটিলতাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। মধ্যযুগীয় সমাজের অনড় সমাজবন্ধন ভাঙিয়া গিয়া নূতন যুগের জীবনযাত্রায় অসংখ্য জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা সাহিত্যে প্রকাশিত না হইয়া পারে না। তাই এ যুগের সাহিত্যের প্রধান বাহন হইল নাটক, যদিও তখন স্পেন্‌সার-এর মত শক্তিমান বর্ণনাকুশলী কবিরও আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, এ যুগের কমেডিগুলিতে শেকসপীয়র যে ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করিতেছিলেন তাহাতে তখনকার সমাজের প্রকৃত জটিলতা প্রতিফলিত হইতে পারে নাই। এই সব কমেডিতে জটিলতার সমাধান হয় কাল্পনিক উপায়ে, আকস্মিকভাবে। তাই এই সব কমেডিতে প্রকৃত নাটকীয় উৎকর্ষ উচ্চস্তরের নহে; তাহারা মূলত গীতিধর্মপ্রবণ ও আত্মকেন্দ্রিত।

প্রথম যুগের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে সামাজিক বাস্তবনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় অধিকতর পরিমাণে। তাহার প্রধান কারণ, তাহাদের নির্বাচিত বিষয়বস্তু। ঐতিহাসিক নাটকে লেখকের কল্পনার বিস্তার আপনা হইতেই সীমাবদ্ধ। আন্তর্জাতিক ক্যাথলিকতাবাদের বিরোধিতায় জাতীয়-ভাবাপন্ন প্রোটেস্টান্টবাদের প্রাবল্য তখনকার ইংলণ্ডের সমাজ-চেতনার একটি প্রাণবান ধারা। এই ধারার অন্যতম বাহক হিসাবে শেকসপীয়র যখন নিজে নাটক লিখিয়াছেন বা অন্যের রচিত নাটকের পরিমার্জন করিয়াছেন তখন তাহাতে ফুটিয়া উঠিয়াছে সামন্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর সংঘর্ষের যথাসম্ভব যথাযথ চিত্ররূপ ও নবজাত বৃটিশ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধ ও বৃটিশ জাতীয়তাবোধের সবল আত্মপ্রকাশ। অনেক বিখ্যাত রাজনীতিবিদ তাই মনে করেন, ইংলণ্ডের জাতীয় চরিত্র বুঝিবার প্রকৃষ্ট উপায়, শেকসপীয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলির সাভিনিবেশ অধ্যয়ন। এখানেও তাঁহার বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ভাষার নিজস্ব ভঙ্গিতে ও চরিত্র-চিত্রণে আপেক্ষিক দক্ষতায়। কিন্তু সে ভাষা আবেগশীল হইলেও অযথা অলঙ্কারবহুল, চরিত্রগুলি পরিস্ফুট হইলেও বিকাশবিহীন, স্থিতিশীল। স্পষ্টই বোঝা যায় শেকসপীয়র তখনও রিনেসাঁস ইংলণ্ডের মানস-জীবনে গভীর আলোড়নকে সমগ্রভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই,

তখনও তাঁহার শিল্প-জীবনে চলিতেছে পথ-খোঁজার পর্ব, উদ্যোগ-আয়োজনের পর্ব।

তথাপি ইহার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে রিনেসাঁস-চেতনার একটি মূলবিধির দিকে শেকসপীয়রের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই বিধিটিকে সূত্রাকারে বলা যাইতে পারে—প্রতীয়মানতার সহিত বাস্তবতার বিরোধ। মধ্যযুগীয় মানসে এ-হেন বিধির প্রভাব খুবই দুর্বল। কিন্তু যখন প্রমাণ হইয়া গেল, পৃথিবী অচল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহা প্রকৃতপক্ষে অবিরাম গতিশীল; দেখিতে সমতল হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা গোলাকার; আটলাণ্টিক মহাসাগর সীমাহীন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও তাহার অপর পারেও মানুষের বাসযোগ্য দেশ আছে; আর খৃষ্টিয়ানী সংস্কৃতিই মানুষের জ্ঞানরাজ্যের আদিকাণ্ড নহে, তাহারও পূর্বে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যে শোভিত আছে অপরূপ রত্নরাজি—তখন মানুষের বহির্জগত ও অন্তর্জগত উভয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত প্রতীয়মানতাকে আর কেহ বিনা বিচারে মানিয়া লইতে প্রস্তুত রহিল না। চোখে-দেখা সত্যের সহিত বুদ্ধিগ্রাহ্য সত্যের ঐকান্তিক বিভেদ ঘটিয়া গেল। এই মূল বিধিকে শেকসপীয়র যোগবলে অকস্মাৎ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে এই মূল বিধির বহুমুখীন তাৎপর্য তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় ও তাঁহার রচনার সকল পর্বেই ইহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম পর্বে এ উপলব্ধি ছিল ভাসা-ভাসা; তাই ইহার প্রকাশও ছিল স্থূল। যেমন, কমেডি-অব-এররস-এ যমজ ভাই দুটি দেখিতে অবিকল একরূপ হইলেও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক; আর টেমিং অব দি শ্রু-তে ক্যাথারিনা প্রকাশ্যে মুখরা হইলেও অন্তরে বিনীতা, আর তাহার বোন বিয়াঙ্কা বাহ্যত বিনীতা হইলেও অন্তরে কটুভাষিনী, যে গুণ তাহার বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। মার্চেণ্ট অব ভেনিস-এ তিনটি বিভিন্ন ধাতুময় পেটিকার মারফত নির্বাচনে ইহারই সূক্ষ্মতর প্রকাশ; ইহার স্পষ্টতম রূপ হইতেছে হ্যামলেটে, পিতার মৃত্যুতে শোক সম্বন্ধে তাহার মায়ের সাধারণ উক্তির উত্তরে হ্যামলেট রূঢ়ভাবে বলে: seems, madam, nay it is, I know no 'seems'; ইহার সব চেয়ে নাটকীয় ব্যবহার পাওয়া যায়, ক্রুদ্ধ ওথেলোর নিকট ইয়াগোর এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ শ্লেষোক্তিতে, যে ডেসডিমোনাকে ক্যাসিয়ো-র সহিত এক শয্যায় শায়িতা দেখিলেও তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করা চলে না, সে হয়ত প্রকৃত পক্ষে শুদ্ধা নারী হইতে পারে; আর ইহার কৌতুকময়

পরিণতি বলা যাইতে পারে টেম্পস্ট-এ, যখন ফার্ডিনান্ড প্রস্‌পেরোকে অত্যাচারী প্রভু ভাবিয়া বিদ্রোহ করিতে চাহে মিরান্ডাকে লাভের আগ্রহে।

মনে রাখিতে হইবে প্রতীয়মানতার বিরুদ্ধে শেকসপীয়র যে নূতন সত্যের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কোনো রহস্যময় ব্রহ্মবাদ নহে, তাহা বহু-মানবের সাধনালব্ধ বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদ। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবন ও মানুষের ব্যক্তিসত্তার স্ববিরোধ-সমন্বিত গণনাতীত রূপ-বৈচিত্র্য—ইহাই ছিল তাঁহার শিল্প-জীবনের সজাগ পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু।

রিনেসাঁস-চেতনায় বিশ্বজগতে মানুষের মূল্যবত্তা সম্বন্ধে ছিল দ্বৈতরূপ। জানা আছে যে মধ্যযুগীয় ধারণায় পৃথিবী ছিল সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির কেন্দ্রে, আর মানুষ ছিল তাহার অধিপতি। কিন্তু নূতন জ্যোতির্বিদ্যায় পৃথিবী আপন গুরুত্ব হারাইতে বাধ্য হইল। পৃথিবীর অধিবাসী হিসাবে বিশ্বসৃষ্টির সমগ্রতায় মানুষের প্রতিষ্ঠার হইল লাঘব। তাহা সত্ত্বেও তাহার নিজের চোখে তাহার মূল্যবোধ না কমিয়া বাড়িয়া গেল। দৈহিক হিসাবে মানুষ যাহা হারাইল তাহার অনেক বেশি পূরণ হইল মনোজগতে। মানুষের বুদ্ধির অগম্য যেন কোনো কিছু রহিল না। বুদ্ধির সাধনায় ও তাহার ব্যবহারে মানুষ ইহলোকেই স্বর্গরাজ্য সৃজনের স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিল। ইহাই রিনেসাঁস মানবিকতা-বাদের মূল উৎস, মোর-এর 'ইউটোপিয়া' এ যুগের অমর অবদান।

মানসজীবনে বুদ্ধির প্রাধান্যে সমাজজীবনে ব্যক্তি হইয়া উঠিল প্রধান। মানুষের মূল্য বিচারে আর কোনো মাপকাঠি প্রযোজ্য নহে,—জন্ম, বংশ, ধর্ম, সম্পত্তি ইত্যাদি নহে—বুদ্ধির প্রখরতা ও ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য দিয়াই মানুষের বিচার। বুদ্ধিই শক্তি, বুদ্ধিমানের নিকট পৃথিবীর কোনো পথই অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না। বুদ্ধিকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া ব্যক্তি যে কোনো শৃঙ্খল হইতে মুক্তি উদ্ধার করিতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার আপন শক্তির দ্বারাই সীমাবদ্ধ, অন্য কোনো সীমাকে স্বীকার করা মানবিকতার অপমান। একদিকে ব্যক্তিসত্তার পূর্ণপ্রকাশ, অন্যদিকে সমগ্র মানব সমাজের সুষমাময় প্রতিষ্ঠা—এই বীর্যবান উদ্যম ও কল্পনাময় আদর্শ—উভয়ে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হইয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল রিনেসাঁস যুগের মানবিকতা। যে সমাজে ব্যক্তির উদ্যম স্বীকৃত ও যাহা মানবিক আদর্শে অনুপ্রাণিত তাহাতে অসংখ্য রকমের জটিলতার সম্ভাবনা সহজেই অনুমান করা যায়।

শেকসপীয়রের দ্বিতীয় পর্বের নাটকগুলিতে এই জটিলতার নিকটতর

অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার এ যুগের কমেডিগুলিতে হাস্যরসের মধ্যেও গম্ভীর অলঘু ভাবের প্রবর্তন সকল পাঠকেরই চোখে পড়িবে। দেখা যাইবে, এ-গুলিতে নাটকীয় জটিলতা কেবল পরিস্থিতির জটিলতাতে আবদ্ধ নহে, জটিল চরিত্রের অবতারণাও শুরু হইয়াছে। জটিল চরিত্র বলিতে বোঝায় তাহাদিগকে যাহাদের চিন্তা ও কর্ম একটি বাঁধা পথে চলে না, যাহাদের মধ্যে ভালো ও মন্দ, কাম্য ও অকাম্য একই কালে একই স্থানে পরস্পরকে জড়াইয়া থাকে। তাহাদের সম্বন্ধে পাঠক বা দর্শকের মনে অনেক সময় প্রশ্ন থাকিয়া যায়, তাহাদিগকে ভালবাসিতে হইবে কি ঘৃণা করিতে হইবে। শাইলক, মালভোলিও, জেকুইজ, টাচস্টোন, ফলস্টাফ ইত্যাদি চরিত্রে তাই অভিনেতাকে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া চলিতে হয়। এই যুগের রচনায় ভাষা প্রয়োগেও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যৌবনসুলভ প্রাচুর্যের স্থলে আসিয়াছে সুদক্ষ সংযম। কথার মারপ্যাঁচের আড়ালে বক্তব্য আর ঢাকা পড়ে না। বরং হালকা কথার পিছনে অনেক সময় গভীর চিন্তার ছায়া দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, মানুষের ভাগ্যে দৈব ও পুরুষকারের সম্বন্ধ, বা কবিতায় সত্যের সহিত কল্পনার সম্বন্ধ,—অ্যাজ ইউ লাইক ইট নাটকে রোজালিন্ড, সিলিয়া ও টাচস্টোনের মুখে ইহাদের লইয়া যে পরিহাস-রসিকতা আছে, তাহার পিছনে নিশ্চয়ই আছে মারমেড ট্যাভার্নে অনেকদিনের অনেক উত্তপ্ত বিতর্কের স্নিগ্ধ রসাভাস।

এ পর্বে রচিত ঐতিহাসিক নাটকেও অনুরূপ পরিবর্তন দেখানো যাইতে পারে। যেমন তাঁহার বিখ্যাত নাটক চতুর্থ হেনরীর প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ইহার রচনা 'তৃতীয় রিচার্ড', 'রাজা জন' অথবা "দ্বিতীয় রিচার্ড" অপেক্ষা পরিপক্বতর। ইহাতে অলংকারবহুল বক্তৃতার স্থলে আসিয়াছে সরস কথোপকথন। সবচেয়ে লক্ষ্যযোগ্য এই যে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজা অথবা অমাত্য শ্রেণীর চরিত্র অপেক্ষা সাধারণ চরিত্রের অংকনে বেশী মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। সেই অর্থে ইহারা যতটা ঐতিহাসিক তাহার চেয়ে বেশি সামাজিক নাটক।

তবুও ইহা স্বীকার করিতে হইবে শেকসপীয়রের লেখনী এই পর্যন্ত আসিয়া থামিলে তিনি ভূতলে অতুল শেকসপীয়র হইতে পারিতেন না। কারণ এই পর্বেও শেকসপীরের নাটকীয় শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই, জাতীয় জীবনের মর্মমূলে যে গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব সমাজ-চেতনাকে জটিলতর পথে পরিচালিত করিতেছে তাহার প্রকৃত স্বরূপ তিনি আভাসে বুঝিতেছিলেন, কিন্তু অন্তরস্থ করিতে

পারেন নাই। তাই এ পর্বের নাটকেও আছে এমন পরিস্থিতি যাহা সম্পূর্ণ বাস্তব নহে, আছে এমন জটিলতা যাহার সমাধান হয় আকস্মিক বেশ পরিবর্তনে ও আকস্মিক চিত্ত পরিবর্তনে। রিনেসাঁস চেতনার দ্বিতীয় মূল্যবোধ—হেতুবোধ, তখনও তাঁহার আয়ত্তের বাইরে।

॥ সাত ॥

হেতুবোধের আবিষ্কার মধ্যযুগীয় জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতম অভিঘাত। ইহাকে আধুনিক বিজ্ঞানের মণিকোঠা বলাও চলে। একবার হেতুবোধ, অর্থাৎ কার্য-কারণ-সম্বন্ধ মানিয়া লইলে আর অতি-প্রাকৃতের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। আকস্মিককেও পরিহার করিতে হয় মূল ঘটনা হিসাবে। যাহাকে মনে হয় অতি-প্রাকৃত বা আকস্মিক, তাহাও নিশ্চয় কার্যকারণ সম্বন্ধে গ্রথিত, হেতুবোধের দ্বারা শৃংখলিত। শুধু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের অভাবে আমরা তাহাকে পূর্ণভাবে জানিতে পারি নাই। তাহারা আমাদের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতার প্রকাশ-মাত্র; সুতরাং কোনো জটিল পরিস্থিতির সমাধানে অতি-প্রাকৃতের বা আকস্মিকের প্রয়োগ, পরিচয় দেয় আমাদের শক্তির অক্ষমতার।

শেকসপীয়রের তৃতীয় পর্বে, ট্র্যাজেডি পর্বে, দেখা যায় নাটকে এই হেতুবোধের প্রয়োগে তিনি কি বিস্ময়কর সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন। শেকসপীয়রের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁহার বৃহৎ ট্র্যাজেডিগুলিতে। এ-গুলিতে তিনি দেখাইয়াছেন নাট্যকলার পরিণততম রূপ। প্রতিটি নাটকের মৌলিক পরিস্থিতির অকুতোভয় নির্বাচনে তাঁহার অসাধারণ শিল্পবোধের পরিচয় মেলে। নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত ঘটনার পরম্পরা, অনিবার্য গতিতে অগ্রসর হয় নাটকে নিয়তির দিকে। কোনো ঘটনাই নহে অ-কারণ বা অ-হেতুক। যেখানে আকস্মিক ঘটনা ঘটিয়াছে, যেমন ওথেলো-তে রুমাল ফেলা, তাহা মিশিয়াছে মূল ঘটনা-স্রোতের পরিপূরক রূপে, তাহা হইতে পৃথক হইয়া নহে। যেখানে অতি-প্রাকৃতের ব্যবহার করা হইয়াছে, যেমন 'হ্যামলেট' বা 'ম্যাকবেথ'-এ, তাহারও নাটকীয় সঙ্গতির উপাদান দেওয়া আছে নাটকের ভিতরেই। যেখানে কোনো চরিত্রে দেখানো হইতেছে অভাবিতপূর্ব পরিবর্তন—যেমন ডেসডিমোনার প্রতি ওথেলোর নির্মম ব্যবহারে, বা পৃথিবী সম্বন্ধে লিয়রের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল রূপান্তরে, সেখানেও হেতুবোধের ব্যত্যয় করা হয় নাই। পাঠক বা দর্শকের পক্ষে বুঝিতে বিলম্ব হয় না, অনুরূপ ব্যক্তির পক্ষে অনুরূপ অবস্থায় অনুরূপ-

ভাবে ব্যবহার করাই স্বাভাবিক। ট্র্যাজেডিগুলিতে যেখানে যেখানে অপূর্ব কবিত্বের প্রকাশ আছে তাহা কোনো সময়েই তাহাদের নাটকীয় উপযোগিতা ছাড়াইয়া স্বয়ং-প্রধান হইয়া পড়ে না। এই উপযোগ-বোধ শেকসপীয়রের বৃহৎ ট্র্যাজেডিগুলিতে যে পরিমাণে পাওয়া যায় বিশ্বসাহিত্যে অন্য কোনো নাটকে সেই পরিমাণে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। এবং এই উপযোগ-বোধ তিনি পাইয়াছিলেন সে যুগের বস্তুনিষ্ঠ হেতুবিধির উদ্ভাবন হইতে। বস্তুবাদী হেতুবিধির প্রথম ও প্রধান আচার্য বেকন ছিলেন শেকসপীয়রেরই সমকালীন।

সাহিত্যে আঙ্গিক হইল আধারের মত যাহার মধ্য দিয়া আধেয় পায় আপন রূপ। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে মূল প্রেরণা হইল সামাজিক চেতনা যাহা হইতে কোনো বিশেষ সাহিত্য-সৃষ্টিতে বিশেষ আধেয় খুঁজিয়া লয় আপন উপযুক্ত আধার বা শিল্পরূপ। শিল্পীর উৎকর্ষ এইখানে, সমাজ-চেতনাকে তিনি কিভাবে উপলব্ধি করিতে পারেন, ও কতখানি অবিকৃতভাবে তাহাকে শিল্পের মাধ্যমে আঙ্গিকের কৌশলে আত্মনিরপেক্ষ অন্যজনমনগ্রাহ্য করিয়া তুলিতে পারেন। ট্র্যাজেডি পর্বে শেকসপীয়রের বস্তুনিষ্ঠা কেবল আঙ্গিকের হেতুনিষ্ঠাতেই নিবদ্ধ নহে, এই পর্বে তাঁহার সৃজনশীলতা সামাজিক বাস্তবের নিকটতম অনুগামী। তাঁহার ট্র্যাজেডিগুলি বিরাট ব্যক্তিসত্তার চিত্রশালিকা—কারণ, রিনেসাঁস-ইংলণ্ড ছিল বিরাট ব্যক্তিদের জীবন-ইতিহাসের যুগ। তাহারা একদিকে যেমন বীর, অন্যদিকে তেমনি জালিম. 'হিরো' হইতে 'ভিলেন'-এর পার্থক্য মাত্র একটি পদক্ষেপ। যেসব গুণ থাকিলে হিরো হওয়া যায় তাহাও অনেক পরিমাণে মিলিত প্রকৃত ভিলেনদের ভিতরে। বস্তুত ধনবাদী সমাজে জীবনের গতি এমনই দ্বান্দ্বিক যে প্রকৃতপক্ষে ভিলেন হইতে গেলেও হিরো সুলভ অনেক গুণের প্রয়োজন হয়। যাহা মন্দ তাহা প্রকাশ্যভাবে মন্দ বলিয়া ধরা পড়িলে তাহার কার্যকারিতা খর্ব হইয়া যায়। অনেক সদ্‌গুণের সহিত দু একটি সমাজ-বিরোধী স্বার্থপর প্রবৃত্তি প্রবলভাবে যুক্ত হইলে তবেই তাহা মন্দ হিসাবেও অধিকতর সার্থক হইয়া উঠে। শেকসপীয়রের ইয়াগো, মিল্টনের সেটান ও গ্যেটের মেফিস্টোফিলিস—এই সাহিত্যিক সূত্রের তিনটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। অনেক প্রশংসনীয় গুণের সহিত দু একটি দুর্বলতা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া গেলে হিরো-র জীবনও হয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত। রিনেসাঁস যুগে ব্যক্তিসত্তার মুক্তির আলোড়নের ইহাই হইল প্রকৃত তাৎপর্য, যে তাহাতে মানুষের সামনে একদিকে যেমন দেবতা হইবার স্বপ্ন সৃজন করে, অন্যদিকে তেমনি দৈত্য হইবার

পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। শেকসপীয়রের ট্র্যাজেডিতেও তাই দেখা যায় যে দেবত্ব ও অসুরত্ব পরস্পরের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ; তাই বলা হইয়া থাকে শেকসপীয়র স্বর্গ ও নরক উভয়ত্রই পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে স্বর্গ ও নরক পরস্পরের প্রতিবেশী এই মাটির পৃথিবীতেই, এই জনসাধারণের জীবনের মধ্যেই। তাই তিনি আঁকিয়া গিয়াছেন ব্যক্তিসত্তার বহুল ও জটিল রূপ। কিন্তু যতই জটিল হউক তাহারা তাঁহার সৃষ্টিতে প্রত্যেকেই ব্যক্তি, বিরোধী-প্রবৃত্তি সমন্বিত একক প্রাণী। তাহাদের ভাষার প্রয়োগে এমন কি উপমার স্বচ্ছন্দ ব্যবহারেও তাহাদের ব্যক্তিত্ব যে নিজের অজ্ঞাতসারে প্রকাশ পায়—শেকসপীয়রের কৃতিত্বের লক্ষণ হিসাবে সমালোচকেরা তাহারও নির্ঘণ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। তাহারা প্রত্যেকে নিজস্ব ধরনে ভালোবাসে, নিজস্ব ধরনে শত্রুতা করে। তাহাদের প্রেমও যেমন সাবেগ, তাহাদের ঘৃণাও তেমনি সাবেগ। তাহারা একদিকে যেমন নিজেকে ভালোবাসিয়া অপরের সর্বনাশ করিতে পারে, অন্যদিকে তেমন অপরের জন্য নিজের প্রাণও দিতে পারে। তাহাদের প্রত্যেকেরই প্রেরণা, আপন ব্যক্তিসত্তার অকুণ্ঠ প্রকাশ। অথচ এই অকুণ্ঠ প্রকাশের অন্তরে যে বিরোধ আছে তাহাকে প্রকাশ করিতে পারাই শেকসপীয়রের ট্র্যাজিডিগুলির পরম উৎকর্ষ। এই উৎকর্ষের পরিমাণ বুঝিতে পারা যায় তৃতীয় রিচার্ডের সহিত ম্যাকবেথের তুলনায়। তৃতীয় রিচার্ড বিকলাঙ্গ হত্যাকারী খল ও শঠ, তাহা সত্ত্বেও তিনি প্রজাদের বিশ্বাস অর্জন করেন, লেডি অ্যান-কে মিথ্যা প্রণয়ের অভিনয়ে অভিভূত করিতে পারেন ও ডিউক অব বাকিংহ্যামের বিশ্বস্ত বন্ধুও হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার শয়তানিতে কোথাও অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ নাই। তাই তাঁহার চরিত্র মানবিকতার উপাদানে বঞ্চিত, শিল্পসৃষ্টি হিসাবে নিষ্প্রভ। অপর পক্ষে ম্যাকবেথের অধঃপতনের মূল কারণ, তাঁহার উচ্চাশা, তাঁহার পরিবেশে মোটেই দোষ হিসাবে গণ্য ছিল না। সিংহাসনে যেখানে জন্মগত অধিকার নাই, সেখানে রাজত্ব-কামনা ম্যাকবেথের মত সম্মানিত বীরের পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এই উচ্চাশার পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টা তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত দানবে পরিণত করিল। কিন্তু এই একান্ত স্বার্থপর-বৃত্তির প্রচণ্ডতা সত্ত্বেও তাঁহার নৈতিক বিবেক কত উচ্চস্তরের ছিল তাহা বুঝাইবার জন্য শেকসপীয়রকে প্রয়োগ করিতে হইয়াছে উইচ-ত্রয়ীর অতি-প্রাকৃত প্রভাব, ও তাহাদের চতুর্থ সঙ্গিনী—লেডি ম্যাকবেথের মত সহধর্মিণীর সহযোগিতা। এই নৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বই ম্যাকবেথকে ভিলেন হিসাবেও রিচার্ড অপেক্ষা অনেক

উচ্চস্তরে তুলিয়াছে অথচ সম্মানের অযোগ্য করে নাই। লেডি ম্যাকবেথের অন্তর্দ্বন্দ্বও কম শোচনীয় নহে। যে নারী স্বামীকে ভালোবাসিয়া, স্বামীর অন্তরের কামনার চরিতার্থতার জন্য আপন নারীত্ব ও মাতৃত্বকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত তাহার লৌহ-কঠিন ইচ্ছাশক্তির পরিণাম হইল নিদ্রিত-সঞ্চরণ দৃশ্যে। এই দৃশ্যে এই দানবীর প্রতি যে অমিশ্র করুণার সঞ্চার হয়, বিশ্বসাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। এ সংসারে স্বর্গ ও নরক ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, রিনেসাঁস চেতনার এই দ্বান্দ্বিকরূপ শেকসপীয়রের করায়ত্ত ছিল বলিয়াই এ হেন দৃশ্য অঙ্কন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছিল।

কেবল লেডি ম্যাকবেথে নহে, নারীচরিত্র অঙ্কনে শেকসপীয়রের প্রবণতা ও কুশলতা তাঁহার বস্তুনিষ্ঠ কল্পনার সুবৃহৎ পরিচায়ক। ব্যক্তিসত্তার মুক্তি মানিয়া লইলে আর নারীকে সমাজ-জীবনে পিছাইয়া রাখা যায় না। রানী এলিজাবেথের জটিল ব্যক্তিত্ব ইংলণ্ডের সমকালীন ইতিহাসে এক প্রকাণ্ড ঘটনা। মধ্যযুগের শাস্ত্রশাসন হইতে মুক্ত হইয়া নারীত্ব আপন মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইল। পারিবারিক সম্বন্ধের নিগড়ে আর তাহাকে বাঁধিয়া রাখা যায় না। সম্বন্ধ-বিবর্জিত নিছক নারীত্ব বুর্জোয়া চেতনার একটি বিশেষ দান। সে নারী মাতা, কন্যা বা বধূ নহে, সে মোহিনী, "অসংযত বাঁধন-হারা পুরুষ-প্রিয়া", আপন প্রণয়াবেগের প্রাবল্যই যাহার জীবনের বিশেষত্ব। তাহার মধ্যে আছে ছলাকলা, চতুরতা, মিথ্যাচার, কিন্তু এই নৈতিক ত্রুটিগুলি তাহাকে নিন্দনীয় না করিয়া বরং আকর্ষণীয় করিয়া তোলে। শেকসপীয়রের ক্লিওপাট্রা এই নূতন-উদ্ভূত নারীত্বের মনোহারিণী কাব্য-প্রতিমা। তাহার চৌম্বক-শক্তির অনন্ত বৈচিত্র্যকে বয়স পারে না শুকাইতে, ব্যবহার পারে না বাসি করিতে। প্রাক-বুর্জোয়া যুগের নারীত্ব যেমন ট্রয়ের-অভিশাপ হোমরের হেলেন-এ কেন্দ্রীভূত, বুর্জোয়া যুগের নারীত্ব তেমনি ঘনীভূত এই নাইল-নদের সর্পিনীতে। ভবিষ্যতের অনেক শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া লেখক—যেমন টুর্গেনেভ বা দোদে—নারীত্বের এই চেহারাকে আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু শেকসপীয়রের সাফল্য তাঁহাদের ক্ষমতাতীত। একটি ছোট গল্পে—মরুভূমিতে প্রণয়াবেগ—বালজাক এক ব্যাঘ্রিণীর ছবি আঁকিতে গিয়া প্রায় শেকসপীয়রীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তবুও তাহা খণ্ডচিত্র, বুর্জোয়া নারীত্বের পোরট্রেট নহে।

ক্লিওপাট্রাকে যদি মুক্ত বুর্জোয়া নারীত্বের প্রতিরূপ বলিয়া মানিতে হয়, তাহা হইলে শেকসপীয়রের হ্যামলেট সমস্ত বুর্জোয়া মানবিকতাবাদীদের

অবিসংবাদিত প্রতিনিধি। হ্যামলেটের চরিত্র সম্বন্ধে বিয়েলিনস্কি-র সোচ্ছ্বাস উক্তি মনে পড়ে ঃ "হ্যামলেটে···এ কথাটির অর্থ কি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ? ইহার অর্থ মহৎ ও গভীর; ইহা মানুষের জীবন, সমগ্র মানবসমাজ, ইহা তুমি আমি আমরা প্রত্যেকে!" প্রশ্ন জাগে, কোন্ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে হ্যামলেট বুর্জোয়া যুগের সকল চিন্তাশীলের প্রতিভূকল্প হইয়া উঠিতে পারিয়াছে? হ্যামলেটের মত আমাদের সকলের তো পিতার হত্যা, মাতার বিবাহ ও পিতৃব্যকে শাস্তি দিবার সংকটে পড়িতে হয় না। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় হ্যামলেটের নৈতিক চেতনায় যে কর্মসংকট দেখা দিয়াছিল, বুর্জোয়া সমাজে নীতিচেতনাপরায়ণ হইলে তাহা হইতে কাহারো মুক্তি নাই। মৃত পিতার প্রেতাত্মার মুখ হইতে শোনার পর ক্লডিয়াসের প্রাপ্য সম্বন্ধে হ্যামলেটের মনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। কিন্তু হ্যামলেট তো নহে ম্যাকবেথ কি ওথেলো। সে মানবিকতাবাদী বুদ্ধিজীবী। ইহা সত্য নহে যে হ্যামলেটের মানব-প্রকৃতি ছিল কর্মবিমুখ, কিন্তু কর্মের চিন্তাগত সমর্থন না থাকিলে তাহার নিকট কর্ম অসার্থক। তাহার মানসিক দ্বন্দ্বের মূল প্রশ্ন—ক্লডিয়াসকে মারিলেই কি সমস্যার সমাধান হইল? ক্লডিয়াস তো কেবল একটি ব্যক্তি নহে, সে যে মানবিক জীবনের সমস্ত অন্যায়ের নিদর্শন। আর হ্যামলেটের নিকট সমস্ত জীবন সমস্ত পৃথিবী যে বাসি বিস্বাদ ও আকর্ষণহীন হইয়া গিয়াছে; সে এমন যুগে জন্মিয়াছে যে তাহার চোখে সমস্তই বিশৃংখল। মানবিক হিসাবে তাহার কর্তব্য, সে জানে, এই বিশৃংখলতাকে সংশোধিত করিয়া সুষমার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বিশৃংখলতা যে সর্বব্যাপী। একটি অন্যায়ের প্রতিকার করিতে গেলে সমস্ত সমাজব্যবস্থার মূলে গিয়া টান পড়ে। কোনো অন্যায়ই তো একক বিচ্ছিন্ন অন্যায় নয়—প্রত্যেক অন্যায়ের সহিত জড়িত হইয়া আছে এমন অনেক বিষয় যাহার সহিত সে নিজেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যাহাদিগকে বাদ দিয়া তাহার নিজের জীবনও অর্থহীন। এই অন্তর্দ্বন্দ্বই হ্যামলেট নাটকের প্রধান ঘটনা। এবং বুর্জোয়া সমাজে এমন ব্যক্তির জীবন কল্পনা করা কঠিন, চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় যাঁহার জীবনাদর্শ অথচ যাঁহাকে হ্যামলেটের মত নৈর্ব্যক্তিক প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে হয় না।

হ্যামলেট নাটক যে শেষ পর্যন্ত ট্র্যাজেডি হইল তাহা নাট্যকারের খেয়াল বা শেষ দৃশ্যে কতকগুলি মৃত্যু ঘটাইয়া দর্শকের করুণা-উদ্রেকের কৌশল মাত্র নহে; ইহা শেকসপীয়রের বস্তুনিষ্ঠার ন্যায়সংগত পরিণতি। রিনেসাঁস-চেতনা

মুক্ত মানবসমাজের যে স্বপ্ন সৃজন করিয়াছিল তাহার পরিপূরণ বুর্জোয়া সমাজের বাস্তব কাঠামোর মধ্যে ছিল অসম্ভব। আজ ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়া দেখিলে বোঝা যায়, তাহার ভূমিকাও ছিল অন্যরূপ। তাহার ঐতিহাসিক দায়িত্ব ছিল সংহতিবদ্ধ মানুষের শ্রমশক্তি ও উৎপাদন শক্তিকে কল্পনাতীতভাবে বাড়াইয়া দেওয়া। ইহারই অনুষঙ্গ হিসাবে ধনবাদী সমাজে শ্রেণী-সংঘর্ষ হইবে তীব্রতর, শোষিত শ্রেণীর দুঃখ দুর্দশার অন্ত থাকিবে না, শোষণ ও অত্যাচার বিসর্পিত পথে প্রবেশ করিবে সমাজের সকল স্তরে, দূষিত করিবে মানুষের সমস্ত পরিবেশকে ও কলঙ্কিত করিবে মানুষের সকল সম্বন্ধকে। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থার প্রতিরোধ যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একদিন আনিয়াছিল মুক্তির আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি, তাহাই বস্তুগত নিয়মের অমোঘ বিকাশে হইয়া উঠিবে দাসত্বের নিগড় ও অন্ধকারময় নিয়তি। যাহা আছে তাহা কোনক্রমেই তাহা থাকে না, অন্তর্দ্বন্দ্বের গতিশীলতায় তাহার রূপান্তর হয়—এই রূপান্তর বিধি রিনেসাঁস-চেতনার তৃতীয় মূলবিধি। সেকসপীয়রের নাটকে এই মূলবিধির সার্থক প্রয়োগ প্রচুর দেখা যায়। সমালোচকেরা প্রায় বলিয়া থাকেন—অন্যান্য নাট্যকারের তুলনায় শেকসপীয়র-সৃষ্ট চরিত্রগুলি মনে হয় যেন জীবন্ত। জীবনের ধর্ম গতিশীলতা। গতিশীলতার অন্তরে আছে—হেগেল যাহা পরে দেখাইয়া দেন—একটি আত্যন্তিক দ্বন্দ্ব: যাহা আছে তাহার নিজেকে বিবর্তিত করিয়া অন্য কিছু হইবার প্রবণতা; অর্থাৎ 'থাকা' ও 'হওয়া'র দ্বন্দ্ব। শেকসপীয়রের ট্র্যাজেডিতে প্রধান চরিত্রগুলি গোড়ায় যাহা থাকে শেষ পর্যন্ত তাহা থাকে না। আপন চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে অন্য কিছু হইবার দিকে ঝোঁকে—তাহারা যাহা হইতে চাহে তাহার পথে আসিয়া পড়ে প্রতিবন্ধক, শুরু হয় সংঘর্ষ—ওথেলোর সহিত ইয়াগোর, ম্যাকবেথের সহিত হেকেটে-এর, লিয়রের আত্মকেন্দ্রিকতার সহিত তাহার বৃদ্ধ বয়সে নবার্জিত বাস্তবতাবোধের হ্যামলেটে ব্যক্তিগত নীতিবোধের সহিত বৃহত্তর সমাজ-ব্যবস্থার নীতিবোধের। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথে বুর্জোয়া সমাজে বাহ্য ও আন্তর কত যে বাধা তাহার বৈচিত্র্য শেকসপীয়রের ট্র্যাজেডিতে চিরন্তন রূপলাভ করিয়াছে। এ বাধা বুর্জোয়া সমাজের অন্তর্নিহিত, সে সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদের বিপ্লবী পরিবর্তন না ঘটিলে এ বাধা দূর হইতে পারে না। একমাত্র শ্রেণী-সংঘর্ষহীন সমাজবাদী সমাজেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। সুতরাং অনিবার্যভাবে বুর্জোয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বিফলতার সাহিত্য—অর্থাৎ ট্র্যাজেডি।

বিফলতাই কি তবে শেকসপীয়রীয় ট্র্যাজেডির মূল সুর ? একথা বলা চলে না। বিফলতা মূল সুর হইলে কি শেকসপীয়রের ট্র্যাজেডি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানবিকতাবাদীগণের অনুপ্রেরণার উৎস হইতে পারিত ? বিফলতাবোধ হইতে কোনো মহৎ সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। মহৎ চরিত্রের মৃত্যুতে ট্র্যাজেডির অবসান হইতেছে আপাত প্রতীয়মান অবসান। বাস্তব পক্ষে তাহারা মানবিকতার জয়গানে মুখর। ম্যাকবেথের মৃত্যু হইতেছে তাহার মুক্তি, হেকেট্-রূপ নিয়তির সর্বনাশা প্রভাব হইতে মুক্তি ; ওথেলোর মৃত্যু ডেসডিমোনা সম্বন্ধে তাহার সত্যোপলব্ধির প্রমাণ, ডেসডিমোনা না থাকিলে তাহার জীবনই যে মিথ্যা ; কর্ডেলিয়ার মৃতদেহকে কোলে করিয়া লিয়রের প্রলাপ, সমস্ত নির্দয় ঝড়ঝঞ্ঝার পর তাহার শক্তিময় জীবনের আবাহনের প্রকাশ ; আর হোরেশিও-র নিকট মৃত্যুর পূর্বে হ্যামলেটের সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাহার জীবনের প্রকৃত কাহিনী যেন হোরেশিও সর্বসাধারণকে জানাইতে ত্রুটি না করে ; তাহার মানবিক আদর্শের সাধনা ও ব্যর্থতা যদি সর্বসাধারণে না জানিল তবে যে তাহার সমস্ত দুঃখভোগ আত্মকেন্দ্রিকতায় আবদ্ধ থাকিয়া মানবসমাজের পক্ষে অসার্থক হইয়া যাইবে।

O good Horatio, what a wounded name,
Things standing thus unknown, shall live behind me !

ইহার পরে যে কয়টি লাইন আছে অনেক ধ্বনিবাদী ইংরেজ সমালোচকের মতে তাহাতে ছন্দস্পন্দের সৃজনী শক্তিতে ও বিরাট ইঙ্গিতময়তায় পাওয়া যায় শেকসপীয়রীয় প্রতিভার উচ্চতম নিদর্শন।

If thou didst ever hold me in thy heart,
Absent thee from felicity awhile,
And in this harsh world draw thy breath in pain,
To tell my story.

ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কারণ এখানেই আছে শেকসপীয়রের প্রিয়তম চরিত্রের মহৎ জীবনাদর্শের করুণ ব্যর্থতার পর মানবিক সার্থকতার স্বপ্নের শেষ আবেদন। দেখা যাইতেছে, ধনবাদী সমাজে বাস্তবতার শক্তি রূঢ় কিন্তু মানবতার স্বপ্নও দুর্মর। এই দুর্মর স্বপ্নের পূজারী হিসাবেই শেকসপীয়রীয় ট্র্যাজেডির নায়কেরা মানবিকতাবাদীগণের সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য পাইয়া আসিতেছে ও পাইতে থাকিবে।

॥ আট ॥

শেকসপীয়রের শিল্পরচনায় এই মানবিকতার স্বপ্ন ছিল কিরূপ দুর্মর তাহার সাক্ষ্য তাঁহার শেষ জীবনের কমেডিগুলি। প্রথম পর্বের কমেডিগুলির সহিত তাহাদের পার্থক্য একেবারে মূলগত। এই দুই পর্বের মধ্যে গিয়াছে বিরাট ট্র্যাজেডির যুগ, স্বপ্নের সহিত বাস্তবতার সংঘাতের যুগ। সে পর্ব পার হইলেও তাহার তিক্ত অভিজ্ঞতা, মানবজীবনের অন্ধকার দিকের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয়, শেকসপীয়রের মানসক্ষেত্র হইতে মুছিয়া যায় নাই। আয়াকিমো, লিয়ণ্টেস, অটোলিকস, অ্যাণ্টোনিও ও সিবাস্টিয়ান, এ যুগেরই সৃষ্টি। কিন্তু তবুও দেখা যায়, এগুলিতে শেষ পর্যন্ত জয়ী হইতেছে শুভ ও কল্যাণের শক্তি। মনুষ্যত্বে বিশ্বাস যেন মরিয়াও মরিতেছে না। মানব জাতির ভবিষ্যৎ আনন্দ সূচিত হইতেছে ইমোজেন-পসথিউমাস, ফ্লোরিজেল-পার্ডিটা ও ফার্ডিনান্ড-মিরাণ্ডার আনন্দময় পরিণয়ে ও পরিণামে। তরুণ-তরুণী জীবনের প্রতি এমন কোমল স্নেহ ও সযত্ন অভিভাবকত্বের দরদ তাঁহার পূর্বের যুগের রচনায় পাওয়া যায় না। আর বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে এমন অপরূপ কবিত্বপূর্ণ ইন্দ্রজালময় বর্ণনা এই কমেডিগুলিতে আছে যাহাতে বিশ্বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়ে যে তিনি জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পলাতকবৃত্তি অবলম্বন করেন। এমন কি, শেকসপীয়রের শেষ রচনা বলিয়া সাধারণত স্বীকৃত টেমপেস্টেও পলায়নপরতার দৃষ্টান্ত খোঁজা অযৌক্তিক। প্রসপেরো অনাগত মানবসমাজে আদর্শ জ্ঞানীর চিত্র। তাঁহার নিকট মানবের ভবিষ্যৎ ভাগ্য উন্মুক্ত পুস্তকের মতো দৃষ্টিগোচর, আগামীকালের সন্তানদের জন্য সুখের পথ প্রস্তুত করিতে তিনি সর্বদাই ব্যস্ত। তাঁহার জ্ঞানসাধনার ফলে কেবল ক্যালিব্যানরূপী প্রকৃতির অশুভ শক্তি নয়, এরিয়েলরূপী শুভশক্তিও তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন। এরূপ চিত্রকে পলায়নপরতা বলা, বাস্তবের নিকট নতিস্বীকার বলিয়া ব্যাখ্যা করা, জগতে শ্রেষ্ঠ মানবিক কবির উপর অমানুষিক অবিচার। ইহা তাঁহার মর্মের গোপন কথা, বাস্তবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানবের ভবিষ্যৎ মহিমাকে কল্পনার প্রক্ষেপণে দৃষ্টি-গ্রাহ্য করার অতিমানবিক প্রয়াস। এ প্রয়াস শেকসপীয়রেরই উপযুক্ত।

এই প্রসঙ্গে বিচার করা যায় কেন তিনি টেম্পেস্টের পর আর কোনো নাটক রচনার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার কবিত্বশক্তি যে বিন্দুমাত্র স্তিমিত হয় নাই, টেম্পেস্টই তাহার প্রমাণ। কল্পনার ঊর্ধ্বগতিতে তিনি ইহাতে যে উচ্চতায় পৌঁছিয়াছেন তাহা অপর কাহারো অনধিগম্য। এই দুর্লভ

কবিশক্তিকে কেন যে তিনি আর ব্যবহার করিতে চাহিলেন না, ইহাও তাঁহার কবি প্রতিভার বস্তুনিষ্ঠার নিদর্শন। অনেক কবির এমন কি অনেক উচ্চশ্রেণীর কবির কথা ইতিহাসে সঞ্চিত আছে যাঁহারা থামার সময় হইলেও থামিতে চাহেন নাই বা পারেন নাই, লিখিয়া গিয়াছেন অনেকটা অভ্যাসবশে যন্ত্রচালিতের মত। শেকসপীয়রের থামিয়া যাওয়া এই যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। যে রচনায় প্রাণ নাই, যাহা কেবল কথার খেলা বা আঙ্গিকের নৈপুণ্য তাহা জ্ঞানবৃদ্ধ শেকসপীয়রের ছিল অনভিপ্রেত। যে কল্পনার মূলে বাস্তবের অভিজ্ঞতা নাই, তাহা উদ্দেশ্যহীন শূন্যগর্ভ রঙীনফানুস। যে সমাজ-জীবনের তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ রূপকার, তাহার রূপান্তরের ধারা অনুসরণ করিয়া তিনি তাহার আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত মানসচক্ষে দেখিয়া লইয়াছিলেন। তাহার অবসানে কি ঘটিতে পারে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাও তিনি করিয়াছিলেন। কিন্তু কবিপ্রতিভা, এমনকি শেকসপীয়রের কবিপ্রতিভাও দেশকালের নিয়মাধীন। ভবিষ্যৎ তো বর্তমানের সরল বিস্তার মাত্র নয়; তাহার পথে আছে দুর্বার বঙ্কিমতা। কল্পনায় ঊর্ধ্বে উঠিয়া কবি সাধারণের অপেক্ষা অনেক বেশি দূর দেখিতে পান ভবিষ্যতের অভিমুখে। তাই তো বৃহৎ কবিকে বলা হয় প্রবক্তা, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা! কিন্তু তাঁহার ভবিষ্যৎদৃষ্টি তাঁহার সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ দ্বারা সীমাবদ্ধ। যতদিন সে বনিয়াদ টিকিয়া থাকিবে ততদিন তাহার উপরিতলের নানা বিবর্তন তাঁহার পক্ষে হয়ত ধ্যান-গোচর করা সম্ভব। কিন্তু এই সামাজিক বনিয়াদ ভাঙিয়া যখন নূতন অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়িয়া উঠিবে তখন তাহার উপর নির্মিত হইবে নূতন উপরিতল, নূতন সামাজিক চেতনা। আসিবে তাহাতে নূতন সমস্যা, নূতন অন্তর্দ্বন্দ্ব ও তাহাদের নিয়ন্ত্রণকারী নূতন বিধিসমষ্টি। এ যুগে বসিয়া আগামী যুগের বাস্তবকে প্রত্যক্ষ করা মানুষের ক্ষমতাতীত। শেকসপীয়রের বস্তুনিষ্ঠ শিল্পবোধ তাঁহাকে সেই অবশ্য-ব্যর্থ প্রচেষ্টা হইতে বিরত রাখিয়াছিল। তাঁহার ক্ষমতার সীমা সম্বন্ধে তাঁহার চেতনা ছিল প্রখর। তবে কি আর দ্বিতীয় শেকসপীয়র মানবসমাজে জন্মিতে পারে না? এই প্রশ্নের উত্তরে এঙ্গেলস লিখিয়াছিলেন, বুর্জোয়া সমাজের অবসানে যে নূতন মানবসমাজ গঠিত হইবে, যে কবি তাহার বাস্তবতাকে তেমনভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, শেকসপীয়র যেমন করিয়াছিলেন বুর্জোয়া সমাজের এবং প্রকাশ করিতে পারিবেন তেমন শিল্পজ্ঞানের সহিত শেকসপীয়র যেমন পারিয়াছিলেন তাঁহার নাটকাবলীতে

—তিনিই হইবেন শেকসপীয়রের উপযুক্ত বংশধর, তিনিই হইবেন নূতন যুগের শেকসপীয়র। শেকসপীয়রের প্রতিভার পরিমাপ সম্বন্ধে, মনে হয়, ইহাই হইল শেষ কথা।

॥ নয় ॥

এঙ্গেলস-এর বিজ্ঞানদৃষ্টিতে যে সমাজিক বিপ্লব ছিল সুনিশ্চিত কিন্তু অনাগত, আমরা সেই সমাজবিপ্লবের যুগেই বাস করিতেছি। বস্তুত আমাদের যুগের সহিত শেকসপীয়রের যুগের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, এ তথ্য থিওডোর স্পেনসারের মতো মার্কিনী সমালোচকেও চোখে পড়িয়াছে। কিন্তু ইতিহাসের প্রগতি হয় কম্বুরেখায়, তাই কোনো ভবিষ্যৎ যুগ অতীত যুগের একান্ত সমানধর্মী হইতে পারে না। শেকসপীয়রের যুগে ছিল সামন্তবাদ হইতে ধনবাদে অভিবর্তন, আমরা দেখিতেছি, ধনবাদ হইতে সমাজবাদে। এবারে আর মানবিক শোষণের হস্তান্তর নয়, শোষণের চরম অবসান, নিঃশ্রেণিক সমাজের প্রতিষ্ঠা। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ধনবাদের একচ্ছত্র আধিপত্য হইল খণ্ডিত, তখন হইতে সকল সভ্য দেশের নিকট প্রধান সমস্যা—কিভাবে সমাজবাদী রাষ্ট্রে উপনীত হওয়া যায়। দেশ ভেদে ইহার প্রণালী বিভিন্ন কিন্তু মূল পদ্ধতি একই, শ্রেণীসংঘর্ষের অবসান ঘটানো নির্বিত্ত শ্রেণীর একাধিপত্যের সহায়তায়। বলা বাহুল্য, এই পথে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন সকলের অগ্রণী, তাহারই শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া অন্যান্য দেশ মার্কসবাদকে সার্থক প্রয়োগ করিতে শিখিতেছে। একটি বিপ্লবী যুগ অতীতের বিপ্লবী যুগের ঐতিহ্যকে বিস্মৃত হইতে পারে না। তাই সোভিয়েৎ সংস্কৃতি-সেবীদের মধ্যে শেকসপীয়র-চর্চা অভাবিতবেগে চলিতেছে। ইহার বিবরণ পড়িয়া সুপ্রসিদ্ধ শেকসপীয়রীয় পণ্ডিত ডোভার উইলসন বলিতেছেন—সোভিয়েতের আয়োজন দেখিয়া শেকসপীয়রের স্বদেশের পণ্ডিত ও অভিনেতা উভয়েই হিংসায় পূর্ণ হইতে পারেন। ("Here is something that may well fill both actors and scholars with envy in this countrry.") পঠন-পাঠন, গবেষণা, অনুবাদ ও অভিনয়—আলোচনার এই সব অঙ্গ পরস্পর সংযোজিত হইয়া এদেশের শেকসপীয়রীয় সাহিত্যে এমন অনেক নূতন আলোকপাত হইতেছে যাহা অন্য কোনো দেশের শেকসপীয়র-সাধক অবজ্ঞা করিতে পারেন না। তাই দেখা যায় সম্প্রতি কেমব্রিজ হইতে যে 'শেকসপীয়র সার্ভে' প্রতি বৎসর প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে মস্কোর

ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক মারোজভ-এর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। এই সার্ভে'র সম্পাদনায় সহযোগিতা করে আটাশটি দেশ—কিন্তু দুঃখের বিষয় সে তালিকায় বাংলাদেশ অথবা ভারতের নাম পর্যন্ত নাই। আমাদের দেশে শেকসপীয়র পঠিত হন, কিন্তু তাঁহার অনুশীলনের চেষ্টা দেখা যায় না। এই সময়ে ঋষি দাসের পুস্তক-প্রকাশ, তাঁহার গুরুতর অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এই দিক দিয়া দ্যোতনাপূর্ণ। এখন বাঙালী শিক্ষিত-সমাজের দায়িত্ব উপযুক্ত শেকস-পীয়র সমিতি গঠন করিয়া বাঙালী সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সগৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

বাঙালীর শেক্সপীয়র প্রেম

'ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি'—এই বলিয়া শেক্সসপীয়রকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের একজন প্রধান কবি। ভারত সাম্রাজ্য ও সেক্সপীয়রের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইতে বলিলে ইংল্যাণ্ড শেষোক্তকেই বাছিয়া লইবে কারলাইলেরএই ব্যবসাদারী হিসাব অপেক্ষা ইংল্যাণ্ড ও ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূক্ষ্মতর উপলব্ধি প্রতিভাত হইয়াছে এই বাক্যে। ইহা তো সুবিদিত বঙ্গীয় রেনেসাঁস এমন এক কূলপ্লাবী ভাবাবেগের ফল যাহাতে দুইটি লক্ষ্য একাকার হইয়া গিয়াছিল। তাহার একটি হইল পশ্চিম হইতে আনীত নতুন বিজ্ঞান ও মানববাদের প্রতি একাগ্র নিষ্ঠা আর অপরটি পরাধীনতা সম্পর্কে তেমনই সুতীব্র জ্বালাবোধ যাহারই ফল পরিণাম ভারতের অতীত গৌরবের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত। শেক্সপীয়র প্রসঙ্গে কালিদাসের উল্লেখ তাই আকস্মিক নয়। নাট্যকার হিসাবে কালিদাসও বিশ্ব-পরিচিতি দাবি করিতে পারেন। গ্যয়টে তাঁর একটি শ্রেষ্ঠতম শ্লোকে কালিদাসের 'শকুন্তলা'র প্রতি এই বলিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন:

Willst du die Blu*t*e des fr*u*hen
    die Fr*u*chte des sp*a*teren Jahres,
Willst du was reizt und entz*u*ckt
    willst du was s*a*ttigst und n*a*hrt,

Willst du den Himmel, die Ende,
mit einen Namen begreifen
Nenn'ich Sakuntala, Dich
und so ist Alles gesaget.

(কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত ও স্বর্গ একত্র দেখিতে চায় তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।)*

বাঙালী কবির কাছে অবশ্য কালিদাস তাঁর শত মাধুর্য সত্ত্বেও বিগতযুগের প্রতিনিধি শেক্সপীয়র মহত্তর কেননা তাঁর রচনায় জীবন্ত বাস্তবের হৃদস্পন্দন অনুভব করা যায়।

শেক্সপীয়র সম্পর্কে এই গভীর শ্রদ্ধা বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম চারিত্র-লক্ষণ আর তা পুষ্ট হইয়াছিল কলিকাতা হিন্দু কলেজ ও তার শিক্ষার প্রভাবাধীনে। আধুনিক ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি অনিবার্য সীমা নির্দেশক হইল এই শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা। "হিন্দু সম্প্রদায়ের শিশুদের উদারনৈতিক শিক্ষা দানের" জন্য বহু ব্যক্তির চাঁদায় এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। পরিকল্পনাটির প্রতি রাজা রামমোহন রায়ের পূর্ণ সহানুভূতি ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি ইহার সমর্থনে দাঁড়ান নাই। তাঁহার ভয় ছিল তাহা হইলে "রক্ষণশীল দেশবাসীর সংস্কার আহত হইবে এবং তাহার ফলে সমগ্র কাজটিই পণ্ড হইবে।" ১৮১৬ সালের ২৭শে আগস্ট দাতাদের এক সাধারণ সভায় পরিকল্পনাটি চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সেটা ছিল সেক্সপীয়রের মৃত্যুর দ্বিতীয় শতবার্ষিকী বৎসর। মাত্র কুড়িজন ছাত্র লইয়া কলেজটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় সোমবার, ২০শে জানুয়ারি, ১৮১৭। হিন্দু কলেজের ছাত্রদের তখন দুইটি ভাষা শিক্ষা করিতে হইত। তাহার মধ্যে ইংরাজী ছিল আবশ্যিক। ফলতঃ পরবর্তী দশ বছরে ইংরাজী শিক্ষার দ্রুত প্রসার হইল। ১৮২৭ সালে কলেজের উচ্চতম শ্রেণীর ছাত্রদের পড়িতে হইত পোপ-এর কবিতা-সংগ্রহ, 'ভাইকার অব ওয়েকফিল্ড', 'প্যারাডাইজ লস্ট' ও শেক্সপীয়রের নাটকাবলী। ১৮৩১ সালে জেনারেল কমিটির বিবরণীতে লেখা হইল "ইংরাজী ভাষার উপর এতটা দখল অর্জিত হইল এবং ঐ ভাষার সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে এতটা পরিচিতি সাধিত হইল যে ইওরোপের বিদ্যালয় সমূহে কদাচিৎ তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে।"

* রবীন্দ্রনাথ কৃত সারানুবাদ

এই চমকপ্রদ সাফল্যের জন্য অনেক পরিমাণেই দায়ী ছিল ১৮২৮ সালের ইংরাজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক হিসাবে এইচ. এল. ভি. ডিরোজিও'র নিয়োগ। এই পদ যখন লাভ করেন তখন ডিরোজিও'র বয়স মাত্র উনিশ বছর। কিন্তু শিক্ষক হিসাবে তিনি অচিরাৎ সাফল্য লাভ করিলেন। ইংরাজী ভাষায় তাঁর জীবন-চরিতকার লিখিয়াছেন, "তাঁর সময়ের আগে বা পরে ভারতবর্ষের কোনো দেশীয় শিক্ষায়তনের কোনো শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের উপর এতটা প্রভাব কোনোদিন বিস্তার করিতে পারেন নাই। শুধু ক্লাশঘরে শিক্ষাদানের সময়েই নয়, ডিরোজিও'র অমায়িক স্বভাব, অদম্য উৎসাহ, পরিহাসবোধ, অধ্যয়নের ব্যাপ্তি, শিক্ষাদানের আগ্রহ, ধৈর্য ও সৌজন্যবোধ ছাত্রদের হৃদয় জয় করিয়াছিল, অর্জন করিয়াছিল তাহাদের গভীর শ্রদ্ধা। শিক্ষাদানের অবসর সময়েও তিনি আলাপ-আলোচনায় ছাত্রদের অধ্যয়নে সাহায্য করিতে সদা-প্রস্তুত ছিলেন, ক্লাশঘরের পড়া-শুনার মধ্যে যে সব প্রসঙ্গ উঠিত সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করিতে ছাত্রদের তিনি উৎসাহ দিতেন। ক্লাশ শুরু হইবার আগে, কখনও বা দিনের কাজের শেষে ক্লাশের পড়া ছাড়াও ইংলণ্ডের সাহিত্য ও চিন্তার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ব্যাপকতর ও গভীরতর করিবার জন্য ডিরোজিও ইংরাজী সাহিত্য হইতে ছাত্রদের পড়িয়া শুনাইতেন। হিন্দু কলেজের যে-কোনো ছাত্রই তাহার এই "স্বেচ্ছাবৃত কর্মভারের সুযোগ লইতে পারিত।" ইতিহাসের এক নির্মম পরিহাস এই যে শিক্ষক হিসাবে তাঁহার সাফল্যই ডিরোজিও'র পতনের কারণ হইল। মুক্ত চিন্তায় তাঁহার উৎসাহদান হিন্দু প্রতিক্রিয়াকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। তাঁহার বিরুদ্ধে নীতিহীনতার এক আজগুবি অভিযোগ আনা হইল। প্রতিবাদে ১৮৩১ সালে ডিরোজিও পদত্যাগ করিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে তিনখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, সম্ভ্রমবোধ ও চারিত্র্যগুণে চেস্টারফিল্ডকে লেখা ডঃ জনসন বা ১৯১৯ সালে ভাইসরয়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রের মতো ইংরাজী ভাষার সুবিখ্যাত পত্রগুলির সঙ্গে তাহা তুলিত হইতে পারে।

হিন্দু কলেজের সহিত তাঁহার সাহচর্যের কথা বাদ দিলেও, ডিরোজিও বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের এক চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব। তাঁহাকে বাদ দিয়া বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কোনো বিবরণ রচনা করিতে গেলে তাহা অসম্পূর্ণ থাকিবে। এক পর্তুগীজ ব্যবসায়ী আর বিহারের জনৈক নীলকরের ভগিনী এক ইংরাজ রমণীর পুত্র ডিরোজিও তাহার প্রথম কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হইতে না হইতে

বিখ্যাত হইয়া পড়েন। তখন তাহার বয়ঃক্রম মাত্র অষ্টাদশ বৎসর। সেই হইতে যৌবনের সমস্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা লইয়া তিনি সাহিত্য-সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। সেকালে যে সমস্ত বিষয় মানুষের চিত্ত আলোড়িত করিত তাহার প্রায় সবগুলি লইয়াই তিনি গদ্য ও পদ্য রচনা করিয়া চলিলেন অবিশ্রান্তভাবে। আশ্চর্যের বিষয়, কলিকাতার কোনো একটি বে-সরকারি বিদ্যালয়ে ছয় হইতে চৌদ্দ. মাত্র এই আট বছর, তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তবু কবি হিসাবেই ডিরোজিও অমরত্বের দাবি করিতে পারেন। কিঞ্চিদধিক এক শতাব্দী কাল অতিক্রান্ত হইলেও তাঁহার সেই আবেগবিদ্ধ বাক্যের জ্যোতি কিছুমাত্র ম্লান হয় নাই। ১৮৩১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে ডিরোজিও পরলোক গমন করেন। কিন্তু কে ভুলিতে পারিবে ভারতবাসীর কাছে স্বাদেশিকতার তাঁর সেই উদ্দীপনাময় আহ্বান? তিনি ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রথম কবি-পথিকৃৎ, কাব্যিক রেনেসাঁসের যা ছিল একটি মূল সুর।

TO INDIA—MY NATIVE LAND

My Country ! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast.
Where is that glory, where that reverence now ?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou ;
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery.
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime.
Which human eye may never more behold ;
Aud let the guerdon of my labour be
My fallen country ! One kind wish from thee !

মধুসূদন দত্ত যখন ছাত্র হিসাবে হিন্দু কলেজে আসিলেন তখন ডিরোজিও

আর সেখানে ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি তখনও জাগরূক ছিল। হিন্দু কলেজের এই সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান ছাত্রটির, যিনি পরবর্তী জীবনে আধুনিক বাংলা কবিতার জনক হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত এই মহান শিক্ষকের কি যেন একটা অদৃশ্য যোগসূত্র ছিল। মাইকেল যেহেতু মুক্ত ছন্দে বীররসাক্রান্ত মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন সেহেতু সাধারণত তাঁহাকে মিলটনের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু মেজাজ এবং জীবনযাত্রার ধারার দিক হইতে মার্লোর সহিতই তাঁহার অধিকতর সাদৃশ্য চোখে পড়ে। তিনি আবার, আধুনিক অর্থে, আমাদের প্রথম নাট্যকারও এবং বাঙলায় জাতীয় রঙ্গশালা আন্দোলনের একজন প্রধান পুরোধা। ছাত্র হিসাবে মধুসূদন কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপাল ক্যাপটেন ডি এল রিচার্ডসনের প্রভাবাভিভূত হন। রিচার্ডসন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন ১৮১৯ সালে বেঙ্গল আর্মির ক্যাডেট হিসাবে কিন্তু দশ বছর পরে শারীরিক অসামর্থ্যের দরুন অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সাহিত্যচর্চায় আত্মোৎসর্গ করেন। তিনি একাধারে ছিলেন কবি, নিবন্ধকার ও সাংবাদিক আর শিক্ষণ-প্রতিভা যে তাঁহার সহজাত ছিল তিনি অচিরাৎ তাহারও প্রমাণ দিলেন। একদিন হিন্দু কলেজের ছেলেদের তিনি যখন ওথেলো পড়াইতে-ছিলেন মেকলে তাহা শোনেন। তিনি পরে রিচার্ডসনকে বলিয়াছিলেন: 'আমি ভারতবর্ষ সম্পর্কে আর সব কিছুই হয়তো ভুলিয়া যাইব কিন্তু কখনও ভুলিব না তোমার শেক্সপীয়র পড়ান।' মধুসূদন ছিলেন ডি. এল আর-এর ছাত্র-মহলে তিনি ঐ প্রীতিপূর্ণ নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন—একনিষ্ঠ শিষ্য। আর অনুকরণ যদি সনিষ্ঠ অনুরাগের নিরিখ হয় তবে সে পরীক্ষায়ও তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ হইবেন। গুরুর হস্তাক্ষর অনুকরণ করিতে না পারা পর্যন্ত তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। নিজের কবিত্ব-প্রতিভা সম্পর্কে সদা-সচেতন এবং রিচার্ডসনের মতো শিক্ষকের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ মাইকেল শেক্সপীয়রের প্রতি আজীবন অনুরাগ পোষণ করিতেন। চাহিলে শেক্সপীয়র নিউটন হইতে পারিতেন সতীর্থদের কাছে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সহজাত অনীহা সত্ত্বেও গণিতের রহস্যভেদের জন্য একবার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন এবং সত্য সত্যই এক পরীক্ষায় অঙ্কে বহু নম্বর পাইয়া বন্ধু ও শিক্ষকদের তাক লাগাইয়া দিলেন। পরে তিনি ল্যাতিন, গ্রীক, ইত্যালিয়ান ও ফরাসী ভাষা সহ আট-নয়টি ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন। কিন্তু দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী দারিদ্র্য-দীনপীড়িত মাইকেল যখন তাঁহার দ্বিতীয়

পত্নী, ফরাসী রমণী যাহাকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসিতেন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন তখন তিনি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন শেক্সপীয়রের সেই সুপরিচিত পংক্তিগুলিতেই, লেডি ম্যাকবেথের আকস্মিক মৃত্যুর পর ম্যাকবেথ যাহাতে জীবন-মৃত্যুর রহস্য উন্মোচনপ্রয়াসী হন।

রিচার্ডসনের প্রাণবন্ত শেক্সপীয়র পাঠন খুবই সুফলপ্রসূ হইয়াছিল। তাঁহার ছাত্রেরা শুধু পরীক্ষা-পাশের জন্য শেক্সপীয়র অধ্যয়ন করিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না, তাহারা ঘরোয়াভাবে শেক্সপীয়র আবৃত্তি করিতেন, আয়োজন করিতেন শৌখিন অভিনয়ের। এমন কি রিচার্ডসনের আগেও বাংলার শিক্ষিত-সমাজের যাহারাই হিন্দু কলেজ মারফৎ শেক্সপীয়র ও ইংরাজী নাটকের সহিত পরিচিত হন এবং ইংরাজী রঙ্গশালায় অভিনয় দেখেন তাহারাই নাটক সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহী হইয়া উঠেন। ইহারই ফলস্বরূপ জন্ম হইল 'হিন্দু থিয়েটার'-এর। ১৮৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর জুলিয়াস সীজারের নির্বাচিত দৃশ্যাবলী লইয়া এই রঙ্গশালার দ্বারোদ্ঘাটন হয়। এই রঙ্গশালা ক্ষণস্থায়ী হইয়াছিল কিন্তু ইহার প্রেরণা সহসা নির্বাপিত হয় নাই। ১৮৪৮ সালে আমরা দেখিতে পাই একজন বাঙালী অভিনেতা বাবু বৈষ্ণবচাঁদ আঢ্য কলিকাতার ব্রিটিশ থিয়েটার Sans Souci-তে ওথেলোর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ১৮৫৩ সালে দেখি বাঙালী তরুণদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ওরিয়েন্টাল থিয়েটার ওথেলো নাটকের ইয়াগোরূপী বাবু প্রিয়নাথ দে দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত করিলেন। পরবর্তী বৎসরে তাঁহারা "দ মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। পোর্সিয়ার ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন মিসেস গ্রীগ নামে এক ইংরাজ মহিলা। ১৮৫৫ সালে তাঁহারা আবার দর্শক সাধারণের সামনে উপস্থিত হইলেন—এবারে একটি অচলিত নাটক লইয়া। তাহা হইল শেক্সপীয়রের 'হেনরি দি ফোর্থ''।

১৮৫৫ সালের বাংলার শিক্ষা-ইতিহাসে এক রূপান্তরের যুগ শুরু হইল। এই বছর শুধু হিন্দুদের জন্য বেসরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে হিন্দু কলেজের অস্তিত্বের অবসান ঘটিল। সরকার ইহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া ইহার দরজা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ১৮৫৫ সালের ১৫ই জুন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হইল। প্রায় একই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও পূর্ণরূপ গ্রহণ করিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইল ১৮৫৭ সালের মার্চ

মাসে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ২৩ জন ছাত্র এই পরীক্ষায় বসিলেন এবং সকলেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন, যিনি পরবর্তীকালে উনিশ শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

মধুসূদন যেমন ছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার জনক তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র হইলেন আধুনিক বাংলা উপন্যাসের জনক। মধুসূদনের মতো বঙ্কিমচন্দ্রও মাতৃভাষা ব্যবহারের পূর্বে ইংরাজী ভাষায় সাহিত্যরচনার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৬৫ সালে প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইবার পর হইতে ১৮৯৪ সালে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁহার প্রথম উপন্যাসের সহিত 'আইভ্যানহো'র আপাতসাদৃশ্যের কারণে ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁহাকে সাধারণত স্যার ওয়াল্টার স্কটের সঙ্গে তুলনা করা হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতপক্ষে তাঁহার উপন্যাস শেক্সপীয়রের নাটকের নিকটতম। তাঁহার অধিকাংশ উপন্যাসেরই নাট্যরূপ দেওয়া হইয়াছে এবং সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। অদ্যাপিও তাহারা প্রভূত জনসমাদরধন্য। বঙ্কিমচন্দ্র অন্তত এমন একটি চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন (কপালকুণ্ডলা) "বিশুদ্ধ" নারীত্বের চিত্ররূপ হিসাবে যাহা শেক্সপীয়রের মিরাণ্ডার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে।

বাংলা অনুবাদে শেক্সপীয়রের নাটক পরিবেশনের কিছু কিছু প্রয়াস সাধারণ রঙ্গমঞ্চে কখন-সখন করা হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় এই প্রয়াসের সাফল্য খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। বাঙালী শিক্ষিতসমাজ যে কারণেই হউক বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রতি প্রসন্ন হইতে পারেন নাই। ইহার একটা কারণ হয়তো এই যে কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শেক্সপীয়র পাঠন ও শৌখীন ও পেশাদার দলের অভিনয় বিপরীতমুখী খাতে প্রবাহিত হইয়াছে। কোলরিজ ও ল্যাম যে ঐতিহ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং ব্র্যাডলের কাছে যাহা অবিসংবাদী প্রামাণিকতা লাভ করিয়াছে তাহার অনুসরণে শেক্সপীয়রের নাটকাবলী আদর্শ নাট্যকীয় কাব্য হিসাবেই পড়ান হইত—যাহার রসগ্রহণ করিতে হয় এককভাবে অনুভবের মধ্য দিয়া—রঙ্গমঞ্চে পরিবেশনের বাস্তব সমস্যা ও দর্শকসাধারণের সমবেত প্রতিক্রিয়ার সহিত তাহা সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কবিবর্জিত। ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনেতাদের প্রতি

অধ্যাপক এইচ. এম. পার্সিভালের মনোভাব। কোনো এক ছাত্রের কাছে এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন: "রঙ্গলয়ের লোকেদের শেক্সপীয়র সমালোচনায় আস্থা স্থাপন করিও না। তুমি-আমি শেক্সপীয়র পড়ি ও অনুভব করি; উহারা শেক্সপীয়র অভিনেতা, উহারা অনুভবের ভান করে।"

অধ্যাপক পার্সিভাল ভারতবর্ষে শেক্সপীয়র-বিদ্যার শীর্ষস্থান অধিকারী। ১৮৫৫ সালে চট্টগ্রামে এক ভারতীয় খ্রীষ্টান পরিবারে তাহার জন্ম। তিনি বিলাত যান ১৮৭৩ সালে। সেখানে ধ্রুপদী বিদ্যায় ও ফরাসী ভাষায় উচ্চসম্মান লাভ করিয়া তিনি স্নাতক হন। লণ্ডনে ধ্রুপদী বিদ্যায় এম. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে অধ্যাপক ব্ল্যাকির উচ্চতর গ্রীক ক্লাস ও এডিনবরায় অধ্যাপক সেলারের "অগ্রসর ছাত্রদের" ল্যাটিন ক্লাসে যোগ দেন। ১৮৭৯ সনে তিনি এই পরীক্ষায় সোনার পদকের ঠিক পরবর্তী দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তিনি হেনরি মরলে'র অধীনে ইংরাজী সাহিত্য ও ক্রুম রবার্টসনের অধীনে দর্শনের ক্লাসেও অধ্যয়ন করেন। তদুপরি তিনি নিয়মিত পাঠের অবসরে এডিনবরায় প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যার পাঠক্রমও শেষ করেন এবং ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন হইতে সার্টিফিকেট অব মেরিট লাভ করেন। ক্লাসে লেকচার দিবার সময় অবশ্য বিদ্যা জাহীর করিবার কোনোরূপ চেষ্টা তিনি করিতেন না। দুর্বোধ্য অংশকে বা সুদূরতম অনুষঙ্গও তিনি কখনও এড়াইয়া যাইতেন না। যদিও তিনি শেক্সপীয়র বিশেষজ্ঞরূপেই সমধিক পরিচিত ছিলেন তথাপি বিখ্যাত অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারির পূর্বে প্রকাশিত তাঁহার-কৃত মিল্টনের স্যামসন অ্যাগনিস্টিস ও স্পেনসরের ফেয়ারী কুইন-এর সংস্করণগুলি হইতে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার সাহিত্যগত ও ভাষাতাত্ত্বিক গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শেক্সপীয়র বিষয়ে তাঁহার লেকচারগুলি ছাত্রদের এক নতুন সৌন্দর্যের জগতে লইয়া যাইত, যে জগতে নিকৃষ্ট সমালোচকদের প্রবেশাধিকার নাই। তিনি কখনও অন্য লোকের অভিমতের বাহক ছিলেন না। বলিতে কি তিনি ১৯২৬ সালের পূর্বে শেক্সপীয়র সম্পর্কে ক্রোচে বা ব্রাডলের বই পড়েন নাই। তখন তিনি কর্ম অবসর লইয়া লণ্ডনে বাস করিতেছিলেন। "ইণ্ডিয়ান শেক্সপীয়র" সিরিজের বইগুলি প্রকাশের দায়িত্ব লইবার পরই তিনি ঐগুলি পড়িয়াছিলেন। পড়িবার সময় তাঁহার মনে সংশয় ছিল হয়তো তাঁহার এতদিনকার ধ্যানধারণা সব নস্যাৎ হইয়া যাইবে। তাই কিছুটা স্বস্তির সঙ্গেই পরে তিনি বলিয়াছিলেন:

"তাহা হয় নাই।" ক্রোচে এবং ব্রাডলে সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্যগুলি উদ্ধারযোগ্য :

"Croce's biggest fault is that he forgets his own standard—to judge Shakespeare by our emotions—and becomes metaphysical now and then (he is a Hegelian). But so is Bradley now and then, without rising to any height that Croce reaches. Bradley is painstaking, has read Shakespeare carefully, draws his conclusions conscientiously ; but what he so draws and states might have been stated effectively in one-fourth of the space he takes up. He does not understand the minor character in *Macbeth* and misunderstands the scene between Macduff and Malcolm. I see he uses those crutches, the tests, (down to decimals on the subject of "stopped" an "unstopped" I think)—crutches that people who can walk reverently on their own two legs behind Shakespeare should disdain to use."

একত্রিশ বছর একাদিক্রমে চাকুরী করিবার পর অধ্যাপক পার্সিভাল ১৯১১ সনে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ গুরুর প্রতি তাঁহার একাগ্র নিষ্ঠার মধ্য দিয়া তাঁহার স্মৃতি পরবর্তীকালের ছাত্রসমাজের মধ্যে জাগাইয়া রাখেন। ১৯১৫ সাল হইতে পরবর্তী পঁচিশ বৎসরকাল তিনি বিশেষ যত্ন সহকারে শেক্সপীয়র অধ্যাপনা করেন। অধ্যাপক ঘোষ অবশ্য অধ্যাপক পার্সিভালের মতো মহাকোষিক পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন না কিন্তু তাঁহার এমন একটি গুণ ছিল যা তাঁহার গুরুর ছিল না। তিনি শেক্সপীয়র পড়িতেন চমৎকার। এদিক দিয়া তিনি রিচার্ডসনের ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছিলেন। এই গুণটি আরও চমৎকৃত করে যখন মনে করি তাঁহার অধিকতর বিখ্যাত পূর্বসূরী ডিরোজিওর মতো তাঁহার শিক্ষা হইয়াছিল পুরাপুরি কলিকাতাতেই। পার্সিভালের প্রতি আনুগত্য সত্ত্বেও অধ্যাপক ঘোষ তাহার ক্লাশকে রঙ্গমঞ্চের নিকটতর করিয়াছিলেন, নাটক পাঠনের প্রাণস্পন্দিত অন্তঃস্থলে পৌঁছিয়াছিলেন। তিনি আজ আর আমাদের মধ্যে নাই কিন্তু বাংলা দেশে বিভিন্ন কলেজে আজ

যাঁহারা শেক্সপীয়র পড়ান তাঁহাদের অধিকাংশই তাঁহার ছাত্র এবং ছাত্র বলিয়া গর্বিত।

বিদ্যালয়ের বাহিরেও বাংলাদেশে একনিষ্ঠ শেক্সপীয়র অনুরাগীর সংখ্যা কম নহে। আমাদের নাট্যকারেরা প্রায় সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই শেক্সপীয়র অনুরাগ তাঁহাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ যাঁহারা তাঁহার মূল রচনা পাঠ করিয়াছেন। অত্যন্ত দুঃখের কথা তাঁহার রচনাবলীর যথাযথ অনুবাদ আজ অবধি হয় নাই। অনুবাদ কিছু আছে কিন্তু তাহা প্রায়শই সন্তোষজনক নহে। শ্রীঋষি দাস-কৃত তাঁহার প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবন-চরিত মাত্র কয়েক বছর আগে প্রকাশিত হইয়াছে। দেরীতে হইলেও ইহাকে শুভ সূচনা বলিতে হইবে। কয়েক বছর আগে বঙ্গীয় শেক্সপীয়র পরিষদও স্থাপিত হইয়াছে। এই পরিষদের উদ্দেশ্য .

শেক্সপীয়রের রচনাবলীর যথাযথ বাংলা তরজমা প্রকাশ করা ;

বাংলা টীকা, টিপ্পনি ও ভূমিকা সহ সম্পাদিত শেক্সপীয়রের রচনাবলী প্রকাশ ;

সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বাংলা তরজমায় শেক্সপীয়রের নাটক পরিবেশন ;

বিভিন্ন নাটকদলের সহযোগিতায় বাংলা এবং ইংরাজীতে শেক্সপীয়রের নাটক অভিনয়ের আয়োজন করা।

এই সমিতির প্রস্তুতি কমিটিতে যোগ দিয়াছিলেন কয়েকজন প্রথম সারির অভিনেতা। ইহাদের মধ্যে ছিলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী যিনি কলেজে শেক্সপীয়র অধ্যাপনা ছাড়িয়া সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ও নাট্যপরিচালক হইয়াছিলেন এবং শেক্সপীয়র সাহিত্যের তন্নিষ্ঠ ছাত্র উৎপল দত্ত যিনিও রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্রকে বরণ করিয়াছেন। আর ছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, লীলা মজুমদারের মত সাহিত্যিকবৃন্দ, অধ্যাপক পি. কে. গুহ, ডঃ এম. এম. ভট্টাচার্য, ডঃ এস. সি. সেনগুপ্ত প্রমুখ অধ্যাপকেরা। সমিতি বিশেষ সাফল্যের সহিত কয়েকটি শেক্সপীয়র পাঠের বৈঠক আয়োজন করেন। ভারতের সঙ্গে শেক্সপীয়রের যোগাযোগের যে স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছিলেন সমিতি তাহাদের কর্মকাণ্ডে তাহাকে রূপ দিতে পারিবে বলিয়া আশা রাখে।

শেক্সপীয়রের মৃত্যুর তৃতীয় শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯১৬ সনে যে Book of Homage to Shakespeare প্রকাশিত হয় ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ তাহাতে ইংরাজী অনুবাদ সহ একটি বাংলা সনেট রচনা করিয়া

দিয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার ইংরাজী রচনাবলীর মধ্যে এই ইংরাজী তরজমাটি স্থান পায় নাই :

"When by the far-away sea your fiery disk appeared from behind the unseen, O poet, O Sun ; England's horizon felt you near her breast, and took you to be her own.

"She kissed your forehead, caught you in the arms of her forest branches, hid you behind her mist mantle, and watched you in the green sward where fairies love to play among meadow-flowers.

"A few early birds sang your hymn of praise while the rest of woodland choir were asleep.

"Then at the silent beckoning of the Eternal you rose higher till you reached the midsky, making all quarters of heaven your own.

"Therefore at this moment after the end of centuries the palm groves by the Indian seas raise their tremulous branches to the sky murmuring your praise."*

* মূল ইংরাজী হইতে লেখকের অনুমতিক্রমে অনূদিত

সাম্প্রতিক বিচারে শেক্সপিয়ার

শেক্সপিয়ার সম্বন্ধে বই লেখায় যেন বিরাম নাই। এই একটি লেখকের জীবন ও নাটকাবলী সম্বন্ধে যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, শুধু ইংরেজী ভাষাতেই, তাহা দ্বারা প্রকাণ্ড পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠা করা যায়। অথচ শেক্সপিয়ার-সমালোচনা কেবল ইংরেজী ভাষাতেই আবদ্ধ নহে। পৃথিবীর সকল সভ্য ভাষায় তাঁহার প্রতিভার আলোচনা অপরিহার্য্য। হেমচন্দ্রের উক্তি,—ভারতের কালিদাস, জগতের তুমি, ইহা লইয়া এই তর্ক উঠিতে পারে যে কালিদাস আজ কাব্যজগতে সর্ব্ব ভারতীয়ত্বের দাবী করিতে পারেন কি না, কারণ তাঁহার যুগ বহুদিন অতীত হইয়া গিয়াছে। হায় কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল। কিন্তু শেক্সপিয়ারের মহত্ত্ব সম্বন্ধে ইংরেজ কবির প্রশস্তি—"অন্যে সবে প্রশ্নাধীন, তুমি তর্কাতীত" আজিও সর্ব্বত্র সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে সাহিত্য সমাজে গৃহীত। বস্তুতঃ বলা যাইতে পারে যে, শেক্সপিয়ারপূজা যেন একপ্রকারের কাল্ট হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভক্তির আধিক্য বশতঃ এমন উদ্ভট ও অদ্ভুত মতামত তাঁহার সম্বন্ধে প্রচারিত হইয়াছে যে মরণের পরপারে মহাকবি সেই সব জানিতে পারিলে অকুণ্ঠে স্বীকার করিতেন যে কল্পনার প্রাচুর্য্যে তাঁহার অনুচরেরা তাহাদের গুরুকে বহু পশ্চাতে ফেলিয়া গিয়াছে। এই আতিশয্যে বিরক্ত হইয়া স্বভাবসিদ্ধ তিক্ততার সহিত স্ট্রিণ্ডবার্গ একবার বলিয়াছেন, সভ্যজগতে ঈশ্বরের

অস্তিত্বে সন্দেহ করা বরং সম্ভব কিন্তু শেক্সপিয়ারের অদ্বিতীয়ত্বে সন্দেহ করা অসম্ভব।

এই পূজাপদ্ধতি গড়িয়া উঠিতে সময় লাগিয়াছে। কবির জীবিতকালেই ইহা শুরু হয় নাই। তবে এ ধারণা সত্য নহে শেক্সপিয়ার বিরাট কবি বলিয়া তাঁহার সমকালে অবজ্ঞাত ছিলেন। বেন জনসন ও মিলটনের সাবেগ বন্দনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা সম্বন্ধে রুচিভেদে প্রশ্ন করার সাহস ড্রাইডেন, পোপ, জনসনের ছিল। বলা যাইতে পারে রোমাণ্টিক যুগ হইতেই এই কাল্ট্-এর আরম্ভ, এবং কোলরিজ, হ্যাজলিট, ল্যাম্ব তাহার প্রধান উদ্যোক্তা। ব্র্যাডলি-র পৌরহিত্যে তাহার সর্ব্বোচ্চ বিকাশ। তখন জনসমাজে সাহিত্য-বিচারে "শেক্সপিয়ার স্বতঃ সিদ্ধ" স্বীকৃত হইল, ও প্রমাণিত হইল বেন জনসনের সুপরিচিত ভবিষ্যদ্বাণী—"তুমি একযুগের নও চিরকালের।"

ব্র্যাডলির ব্যাখ্যানের পর হইতে সাধারণতঃ আলোচনার ধারা মোড় ঘুরিল। শেক্সপিয়ারের কবিত্বশক্তিকে আর সমগ্রভাবে বিচার করার প্রয়োজন রহিল না; রহিল শুধু তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার কোনো একটি দিক গ্রহণ করিয়া তাহারই অনুশীলনে জীবন ব্যয় করা। কেহ বাছিয়া লইলেন যতিচিহ্নের ব্যবহার, কেহ তৎকালীন রঙ্গমঞ্চের বিধিনিষেধ, কেহ বিভিন্ন সংস্করণের পাঠ-বিভেদ, ইত্যাদি। সন্দেহ নাই, এই পুঞ্জীভূত প্রচেষ্টায় শেক্সপিয়ার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রচুর বাড়িয়াছে। প্রশ্ন এই, ইহা দ্বারা শেক্সপিয়ারের মর্ম্মে প্রবেশ করার পথ সুগম হইয়াছে কি না।

সমালোচক হিসাবে থিয়োডোর স্পেনসার-এর (১) বিশেষত্ব এইখানে। ১৯৪২ সালে 'লোয়েল লেকচার্স' দিতে গিয়া তিনি তাঁহার বিষয় বাছিয়া লইলেন, "শেক্সপিয়ার ও মানব চরিত্র"। ইনি খণ্ড আলোচনায় তৃপ্ত নহেন। ইঁহার উদ্দেশ্য শেক্সপিয়ারের নাটকাবলী সমগ্রভাবে পুনরায় আলোচনা করা, ইতিহাস ও দর্শন উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায়। ভূমিকায় তিনি বলিতেছেন ঃ

Our aim is to describe the point of view that underlies the frame-work that gave Shakespeare his terms and his values. It is Shakespeare's vision of life we are after, its dependence

(১) Theodore Spencer—Shakespeare and the Nature of Man. (Macmillan)

on contemporary thought, its development through dramatic form, and its universal truth.

কোনো কবি, এমন কি শেক্সপিয়ারও, স্বয়ম্ভূ নহেন। তাঁহাকে জন্মিতে হয় নির্দ্দিষ্ট কালে, বাড়িতে হয় নির্দ্দিষ্ট পরিবেশে, গ্রহণ করিতে হয় পূর্ব্বতনের ধ্যানধারণা শিক্ষাদীক্ষা, ও তাহারই ভিত্তিতে অর্জ্জন করিতে হয় স্বকীয়তা। সুতরাং কবির স্বকীয়তার পরিমাণ করিতে হইলে প্রথমেই বিচার করা দরকার তিনি কতখানি উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়া ছিলেন। অর্থাৎ কবিকে বিচার করিতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন তাঁহার যুগের বিচার। কিন্তু যাহা কবির কাছে ছিল সহজ স্বাভাবিক, তিন শতাধিক বৎসর পরে তাহা পাঠকের নিকট হইয়া উঠিয়াছে কঠিন দুরূহ। শেক্সপিয়রের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তিগণ যে চোখ দিয়া পৃথিবীকে দেখিতেন বর্ত্তমানে তাহা আমাদের পক্ষে আয়ত্ত করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। থিয়োডোর স্পেনসারের গ্রন্থখানি এই প্রসঙ্গে পাঠককে প্রচুর সহায়তা করিতে পারিবে। ষোড়শ শতকের শেষ পাদে ইংলণ্ডে যে সমস্ত প্রত্যয় ও বিশ্বাস,—বিশ্বপ্রকৃতি, মানবপ্রকৃতি ও সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে,—তখনকার মানুষের অন্তরে সঞ্চিত ছিল তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাবে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে যে শ্রমশীলতা, তথ্যনিষ্ঠা ও লিপি-দক্ষতার প্রয়োজন হইয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

শেক্সপিয়ার জন্মিয়াছিলেন দুইটি বৃহৎ ঐতিহাসিক যুগের সন্ধিক্ষণে। ইহার একদিকে ছিল সুপ্রাচীন স্থিতিশীলতা, শৃঙ্খলা, ও উচ্চ নীচ ব্যবস্থা; অন্যদিকে দ্রুতগতিশীলতা, আলোড়ন ও অধিকারভেদ সম্বন্ধে মর্ম্মভেদী প্রশ্ন। একদিকে মধ্যযুগ, অন্যদিকে নবজন্ম। শেক্সপিয়ারের সমকালীনরা বোধ হয় সেই শেষ পর্য্যায়ের লোক যাহারা মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যজ্ঞানকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করিতে পারিত। মধ্যযুগীয় দর্শনে বলেঃ সমস্ত বিশ্ব মানুষের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, মানুষেই তাহা প্রতিবিম্বিত, মানুষই তাহার সংক্ষিপ্তসার। মানুষ হইতেছে বিশ্বপ্রকৃতির কেন্দ্রস্থলে। সৃষ্টিতে যে শৃঙ্খলা আছে তাহা প্রকাশিত হইতেছে চতুর্ভূতের ব্যবহারে, আকাশের তারকারাজিতে, আধ্যাত্মিক শক্তির ক্রমভেদে, সমাজবিন্যাসের শ্রেণীভেদে। সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ, সমস্ত সৃষ্টির পরিণতি মানুষে। এই মধ্যযুগীয় দর্শন যে শেক্সপিয়ার সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহার নিদর্শন তাঁহার নাটকে পাওয়া যায়। এমন কি এ দর্শনকে তাঁহার চেয়ে শক্তিশালী ভাষায় আর কেহ প্রকাশ

করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। 'ট্রইলাস এণ্ড ক্রেসিডা' নাটকে শৃঙ্খলার গুণগানে ইউলিসিস বলিতেছেন—

The heavens themselves, the planets, and this centre
Observe degree, priority, and place,
Insisture, course, proportion, season, form,
Office, and custom, in all line of order :
And therefore is the glorious planet Sol
In noble eminence enthroned and sphered.
Amidst the other ; whose med'cinable eye,
Corrects all ill aspects of planets evil
And posts, like the commandment of a king,
Sans check, to good and bad : but when the planets
In evil mixture to disorder wander,
What plagues, and what portents, what mutiny,
What raging of the sea, shaking of earth,
Commotion in the winds, fights, changes, horrors,
Divert and crack, rend and deracinate
The unity and married calm of states
Quite from their fixure ! O, when degree is shaked,
Which is the ladder to all high designs,
The enterprise is sick How could communities,
Degrees in schools, and brother-hoods in cities,
Peaceful commerce from dividable shores,
The primogenitive and due of birth,
Prerogative of age, crowns, sceptres, laurels,
But by degree, stand in authentic place ?
Take but degree away, untune the string,
And hark ! what discord follows ; each thing meets
In mere oppugnancy : the bounded waters
Should lift their bosoms higher than the shores,

And make a sop of all his solid globe :
Strength should be the lord of imbecility,
And the rude son should strike his father dead :
Force should be right ; or rather, right and wrong—
Between whose endless jar justice resides—
Should lose their names, and so should justice too.
Then everything includes itself in power,
Power into will, will into appetite ;
And appetite, a universal wolf,
So doubly seconded with will and power,
Must make perforce a universal prey.
And last eat up himself.

ইউলিসিস-এর এই বক্তৃতার শৃঙ্খলাভঙ্গের যে নিদারুণ ভয় প্রকাশ পাইয়াছে শেক্সপিয়ারের জীবদ্দশাতেই ইংলণ্ডের সমাজে তাহা ঘটিয়া গেল নবজন্মের প্রাদুর্ভাবে। বিশ্বপ্রকৃতি, মানব-প্রকৃতি ও সমাজবিন্যাসে শৃঙ্খলা ও স্তরভেদে যে অনমনীয় বিশ্বাস ছিল মধ্যযুগীয় ধর্ম, তাহার বিপক্ষে জাগিল সন্দেহ ও প্রশ্ন। কোপার্নিকস-এর গণনা বিশ্ববিজ্ঞানে বিপ্লব ঘটাইল, মতেন-এর রচনা মানবপ্রকৃতিতে প্রশ্ন জাগাইল, আর ম্যাকিয়াভেল্লীর মতামত সমাজবিন্যাসে যুগান্তরের সূচনা করিল। চিন্তাজগতে এই প্রতিঘাতের ফল হইল কল্পনাতীত।

প্রথমশ্রেণীর গীতিকবি হইবার প্রতিভা শেক্সপিয়ারের ছিল, সনেটগুলি তাহার প্রমাণ। লঘু হাস্য পরিহাসে ও কমেডি রচনায় তাঁহার দক্ষতা এমনই অসাধারণ ছিল যে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিলেও তিনি সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিতে পারিতেন। কিন্তু সকলেই জানেন, শেক্সপিয়ারের প্রধান গৌরব তাঁহার ট্রাজেডি। কি ভাবে ইহা সম্ভব হইল ?

থিয়োডোর স্পেনসারের মতে, মানুষের ইতিহাসে কতকগুলি যুগ আছে মানব-প্রকৃতি-সংক্রান্ত মৌলিক সমস্যাগুলি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে ও প্রকাশিত হয় অসাধারণ আবেগের সহিত। এমনই একটি যুগে শেক্সপিয়ার জন্মান। এই যুগে চিরন্তন সমস্যাগুলি—ভালো ও মন্দের সমস্যা, মানুষের মহত্ত্ব ও নীচত্বের সমস্যা, বাস্তব ও প্রতীয়মানের সমস্যা—নূতন সজীবতার

সহিত আলোচিত হইতেছিল। এই সমস্যাগুলি ছিল এমনই প্রাণবান্ ও কালের গতির সহিত এমন জড়াইয়া গিয়াছিল যে রঙ্গমঞ্চের লৌকিক সাহিত্য দিয়া তাহা সাধারণেরও অভিগম্য ছিল। এই গতিকে গ্রহণ করিয়াই শেক্সপিয়ার নিজেকে তদুপরি স্থাপিত করিলেন। নাটকে, বিশেষতঃ ট্রাজেডীতে মূল বিষয়বস্তু কোনো না কোনো রূপে সংঘর্ষ হইতে বাধ্য। বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে দুইটি বিপরীত অভিমত, একটি মধ্যযুগের অন্যটি নবজন্মের, ইহাদের সংঘর্ষ তাঁহার চিন্তা ও অনুভূতির মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করে ও তাঁহাকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার করিয়া তোলে।

তাঁহার লেখক-জীবন শুরু হয় এই সংঘর্ষকে নাটকীয় রূপদানের চেষ্টায়। তখন তাঁহার দৃষ্টি ছিল অগভীর, এবং তিনি তখনও মানবচরিত্রের পুরাতন মূল্যবোধ কেবল পশ্চাদপট হিসাবে ব্যবহার করিতেন। দ্বিতীয় পর্ব্বে, বিরাট ট্রাজেডীগুলিতে এই সংঘর্ষ গভীরতর হয়, পুরাতন স্থায়ী শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে নবজন্মসঞ্জাত ব্যক্তিত্বপ্রকাশের বিদ্রোহের গর্জ্জন প্রচণ্ড হইয়া ওঠে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বে, যে বিদ্রোহকে শমিত না করিলে পুনরায় শৃঙ্খলা আসিতে পারে না। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ পর্ব্বে বিদ্রোহের স্বর নত হইয়া আসে, বাস্তবের সহিত প্রতীয়মানের দ্বন্দ্বের আধ্যাত্মিক নিরসন হয়, এবং শান্তির সান্ধ্যশোভায় তাঁহার লেখকজীবনের সমাপ্তি হয়। মানবচরিত্র সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে দুইটি বিপরীত দর্শনের আমূল সংঘাত—এই সূত্র অনুসরণ করিয়া থিয়োডোর স্পেনসার শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর মর্ম্মে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছেন। নবজন্মের বিদ্রোহী বাণী কোপারনিকস, মতেন ও মাকিয়াভেল্লীর রচনাবলীর প্রভাবে কিভাবে লোকচিত্তে আসন অধিকার করিতেছিল শেক্সপিয়ারের রচনারম্ভের পূর্ব্বেই তিনি তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছেন। প্রসঙ্গত পিউরিটান আন্দোলন, ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের উল্লেখ থাকিলেও থিয়োডোর স্পেনসারের মতে শেক্সপিয়ারকে বুঝিতে হইলে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন উপরোক্ত দুইটি বিপরীত দর্শনের সংঘাতের সম্যক উপলব্ধি। যে কোন যুগেই হউক, মহৎ ট্রাজেডি লিখিত হইতে গেলে, তাঁহার মতে, এই অবস্থা অবশ্যম্ভাবী—প্রথম, একটি গৃহীত ও চিরাচরিত বিশ্বাস ও ব্যবহারের প্যাটার্ন; দ্বিতীয়, এই প্যাটার্ন কি ভাবে লঙ্ঘন করা যায় সে সম্বন্ধে সুতীব্র চেতনা। এই প্যাটার্ন যদি বিধির বিধান হয় তাহার লঙ্ঘন আসে এস্কিলাস-এর নাটক; সামাজিক বিধান হইলে, তাহার লঙ্ঘনে রচিত হয় ইবসেনের নাটক। আর যদি সেই

প্যাটার্নের অন্তর্ভুক্ত হয় মানুষের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক সর্ব্বপ্রকারের বিশ্বাস, এবং তাহার লংঘন হয় এমন শ্রেণীর যে, কোনো এক ক্ষেত্রে আঘাত লাগিলে তাহা সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে, ইংলণ্ডে ষোড়শ শতকের শেষপাদে যেমন ঘটিয়াছিল. তাহা হইলেই সৃষ্ট হয় শেক্সপিয়ারের নাটক, যাহাতে আপাতপ্রতীয়মান একটি ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্ব সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সকল মানবের অন্তরকে আলোড়িত করে। শেক্সপিয়ার তাই একটি দেশের একটি যুগের কবি নহেন, তিনি সমগ্র মানব-চরিত্রের কবি।

শেক্সপিয়ারের কবি-প্রতিভার এই যে মূল্যবিচার—ইহাতে নিহিত আছে ইতিহাস ও সমাজবিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট দার্শনিকতা যাহাকে বলা হয় ভাববাদ। কিন্তু বস্তুবাদী দর্শনের দিক হইতে শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীর যে আলোচনা ইতিপূর্ব্বে হইয়া গিয়াছে থিয়োডোর স্পেনসার তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। অথচ ইহা তাঁহাদের পাণ্ডিত্যের পরিধির বাহিরে থাকিবার কথা নয়। ইংরেজী ভাষায় এই আলোচনার সূত্রপাত করেন ক্রিস্টোফার কডওয়েল ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত তাঁহার সুবিখ্যাত "ইলিউসন এণ্ড রিয়ালিটি" নামক গ্রন্থে। কডওয়েল মার্কসবাদী ছিলেন। মার্কসবাদ কি প্রণালীতে সাহিত্যের বিচার করে তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই গ্রন্থ। তাছাড়া ১৯৪২ সালে থিয়োডোর স্পেনসার যখন এই বক্তৃতাগুলি দিতেছিলেন তখন তাঁহার স্বদেশ, ইউ. এস. এ, মার্কসবাদী রাষ্ট্র ইউ, এস. এস. আর-এর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। সাহিত্যিক হিসাবে মার্কসীয় দর্শনে সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হওয়া তাঁহার পক্ষে অসঙ্গত ছিল না। সোভিয়েট সাহিত্যিক স্মিরনভ শেক্সপিয়ার সম্বন্ধে যে পুস্তক লেখেন তাহা ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হইয়া কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকাতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহা এদেশেও পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। (২) যাঁহারা মার্কসবাদী সাহিত্যবিচারে আগ্রহশীল, এ দুইটি গ্রন্থ তাঁহাদের অবশ্য পঠিতব্য।

স্মিরনভ-এর মতে, শেক্সপিয়ারকে যে বলা হয় তিনি সমগ্র মানবপ্রকৃতির কবি, তিনিই বিশ্বমানব—এটা একটা ফাঁকা, ভূয়ো সম্মান। এইভাবে তাঁহার বৈপ্লবিক মানবিকতাকে মাত্র উদার মানবহিতৈষণায় রূপান্তরিত করা হয়। শেক্সপিয়ার সেই বিপ্লবী যুগের কবি যাহাকে এঙ্গেলস্ বলিয়াছেন, সেইকাল

(২) Shakespeare : A Marxist Interpretation. By A. A. Smirnov, Progressive Forum, Calcutta.

পর্যন্ত মানুষের ইতিহাসে যত বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে সব চেয়ে প্রগতিশীল। এ যুগের প্রধান বিশেষত্ব ভাব-সংঘর্ষ নয়, শ্রেণী-সংঘর্ষ; ফিউডাল আভিজাত্যের অবসান ও বুর্জোয়া শাসকশ্রেণীর উদ্ভব। এই যুগ-বিপর্যয়ের সমস্ত ইতিহাস কাব্যরূপে সংকুচিত হইয়া আছে শেক্সপিয়ারের নাটকাবলীতে। শেক্সপিয়ার বুর্জোয়া বিপ্লবের মানবিকতার কবি। বুর্জোয়া শ্রেণীর যখন প্রথম আবির্ভাব হয় তখন তাহারাই ছিল সমগ্র মানবসমাজের প্রগতির অগ্রদূত। মানব প্রগতির ইতিহাসে তাহাদের অবদান সম্পর্কে ১৮৪৮ সালে "সাম্যবাদীর ঘোষণা"য় লিখিত আছে—

The bourgeoisie, historically, has played a most revolutionary part.

The bourgeoisie, whenever it got the upperhand, has put an end to all feudal, partiarchal, idyllic relations. It has pitilessly torn asunder the motley feudal ties that bound man to his "natural superiors", and has left no other nexus between man and man than naked self-interest, than callous "cash payment."

The bourgeoisie can not exist without constantly revolutionising the means of production, and thereby the relations of production, and with them the whole relations of society. Conservation of the old modes of production in unalterd form was, on the contrary, the first condition of existence for all earlier industrial classes. Constant revolutionising of production, uninterrupted disturbance of all social conditions, everlasting uncertainty and agitation distinguish the bourgeois epoch from all earlier ones. All fixed and fast-frozen relations, which their train of ancient and venerable prejudices and opinions, are swept away, all new-formed ones become antiquated before they can ossify. All that is solid melts into air, all that is holy is profaned, and man is at last compelled to face with sober senses his real conditions of life and his relations with his kind.

ফিউডাল আভিজাত্যের বিরুদ্ধে নবজাত ধনিকবর্গের অভিযান, ইংলন্ডের ঐতিহাসিক কারণে, এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল যেখানে রাজা প্রতিক্রিয়াশীল অভিজাতবর্গের বিরোধে ধনিকগণের সহায়ক হইলেন। রাজাই তখন প্রকৃত দেশসেবক, প্রকৃত জননায়ক; রাজসভাই প্রগতিশীল জনমতের উজ্জ্বল কেন্দ্র। তাই দেখিতে পাওয়া যায় শেক্সপিয়রের প্রথম যুগের নাটকে প্রধান চরিত্র, রাজা বা রাজকুমার বা রাজবংশীয় অভিজাত। শেক্সপিয়ারের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মূল সুর; নিরঙ্কুশ একচ্ছত্র রাজার শাসনাধীনে জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপন। কিন্তু ইহা প্রাচীনযুগের উপাসনা নয়, ইহা ফিউডাল আধারে বুর্জোয়া আধেয়ের প্রকাশ। আর দেখিতে পাওয়া যায়, বন্ধনমুক্ত ব্যক্তি-মানবের জীবন উপভোগের উন্মুখর উল্লাস, তাঁহার প্রথম যুগের কমেডি-গুলিতে। ফিউডাল যুগের আজন্ম মৃত্যু শারীরিক মানসিক বন্ধনের দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভের পর—শোষিত সমাজের ইহাই কি উপযুক্ত মনোভাব নয়? এঙ্গেলস্-এর ভাষায় এ-যুগ ছিল ঃ

A period which loosened all the old ties of society and shattered all inherited conceptions. The world had suddenly become ten times bigger; instead of a quadrant of a hemisphere, the whole globe now lay before the eyes of the West Europeans, who hastened to take possession of the other seven quadrants. And along with narrow barriers of their native land, the thousand year old barriers of medieval conventional thought were also broken down. An infinitely wider horizon opened out both before the outward and inward gaze of man. What mattered the prospects offered by respectability, or the honourable guild privileges inherited through generations, to the young man tempted by the wealth of India, the gold and silver mines of Mexico and Potosi.

উদীয়মান ধনতন্ত্রের এই বিশ্ববিপ্লবী ভূমিকা, সমগ্র প্রগতিশীল মানবসমাজের অগ্রগামী বিজয়ী বাহিনী হইবার দাবী, দীর্ঘদিন স্থায়ী হইল না। আপন শ্রেণীস্বার্থের অদম্য তাড়নায় তাহারা প্রচণ্ড শোষণে প্রবৃত্ত হইল অমাত্যবর্গের সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া। রাজার স্বাধীন সত্তা, জনগণের প্রকৃত

নায়কত্ব লুপ্ত হইয়া আসিল, তিনি তখন ধনিক ও অমাত্যবর্গের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতিনিধি। বেআইনী আইনের জোরে তাহারা লুটপাট শুরু করিল। পণ্যদ্রব্যে অন্যায় একচেটিয়া অধিকার, জোর করিয়া দরিদ্রের জমি বেদখল প্রভৃতি রক্তাক্ত প্রণালীতে তাহারা প্রবৃত্ত হইল আদিম মূলধন সংগ্রহে ও নিঃসম্বল নির্ব্বিত্ত শ্রেণী সৃজনে। কারণ এই বনিয়াদ ছাড়া যে ধনতন্ত্রের উত্তুঙ্গ সৌধ নির্ম্মাণ, বুর্জোয়া শ্রেণীর একাধিপত্য স্থাপন অসম্ভব। মুক্ত মানবিকতার মোহন স্বপ্ন ক্ষণিকের চমক দিয়া আবার মিলাইয়া গেল।

এই রূঢ় আঘাত, মানবজাতির নিকট ধনতন্ত্রের এই বিশ্বাস-হনন, সাধারণের অগোচর থাকিলেও শেক্সপিয়ারের চোখ এড়ায় নাই। একদিন যাহা থাকে মঙ্গলকর, কেমন করিয়া তাহা অশুভ হইয়া উঠে, ইহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না।—

Nor aught so good but, strained from their fair use,
Revolts from true birth, stumbling on abuse ;
Virtue itself turns vice, being misapplied ;
And vice sometimes by action dignified.

জীবনের এই দ্বান্দ্বিক গতির সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহার ছিল নির্ম্মায়িক সত্যসন্ধানী দৃষ্টি, বৈজ্ঞানিকের মতো। মনে রাখিতে হইবে ইংলন্ডে বৈজ্ঞানিকপদ্ধতিতে তথ্য আলোচনাও প্রায় এই সময়ে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহাই লর্ড বেকন-এর অমরকীর্ত্তি। যাঁহারা মনে করিতেন শেক্সপিয়রের নাটকগুলি বেকন দ্বারা লিখিত, অকবি-সুলভ এই নির্ম্মায়িকতার সাদৃশ্যই বোধ হয় তাঁহাদের বিভ্রান্ত করিয়াছিল। শেক্সপিয়ার এই রূঢ় আঘাত অলসভাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। এ বিশ্বাসভঙ্গে তাঁহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। তাই তাঁহার দ্বিতীয় যুগে রচিত নাটকগুলিতে, যে যুগে তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত ট্র্যাজেডিগুলি রচিত হয়, প্রকাশ পাইয়াছে এই বিশ্বাসভঙ্গের অকুণ্ঠ সমালোচনা। একদিকে স্বপ্ন, ধনতন্ত্র কি হইতে পারিত, ব্যক্তি-মানবকে কোন উন্নতির পর্য্যায়ে সে তুলিয়া ধরিতে পারিত ; অন্যদিকে বাস্তব, ধনতন্ত্র কোথায় চলিয়াছে, মুক্ত শক্তির অপব্যবহারে কত দ্রুত পশুত্বের পর্য্যায়ে পৌঁছিতেছে। যে সমাজে "অর্থের বন্ধন" ছাড়া আর কোন বন্ধনই স্বীকৃত হয় না, যেখানে ন্যায় অন্যায়ের মাপ হয় শুধু টাকার মানদণ্ডে তাহা যে কোথায় পৌঁছিতে পারে তাহার সতেজ বর্ণনা পাওয়া যায় "টাইমন অব এথেন্স" নামক নাটকে ঃ—

Gold ! Yellow, glittering, precious gold ! No, gods,
I am no idle votarist. Roots, you clear heavens,
Thus much of this will make black white, foul fair,
Wrong right, base noble, old young, coward valiant.
This yellow slave,
Will knit and break religions ; bless the accurs'd ;
Make the hoar leprosy adored ; place thieves,
And give them title, knee and approbation,
With senators on bench.

অন্যত্র টাইমন বলিতেছেন—

All is oblique,
There is nothing level in our cursed natures
But direct villany. Therefore, be abhorred
All feasts, societies, and throngs of men !
His semblable, yea, himself, Timon disdains.
Destruction, fang mankind !

ধনতন্ত্রের এই অন্তিম সম্ভাবনার নির্দ্দয় সমালোচনা করিলেও, এই ট্র্যাজেডির যুগেও শেক্সপিয়ার ছিলেন ধনতন্ত্রের বিপ্লবী ঐতিহ্যের, তার মুক্তির বারতার, তার সৃজনী আনন্দের বীর্যবান সমর্থক। তাই দেখিতে পাওয়া যায় ব্যর্থতা সত্ত্বেও তাঁহার সমস্ত সমবেদনা ধাবিত হইয়াছে সেই সব চরিত্রের সৃষ্টিতে যাহারা আদর্শনিষ্ঠ বিশ্বমানবের চিত্ত অধিকার করিয়াছে, হামলেট, ওথেলো, লীয়ার, ডেসডেমোনা, কর্ডেলিয়া।

ধনতন্ত্রের মুক্তিসাধনার মায়া, নির্মমায়িকতা সত্ত্বেও, শেক্সপিয়ারকে পাইয়া বসিয়াছিল। যখন তিনি বাস্তব অভিজ্ঞতায় জানিতেছেন যে তাঁহার স্বপ্নের সমাজব্যবস্থা সুদূর পরাহত—তখন সে সত্যকে যেন মনে প্রাণে গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। সার টমাস মোর-এর মতো তাঁহার কল্পনাতেও যে একটি ইউটোপিয়া ছিল তাহা 'টেম্পেস্ট' নাটকে গঞ্জালো বর্ণিত কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ দিয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু শেক্সপিয়ার বুঝিতেছিলেন, এ সমাজ ব্যবস্থা স্বপ্ন জগতেই থাকিয়াই যাইবে। মনের এই দ্বিধাগ্রস্ত আশা-ভগ্ন অবস্থায় কোন কবিই তাঁহার অন্তরের শ্রেষ্ঠ দান দিতে পারেন না ; শেক্সপিয়ারও পারেন নাই।

জীবনের জটিলতাকে নিবিষ্টভাবে দেখিবার ও সমগ্রভাবে দেখিবার যে ক্ষমতা ছিল তাঁহার ট্র্যাজেডি যুগের বিশেষত্ব, তিনি যেন তাহা হইতে বঞ্চিত হইলেন। বাস্তব ঘটনা বাদ দিয়া তিনি আষাঢ়ে গল্প ও পুরান কথা রচনায় মন দিলেন, যাহাতে তাঁহার মানসিক সততায় আঘাত না লাগে। এই পলাতক দোলায়মান অবস্থাও বেশী দিন টিকিল না। শেক্সপিয়ারের অকুণ্ঠ লেখনী, যাহা বৎসরে প্রায় দুইটি করিয়া পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করিত, শ্লথগতি হইয়া আসিল। লেখনভঙ্গীও যেন খঞ্জ, তাহাতে তাঁহার অভ্যস্ত গভীরতার আভাস মেলে না। এই ভগ্নমন বিশ্বকবির অসহ্য হইয়া উঠিল। 'টেম্পেস্ট' লেখার পর তিনি লণ্ডন ছাড়িয়া ষ্ট্র্যাটফোর্ডে ফিরিয়া গেলেন, পাঁচ বৎসর বাঁচিয়া রহিলেন। আঙ্গিক ব্যবহারে ও ভাষার জাদুতে পূর্ব্বতন অধিকার শেষ পর্ব্বেও তাঁহার করায়ত্ত ছিল। অথচ আর একটা নাটকও লিখিলেন না, এমনকি একটা সনেট লিখিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। মানব মুক্তির স্বপ্নচূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিরাট কল্পনার অজস্র উৎসও শুকাইয়া গেল। প্রতিক্রিয়াশীল সমাজের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী সাহিত্যিকের ইহার চাইতে মর্ম্মন্তুদ আর কি অভিশাপ হইতে পারিত, ভাবিতে পারা যায় না।

থিয়োডোর স্পেনসার লক্ষ্য করিয়াছেন তিনশত বৎসরের আগে যে যুগের সূচনা হইয়াছিল তাহা আজ অবসানপ্রায়। শেক্সপিয়ারের মতো আমরাও এক নূতন যুগসন্ধিক্ষণে বাস করিতেছি। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে আমাদের যুগেও পুরাতন ধ্যান-ধারণার সহিত নূতনের সংঘর্ষ বাধিয়াছে। সামাজিক ব্যবস্থায় মানুষের যা হওয়া উচিত তাহার সহিত মানুষ যে অবস্থায় আছে তাহার, আকাশ-পাতাল প্রভেদ। চিন্তা ও অভিজ্ঞতায় সকল স্তরেই বাস্তবের সহিত প্রতীয়মানতার দুর্ল্লঙ্ঘ্য ব্যবধান। সে যুগেও যেমন প্রবাদ রটিয়াছিল পৃথিবীর শেষ আসন্নপ্রায়; এযুগের বিজ্ঞানও থার্ম্মোডিনামিক্স্-এর দ্বিতীয় বিধির দ্বারা প্রমাণ করিতেছে পৃথিবীর নির্ব্বাণ অনিবার্য্য। সে যুগের তিনজন প্রধান ব্যঙ্গ কবি—ডান্, হল ও মার্স্টন—সামাজিক দুর্নীতিকে তীব্র কশাঘাতের পর এংগ্লিক্যান চার্চ্চের শান্ত ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; এযুগের ইংরেজী সাহিত্যিকদের মধ্যেও সে লক্ষণ সুবিদিত। ইহা সুস্পষ্ট, মানুষের নিয়তির এইরূপ ক্ষুদ্র ধারণা লইয়া কোনও বৃহৎ সাহিত্য রচিত হইতে পারে না। তিনশত বর্ষ পরে শেক্সপিয়ারের যুগ আলোচনা করিয়া আমরা দেখিতেছি যে, সে যুগ শুধু ক্ষয়ের নয়, সে যুগেই শুরু হইয়াছে ইতিহাসের

এক গৌরবময় অধ্যায়। তাহারই অনুসরণে আসিয়াছে এক গৌরবময় সাহিত্য। থিয়োডোর স্পেনসারের আশা, হয়ত তিনশত বর্ষ পরে আমাদের যুগও এক গৌরবময় ঐতিহ্যের উন্মেষের যুগ বলিয়া গণিত হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান বিশ্বের দিকে চাহিয়া, ও বর্ত্তমান বিশ্বসাহিত্যের আলোচনা করিয়া তিনি তাঁহার আশার সমর্থক নিদর্শন খুঁজিয়া পাইতেছেন না। জীবন এত জটিল হইয়া উঠিয়াছে ও সাহিত্য জীবন হইতে এত দূরে সরিয়া যাইতেছে যে হয়ত ভবিষ্যতে মানবাত্মার পূর্ণ প্রকাশ অনুষ্ঠিত হইবে সাহিত্যে নয়, সিনেমায় ও রেডিয়োতে। সাহিত্যে মানব চরিত্রের পূর্ণ প্রতিফলন শেক্সপিয়ারেই শেষ হইয়া গিয়াছে।

সাহিত্য সম্বন্ধে থিয়োডোর স্পেনসারের এই হতাশার কারণ, মার্কসবাদী দৃষ্টি হইতে, বোঝা কষ্টকর নয়। তিনি ঠিকই ধরিয়াছেন, আমাদের কাল শেক্সপিয়ারের কালের অনুরূপ এক যুগসন্ধির কাল। তিনশত বৎসর অধিষ্ঠানের পর ধনতন্ত্র আজ মুমূর্ষু। তাহারই গর্ভ হইতে উদ্ভূত সমাজতন্ত্র আজ তাহার শেষ শয্যা রচনা করিতেছে। তাই ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহে আজ ধ্বংস ও ক্ষয়ের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। তাহাদের সাহিত্যে ও দর্শনেও বিক্ষিপ্ত ও অবসাদ সমস্ত আসর জুড়িয়া বসিয়া আছে। মানব মুক্তির উদাত্ত কণ্ঠ সেজগতে আজ রুদ্ধ।

থিয়োডোর স্পেনসার শুধু সেই জগতেই নিজের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়াছেন। যে দেশের রাষ্ট্রে আজ সমাজতন্ত্র সার্থক, শ্রেণী-সংঘর্ষ বিলুপ্ত, মানুষের দ্বারা মানুষের অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক নিপীড়ন অতীত কথায় পর্য্যবসিত, সে দেশের দর্শন ও সাহিত্য তাঁহার দৃষ্টিগোচরে আসে নাই। আসিলে দেখিতে পাইতেন, সাহিত্যের অধোগতি সম্বন্ধে তাঁহার আশঙ্কা অমূলক। সোভিয়েট রুশিয়ার সাহিত্যে আজ ধ্বনিত হইতেছে ধনতন্ত্রের বন্ধন হইতে মুক্ত মানবের বীরত্বের কাহিনী, তাহার বিপ্লবী ও বৈজ্ঞানিক জীবনদর্শন, তাহার অনন্ত বিস্তৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা। মিখাইল শোলোকভ, আলেক্সী টলস্টয়, কন্স্টানটিন সিমনভ, ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গ, ভান্দা ভাসিলিয়েভ্‌স্কা,—ইহাদের রচনাতেই আজ পৃথিবীর সকল দেশের মুক্তিকামী আদর্শনিষ্ঠ নরনারী আপন অন্তরের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেছে। আর সোভিয়েট সমালোচকের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেই ধনতান্ত্রিক জগতের বিপ্লবী মানবিকতার বৃহত্তম কবির আলেখ্য স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে।

ম্যাকবেথের ভূমিকা

শেকস্‌পীয়রের নাটক রচনায় দেখা যায় বিস্ময়কর বৈচিত্র্য। হ্যামলেট-নাটকে পলোনিয়াস-এর মুখে যে বিখ্যাত উক্তিটি আছে নাটক-রচনার নানাবিধ প্রকার সম্বন্ধে, শ্লেষই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য নাও হইতে পারে। কারণ, শেকস্‌পীয়রের নিজের রচনাতেই তাহাদের অধিকাংশের উদাহরণ পাওয়া যায়। তবুও একথা নিশ্চিত, 'শেকস্‌পীয়র' বলিতে বিশ্বের যে অদ্বিতীয় নাট্যকারের উল্লেখ করা হয়, তাঁহার চূড়ান্ত উৎকর্ষ ট্র্যাজিডিতে। 'ম্যাকবেথ' পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিডিগুলির অন্যতম।

ম্যাকবেথ-কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। ইহার প্রধান চরিত্রগুলি শেকস্‌পীয়রের স্বকপোলকল্পিত নহে, স্কটলণ্ডের একাদশ শতাব্দীর ইতিবৃত্ত হইতে গৃহীত। হলিনশেড লিখিত "ক্রনিকল্‌স্ অব স্কটলণ্ড" হইতে তিনি ঘটনার ও পরিবেশের নানা ইঙ্গিত তাঁহার নাটকে যোজনা করিতে দ্বিধা করেন নাই। ইহা সত্ত্বেও ম্যাকবেথ ঐতিহাসিক নাটক নহে, অবিসংবাদিত ট্র্যাজিডি। ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান দায়িত্ব ঘটনায় ও চরিত্রে তথ্যকে মানিয়া চলা; নাটকীয় কল্পনা ইহাতে ইতিহাসের শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। ট্র্যাজিডি রচনায় নাট্যকার অপেক্ষাকৃত বন্ধনমুক্ত। ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ তাঁহার কল্পনাকে উদ্‌বুদ্ধ করে, নিয়ন্ত্রিত করে না। ট্র্যাজিডিতে ইতিহাস অতীতের বশংবদ

অনুসরণ নহে, নাট্যকারের সমসাময়িক জীবনের আত্মপ্রকাশের কল্পনা-সমৃদ্ধ অবলম্বন। স্কটলণ্ডের পুরাণো ইতিহাস অবলম্বন করিয়া শেকস্‌পীয়রের কল্পনা পরিস্ফুট করিয়াছে রেনেসাঁস-ইংলণ্ডের অন্তর-লোকের একটি জটিল দিক্‌। রেনেসাঁস-ইংলণ্ডের মর্মচেতনার বিশ্বব্যাপী ভূমিকা আছে বলিয়াই 'ম্যাকবেথ'-নাটকের আবেদন ইংলণ্ডেই সীমাবদ্ধ নহে।

শেকস্‌পীয়রের সমকালীন ইংলণ্ড ছিল বৃহৎ ব্যক্তিত্ববিকাশের অভূতপূর্ব উপযোগী পরিবেশ। কিন্তু বৃহৎ ব্যক্তিত্বের অর্থ এই নয় যে সে-ব্যক্তিত্ব সর্বত্র ত্রুটিহীন বা পাপমুক্ত। বরং ইহা বলা যাইতে পারে যে, বৃহৎ ব্যক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে জটিল ব্যক্তি ; দোষ ও গুণ, পাপ ও পুণ্য তাহাদের চরিত্রের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইহাতেই তাহাদের জটিলতা। কয়েকটি বিরোধী প্রবণতা একত্র অবস্থান করিলেই জটিলতার সৃষ্টি হয় না ; তাহাদের মধ্যে থাকা চাই অন্যোন্যনির্ভরতা, পরস্পরের আপেক্ষিকতা, যাহাতে একের অস্তিত্বে বা অভাবে অন্যের অস্তিত্ব বা অভাব অবধারিত হইয়া পড়ে। দোষ ও গুণ উভয়ে মিলিয়া এমন একটি ঐকিকতা অর্জন করে যাহা নাটকে সৃষ্ট চরিত্রে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের প্রধান লক্ষণ। শেকস্‌পীয়রের 'ম্যাকবেথ' এই অপরূপ সৃষ্টি-কৌশলের অন্যতম প্রোজ্জ্বল উদাহরণ।

ম্যকবেথ-এ শেকস্‌পীয়র আঁকিয়াছেন এমন একটি ব্যক্তি, যে দেখাইল কৃতঘ্নতার পরাকাষ্ঠা—তাহার রাজা, আত্মীয় ও অতিথি ডানকান-কে গোপনে হত্যা করিয়া। এই একটি হত্যার রক্তাস্বাদ তাহাকে পরিণত করিল নরখাদক রাক্ষসে, আপন উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতাড়নে। তবুও, শেকস্‌পীয়র দেখাইয়াছেন, ম্যাকবেথকে সাধারণ খুনী বা পাপাচারী ভাবিলে ভুল করা হইবে। একদিন সে ছিল সর্বজনপূজ্য মহাবীর, সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ। রাজা হইবার অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাহার ছিল। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা মাত্রই পাপ নহে, বিশেষতঃ, ম্যাকবেথের ঐতিহাসিক পরিবেশে। তবুও এই ছিদ্র দিয়াই শনি তাহার অন্তরে প্রবেশ করিল, ও সৃষ্টি করিল ধ্বংসের তাণ্ডব। ম্যাকবেথের অন্তরস্থ দুর্মর নীতিবোধকে পরাজিত করিতে নাট্যকার বাধ্য হইয়াছেন মানুষী শক্তির বাহিরে পৈশাচী শক্তির প্রয়োগের ব্যবস্থা করিতে। মানবিক কাহিনীতে এই অতিমানবিকের আবির্ভাব অন্যথায় অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহার উপরেও সৃষ্টি করিতে হইয়াছে প্রায়-অমানুষী লেডি ম্যাকবেথকে—যাহাকে বলা হইয়া থাকে চতুর্থা ডাকিনী। তবুও ম্যাকবেথের নীতিবোধ, তাহার কঠোর আত্মবিচার,

মাঝে মাঝে মেঘাবৃত হইলেও কখনো একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। শেষ পর্যন্ত সে ডাকিনীদের প্রকৃত স্বরূপ চিনিতে পারে, সহধর্মিণীর আত্মহত্যা আর তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তাহার অবিচারের শ্রেষ্ঠ বলি ম্যাক্‌ডাফ-কে সে চিনিতে পারে নিয়তির অস্ত্র বলিয়া; তাহারই হস্তে নিহত হইয়া সে কৃতকর্মের ফলকে গ্রহণ করে বীরের মতো। শেকস্‌পীয়রের উদার মানবিক দৃষ্টি এই নরপশুর প্রতি অনুকম্পা না জাগাইয়া দর্শক বা পাঠককে অব্যাহতি দেয় না।

লেডি ম্যাকবেথের চরিত্র-সমস্যাও কম জটিল নহে। আদর্শ সহধর্মিণী এই নারী, স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে আপন অন্তরে গ্রহণ করিয়া, ইচ্ছাশক্তির প্রতি-মূর্তির মতো, স্বকীয় নারীত্বকে উৎপাটিত করিয়া পরিণত হয় রাক্ষসীতে। ম্যাকবেথের আছে দ্বিধাগ্রস্ত নীতিবোধ, তাহার তা নাই। সে আপন লক্ষ্যপথে হ্রস্বতম সরল রেখার অনুগামিনী। রমণীর কোমলতা—এমন কি, মাতৃভাবও—তাহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত। মনে হয়, সে বুঝি ম্যাকবেথ অপেক্ষাও শক্তিমতী, অন্তর্দ্বন্দ্বের অতীত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, লেডি ম্যাকবেথ গর্ণরিল, কি রীগান নয়। তাহার অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকাশ তাহার স্বপ্নসঞ্চরণে। এই একটি স্বল্পপরিসর দৃশ্যের অভাবনীয় গভীরতায় শেকস্‌পীয়রের মানবিক দৃষ্টির প্রসার উদ্ভাসিত হয়। ইহার পর লেডি ম্যাকবেথের ভয়াবহ ব্যর্থতায় অশ্রুসিক্ত না হয় এমন পাঠক বা দর্শক কল্পনা করা কঠিন। ট্র্যাজিডি মাত্রেই ব্যর্থতার কাহিনী। কিন্তু শেক্‌সপীয়রের ট্রাজিডির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে ব্যর্থতা কেবলমাত্র ভয়াবহ নহে কারুণ্যপূর্ণ। এই কারুণ্যের জন্যই ব্যর্থতা সত্ত্বেও মানবজীবনের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে না, জাগে ব্যাপকতর পরিবেদনা। ইহাই শেকস্‌পীয়রীয় ট্র্যাজিডির অমর অবদান।

'ম্যাকবেথ'-এর অনুবাদ বাংলা ভাষায় এই নূতন নহে। তবে এই অনুবাদ একটি বিশেষ নীতি অনুসারে রচিত। এই নীতির উদ্দেশ্য মূলের যথাযথ অনুগামী হওয়া। এই নীতিতে মূলের প্রত্যেকটি বাক্যের প্রতিরূপ দিবার চেষ্টা করা হয়; এবং অনুবাদে এমন কোন শব্দ ব্যবহার করা হয় না, যাহার উপযোগী শব্দ মূলে নাই। ইহা ত গেল নাটকের অর্থগত দিক। শেকস্‌-পীয়রীয় নাট্যকাব্যে ছন্দের গুরুত্ব শব্দগত অর্থের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বলা বাহুল্য, ইংরেজী পঞ্চপর্বিক 'ব্ল্যাংক ভার্স'-এর অবিকৃত প্রতিরূপ বাংলায় ফোটাইয়া তোলা হয়ত অসম্ভব ব্যাপার। যতটা সম্ভব, তাহা হইতেছে,

শেকস্‌পীয়রের বাক্যাবলীর শব্দসংযোজন ও যতিসংস্থাপনকে সযত্নে অনুসরণ করা, যাহাতে শেকস্‌পীয়রীয় রচনার ধ্বনিসম্পদের কিছুটা আভাস অনুবাদে প্রতিফলিত হয়। মূলে যেখানে গদ্য বা মিত্রছন্দ আছে, অনুবাদেও তাহাই করা আছে। এই সঙ্গে সর্বদাই মনে রাখিতে হইয়াছে, যেন অনুবাদের ভাষা অযথা শ্রুতিকটু বা অস্পষ্টার্থ না হয়। যতদূর জানা আছে, এই ধরণে শেকস্‌পীয়রের অনুবাদ প্রচেষ্টা বাংলা ভাষায় এই প্রথম। স্বভাবতঃই এই অনুবাদে আছে অনেক ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা। পূর্ববর্তী অনুবাদের—গিরীশচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথ কৃত ডাকিনী দৃশ্যগুলির—সহায়তা সকৃতজ্ঞে স্বীকার করিতেছি। ভবিষ্যৎ অনুবাদকের পক্ষে বর্তমান অনুবাদ কাজে লাগিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে।

এই অনুবাদে অকস্‌ফোর্ড হইতে প্রকাশিত অধ্যাপক গ্রিয়ার্সন সম্পাদিত ম্যাকবেথের সংস্করণ অনুসৃত হইয়াছে।

সাহিত্য সমালোচনা

The Essential Shakespeare—By J. Dover **Wilson**, (Cambridge University Press).

সাহিত্যজগতে মতভেদের অন্ত নাই, মিলের চেয়ে গরমিলের উদাহরণই অতি সহজে চোখে পড়ে; ইহাদের অনুপাত পৃথিবীর স্থলজলের অনুপাত অপেক্ষা অনেক বেশী। তবু একটি সাহিত্যিক সত্য হিমালয়ের উচ্চতার মতনই অবিসংবাদিত। তাহা এই, শেক্‌স্‌পিয়ার সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে চেষ্টা হইয়াছে গ্রীসের প্রাচীন নাট্যকারত্রয় বা ইটালীর দান্তেকে তাঁহার সমকক্ষ প্রমাণ করিতে। কিন্তু কবিকে মানব-জীবনের অখণ্ড সমগ্রতার অবিকার চিত্রশিল্পী হিসাবে দেখিলে এ চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। একমাত্র হোমারই হয়ত এ সমকক্ষতার দাবী করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার ক্ষেত্রেও বলা যায় নাকি জীবনের বিস্তৃতিবোধে তাঁহার ক্ষমতা শেক্‌স্‌পিয়ারের সমশ্রেণীর হইলেও, জটিলতাবোধে শেক্‌স্‌পিয়ারের দৃষ্টি গভীরতর? ইংরাজের সহিত সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের অন্নজগতে যত ক্ষতি হইয়া থাকুক, মনোজগতে পরমলাভ এই শেক্‌স্‌পিয়ারের সহিত পরিচয়। ইংরাজীভাষার সম্যক অনুশীলন ব্যতীত এ পরিচয় নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ হইতে পারে না। কোন্ অনুবাদে মূলের অভাব মিটাইতে পারে? আর

অনুবাদকের হাতে পড়িয়া অনেক সময় বড় কবিদের কি দুর্দ্দশা হয় তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, শেক্‌স্‌পিয়ারের ফরাসী অনুবাদ।

জানিনা কেন, ইংরাজীভাষার প্রচুর আলোচনা সত্ত্বেও আমরা শেক্‌স্‌পিয়ারের নিকট হইতে যতটা শেখা উচিত ততটা শিখি নাই। বঙ্গসাহিত্য মিলটন বাইরন শেলী কীট্‌স্‌ স্কট্‌-এর নিকট যতটা ঋণী, শেকস্‌পিয়ারের নিকট তাহার সিকিও নহে। বাংলাভাষায় নাটক আছে নামে মাত্র। গুণবিচারে এমন তিনখানি নাটক পাওয়া যায় না যাহারা কোন বিখ্যাত ইংরাজী নাটকের পাশে দাঁড়াইতে পারে। নাটক না হইয়াও একটিমাত্র বাংলা পুস্তক অনাসক্ত কল্পনার সাবেগ স্ফুটনে শেক্‌স্‌পিরিয়ত্বের পর্য্যায়ে পড়ে—রবীন্দ্রনাথের চতুরঙ্গ। এ কথা সত্য নয় যে বাংলা নাট্যকারেরা শেক্‌স্‌পিয়ারের সহিত পরিচিত নহেন। বরং অনেকস্থলে তাঁহার অন্ধ ও অসংলগ্ন অনুকরণ হাস্য ও করুণার উদ্রেক করে। এই অক্ষমতার মূলে আছে শেক্‌স্‌পিয়ারের বিশাল প্রতিভার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার শক্তির অভাব। এমন পাঠকের সংখ্যা বিরল নয় যাঁহাদের শেক্‌স্‌পিয়ার ভালো লাগে অবান্তর কারণে, যে বিশিষ্ট কারণে লাগা উচিত তাহার জন্য নয়। অনেক পাঠকের নিকট শেক্‌স্‌পিয়ারের নাটকাবলী নৈর্ব্যক্তিক শিল্পকুশলতার চরম নিদর্শন। ইহাদের পিছনে যে গতিশীল, প্রতি-ক্রিয়াপ্রবণ মানবীয় মন আছে তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে ইঁহারা যথেষ্ট সচেতন নহেন। কাব্য বুঝিতে গিয়া কবিপ্রকৃতিকে বুঝিতে চাহি না বলিয়া আমাদের কাব্যবোধ সম্পূর্ণ ও সৃষ্টিসমৃদ্ধ হইয়া উঠে না।

এ ত্রুটি শুধু আমাদের দেশেরই বিশেষত্ব নয়, যে দেশে শেক্‌স্‌পিয়ারের জন্ম সেখানেও ইহা অল্পবিস্তর দেখা যায়। সেখানেও কবির কাব্যের আলোচনা হয় জীবনকে বাদ দিয়া, জীবনের আলোচনা হয় কাব্যকে বাদ দিয়া। সিড্‌নে লি লিখিত শেক্‌স্‌পিয়ারের জীবনচরিত কবির জীবন সম্বন্ধে বর্ত্তমানে সর্ব্বোচ্চ প্রামাণ্য গ্রন্থ। তথ্য ইহাতে বহুল আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু শেক্‌সপিয়ারের যে-ছাপ ইহা মনে মুদ্রিত করিয়া দেয় তাহা বিশ্বের অদ্বিতীয় কবির নহে, যেন কোন সফলকাম বণিকপ্রবরের। ষ্ট্র্যাটফোর্ড-এর রাখাল বালক কেমন করিয়া লণ্ডনে আসিয়া কাব্যের ব্যবসা করিয়া পয়সা করিল—ইহাই এ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য; নিজের ও কন্যা দুইটির সংস্থানসংগ্রহ ছিল যেন কবির সাহিত্য-সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য।

আলোচ্য গ্রন্থখানিকে এক কথায় এই বলিয়া বর্ণনা করা যায়, ইহা সিড্‌নে

লি-র জীবনচরিতের তীব্র প্রতিবাদ। অবশ্য ইহা পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত নহে, দেড় শত পৃষ্ঠার মধ্যে তাহা আশা করা বৃথা। ইহা একটি প্রাথমিক প্রচেষ্টা, a biographical adventure। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলিতেছেন, কেহ যেন গ্রন্থের নাম দেখিয়া ভুল না বোঝেন। "Here, in a nutshell, is the kind of man I believe Shakespeare to have been" is what it is intended to convey। তাঁহার ধারণা, অগণ্য জীবনচরিতের মিথ্যার তলে সত্য শেকস্‌পিয়ার চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহাকেই তিনি উদ্ধার করিতে চান। তিনি জানেন, কোন জীবনচরিতই লেখক-নিরপেক্ষ হইতে পারে না, লেখকের স্বকীয় ঝোঁক বর্ণিত ব্যক্তির চরিত্রগঠন নিয়মিত করে। প্রত্যেক চরিতকারের মনে তাঁহার বিষয়-বস্তুর একটি আলেখ্য ফুটিয়া উঠে, তাঁহার লিখিত জীবনচরিতকে সেই আলেখ্যের অনুবর্তী হইতেই হয়। ডোভার উইলসন বলেন, ষ্ট্রাটফোর্ড-এ শেকস্‌পিয়ারের যে আবক্ষ মূর্ত্তিটি আছে তাহাই সিড্‌নে লি-কে ভুলপথে চালাইয়াছে। গারাট্ য়্যানসেন্ কৃত এই প্রস্তর মূর্ত্তিটি সাধারণতঃ শেকস্‌পিয়ারের যথার্থ প্রতিকৃতি বলিয়া গৃহীত; কিন্তু ডোভার উইলসনের মতে শেকস্‌পিয়ারের প্রকৃত মর্ম্মোপলব্ধির পথে এই মূর্ত্তিটি সব থেকে বড় বাধা। বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এই মূর্ত্তিটিতে নাকি ফুটিয়া উঠিয়াছে নির্ব্বোধ ও আত্মতুষ্ট বিত্তশালীর ভাব। লি অনেকবার ষ্ট্রাটফোর্ড-এ গিয়া এ মূর্ত্তিটি ধ্যান করিতেন। তাই তাঁহার রচনা হইয়া উঠিয়াছে, এ মূর্ত্তিটি সজীব হইলে যেরূপ মানুষ হইত তাহার, শেকস্‌পিয়ারের নহে।

লি-র বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহাভিযানের ধ্বজা ডোভার উইলসন্ তাঁহার গ্রন্থের মুখচিত্র হইতেই উড়াইয়াছেন। এমুখচিত্রটি শেকস্‌পিয়ারের নহে, তাঁহার একান্ত সমসাময়িক একজন যুবকের প্রতিকৃতি। ইহা "গ্রাফ্‌টন্ পোর্ট্রেট্" নামে পরিচিত। ছবিটির বিশেষত্ব এই, চিবুক, ঠোঁট, নাক ও প্রকাণ্ড কপাল মিলাইয়া দেখিলে শেকস্‌পিয়ারের প্রচলিত প্রতিকৃতির সহিত ইহার ঘন সাদৃশ্য আছে, অথচ ইহার মুখের ভাব শেলীর মুখের মতো কবিত্বপূর্ণ ও চোখের দৃষ্টি অপূর্ব বিস্ময়কর। এমন কোন প্রমাণ নাই যে ছবিটি শেকস্‌পিয়ারের। অথচ ডোভার উইলসন্ বলেন, তিনি যত এটিকে দেখেন, ততই তাঁহার লোভ হয় ইহাকে শেকস্‌পিয়ারের মূর্ত্তি বলিয়া ভাবিতে। অন্ততঃ তাঁহার বিশ্বাস, এটিকে প্রকৃত বলিয়া ভাবিলে শেকস্‌পিয়ারের কবিপ্রকৃতিকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা ত নাই-ই, তাঁহার কবিত্বের মর্ম্মোপলব্ধি করার সম্ভাবনাই বেশী।

এই সূত্রে গ্রন্থকার শেকস্‌পিয়ার সম্বন্ধে আরো দু-একটি সুপ্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার উল্লেখ করিয়া সজোরে খণ্ডন করিয়াছেন। শেকস্‌পিয়ার সর্ব্বকালের কবি ত বটেনই কিন্তু একথা সাধারণতঃ মনে রাখা হয় না যে তিনি তাঁহার সমকালের কবিও বটেন। তাঁহার প্রধান কাজ ছিল তাঁহার সমকালবর্ত্তীদের আনন্দবিধান করা। তাই তাঁহার নাটক তৎকালীন ঘটনাবলীর সরল ও বক্র উল্লেখে পূর্ণ থাকিতে বাধ্য। এরূপ অনেক উল্লেখ বৃত্তিকারেরা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, তবু আরো কত যে লুকাইয়া আছে তাহার অবধি নাই। এলিজাবেথীয় ও জাকোবীয় যুগকে তন্ন তন্ন করিয়া না জানিলে এ সমস্ত আবিষ্কৃত হইবার নয়। আর এই সময়কার বাহ্য ও আন্তর ইতিহাসের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয়ের আলোকে তাঁহার কাব্য পড়িতে হইবে, নহিলে তাঁহার কবি-প্রকৃতির রহস্য আমাদিগকে এড়াইয়া যাইবে। শেকস্‌পিয়ার সম্বন্ধে আর একটি অতিপ্রচলিত ধারণা, তাঁহার ছিল চরম জ্ঞান ও পরম শান্তি। ছিলই ত, কিন্তু চিরদিনই কি তিনি এইরূপ জ্ঞানবৃদ্ধ ছিলেন? তাঁহার তরুণ বয়সের কমেডি-গুলি কি সাক্ষ্য দেয়? অভব্য অশ্লীলতায়ও তিনি ছিলেন ওস্তাদ এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকে কি? তাঁহার জীবন সম্বন্ধেও কি একথা বলা চলে না যে, "We cannot ascribe to Shakespeare that rigid propriety of sexual conduct, the absence of which in more modern poets it has been too often the duty of their family biographers to conceal"?

এই সমস্ত কথা মনে রাখিয়া ডোভার উইলসন তাঁহার ক্ষুদ্র চরিতাখ্যায়িকাটি লিখিয়াছেন। তিনি কবির জীবন দিয়া কাব্য বুঝিতে চাহিয়াছেন, আর কাব্য দিয়া জীবন। কীট্‌স্‌-এর এই এই উক্তিটি তাঁহার মূলমন্ত্র: "Shakespeare led a life of Allegory; his works are comments on it": শেকস্‌পিয়ারের জীবন একটি রূপক, ও তাঁহার রচনাবলী তাহার ব্যাখ্যা। প্রয়োজনমত তিনি অন্যান্য প্রাচীন ও আধুনিক কবিচিত্তের বিকাশধারার উদাহরণ গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ইংলণ্ডে যে মনোবৃত্তি Aldous Huxley-র Point Counterpoint-এ বা T. S. Eliot-এর The Waste Land-এ ফুটিয়াছে, তাহাকে আমরা বিশেষভাবে আধুনিক বলিয়াই ভাবিয়া থাকি। অথচ দেখা যায় শেকস্‌পিয়ার ইহার ভিতর দিয়াও কাটাইয়া গিয়াছেন। ফলে পুস্তিকাখানির আদ্যন্ত অত্যন্ত উপাদেয় হইয়া উঠিয়াছে। শেকস্‌পিয়ারের

বিষয় নূতন বই হাতে পাইলে প্রায়শঃ পড়িতে ইচ্ছা হয় না। মনে হয়, সমালোচক শুধুই বাক্যের থলি উজাড় করিয়াছেন। কিন্তু ডোভার উইলসন একটি কথারও অপব্যয় করেন নাই। এত অল্প কথায় বেশী বুঝাইবার ক্ষমতা সমালোচনা গ্রন্থে কদাচিৎ পাওয়া যায়। জীবন ও শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্যগুলি সর্ব্বদাই প্রণিধানযোগ্য। লীয়ার, হ্যামলেট, ফলস্টাফ্ ইত্যাদির প্রসঙ্গে তিনি অনেক মূল্যবান কথা বলিয়াছেন, ও শেক্‌স্‌পিয়ারের শেষ যুগ সম্বন্ধে লিটন স্ট্রেচি-র মত খণ্ডন করিতে চাহিয়াছেন। শাইলক্-এর চরিত্র-চিত্র বিষয়ে তিনি বলিতেছেন—

Shylock is the first unmistakable example of what may be called Shakespeare's tragic balance, the balance between pitiless observation, and divine compassion and understanding. He hides nothing. He shows us everything of Shylock's meanness, cunning and cruelty—vices which he himself detested above all vices—and notwithstanding, he compels the best of us, and the best in us, to cry out with Heine's "fair Briton" upon the Jew's exit, "By heaven, the man is wronged."

This is the quality that makes Shakespeare one of the great moral forces of the world, a world Saviour and Redeemer. "The great secret of morals is Love," Shelley writes, "or a going out of our own nature, and an identification of ourselves with the beautiful which exists in thought, action, or person, not our own. A man to be greatly good must imagine intensely and comprehensively, the pains and pleasures of his species must become his own." Shakespeare is even more "greatly good" than Shelley suggests is possible ; for he can identify himself with what he thought ugly and detestable, knocking all the time at our heart for pity and awe. No one but Dostoieffsky among the moderns can touch him here.

ডোভার উইলসন যাহাকে বলিতেছেন, "tragic balance" তাহাই শেকস্‌পিয়ার-প্রতিভার মূলসূত্র। এইটিকে অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশে

সাহিত্য ও জীবনের পর্য্যালোচনা আরম্ভ হইলে অচিরে উৎকর্ষলাভের সম্ভাবনা। অবশ্য সৃষ্টি প্রতিভা, প্রকাশ-সামর্থ্য কাহারো নিকট হইতে ধার পাওয়া যায় না। কিন্তু স্রষ্টা হইতে হইলে জীবনের পর্য্যালোচনা না করিলে চলে না ; সে পর্য্যালোচনা যত উচ্চস্তরের হইবে, ততই মঙ্গল। সৃষ্টিশিল্পের আদর্শ সম্বন্ধেও তাঁহাকে সজাগ থাকিতে হয়—অপরের সৃষ্টির বেলায় যদিই বা উদাসীন থাকা সম্ভব হয়, নিজের সৃষ্টির বেলায় কিছুতেই সম্ভব নয়। অচেতন শিল্পী কোনদিন বড় শিল্পী হইতে পারে না।

"L'ecrivain est classique qui porte un critique en soi-me'-me, et qui l'associe intimement a' ses travaux." (Paul Vale'ry.)

পুশকিন স্মরণে

এ বৎসরে রুশ দেশের মহাকবি আলেকসান্দর মৃত্যুর ১২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহার দুইটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম কবিতাটি পুশকিন লিখিয়া পাঠান তাঁহার সেইসব সহযোগী বন্ধুদের জন্য যাঁহারা ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে জার প্রথম আলেকসান্দরের বিরুদ্ধে বিফল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। ইতিহাসে ইহা "ডেকাব্রিস্ত অভ্যুত্থান" নামে খ্যাত। পুশকিন তখন রাজাজ্ঞায় স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থায় ছিলেন। পরে জার প্রথম নিকলাই তাঁহাকে রাজধানীতে ডাকাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করেন—সেদিন তুমি পিটার্সবুর্গে উপস্থিত থাকিলে কি করিতে? তৎক্ষণাৎ মহাকবির অকম্পিত উত্তর আসিয়াছিল—বিপ্লবীদের সহিত যোগ দিতাম। পুশকিনের এই কবিতা গোপনপথে সাইবেরিয়ার বন্দীশিবিরে পৌঁছিলে মহা উৎসাহের সঞ্চার করে। বন্দীরাও গোপনপথে পুশকিনকে যে যে উত্তর পাঠান তাহাতে লেখা ছিল—"এই স্ফুলিঙ্গ একদিন দাবাগ্নি প্রজ্বলিত করিবে।" রুশভাষায় "স্ফুলিঙ্গের" প্রতিশব্দ—"ইস্‌ক্রা"। এই উক্তি মনে রাখিয়াই লেনিন পরে রুশীয় বলশেভিকদের মুখপত্রের নাম দিয়াছিলেন—ইস্‌ক্রা। ইহাও বলা প্রয়োজন, রুশদেশে সাইবেরিয়াকে বলা হয় সিবীর।

সাইবেরিয়ায়

সিবীর্‌-এর খনির গভীরে
রেখো মনে দৃপ্ত অহংকার—
নয় বৃথা তিক্ত পরিশ্রম,
বৃথা নয় চিন্তা উচ্চাশার।

দুর্ভাগ্যের সহোদরা, আশা,
আলো করি ভূগর্ভ-আঁধার
জাগাইবে সাহসের সুখ ;
আসিবেই দিন কামনার।

আমার এ প্রীতি ভালোবাসা
পৌঁছাইবে রুদ্ধ জালা ভেদি'
গহ্বরের তমিস্রারে ছেদি'
খুঁজে নেবে মোর মুক্তভাষা।

শৃংখলের ভার নত, আর
প্রাকার বিচূর্ণ হবে—মুক্তি
জানাইবে দ্বারে স্বাগতোক্তি ;
ভাই দেবে হাতে তলোয়ার

দ্বিতীয় কবিতাটির প্রারম্ভে আছে একটি লাটিন উদ্ধৃতি যাহার অর্থ— "আমি রচি স্মৃতিস্তম্ভ"। মহাকবির অপঘাত-মৃত্যুর স্বল্পকাল পূর্বে ইহা রচিত। ইহাতে অভিব্যক্ত তাঁর নিজের সম্বন্ধে জীবনের অন্তিম কামনা। মস্কোয় গোর্কি স্ট্রীটে পুশকিন পার্কে কবির যে পূর্ণাবয়ব প্রতিমূর্তি আছে তাহার পাদপীঠের দুইদিকে উৎকীর্ণ আছে ইহার দুইটি স্তবক—তৃতীয় ও চতুর্থ। এস্থানটি মস্কোবাসীদের পক্ষে তীর্থস্থান স্বরূপ—প্রতিদিন বহুজন ইহাতে বহুবিধ পুষ্পের অঞ্জলি নিবেদন করিয়া যান।

স্মৃতিস্তম্ভ

রচিয়াছি মোর স্মৃতিস্তম্ভ, মানুষের হাতে-গড়া নয়,
তার দিকে হাঁটাপথে অবিরাম জনতার সার,
জার আলেকসান্দারের ঊর্ধ্বমুখ জয়স্তম্ভটিরে
সদর্পে ছাড়ায়ে যায় উচ্চশির তার।

মরিব না আমি একেবারে—সংগীতের পবিত্র ঝংকারে
আত্মা মোর বাঁচি রবে ধূলিরে ও ধ্বংসে পরাজিয়া,
রহিবে আমার যশঃ আকাশের তলে এ ধরায়
রবে বাঁচি যতদিন এক কবি-হিয়া।

আমার নামের ধ্বনি ছড়াইবে সারা রুশ জুড়ে,
তাহার সকল গোষ্ঠী আহ্বানিবে নিজ নিজ ভাষে,
পৌত্রকুল দৃপ্ত হবে—স্লাভ, ফিন্, অধুনা-বর্বর
তুংগুজ্, ও কালমুক্-এর প্রান্তর-আবাসে।

আমারে বাসিবে ভালো সর্বলোকে যুগ যুগ ধরে'
মোর বীণে ফুটায়েছি করুণার তীব্র অনুভূতি,
আমার নির্মম যুগে গাহিয়াছি মুক্তির বন্দনা,
জাগায়েছি অনুকম্পা পতিতের প্রতি।

হে কল্পনে, কোরো না অমান্য মোর বিধির নির্দেশ,
জয়মাল্যে নাহি মোহ, অপমানে নাহি কোন ভয়,—
নিন্দায় ও সুখ্যাতিরে নিয়ো তুমি অখণ্ড অন্তরে,—
স্তব্ধ থেকো শুধু যবে মূর্খে কথা কয়।

সাহিত্যতাত্ত্বিক বেলিনস্কি (১৮১১-১৮৪৮)

"আমি হিংসা করি আমাদের পৌত্র-প্রপৌত্রগণকে যাহাদের ভাগ্যে ঘটিবে রুশদেশে বাস করা ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে - যখন এই দেশ আসিয়া দাঁড়াইবে শিক্ষিত জগতের পুরোভাগে, বিজ্ঞানে ও শিল্পে করিবে বিধি-বিধানের প্রণয়ন ও অর্জন করিবে জ্ঞানালোকিত মানবজাতির সসম্মান শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।"

ভাবিলে শিহরিয়া উঠিতে হয় এই চমকপ্রদ সামাজিক ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়াছিলেন ভিসারিয়ন গ্রিগোরিয়েভিচ বেলিনস্কি—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রুশীয়েরা যে তাঁহার শতাব্দী পূর্বের স্বপ্নের অনুপযোগী ছিল না, তাহা অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণিত হইতে লাগিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রুশজাতির পক্ষে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাত হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার গৌরবময় পরিণাম পর্যন্ত। আর, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে বেলিনস্কির একশত পঞ্চাশতম জন্মবার্ষিকী বৎসরে, রুশজাতির উৎকটতম নিন্দুকেরাও অস্বীকার করিতে পারে না যে রুশীয়েরা অর্জন করিয়াছে জ্ঞানালোকিত মানবজাতির সসম্মান শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।

বেলিনস্কির সংক্ষিপ্ত জীবিত কালের সবটাই কাটিয়াছিল সেই যুগে যখন রুশদেশে জারতন্ত্রের প্রতাপ ছিল মধ্যাহ্নমার্তণ্ডের মতো দোর্দণ্ড। তিনি যখন এক বছরের শিশু তখন নেপোলিয়নকে পরাজিত হইয়া মস্কো হইতে

ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইয়া আসিতে হয় প্যারিস অভিমুখে। যে ভূমিদাসপ্রথা ছিল জারীয় স্বৈরাচারের সুদৃঢ়তম ভিত্তি তাহা যেন প্রতিপন্ন হইল অপরিবর্তনীয় বলিয়া। ইহার বিরুদ্ধে দেকাব্রিস্তদের অভ্যুত্থান (১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ) হাউই বাজীর মতো ব্যর্থ হইয়া গেল, বেলিনস্কি তখন স্কুলের গণ্ডীও পার হন নাই। সে সময়ে রুশদেশের গ্রাম্য স্কুলে যে মূঢ় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল স্বভাবতঃ প্রতিভাশালী বেলিনস্কির পক্ষে তাহা ছিল সহায়ক নয়, হন্তারক। স্কুলের শিক্ষা সমাপনের আগেই তিনি চলিয়া আসিলেন মস্কোয়, ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে, তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় আপন ভাগ্য পরীক্ষা করিতে। উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রবেশ করিলেন ভাষাতত্ত্ব বিভাগে, সরকারী বৃত্তিভোগী দরিদ্র ছাত্র হিসাবে, যাহাদিগকে শপথ লইতে হইত রাজানুগত্যের। ছাত্রাবাসের যে কক্ষে আরো অনেকের সহিত তাঁহার স্থান হইয়াছিল রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে তাহা এখন সর্বজনবিশ্রুত, "এগারো নম্বরের কামরা" বলিয়া। আবাল্য সাহিত্যানুরাগী বেলিনস্কির শিক্ষার ও সাধনার, তাঁহার বিপ্লবী মতবাদের বিকাশের সংহতি-কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল এই "এগারো নম্বরের কামরা।"

১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার সময় হইতে মস্কো বিশ্ববিদ্যালর ছিল রুশ দেশে বিজ্ঞান চর্চার ও স্বাধীন চিন্তার সূতিকাগার। লমনোসফ্ ও তাঁহার শিষ্যবর্গের অনুপ্রেরণায় দর্শনে বিজ্ঞানে ও সাহিত্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নানাভাবে সুনাম অর্জন করিতেছিলেন। পশ্চিম ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত ধারার সহিত তাঁহারা থাকিতেন ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জার্মান, ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যকে প্রত্যক্ষভাবে জানিতেন। ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অন্তরে যে প্রগতিশীল চেতনার সঞ্চার হইত স্বদেশে তাহার অনুরূপ কর্মক্ষেত্রের অভাবে তাহাদের অন্তর হইত পীড়িত। অভিজাত শ্রেণীর শিক্ষিত অংশের মধ্যেও স্বৈরাচারের ও ভূমিদাস প্রথার প্রতি ঘৃণা পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। তাই ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই যে দেকাব্রিস্ত অভ্যুত্থানের পরিচালকবর্গের অধিকাংশই ছিলেন অভিজাত বংশীয় ও মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক বা ছাত্র। কিন্তু এই অভ্যুত্থানের আতঙ্কে জার প্রথম নিকোলাই-এর দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার নিকট প্রতিভাত হইল যেন এক বিশাল 'কেওস'—সর্ববিধ বিশৃঙ্খলার ভয়াবহ আধার। তিনি ইহার সর্বত্র দেখিতে লাগিলেন গুপ্ত সমিতির প্রেতাত্মা, নূতন অভ্যুত্থানের অশুভ সংকেত। পুলিশের কড়া নজর হইতে ছাত্র বা শিক্ষক

কাহারো রেহাই ছিল না। সম্মানিত অধ্যাপককেও গুপ্তচর বৃত্তি গ্রহণ করিতে হইত। সম্ভব হইলে জার সম্রাট এই বিশ্ববিদ্যালয়কে পোড়াইয়া ফেলিতে দ্বিধা করিতেন না। কিন্তু তাহা সম্ভব না হওয়ায় যাহাতে সেখানে কোনরূপ "নূতন ভাবে"-র সঞ্চার না হয় তাহার ব্যবস্থায় মন দিলেন।

কিন্তু এত করিয়াও সর্বশক্তিমান জারের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না। একদিকে নিপীড়নের মাত্রাধিক্যে ভূমিদাসদের সহনসীমা ঘন ঘন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, অন্যদিকে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেও নিত্য বাড়িতে লাগিল শ্রম-শিল্প প্রবর্তনের মাধ্যমে রুশদেশে ধনতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অদম্য আগ্রহ। দেকাব্রিস্তদের স্ফুলিঙ্গ নিবিয়া গিয়াও ভবিষ্যতে অগ্নিকাণ্ডের পথ দেখাইয়া গেল। তাঁহাদের তীক্ষ্ন সমালোচকের দৃষ্টি ও সুগভীর দেশাত্মবোধ দেশময় ছড়াইয়া পড়িল গ্রিবায়েদফ-এর নাটক—"বুদ্ধিমত্তার বিপত্তি"র আইন-বিরোধী প্রচারের ও পুশকিনের রচনাবলীর প্রতিভাময় প্রভাবে। স্বৈরাচার ও সার্ফপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কয়েকজন মুষ্টিমেয় সৈনিক যোদ্ধার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া জন সাধারণের জীবন সংগ্রামের নিকটবর্তী স্তরে আসিয়া অবতীর্ণ হইল। শ্রমশিল্পের ব্যাপক প্রসারের অভাবে তখনও রুশদেশে শ্রমিক শ্রেণীর উদ্ভব হয় নাই, হইবার সম্ভাবনা ও ছিল সুদূরে। সমাজবিপ্লবের এই স্তরে নেতৃত্বের ভূমিকা, ইতিহাসের নিয়মানুসারে, লইতে হইল মধ্যবিত্ত মস্তিষ্ক-জীবীকে। এই শ্রেণীর যে সকল বুদ্ধিজীবীর এই পর্বে জারের অমোঘ ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করিয়া বিপ্লবীগণবাদের বাণী দৃঢ় কণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ওএগারো নম্বর কামরার পাঠচক্রের নেতা ভিসারিয়ন বেলিনস্কি তাহাদের অন্যতম ও সর্ববাদী সম্মতভাবে সর্বাগ্রগণ্য।

সহজাত দীপ্তবুদ্ধির সহিত বেলিনস্কির জীবনে যুক্ত হইয়াছিল জনজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রায় বাল্যকাল হইতেই। যে গ্রামে তাঁহার জন্ম যাহা এখন তাঁহারই নামানুসারে পরিচিত—তাহা তখন ছিল ঠিক সেইরূপ অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত যাহার শ্লেষাত্মক বর্ণনা পাওয়া যায় গোগলের "পরিদর্শক মহাশয়" নাটকে। অথচ তাঁহার পিতা ছিলেন ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বিরাট দেশপ্রেমিক যুদ্ধে নৌ-সেনাবাহিনীতে ডাক্তার। যুদ্ধান্তে গ্রামে ফিরিয়া কিছুকাল তিনি এই জাতীয় জীবন-মরণ সংগ্রামের আদর্শ ভুলিতে পারেন নাই। নিজে চার্চে যাইতেন না ও প্রখরবুদ্ধি সন্তানকে নিজেই শিখাইতেন ল্যাটিন ভাষা। কিন্তু গ্রাম্য পরিবেশ অচিরে তাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়া লইল। স্বগৃহে পশুবৎ

আচরণেও তাঁহার বাধিত না। পিতার অধঃপতনে পুত্রের হইল চৈতন্যোদয়। আসিল বিচার-প্রবণতা ও প্রতিকার-স্পৃহা। এইরূপ মানসিক প্রস্তুতি লইয়া বেলিনস্কি যখন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে পদার্পণ করিলেন তখন সেখানকার আবহাওয়া ছিল বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো। ছাত্রদের মধ্যে একদিকে দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সমাজনীতি বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়নে ও আলোচনায় অক্লান্ত আগ্রহ, অন্যদিকে তেমনই স্বদেশের বর্তমান দুর্দশা ও ভবিষ্যৎ অগ্রগতি সম্বন্ধে উত্তেজিত বিতণ্ডা। পাঠচক্রের নিজস্ব অধিবেশনে ও বিভিন্ন পাঠচক্রের প্রতিনিধিদের ভিতরে যে সকল বিতর্কসভা ছাত্রাবাস ভবনকে মুখরিত করিয়া তুলিত তাহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যা-বুদ্ধি জাহির করার সস্তা প্রলোভন নয়, ভবিষ্যতে কর্মকাণ্ডে জীবন উৎসর্গ করার পূর্বপ্রস্তুতি। জারের সুকঠিন শাসনে তখন অন্য কোনরূপ কর্ম-তৎপরতার পথ ছিল বন্ধ—একমাত্র সাহিত্যালোচনার পথ ছিল কিছুটা খোলা। তখন ছাত্রদের মধ্যে কোনরূপ বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি ছিল না, এবং থাকিতেও পারিত না, কিন্তু ছিল এক গুপ্ত অর্থাৎ অপ্রকাশিত ঐক্য, যে জারের সহিত সংগ্রামের পথে সার্ফ প্রথার অবলোপ ছাড়া দেশের মুক্তির জন্য অন্য কোন পথ নাই। ছাত্রসমাজের এই পরিস্থিতিতে বেলিনস্কির ভূমিকা অচিরাৎ নির্দিষ্ট হইয়া গেল। এই ছাত্র বন্ধু-মহলে তাঁহার নূতন নামকরণ হইল 'ভিসারিয়ন ফিউরিয়জো'।

বিদ্যাচর্চার সুতীব্র তৃষ্ণার সহিত অল্পবয়স হইতেই বেলিনস্কির ঝোঁক ছিল কবিতা রচনায় ও নাটকাভিনয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে কবি, অভিনেতা বা নাট্যকার হিসাবে তিনি জীবনে কোন সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। তবুও ছাত্রাবস্থায় রচিত তাঁহার নাটক 'দমিত্রি কালিনিন'—নাট্য শিল্পের নানাবিধ দুর্বলতা সত্ত্বেও ইতিহাস-খ্যাত হইয়া আছে। ইহা এক বিদ্রোহী ভূমিদাসের কাহিনী যে তার আত্মহত্যার পূর্বে ঘোষণা করে "জীবন যেপেছি স্বাধীনভাবে, মৃত্যুও মোর স্বাধীন।" বেলিনস্কির স্বভাবসিদ্ধ আবেগের সহিত এই নাটক পাঠচক্রে পড়া হইলে ছাত্রমহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ইহাকে মঞ্চস্থ করার প্রস্তাব গৃহীত হইল, কিন্তু তাহার পূর্বে প্রয়োজন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারকের অনুমোদন। অধ্যাপক-বিচারক বেলিনস্কিকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া জানাইয়া দিলেন যে "নাটকটি দুর্নীতিপূর্ণ ও বিশ্ববিদ্যা-লয়ের কলঙ্কস্বরূপ"। তাঁহাকে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনের ভয়ও দেখানো হইল।

সকলেই জানিত, এরূপ শাস্তির ভয় মোটেই অমূলক ছিল না। নাটকের অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিরাগ তাহাতেও শান্ত হয় নাই। শারীরিক অসুস্থতায় বেলিনস্কি তাঁহার তৃতীয় বার্ষিক পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এই "অকৃতকার্যতা"র অছিলায় তাঁহার উপর জারি হইল বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়নের আদেশ। প্রকৃত কারণ যে কি তাহা বুঝিতে কাহারও দেরি হইল না।

বিতাড়িত বেলিনস্কির আর্থিক দুর্দশা চরমে উঠিল। নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টায় তাঁহাকে করিতে হইল দিবা-রাত্র পরিশ্রম, ছেলে পড়ানো, টুকিটাকি লেখার কাজ, ও কখনো কখনো বিভিন্ন ভাষা হইতে অনুবাদ। সহানুভূতিশীল সহায়কও দু-একজন জুটিয়াছিল, যাঁহাদের চেষ্টায় তাঁহার অনুবাদগুলি সাময়িক পত্রে স্থান পাইত। তাঁহার এই সময়কালের অনুবাদ-রচনার মধ্যে একটির নাম পাওয়া গিয়াছে—"কলিকাতায় একটি দিন।" মূল রচনাটির সন্ধান না জানায় আমি দুঃখিত।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বেলিনস্কির বয়স যখন তেইশ, 'মল্ভা' (জনশ্রুতি) পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইল তাঁহার "সাহিত্য স্বপ্নাবলী"। এখন হইতেই প্রারম্ভ সাহিত্যসমালোচক হিসাবে বেলিনস্কির প্রতিষ্ঠা। সাবেগ জীবন্ত ভাষায় ইহাতে তিনি দিলেন রুশ সাহিত্যের বিকাশের একটি সমীক্ষা, লমনোসফ্ হইতে শুরু করিয়া তাহার কালের লেখকগণ পর্যন্ত। প্রথম থেকেই বেলিনস্কির সমালোচনা-পদ্ধতির ইহাই ছিল বিশেষত্ব যে সাহিত্য-বিচার বলিতে তিনি নিছক 'সাহিত্যিক' বিচারই বুঝিতেন না। "স্থায়ী ও সারগর্ভ হইতে হইলে সাহিত্য হইতে হইবে জনগণের সাহিত্য"—ইহা ছিল তাঁহার সুস্পষ্ট অভিমত। কিন্তু জনগণের সাহিত্য বলিতে তিনি বুঝিতেন না যে তাহাতে থাকিবে জনগণের ভাষায় জনজীবনের অনুকৃতি বা স্তুতি। তিনি চাহিতেন তাহাদের আন্তর-জীবনের, মর্মকথার সত্যনিষ্ঠ রূপায়ণ। তাই যে কোন লেখক বা রচনা তাঁহার আলোচনার বিষয়বস্তু হোক্ না কেন, তিনি তাহাকে অবলম্বন করিয়া দেখাইতে চাইতেন পারিপার্শ্বিক জীবনের প্রকৃত অবস্থা। তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে প্রকাশ পাইত অনমনীয় সংগ্রামশীল যোদ্ধার স্বাধীনতাকামী অভীপ্সা। তিনি বলিতেন, রুশ সাহিত্যের ও রুশসমালোচনার আছে এক বৃহৎ দায়িত্বশীল কর্তব্য। সাহিত্য নয় প্রমোদের পরিবেশন, সাহিত্যের কাজ নয় কেবল লোককে খুশীকরা "গ্রীষ্মকালে সুস্বাদু লেমোনেডের

মতো"। তাহার কাজ লোককে দেখানো ও বোঝানো জীবন যাত্রার প্রকৃত অবস্থা, জীবনের যাথার্থ্য। সাহিত্য সমালোচনার আকারে প্রকাশ পাইলেও বেলিনস্কির রচনার প্রকৃত মর্ম জারীয় পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না। আদেশ আসিল তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশ বন্ধ রাখার। ঠিক সেই সময়ে শহরে না থাকায় তাঁহার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা নিষ্ফল হইয়া গেল। পরে তিনি বসবাস করেন পিটাসবুর্গে ও বিভিন্ন পত্রের সহিত সহযোগিতা করেন। তাঁহার প্রবন্ধগুলি বুদ্ধিজীবী মহলে প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি করে। যখন যে সাময়িক পত্রে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত তাহার নূতন সংখ্যা বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক মহলে পড়িয়া যাইত কাড়াকাড়ি। স্বয়ং পুশকিন তাঁহাকে আহ্বান করেন "সমসাময়িক" পত্রে রচনা প্রকাশের জন্য। বেলিনস্কি ছিলেন পুশকিনের রচনার পূজারীভক্ত। বারোটি প্রবন্ধে পুশকিনের কাব্যগ্রন্থ "ইয়ে সগনিই আন্যেগিন"-এর যে বিশ্লেষণ তিনি করিয়া গিয়াছেন তাহা এখনও সোভিয়েত দেশে প্রত্যেক কাব্যামোদীর অবশ্য পাঠ্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমান ক্ষেত্রে দেবতার ও ভক্তের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটিতে পারে নাই। এই সম্ভাবনাকে বিলুপ্ত করিয়া দিল পুশকিনের আকস্মিক অপঘাত্যা।

বেলিনস্কির একান্ত দেশপ্রেম ও বিপ্লবনিষ্ঠা সত্ত্বেও একথা ভাবিলে ভুল হইবে যে তাঁহার জীবনদর্শনে ও সমাজবীক্ষায় কোন বৈদেশিক প্রভাব ছিল না বা কখনো ওঠা-নামা ঘটে নাই। আঠারো শতকের শেষের ও উনিশ শতকের আরম্ভের পশ্চিম-ইউরোপের দার্শনিক ও সামাজিক চিন্তা যে তাঁহাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা অসঙ্গত। তখনকার দিনের যে কোন চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীর পক্ষে হেগেলীয় দর্শনের সর্বগ্রাসী প্রভাব হইতে আত্মরক্ষা করা ছিল এক অভাবনীয় ব্যাপার। হেগেলের ভাববাদ হইতে বেলিনস্কিও প্রথমে মুক্তি পান নাই। কিন্তু বেলিনস্কির রচনাবলী অনুধাবন করিলে দেখা যায় তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মনের সমস্ত দ্বারগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া হেগেলীয় দর্শনেরও সাধ্যাতীত ছিল। হেগেলীয় দর্শনের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি তাঁহাকে যতটা আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাঁহার ভাববাদী সিদ্ধান্তগুলি তেমন পারে নাই। হেগেলের বিরুদ্ধে ফয়েরবাখ-এর বস্তুবাদী দর্শন তাঁহাকে তেমনই আকর্ষণ করিয়াছিল যেমন তাহা করিয়াছিল মার্কস ও এঙ্গেলসকে। ইহা ছাড়া ফরাসী বিপ্লবের গর্ভজাত বুর্জোয়া গণতন্ত্রে বিশ্বাস ও ইউটোপীয় সমাজবাদের আদর্শ যে তাঁহাকে কি বিপুল বেগে আকর্ষণ করিত তাহার প্রচুর

নিদর্শন পাওয়া যায় তাঁহার রচনাবলীতে। কিন্তু কোন মতবাদই বেলিনস্কি গ্রহণ করিতেন না বিনা-বিচারে। তাঁহার অনুসন্ধিৎসার মূল উৎস ছিল রুশ-জনগণের জীবনযাত্রা। সব মতবাদেরই বিচার হইত এই কষ্টিপাথরে। তাই সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি থাকিয়া গেলেন—কিরফের ভাষায় এক মহৎ অনুসন্ধানী—দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক দিগদর্শন যন্ত্র তাঁহার আয়ত্তাতীত রহিয়া গেল। দীর্ঘ রোগভোগের পর যে বৎসর ঘটিল তাঁহার জীবনের অবসান, সেই বৎসরই প্রকাশিত হইল আধুনিক বিশ্বের যুগান্তকারী গ্রন্থ—মার্কস ও এঙ্গেলসের যৌথ প্রচেষ্টায় রচিত "কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণা"। বাঁচিয়া থাকিলে যে এই গ্রন্থ বেলিনস্কির দৃষ্টি আকর্ষণ করিত তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। তিনি ইহার আগেই মার্কস ও এঙ্গেলসের রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে "জার্মান-ফরাসী বার্ষিকী ১৮৪৪" নামক সংকলন গ্রন্থে মার্কসের দুইটি ও এঙ্গেলসের একটি প্রবন্ধ পড়িয়া তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। মনে রাখিতে হইবে এই সময়ে মার্কসের বয়স ছিল ছাব্বিশ ও এঙ্গেলসের চব্বিশ। প্রবন্ধগুলি তাঁহারা লিখিয়াছিলেন স্বতন্ত্রভাবে। তাঁহাদের অনুপম যে বন্ধুত্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূচনার ইতিহাসকে পুরাকালের কাহিনীর কাব্যময় সুষমায় মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে তখনও তাহার উদ্ভব হয় নাই। মার্কসের দার্শনিক বিচারভঙ্গী যে বেলিনস্কিকে প্রবলবেগে নাড়া দিয়াছিল তাহা ভবিষ্যৎ গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে। পঞ্চাশের বেশী বয়সে রুশভাষা শিখিয়া মার্কস ও এঙ্গেলস পুশকিনের কবিতায় মুগ্ধ ও বেলিনস্কির মন্ত্রশিষ্য চের্নিশেভস্কির বিপ্লবী মতবাদে চমৎকৃত হইয়াছিলেন ইহা এখন সুবিদিত। কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং বেলিনস্কির রচনার সন্ধান পাইয়াছিলেন কিনা, আমার এ প্রশ্নের উত্তর আমি মস্কোয় প্রবাসকালে জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারি নাই। বেলিনস্কিও তাঁহার জীবনের শেষ দুইবৎসরে উপনীত হন বস্তুবাদে অকুণ্ঠ আস্থায়, চেষ্টা করেন হেগেলের দ্বান্দ্বিককে প্রতিষ্ঠিত করিতে নূতন বস্তুবাদী ভিত্তিতে, যাহাতে তাহা পরিবর্তিত হইতে পারে "বিপ্লবের বীজগণিতে"। এই সময়ে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে এমন একটি বস্তুবাদী জীবনদর্শন শীঘ্রই প্রণীত হইবে যাহাতে জাগতিক বিচারে কোন স্থান থাকিবে না কাল্পনিকতার বা অতীন্দ্রিয়তার। এইরূপ জীবনদর্শন যে প্রণীত হইয়া গিয়াছে, হেগেলের দ্বান্দ্বিকের ভিত্তিতে যে "বিপ্লবের বীজগণিত" রচিত হইয়া গিয়াছে তাহা

জানিবার পূর্বেই তাঁহার হইল অকালে মৃত্যু, ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে ইহা যেন এক নিয়তির পরিহাস।

বেলিনস্কির বিশ্ববীক্ষার বিবর্তনে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দকে ধরা যাইতে পারে উৎক্রান্তি বিন্দু হিসাবে। ঐ বৎসরে স্থাপিত হয় তাঁহার সাহত গেৎর্সন-এর মূলগত মতৈক্য ও সহযোগিতা। গেৎর্সেন ছিলেন বেলিনস্কির চেয়ে এক বছরের ছোট। তাঁহার নামের সহিত একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী জড়িত আছে। তাঁহার বাবা ইয়াকভলেফ, একজন উচ্চ শিক্ষিত রুশ ভূস্বামী, বিবাহ করেন লুইসা হাগ নামে এক জার্মান মহিলাকে। কিন্তু এ বিবাহ আইন-অনুমোদিত ছিল না। পিতার উপাধির পরিবর্তে এই বিবাহের সন্তানকে তাই উপাধি দেওয়া হয় গেৎর্সেন, যেহেতু জার্মান ভাষায় 'হৃদয়' শব্দটির প্রতিশব্দ হইতেছে 'হেৎর্স'-যাহা রুশ উচ্চারণে দাঁড়ায় "গেৎর্স"। গেৎর্সেন বাল্যে ও কৈশোরে স্বগৃহেই উচ্চশিক্ষার সুযোগ পান। বেলিনস্কি যখন মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ঠিক সেই সময়েই গেৎর্সেন আসিয়া তথায় যোগদান করেন ও বেলিনস্কির মতোই অবিলম্বে বিপ্লবী ছাত্রনেতা হিসাবে প্রখ্যাত হইয়া ওঠেন। কিন্তু জার-শাসনের কোমল করুণায় তাঁহার ছাত্রজীবন সম্পূর্ণ হইতে পারিল না, তাঁহাকে কয়েক বৎসর কাটাইতে হইল নির্বাসনে। নির্বাসন হইতে মুক্তি পাইয়া মস্কোয় ফিরিলে বেলিনস্কির সহিত তাঁহার সংযোগ হইল। কিন্তু সর্ব্বাঙ্গীন মিল হইল না মতের। বেলিনস্কির তখন ঝোঁক ছিল দার্শনিক বিপ্লবে, আর গেৎর্সেন ছিলেন সামাজিক বিপ্লবের পক্ষপাতী। হেগেলের প্রভাব কাটাইয়া গেৎর্সেন আগেই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে আসিয়া পেঁাছিয়াছিলেন। বেলিনস্কি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে গেৎর্সেনের সহিত বিতর্ক তাঁহাকে প্রচুর সহায়তা করিয়াছিল "হেগেলীয় দলের টুপি মাথা হইতে খসাইয়া ফেলিতে"। আর বেলিনস্কি সম্বন্ধে গেৎর্সেন বলিয়াছিলেন, "এই স্বভাবতঃ লাজুক ও ক্ষীণকায় মানুষটির ভিতরে ছিল অপরিমেয় সাহস, প্লাডিয়েটরের সাহস। হ্যাঁ, তিনি ছিলেন একজন প্রকাণ্ড শক্তিশালী যোদ্ধা।"

বেলিনস্কির প্রতিভার এই শক্তিশালী যোদ্ধৃত্বের সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে প্রয়োজন হয় তৎকালীন রুশ-সাহিত্যের সহিত নিগূঢ় পরিচয় ও তৎ-সম্পর্কিত বেলিনস্কির প্রবন্ধাবলীর অমনোযোগ অনুধাবন। তাহাতেই জানা যায়, কিভাবে বেলিনস্কি হেগেলের ভাববাদী মায়ার কুজ্ঝটিকা কাটাইয়া দার্শনিক বস্তুবাদের যুক্তি-উজ্জ্বল আলোয় সাহিত্য ও শিল্প আলোচনাকে

সম্বন্ধ করিয়াছেন। বেলিনস্কির মতে, সাহিত্য ও শিল্প হইতেছে বাস্তব জগতের প্রতিবিম্বন শিল্পসম্মত রূপনার—আর্টিস্টিক ইমেজের—সহায়তায়। আর্ট বাস্তবের পুনঃসৃষ্টি, যেন পৃথিবীকে নূতন করিয়া রচনা করা। বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে সাহিত্য ও শিল্প আমাদের পক্ষে ততখানি শক্তিশালী হাতিয়ার, যতখানি বলা যায় বিজ্ঞানকে। বাস্তবের প্রতিবিম্বন হইয়াও শিল্প বা সাহিত্য কেবল তাহাকে অনুকরণ বা কপি করিয়াই থামিতে পারে না। শিল্পী কখনও তৃপ্ত থাকিতে পারে না বাস্তবতার 'ফেনোমেনা'কে অবিকল ভাবে প্রতিরূপিত করিয়াই। তাহার ব্রত হইতেছে এই সকল ফেনোমেনাকে ব্যাখ্যা করা, তাহাদের মূল্য নির্ণয় করা। বেলিনস্কির মতে, জীবনের ও প্রকৃতির দর্পনের মতো উদাসীন প্রতিচ্ছায়া যোগানের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নহে আর্টের; তাঁহার চিত্রণের মধ্যে থাকা চাই ব্যক্তিগত আবেগপূর্ণ চিন্তা, যে চিন্তা চিত্রকে দিবে লক্ষ্য ও দ্যোতনা। তাঁহার "সমালোচনা সম্বন্ধে" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন ঃ

"আমাদের যুগের আর্টের প্রধান লক্ষণ কি? ইহা সমাজের বিশ্লেষণ ও বিচার, অর্থাৎ সমালোচনা। বর্তমানে চিন্তার উপাদান শিল্পকৃতির মধ্যেও মিশিয়া গিয়াছে। আমাদের যুগে সে শিল্পকৃতি নির্জীব যাহা জীবনকে কেবল বর্ণনার জন্যই বর্ণনা করে, যাহাতে না যুগোপযোগী ভাবধারা হইতে উদ্ভূত শিল্পীর প্রবল আত্মগত প্রেরণা, যাহা হইয়া ওঠেনা যন্ত্রণার আর্তনাদ অথবা উল্লাসের হর্ষধ্বনি, যাহাতে থাকে না কোন প্রশ্ন কিংবা উত্তর কোন প্রশ্নের।" স্পষ্টই দেখা যায় বেলিনস্কির এই অভিমত তাঁহার সমবয়সী ফরাসী লেখক তেওফিল গোতিয়ে-র শিল্পাদর্শের একান্ত পরিপন্থী। ইউরোপীয় শিল্পসমাজে তখন গোতিয়ে-র প্রভাব ছিল অসামান্য; তিনি ছিলেন "শিল্পের জন্য শিল্প" এই মন্ত্রের প্রধান প্রবর্তক। তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমাদের কাছে আর্ট কোন সাধনার উপায় নয়, তাহা একান্তই সিদ্ধি। যে শিল্পী সুন্দরের অতিরিক্ত অন্য কিছুকে নিজের লক্ষ্য করেন, আমাদের দৃষ্টিতে তিনি মোটেই নহেন শিল্পী।" এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় শেকসপীয়রের বিচারে বেলিনস্কির গভীর অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ মন্তব্য, যাহা তাহা যুগের পক্ষে যেমন বিস্ময়কর, আমাদের যুগের পক্ষেও তেমনি প্রণিধানযোগ্য। "শেকসপীয়রের সৃজনী প্রতিভা যে বিরাটতম, কবি হিসাবে তিনি যে সর্বোচ্চশ্রেণীর, ইহাতে কাহারো কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা শেকসপীয়রকে খুবই কম বোঝে

যাহারা তাঁহার কবিত্ব শক্তিকে অতিক্রম করিয়া দেখিতে পায় না তাঁহার ভাববস্তুর ঐশ্বর্যকে, সেই অফুরন্ত খনিকে যেথা হইতে মনস্তাত্ত্বিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রকর্মী প্রভৃতি সকলেই সংগ্রহ করিতে পারেন তথ্য ও শিক্ষা। শেকসপীয়র মত কিছুই দেন কবিতার আকারে, কিন্তু তাঁহার দান এমন যে তাহা মোটেই কেবলমাত্র কবিতার অধিকার-ভুক্ত নহে।”

সাহিত্যের সামাজিক তাৎপর্য ও সাহিত্যিকের সুমহান আদর্শ সম্বন্ধে বেলিন্‌স্কির বক্তব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখা যায় তাঁহার অনতিকাল পূর্বে রচিত গোগল-কে লিখিত পত্রে। মনে রাখিতে হইবে, এমন দিন ছিল যখন বেলিন্‌স্কির লেখনী মুখরিত গোগলের যশোগানে। কাব্য রচনার উৎকর্ষে গোগলকে তিনি পুশকিনের উত্তরাধিকারীর আসনে বসাইতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু কালক্রমে গোগল রুশদেশের প্রপীড়িত ভূমিদাসবর্গের প্রতিনিধিত্ব পরিত্যাগ করিয়া ভারতের সনাতন ধর্মের পক্ষে ওকালতি আরম্ভ করিলেন। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের খাতিরেও বেলিন্‌স্কির স্থির থাকিতে পারিলেন না। যক্ষ্মা-রোগে আক্রান্ত অবস্থায় তিনি তখন ছিলেন জার্মানিতে, জালৎসব্রুনের স্বাস্থ্য নিবাসে। সেখান হইতে গোগলকে পাঠাইলেন এক বহ্নিদীপ্ত বিচারপত্র, লেনিনের মতে, যাহার তুলনা রুশভাষায় সে যুগের রচনায় নাই বলিলেই হয়। এই পত্র তৎক্ষণাৎ বে-আইনী ঘোষিত হইয়া গেল, এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে এই নিষেধ প্রত্যাহার করা হয় নাই। কিন্তু ইহা প্রচারিত হইতে লাগিল হাজারে হাজারে হাতে লেখা কপিতে। জারের আদেশে তাঁহার জন্য স্থান নির্দিষ্ট হইয়া রহিল কুখ্যাত পিটার-পল দুর্গে। কিন্তু মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে জারের শাসন হইতে মুক্তি দিয়া গেল। জার যাহাকে হত্যা করিতে চাহিয়াছিলেন তিনি অমর হইয়া রহিলেন রুশজনগণের চিত্তে। রুশজাতির সংগঠক হিসাবে তাঁহার স্থান গৌরবের সেই সুউচ্চশিখরে যেখানে, স্তালিনের উক্তি অনুসারে, অধিষ্ঠিত আছেন পুশকিন ও তলস্তোই, গ্লিনকা ও চাইকভস্কি, গোর্কী ও চেহভ, রেপিন ও সুরিকফ, সেচেনফ ও পাভলফ, যাঁহাদের প্রত্যেকের অবদানে বিশ্ব-সংস্কৃতি ভাণ্ডার সুসমৃদ্ধ।

লেফ তলস্তোই-এর সাহিত্য-সাধনা

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের কথা বলিতে যাঁহাদের নাম স্বতঃই সর্বাগ্রে স্মরণে আসে, বোধ হয় অকুণ্ঠে ঘোষণা করা যায় যে লেফ তলস্তোই তাঁহাদের অন্যতম। বিশেষতঃ আধুনিক অর্থাৎ মধ্যযুগ-পরবর্তী পশ্চিমী সাহিত্যের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এই অভিমতও হয়তো অসংগত নয় যে তিনি কেবল ইতালীর দান্তে ও ইংলন্ডের শেকসপীয়রের সহিত-ই তুলিত হইবার যোগ্য। ইহা অবশ্য স্বীকার্য যে বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের তুলনামূলক মাপকাঠি খুবই অনিশ্চিত। সাহিত্যের প্রকাশ-মাধ্যম হইল ভাষা। ভাষার ব্যবহারে কোন লেখকের কতখানি কৃতিত্ব, তাহার উপরে তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা অনেকাংশে নির্ভর করে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে পদের প্রয়োগে, শব্দের যোজনায় ও নানাবিধ প্রকরণের উদ্ভাবনে রচনাশিল্পী হিসাবে সাহিত্যিক খুঁজিয়া পান ব্যক্তিগত প্রতিভার স্বধর্ম-অনুমোদিত প্রদর্শনক্ষেত্র। কিন্তু রচনা-শিল্পের চরম সার্থকতা প্রদর্শনে নয়, প্রকাশে। সাহিত্য রচনায় শাব্দিক অর্থ ও আনুষঙ্গিক দ্যোতনার ভিতর দিয়া যাহা পাঠককে তত্ত্বশিক্ষার বা রসাস্বাদনের অতিরিক্ত সাবেগ অনুভূতির প্রগাঢ়তায় অভিভূত করিয়া ফেলে তাহাকেই বলা চলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের প্রাণবস্তু। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক লংগিনাস্-এর উক্তিঃ "সাহিত্য কেবল শিক্ষা দেয় না,

সরস করে না, বিচলিত করে।" ইহারই প্রভাবে বৃহৎ সাহিত্য ভাষাগত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করিয়া সর্বমানবীয় হইয়া উঠিতে পারে। সাহিত্যের এই প্রাণবস্তুর উৎসের সন্ধান শক্তিশালী সাহিত্যিক পান তাঁহার সমকালীন ঐতিহাসিক পরিবেশে। সাহিত্যের ইতিহাসে তাই দেখা যায় পৃথিবীর যে কোন দেশে ও যে কোন কালে বৃহৎ সাহিত্যের আবির্ভাব হয় না। যে-দেশে ও যে-কালে সমাজজীবনে গভীরতর আলোড়ন সংঘটিত হয় তখনই কেবল সম্ভব হয় সেখানে বৃহৎ সাহিত্যের উদ্ভাবনা। দান্তের যুগের ইতালীতে ও শেকসপীয়রের যুগের ইংলণ্ডে সামাজিক আলোড়ন বিশ্বমানবের প্রগতির ইতিহাসে দুইটি গৌরবময় অধ্যায়। ইহার পরে ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশেও বিপুল সামাজিক আলোড়ন ঘটিয়াছিল ও তাহার ফলে সেই সব দেশেও সৃষ্টি হইয়াছিল মহৎ সাহিত্যের। কিন্তু সমগ্রভাবে বিচার করিয়া বলা যাইতে পারে যে এইসব দেশে সমাজ-বিপ্লবের সীমারেখা ইংলণ্ডীয় সমাজ-বিপ্লবের সীমারেখাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। তাই দেখা যায় উত্তর-শেকসপীয়রীয় যুগের ফরাসী, জার্মান, বা নরওয়েজীয় সাহিত্য তাহাদের বিপুল মানবীয় সংবেদনশীলতা সত্ত্বেও ইংরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তিসমূহের তুলনায় স্তিমিতজ্যোতি। জারতন্ত্রীয় রুশদেশের যে সামাজিক পরিবেশে ল্যেফ তলস্তোই-এর প্রতিভার উদ্ভব ও বিকাশ তাহার উপর ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানির আর্থিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল অসামান্য; কিন্তু ইতিহাসের নিগূঢ় ইঙ্গিতে তাহাতে নিহিত ছিল সমগ্র মানবসমাজের নূতন অগ্রগতির সম্ভাবনা, ভবিষ্যৎ সমাজবিন্যাসের বীজ। তলস্তোই-এর উর্বর মানসক্ষেত্রে এই বীজ হইতে ফলিল অভাবিতপূর্ব ফসল, তাঁহার রচনাসম্ভার। তাঁহার সাহিত্য-সাধনার মহিমায় রুশসাহিত্য তর্কাতীতভাবে বিশ্বসাহিত্যের পুরোভাগে আসিয়া সম্মানের আসন অলংকৃত করিল।

ইহা আজ সুবিদিত যে রাশিয়ার জাতীয় সাহিত্যের বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় পুশকিনের প্রতিভার মাধ্যমে। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিল তাঁহার অকাল মৃত্যু মাত্র ৩৯ বছর বয়সে, যাহাকে মৃত্যু না বলিয়া হত্যা বলাই বেশী যুক্তিসংগত, কারণ এই হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রে প্রধান নায়ক ছিলেন স্বয়ং জার প্রথম নিকলাই। আবাল্য পুশকিনের রচনার ও ব্যক্তিত্বের প্রবল অনুরাগী শিশু ল্যেফ তলস্তোই-এর বয়স তখন নয়-দশ বৎসর (জন্ম, ১৮২৮); ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না যে পুশকিনের আয়ুষ্কাল স্বাভাবিক

পরিণতি লাভ করিলে তাঁহাদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল অনিবার্য। অন্যদিকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে যখন ৮২ বছর বয়সে বিশ্বপূজ্য সাহিত্যগুরুর জীবন শেষ হইল স্বেচ্ছাকৃত প্রায়-অপঘাতে, তখন প্রথম রুশ-বিপ্লবের পর গোর্কী-র "মা" ও লেনিনের "মেটিরিয়ালিজম ও এম্‌পিরিয়োক্রিটিমিজম্‌" নামক যুগান্তকারী গ্রন্থ দুইটি পাঠকসমাজে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সুবিস্তীর্ণ ঐতিহাসিক পর্ব তলস্তোয়ীয় সাহিত্য-সাধনার উপযুক্ত প্রেক্ষাপট। তলস্তোই-এর রচনাবলী তাঁহার জীবনব্যাপী সমকালীন সামাজিক চেতনার সহিত ওতপ্রোত-ভাবে সম্পৃক্ত। তিনি একদিকে যেমন আজন্মলেখক অন্যদিকে আমরণ-লেখক।

তলস্তোই-এর প্রথম রচনা প্রকাশ্যে দেখা দেয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার চব্বিশ বছর বয়সে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু নামেই প্রকাশ,—"শৈশব"। ইহা ঠিক লেখকের তথ্যনিষ্ঠ আত্মজীবনী নয়, বাল্যস্মৃতির অবলম্বনে একটি পর্যবেক্ষণ-শীল ও সংবেদনশীল চিত্তের আত্মপ্রকাশ। শিশু ল্যোফ-এর সাহিত্য-চর্চা পারিবারিক পরিবেশে ছিল সস্মিত পরিহাসের বিষয়, "ক্ষুদে মলিয়ের" "ছোকরা ইত্যাদি ছিল তার বিভূষণ। কিন্তু প্রাণের মিল ছিল বড়-দাদার সহিত। তাঁহার সহিত গোপন পরামর্শের পর "শৈশব" প্রেরিত হয় "সোভ্রেমেন্‌নিক" (সমসাময়িক) পত্রিকার সম্পাদক কবি নেক্রাসফ্‌-এর নিকট পত্রযোগে। নামের পরিবর্তে লেখক ব্যবহার করিয়াছিলেন দুটি আদ্যাক্ষর, এল, এন, অর্থাৎ ল্যোফ নিকলায়েভিচ। রুশ সাহিত্যজগতে তখন এই পত্রিকার ছিল অপ্রতিহত প্রভাব। তাহার পৃষ্ঠায় স্থান পাওয়া তখন যে কোন লেখকের গৌরবের বিষয়। সোভ্রেমেন্‌নিক-এর পরিচালকেরা মুগ্ধ হইয়া গেলেন এই অজ্ঞাত লেখকের রচনায়। তাহাতে ছিল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনায় অসামান্য কবিত্ব, ও সেই সঙ্গে সামাজিক ন্যায়-মূল্যের উদ্দীপ্ত চেতনা। অভিজাত বংশে জন্মিয়াও ভূমিদাসদের জন্য সমবেদনা যেমন লক্ষণীয়, তেমনই লক্ষণীয় ফরাসী শিক্ষকের অভদ্র আচরণের বিরুদ্ধে অনমনীয় প্রতিবাদ। সম্পাদক নেক্রাসফ্‌ অবিলম্বে লিখিয়া পাঠাইলেন—সাহিত্যাঙ্গনে আপনি নন আগন্তুক অতিথি।

যে আত্মস্মৃতি রচনার সূচনা হয় "শৈশব", তাহা পরে, প্রসারিত হয় "কৈশোরে" ও "যৌবনে"। কিন্তু 'সোভ্রেমেন্‌নিক'-এ গার্হস্থ্যচিত্র "শৈশবে"র পরই প্রকাশিত হয় সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের একটি চিত্র "হঠাৎ আক্রমণ।" ইহাতে আছে ককেসাস প্রদেশের বন্যপ্রকৃতির বর্ণনা ও তথাকার আদিম জাতির উদ্দাম জীবনযাত্রার ও মৃত্যুভয়হীন বীরত্বের কাহিনী। জ্যেষ্ঠভ্রাতার আমন্ত্রণে

এই প্রদেশে অবস্থান ও ভ্রমণের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল এই রোমান্স-ধর্মী খণ্ড-কাব্য। ইহা পড়িয়া নেক্রাসফ এক পত্রে তুর্গেনিয়েফ-কে জানাইয়াছিলেন—"এমন জিনিস ইতিপূর্বে রুশসাহিত্যে দেখা যায় নাই।" ভাবিতে পুলক লাগে যে রুশ-সাহিত্যে প্রবেশের পথে তলস্তোই-এর প্রথম দুই পদক্ষেপ হইল শান্তি ও যুদ্ধের চিত্রায়নে। প্রাকৃতিক শান্তির সহিত তলস্তোই-এর পরিচয় আজন্ম, পৈতৃক নিবাস 'ইয়াস্নায়া পলিয়ানা'-র মনোরম পরিবেশ তাঁহাকে চিরজীবন মুগ্ধ করিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় হইল ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৫৬)। যৌবনের আবেগে তলস্তোই যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন স্বেচ্ছায়, ব্যক্তিগত সাহসিকতায় বীরের সম্মানও পাইয়াছিলেন কিন্তু রুশজাতির ভাগ্যে ঘটিল পরাজয়। এইখানেই যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার দিব্যদৃষ্টি খুলিয়া গেল। সামরিক জীবনে তাঁহার আসিল অতৃপ্তি, কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে তিনি লিখিয়া ফেলিলেন কয়েকটি গল্প—'সেভাস্তোপল-এর গল্প' নামে যাহারা এখন প্রসিদ্ধ। যুদ্ধের কাহিনী হইলেও এগুলিতে নাই বীরত্বের গাথা। বিশ্বসাহিত্যে এই প্রথম স্থান পাইল যুদ্ধের বাস্তবতা যাহার অকপট প্রকাশ—'রক্তক্ষয়ে, আর্তনাদে ও গণহত্যায়'। এই ব্যাপক ভীষণতার ভিতরেও তলস্তোই ভুলিয়া যান নাই প্রকৃত বীরত্বের মানবিক মূল্য। বিশ্বসাহিত্যে তিনিই প্রথম দিলেন সমসাময়িক সাধারণ সৈনিকের নৈতিক মর্যাদার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। গল্পগুলি সোভ্রেমেন্নিকে প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যিক মহলে সাড়া পড়িয়া গেল। নেক্রাসফ বলিলেন, এই লেখক শিকারী পাখি, হয়তো বা একেবারে ঈগল। তুর্গেনিয়েফ লিখিয়া জানাইলেন—আপনার উপযুক্ত অস্ত্র অসি নয়, লেখনী। তলস্তোই সানন্দচিত্তে অসি ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন পিটার্সবুর্গে, মিলিত হইলেন সোভ্রেমেন্নিকের লেখকমণ্ডলীর সহিত। যাঁহাদের নাম এতদিন শোনা ছিল এখন তাঁহাদের সহিত হইল চাক্ষুষ পরিচয়। তাঁহার রচনাগুলি দ্রুত প্রকাশিত হইতে লাগিল এই বিখ্যাত পত্রিকায়। সমালোচকশ্রেষ্ঠ চের্নিশিয়েভস্কি তলস্তোই-এর প্রারম্ভিক যুগের সাহিত্য-সৃষ্টির বিশ্লেষণ করিয়া লিখিলেন এই মর্মে, যে এই ভাগ্য-পুরস্কৃত লেখকের আছে মানসলোকের সূক্ষ্মতম আন্দোলন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও তাহাকে রূপায়িত করার দুর্লভ ক্ষমতা। তিনি ধরিতে পারেন যাহা মানুষের অন্তরে মাত্র সঞ্চারমান, তাহাদের নানা রূপ, বিভিন্ন গতিবিধি। মানবমনের দ্বান্দ্বিকতা তাঁহার আয়ত্তে। আরও একটি বিশেষ লক্ষণের দিকে

তিনি তখনই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন—লেখক হিসাবে তলস্তোই-এর নৈতিক অনুভূতির শুচিতা। বলা বাহুল্য, চেনির্শিয়েভস্কির এই বিশ্লেষণ তলস্তোই-এর পরিণততম জীবনের রচনার সম্পর্কেও সমান প্রযোজ্য।

তলস্তোই পিটার্সবুর্গে আসায় সোভ্রেমেন্নিক-গোষ্ঠীর সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ে এইরূপ আত্যন্তিক গুণানুরাগ সত্ত্বেও তাঁহাদের ঘটিয়া গেল মৌলিক মতভেদ। যাহাকে বলা হয় বিশুদ্ধ আর্ট, তাহার বিরুদ্ধে দুই পক্ষেরই ছিল তীব্র বিরোধিতা। কিন্তু সোভ্রেমেন্নিক গোষ্ঠী "বিপ্লবী গণবাদী", আর কোনরূপ বিপ্লবী পন্থায় আস্থা ছিল না ল্যেফ তলস্তোই-এর। প্রীতির সম্পর্কে পড়িল ছেদ, বিশেষ করিয়া তুর্গেনিয়েফ-এর সহিত। তলস্তোই শহর ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিলেন গ্রামে, পিটার্সবুর্গ হইতে ইয়াস্নায়া পলিয়ানায়। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি এই অঞ্চলের জমিদারি বাছিয়া নিয়াছিলেন তাঁহার বাল্যজীবনের স্মৃতিমণ্ডিত আবাস ভবনটি সমেত। এখন হইতে এই স্থান হইল তাঁহার প্রধান কর্মকেন্দ্র। মাঝে মাঝে মস্কো বা অন্যত্র যাইতে হইয়াছে। তিনি দুই বার ইউরোপের নানা দেশে পর্যটন করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে কিছুকাল মস্কোতে বসবাসও করিতে হইয়াছিল, সেখানেও আছে তাঁর বাসস্থান, যাহা এখন মিউজিয়াম রূপে ব্যবহৃত। কিন্তু তলস্তোই-এর কর্মজীবনকে ভাবাই যায় না ইয়াস্নায়া পলিয়ানাকে বাদ দিয়া। তাঁহার ডায়ারীতে তলস্তোই লিখিয়া গিয়াছেন—রাশিয়া ও তাহার প্রতি আমার মনোভাব আমার পক্ষে কল্পনা করাই কঠিন আমার ইয়াস্নায়া পলিয়ানাকে বাদ দিয়া। ইয়াস্নায়া পলিয়ানাকে বাদ দিয়া হয়তো আমি আরো স্পষ্ট দেখতে পারি আমার জন্মভূমির পক্ষে প্রয়োজন সাধারণ কর্মবিধি। কিন্তু তাকে এমন আবেগ দিয়া ভালোবাসতে পারি না। তাই বিশ্বের সমগ্র সাহিত্যসেবীর দৃষ্টিতে ইয়াস্নায়া পলিয়ানাই তলস্তোই-তীর্থ।

পিটার্সবুর্গ হইতে ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় ফিরিয়া আসিয়া তলস্তোই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কর্মোদ্যোগে আপন জীবনদর্শনকে বাস্তবে রূপায়ণে প্রবৃত্ত হইলেন। সেইকালের জার-শাসিত রাশিয়ায় দেশব্যাপী দুর্গতির পরিমাপ সম্বন্ধে বিপ্লবী গণবাদীদের সহিত তাঁহার কোনরূপ মতভেদ ছিল না। দেশের বিপুলতম সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল চাষীকুলের; স্বয়ং জার ও তাঁর অমাত্যবর্গ, এবং অন্যান্য জমিদারগণের অত্যাচারে তাহারা উনিশ শতকের মধ্যভাগেও ছিল এমন প্রপীড়িত ও লুণ্ঠিত যে তাহার তুলনা ইতিহাসে পাওয়া দুষ্কর। ল্যেফ

তলস্তোই নিজেই একজন অভিজাত ভূস্বামীর সন্তান। বাল্যকাল হইতে নিজ পারিবারিক পরিবেশের অভিজ্ঞতায় তিনি জানিতেন এই অভিজাত শ্রেণীর জীবনযাত্রার হৃদয়হীন আড়ম্বর ও অন্তঃসারশূন্যতা। ভূমিদাসদের দারিদ্রে ও শিক্ষাভাবে তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইত। নিজে জমিদার হইয়া বসিয়া তাই তাঁহার প্রথম কর্তব্য তিনি ইহাই ঠিক করিলেন যে অন্ততঃ তাঁহার নিজের এলাকার চাষীগণকে মনুষ্যত্বে উন্নীত করিতে হইবে। চাই তাহাদের ভিতর শিক্ষাবিস্তার। নিজের ভবনেই স্থাপনা করিলেন বিদ্যালয়, নিজেই গ্রহণ করিলেন শিক্ষণের দায়িত্ব। তাঁহার সংকল্প, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ মানবীয় আদর্শের অনুকূল, তাহাই বিতরণ করিতে হইবে তাঁহার শিক্ষার্থীদের হিতার্থে। ছাত্রবয়সে লেয়েফ তলস্তোই যত না বিদ্যার্চনা করিয়াছিলেন, শিক্ষক হইয়া তাহার পরিমাণ বহু গুণ বাড়াইয়া দিলেন, আত্মোৎকর্ষ ছাড়া শিক্ষকবৃত্তি যে নিরর্থক। নানা শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। গ্রীকের মতো কঠিন ভাষাও তিনি তিনমাসে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। ইউরোপের নানা প্রগতিশীল দেশ ঘুরিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিদর্শনেও তাঁহার ক্লান্তি ছিল না। অর্জিত জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বাহির করিলেন শিক্ষাবিষয়ক সাময়িক পত্র—"ইয়াস্নায়া পলিয়ানা।" এমন প্রবল আবেগে তলস্তোই এই ব্রতে আত্মনিয়োগ করিলেন যে সাহিত্য-রচনার ধারা প্রায় শুকাইয়া আসিল। তাঁহার মতো প্রতিভাশালী লেখকের এই বিপথগামিতায় তুর্গেনিয়েফ পর্যন্ত আশংকা ও দুঃখপ্রকাশ না করিয়া পারিলেন না।

কিন্তু তুর্গেনিয়েফ তলস্তোই-এর এই নূতন ব্রতের প্রকৃত তাৎপর্য তখন বুঝিতে পারেন নাই। জমিদার তলস্তোই-এর এই প্রচেষ্টাকে চিরদিন-প্রবঞ্চিত কৃষকেরা প্রথম হইতেই দুই হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিবে, এইরূপ কল্পনা করা মূঢ়তা। এই নিষ্ঠুর সত্যকে আত্মস্থ করিতে তলস্তোইকে অন্তর্বেদনার জ্বালা সহিতে হইয়াছে বহুদিন। শেষ পর্যন্ত আসিল তাঁহার সাফল্য। শ্রেণীগত আত্মাভিমানের ভার হইতে মুক্ত হইয়া তিনি পারিয়াছিলেন হইয়া উঠিতে চাষীগণের আপনজন। বাস্তবের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে যখন ঘোষিত হইল ভূমিদাসত্বের অবলোপ, তাহা তলস্তোই-এর সত্য দৃষ্টিকে ঠকাইতে পারিল না। তিনিও ঘোষণা করিলেন, আইনসত্ত্বেও রহিয়া গেল "সেই দারিদ্র্য, সেই অন্ধকার, সেই ক্ষুধা।" হৃদয়ের সহিত হৃদয়ের

যোগস্থাপন করিতে পারায় তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইল কেবল কৃষকের কুটিরদ্বার নয়, তাহাদের অন্তরদ্বারও। তাহাদের সবরকমের দুঃখ-সুখ ও কামনা-বাসনা, তাহাদের মানসলোকের দুর্লক্ষ্য দ্বান্দ্বিক গতির সব জটিলতা তাহার নিকট প্রতিভাত হইল মানচিত্রের মতো সুস্পষ্ট। যে অভিজাত 'কাউন্ট' অদূর ভবিষ্যতে রুশ সাহিত্যে 'মুঝিক'-এর মুখে ভাষা দিয়া তাহাকে অমর করিয়া তুলিবেন তাহারই উপযুক্ত প্রস্তুতি ছিল এই কৃষক-শিক্ষার কর্মকাণ্ডে। ভবিষ্যৎ সাহিত্য-গুরুর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও ছিল এই কর্মকাণ্ডের অংগীভূত। তলস্তোই-এর গদ্যরচনা রুশ-সাহিত্যের অন্যতম বিস্ময়। এ বিষয়ে তাহার নিকটবর্তী প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন কেবল পুশকিন ও তুর্গেনিয়েফ। কিন্তু সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করিলে, বিশালতায় ও বৈচিত্র্যে তলস্তোই-এর গদ্য যে তুলনাতীত গোর্কী ও শোলহফ-ও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। এই অপরূপ গদ্য-রচনার গোপন রহস্য তলস্তোই-এর দৃষ্টিগোচর হয় তাঁহার বিদ্যালয়ের জন্য নানাবিধ পাঠ্যপুস্তক ও ছোটগল্প প্রণয়নের প্রয়াসে। আদর্শ গদ্যরচনা কিরূপ হওয়া চাই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন তিনি ঃ তাহা হওয়া চাই— সুগঠিত, সংক্ষিপ্ত, সরল ও সর্বোপরি স্বচ্ছ। মনে হয়, ফ্লবেয়ার-এর মতো উন্নাসিক স্টাইল-বাদীও এই সংজ্ঞায় খুঁত ধরিতে পারেন না।

তবে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে ইয়াস্নায়া পলিয়ানার কৃষককুলের পিতৃস্বরূপ হইয়া রাশিয়ার বিশাল কৃষকসমাজের সহিত একাত্ম হইবার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় তলস্তোই-এর জীবনদর্শন খণ্ডিত হইয়া গেল। তিনি বিজ্ঞান-বিমুখ হইয়া পড়িলেন। বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রভাবে নানাবিধ যন্ত্রের প্রয়োগে পশ্চিম ইউরোপে শ্রমশিল্পের প্রবর্তন হয়, ধনতন্ত্র আবির্ভূত হয়। ধনতন্ত্রের প্রথম যুগে কৃষকের সনাতন জীবনযাত্রায় আসে বিপ্লব। রুশদেশে এই সম্ভাবনা তখন সৃষ্ট হইতেছিল, তাহাতে তলস্তোই হইলেন ত্রস্ত। তিনি কৃষককুলের মুক্তি চান জারতন্ত্রের নিষ্পেষণ হইতে। কিন্তু কৃষককুলের গ্রামীণ সমাজব্যবস্থা ভাঙিয়া যায়, কৃষকের ও জমিদারের মানবিক সম্পর্ক লোপ পাইয়া স্থাপিত হয় কেবল টাকাকড়ির লেন-দেন, ইহা তাঁহার অ-কাম্য। কৃষকসমাজের স্থায়ী মঙ্গল, যাহা তাহার ঈপ্সিত, তাহা যে যন্ত্রের প্রবর্তন, শ্রমশিল্পের প্রসার ও গণবাদের অভিজ্ঞতার পথ দিয়া সমাজবাদের অভিমুখে অগ্রসর না হইলে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না—এই বৈজ্ঞানিক সত্য তিনি কিছুতেই দেখিতে পাইলেন না। কৃষকের দুঃখে তাঁহার তীক্ষ্ন অনুভূতি তাঁহার সত্যনিষ্ঠাকে রাহুগ্রস্ত করিয়া দিল।

তাঁহার জীবনদর্শনে এই স্ববিরোধ তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত পীড়া দিয়াছে। দুঃখ-দারিদ্র্য, অত্যাচার হইতে মুক্তির সম্ভাবনা তিনি দেখিতে পাইলেন না বিজ্ঞান-সম্মত বিপ্লবের পথে, তাঁহার দৃষ্টি বিভ্রান্ত হইয়া পরিচালিত হইল অজানা রহস্যবাদের পথে, অজ্ঞেয় নিয়তিবাদের পথে। তাঁহার রচিত লোকশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষামূলক গ্রন্থগুলি ছাড়াও তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি সুবৃহৎ উপন্যাসগুলি পর্যন্ত এই অসম্পূর্ণতার প্রভাব এড়াইতে পারে নাই।

লোফ তলস্তোই-এর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমক্ষমতা ছিল অপরিসীম। শিক্ষাব্রত, অশ্বারোহণ, সঙ্গীতচর্চা, জমিদারি পরিচালনা, নব পরিণীতা ভার্যার সহিত মিলিয়া ঘর গড়িয়া তোলা—কিছুতেই তাঁহার শ্রান্তি আসিত না। ইহার মধ্যেও চলিতেছিল সাহিত্য রচনা। কিন্তু সেই সব খণ্ড রচনায় এই বিধি-নির্দিষ্ট বিরাট স্রষ্টা তৃপ্তি পাইতেছিলেন না। অন্তরে অন্তরে তিনি খুঁজিতেছিলেন এমন কোন বিষয়বস্তু যাহার উদার আকাশে তাঁহার শিল্পপ্রতিভা ঈগল পাখির মতোই পাখা মেলিয়া উড়িতে পারিবে, পৃথিবীর তুচ্ছতম দৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি না হারাইয়া। যে বৎসরে তাঁহার বিবাহ, সেই ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিল বরদিনো-র যুদ্ধের পঞ্চাশতম স্মৃতিবার্ষিকী। পরিপূর্ণ ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও তলস্তোই ভুলিতে পারেন নাই ক্রাইমিয়ার সংগ্রামে রাশিয়ার জাতীয় অপমান। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের স্মৃতিতে তাই তাঁহার চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠিল। রাশিয়ার জাতীয় ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গৌরবোজ্জ্বল দিন আর আছে কি? বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়নের পরাজিত অবস্থায় মস্কো হইতে পলায়ন ইউরোপীয় ইতিহাসের মোড় ঘুরাইয়া দিয়াছিল। একটি বিরাট বিষয় অবলম্বনে যে বৃহৎ উপন্যাস রচনার আকুতি তলস্তোই অনুভব করিতেছিলেন অন্তরে, তাহা এখন ধরা দিল তাঁহার কল্পনার নেত্রে। তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে বর্তমান যুগেও হোমেরীয় ধরনে এপিক রচনা অসম্ভব নয়। আরম্ভ হইল প্রস্তুতি, একদিকে অধ্যয়ন, অন্যদিকে তথ্যসংগ্রহ। চলিলেন ম্যাপ-হস্তে বরদিনোর যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করিতে, তখনো-জীবিত যোদ্ধাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে। ১৮৬৩-১৮৬৮, এই পাঁচ বছর ধরিয়া চলিল নিরবচ্ছিন্ন লেখনী-চালনা। নিজের রচনার প্রতি তলস্তোই-এর ছিল নির্মম সমালোচকের দৃষ্টি। কাটিয়া-কুটিয়া নূতন করিয়া তুলিতে তাঁহার কোন কুণ্ঠা বা দ্বিধা ছিল না। তলস্তোই-এর দৃষ্টিশক্তি ছিল ক্ষীণ, অথচ চশমা তিনি ব্যবহার করিতেন না। মাকড়সার জালের মতো জড়ানো গুঁড়ি গুঁড়ি লেখাকে

উদ্ধার করিয়া বারবার কপি করার প্রিয় দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করিলেন শিক্ষিতা বিদুষী ভার্যা। ক্রমে রচনা প্রকাশযোগ্য হইয়া উঠিল, প্রকাশিত হইতে লাগিল খণ্ডে খণ্ডে। "সংগ্রাম ও শান্তি" প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা ইউরোপময় সাড়া পড়িয়া গেল। আর তুর্গেনিয়েফ দিলেন দৃপ্ত অভিমত, 'এই উপন্যাসে আছে এমন অনেক দৃশ্য যাহা সমগ্র ইউরোপে এক তলস্তোই ছাড়া আর কাহারো পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না।'

'সংগ্রাম ও শান্তি' হোমেরীয় ধরনের রচনা, সন্দেহ নাই। হোমেরীয় যুদ্ধকাহিনী ইলিয়াদ-এর একটি বিশেষত্ব, অনেক ইউরোপীয় বিজ্ঞান আলোচকের মতে এই যে তাহাতে ঘটনাবলীর ও চরিত্রাবলীর বিস্ময়কর প্রাচুর্য সত্ত্বেও কাহিনী কেন্দ্রচ্যুত হয় না, সমগ্রের সহিত বিশেষের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হয় না। কাহিনীকার হিসাবে তলস্তোই-ও যে এই দাবি করিতে পারেন তাহা এখন সুবিদিত। কিন্তু হোমরের অনুগামী হইয়াও তলস্তোই জানিতেন যে তিনি আধুনিক কালের লেখক, যে কালে হোমেরীয় জগতের পুনর্নির্মাণ সম্ভব নয়। 'সংগ্রাম ও শান্তি'-কে তাই তিনি বলিয়াছিলেন—ফিলসফিক্যাল এপিক। হোমেরীয় ইলিয়াদে ঝোঁক বেশী বহিরঙ্গ কর্মকাণ্ডের দিকে। তলস্তোই বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিয়াছেন প্রতিটি সৃষ্ট চরিত্রের ভাবলোকের দিকে। কোনরূপ জীবনদর্শন লইয়া হোমর মাথা ঘামান নাই। পার্থিব জীবনের ছোট বড় সব রকমের দুঃখ-সুখকে বিনা বিতর্কে গ্রহণ করিতে পারার শক্তিতে তাঁহার জীবনদর্শন প্রতিফলিত। কিন্তু তলস্তোই-এর 'সংগ্রাম ও শান্তি'র বিশাল চিত্রপটে অসংখ্য নরনারীর তরঙ্গোপম সংগমের ও প্রতিঘাতের বৈচিত্র্যকে সমুদ্রসম ঐক্যতানে বিধৃত করিয়া রাখিয়াছে এক বিশ্বপ্রেমিক মানবাত্মার বিশিষ্ট জীবনদর্শন।

ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 'সংগ্রাম ও শান্তি'র উপজীব্য বিষয়বস্তু হইতেছে, আউসতেরলিৎস্-এর যুদ্ধ হইতে (১৮০৫), বরদিনো-র যুদ্ধে নেপোলিয়নের সামরিক বিজয় (১৮১২) ও তৎপরে মস্কোর অগ্নিকাণ্ড এবং জনযুদ্ধে নেপোলিয়নের অভাবিত পরাভব ও চমকপ্রদ পলায়ন। অন্যূন ছয়শত নরনারীর চরিত্র এই উপন্যাসে সন্নিবেশিত। পড়িতে পড়িতে বিস্মিত পুলকে লক্ষ্য করিতে হয় যে ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান চরিত্রের কর্মের ও ভাগ্যের সহিত কল্পিত চরিত্রগুলির কর্ম ও ভাগ্য কী নিগূঢ়সূত্রে গ্রথিত। একটি সুগভীর নীতিবোধ বহুভঙ্গিম ধারায় সর্বত্র আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ন্যায়

তাহাই যাহা সমগ্র মানবসমাজের সংযোগ ও সংহতির সহায়ক, অন্যায় তাহাই যাহা ইহার পরিপন্থী। তলস্তোই-এর বিচারে তাই পশ্চাৎপদ রুশ জনগণের বীরত্বে বিশ্ববিজয়ী নেপোলিয়নের পরাজয় সামরিক ঘটনা নয়, নৈতিক বিচার-দণ্ড। তিনি লিখিয়াছিলেন, "মানবসমাজকে বিভক্ত করাই পাপ।" হয়তো, তাঁহার উপন্যাসের নামকরণেও, 'ভাইনা ঈ মির'—তিনি দিয়া গিয়াছেন এই ইঙ্গিত। পৃথিবীতে এমন আর কি আছে যাহা 'ভাইনা' অর্থাৎ—সংগ্রামের চেয়ে মানবসমাজকে বিভক্ত করে? আর রুশভাষার প্রথম শিক্ষার্থীকেও জানিতে হয় 'মির' শব্দের দুটি অর্থই—বিশ্ব ও শান্তি—সমান প্রচলিত, যদিও তাহার তৃতীয় অর্থটি—গ্রামগোষ্ঠী—এখন আর তেমন প্রচলিত নয়। রুশীয়েরা অসংকোচ গর্ব ও আনন্দ অনুভব করেন যে বিশ্বশান্তি সংসদের প্রধান আবেদন—বিশ্বময় শান্তি হোক—রুশভাষায় প্রকাশ করা যায়—একটি শব্দেরই বিভিন্ন প্রয়োগে—মির মিরু। মনে পড়ে, এক উজ্জ্বল প্রভাতে রুশ-সেনাপতি নিকলাই রস্‌তফ্‌-এর সহিত এক অস্ট্রীয় সৈনিকের সাক্ষাৎ ও জার্মানভাষায় এই বলিয়া পরস্পরকে অভিবদান—জয় হোক সমগ্র বিশ্বের। এই অভিবাদনে তলস্তোই-এর জীবনদর্শনের যে আশাবাদ স্পন্দিত, তাহা জীবনের নারকীয় নিষ্ঠুরতাকে, রুদ্রের বাম বাহুকে পাশ কাটাইয়া নয়, তাহাকে অতিক্রম করিয়া রুদ্রের দক্ষিণ বাহুর শক্তিমত্তায় অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া। মনে পড়ে আর একটি দৃশ্যের কথা। মহৎপ্রাণ আন্দ্রেই বল্‌কনস্কি মানবসমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশার ও দুশ্চিন্তার ভারে মুহ্যমান, তখন তাঁহার বন্ধু দার্শনিক পিয়ের বেজুকফ তাঁহাকে বুঝাইতেছে যে মানুষ সংসারে নয় নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক, শান্তি ও সত্য কেবল কথার কথা নয়, আছে তাহাদের বাস্তব অস্তিত্ব, সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি সমর্থন করে মানবসমাজের সুবৃহৎ ঐক্যের বিজয়ে আমাদের বিশ্বাসকে। "তখন ছিল চারিদিকে পরিপূর্ণ প্রশান্তি, কেবল তটিনীর ছোট ছোট ঢেউগুলি ক্ষীণ বলে আঘাত করিতেছিল নৌকার তলদেশে। প্রিন্স আন্দ্রেই-এর মনে হইল ঢেউয়ের কলধ্বনি যেন পিয়ের-এর কথাই বলিয়া চলিয়াছে—'বিশ্বাস করো, ইহাই সত্য'।

১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী-রুশ সংঘর্ষে সংগ্রামের নায়ক কে ছিল, এই প্রশ্নের উত্তরে তলস্তোই-এর যে সিদ্ধান্ত তাঁহার উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাতে দেখা যায় তাঁহার মহৎ ও বিরাট জীবনদর্শনে বিজ্ঞানবিমুখতা কিভাবে সক্রিয় ছিল। তাঁহার ধারণায় সংগ্রামের প্রকৃত নায়ক না নেপোলিয়ন না কুতুজফ্‌,

নায়ক হইতেছে সাধারণ সৈনিকশ্রেণী, যাহাদের অগণিত ব্যক্তিগত আত্মিক শক্তি সম্মিলিত হইয়া নির্দিষ্ট করে জয় বা পরাজয়। নেপোলিয়ন ছিলেন অহং-সর্বস্ব, আত্মকেন্দ্রিক শক্তিমত্ততার প্রবলতম প্রতিভূ, সাধারণ সৈনিকের মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের কোন সংবাদই তিনি রাখিতেন না বা রাখার প্রয়োজন মনে করিতেন না, তাহাদিগকে পরিচালিত করিতেন কেবল সামরিক সংঘবদ্ধতার প্রতাপে, হুকুমের লগুড়াঘাতে। তলস্তোই-এর বিচারে, তাই তাঁহার পরাজয় ছিল অনিবার্য। অন্যদিকে, রুশ-বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কুতুজফ্ কখনও কোনো সামরিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন না স্বীয় বিচার-বুদ্ধির প্রাখর্যে। তিনি শুনিতেন সকলের কথা, বুঝিতেন সকলকে। তিনি জানিতেন যে তাঁহার একক বিচারের চেয়ে আছে বিরাটতর, তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিশালী শক্তি—তাহা হইতেছে ঘটনার অনিবার্য প্রবাহ। ইহাকে তিনি লক্ষ্য করিতে জানিতেন, তাহার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে জানিতেন, তাঁহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ইহার বিরোধী হইলে জানিতেন নিজেকে সংযত করিতে, থামিয়া থাকিতে। স্বয়ং গ্রন্থকার কুতুজফ্-এর নেতৃত্ব সম্বন্ধে বলিতেছেন—"বহু বৎসরের সামরিক অভিজ্ঞতায় তিনি জানিতেন ও পরিণত বুদ্ধি দিয়া বুঝিতেন যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যেখানে মরণপণ করিয়া লড়িতেছে সেখানে নেতৃত্ব করা যে কোন একক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি জানিতেন সংগ্রামের ফলাফল নির্দিষ্ট হয় উচ্চ সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নয়, যুধ্যমান বাহিনীর ভৌগোলিক পরিবেশে নয়, অস্ত্রশস্ত্রের ও সৈন্যসংখ্যার পরিমাণে নয়; নির্দিষ্ট হয় সেই সূক্ষ্ম, দুর্লক্ষ্য শক্তি দিয়া যাহাকে বলা হয় যোদ্ধার আত্মিক শক্তি। এই শক্তিকেই তিনি অনুসরণ করিতেন, এবং তাঁহার পক্ষে যতটা সম্ভব, ইহার ভিত্তিতে নেতৃত্ব পরিচালনা করিতেন।" স্পষ্ট দেখা যায়, তলস্তোই-এর এ অভিমত নেপোলিয়ন বা কুতুজফ্ কাহারো পক্ষে ইতিহাসসম্মত সুবিচার নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে সামরিক বিজ্ঞানের শিক্ষার বা প্রয়োগের কোন স্থান নাই—এ অভিমত একান্ত অবাস্তব। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সামরিক শিক্ষার অবহেলা করিয়া সাধারণ সৈনিকের অস্পষ্ট নিরুদ্দিষ্ট সংস্কারজনিত-ইন্‌স্টিংক্‌টিভ—প্রজ্ঞার উপর মাত্রাতিরিক্ত আস্থা স্থাপনেই আছে তলস্তোই-এর এই দার্শনিক বিভ্রান্তির দুর্বলতা। বিপ্লবী গণবাদের সহিত মতানৈক্যের ফল এইভাবে তাঁহার জীবনদর্শনের ও কাব্য-কৃতিত্বে আত্মপ্রকাশ করিল।

এই পশ্চাৎগামিতার অন্য একটি নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় 'নাতাশা'

চরিত্রের পরিণতিতে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে সমগ্র উপন্যাসে যত চরিত্র তলস্তোই অংকিত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে আকর্ষণী শক্তিতে নাতাশা-ই সর্বাগ্রগণ্য। তাহার জীবন সহজ-সরল নহে, অনেক জটিল পরিস্থিতির ভিতর দিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তবু নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহার অন্তরের সহজাত আনন্দ, অকপট অনুভূতি, সংবেদনার সুকুমারত্ব। অন্যের অন্তর্বেদনায় অনুকম্পনশীলতা তাহার চিত্তলোকের ঐশ্বর্য। উপন্যাসের অন্য যে কোন চরিত্রের চেয়ে সে আচরণে ও অনুভূতিতে সাধারণ মানুষের সন্নিকটবর্তী, জীবনের মাধুর্য তাহার মধ্যে মূর্ত। কিন্তু এই মাধুর্যের জ্যোতির্মণ্ডল তাহার চরিত্র হইতে খসিয়া পড়ে, উপন্যাসের পরিশিষ্টে। নাতাশা তখন তাহার বৃহত্তর জীবন হইতে বহুদূরে, অন্তরলোকের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে উদাসীন। পিয়ের-এর প্রেমময়ী স্ত্রী হিসাবে সে সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন গদ্যের মধ্যে সম্পূর্ণ নিমগ্ন, পারিবারিক কর্তব্যশীলতায় একাগ্রচিত্তে ব্যাপৃত। স্বামীসেবাতেই তাহার অনন্যসাধারণ নারীজীবনের একান্ত পরিসমাপ্তি। অনেকের মতে নাতাশা-র এই পরিণতিতে আছে তলস্তোই-পত্নীর অনুপ্রাণনা। তাঁহাদের বিবাহিত জীবনের তখনকার কালের ইতিহাস স্মরণে রাখিলে ইহা সহজেই বিশ্বাস করিতে পারা যায়। সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হয় যে তলস্তোই তখনও ভুলিতে পারেন নাই, নরনারীর পারস্পরিক সম্বন্ধ লইয়া পিটার্সবুর্গের বিপ্লবী গণবাদীদের সহিত তাঁহার মতবিবোধ, যাঁহারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন ও সরবে প্রচার করিতেন সামাজিক ক্ষেত্রে নরনারীর সমানাধিকার।

পিয়ের ও নাতাশা-র জীবনের এই গার্হস্থ্য পরিসমাপ্তি যে স্বয়ং গ্রন্থকারকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দেয় নাই, এরূপ ভাবিবার সঙ্গত কারণ আছে। 'সংগ্রাম ও শান্তি' শেষ করার পর তিনি আর একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার জন্য মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, যাহার বিষয়বস্তু হইবে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে পিটার্সবুর্গের সেনেট স্কোয়ারে জারতান্ত্রিক শাসনের উচ্ছেদ করিয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনকল্পে রুশ অভিজাত শ্রেণীর উচ্চ-শিক্ষিত এক অংশের বিপ্লবী অভ্যুত্থান। ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই জানেন কেমন করিয়া এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হইয়া যায় রুশ জনগণের সহযোগিতার অভাবে। প্রথম আলেক্‌জান্দরের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর প্রথম নিকলাই নূতন সম্রাট হইয়া এই 'দেকাব্রিস্ট অভ্যুত্থানের' নেতৃবর্গকে কিরূপ কঠিন হস্তে শাসন করেন তাহাও

ইতিহাসবিখ্যাত। স্বয়ং পুশকিন এই আন্দোলনের সহিত গোপনে সংযুক্ত ছিলেন। ১৪ই ডিসেম্বরের অভ্যুত্থানে তিনি উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, পিটার্সবুর্গ হইতে নির্বাসিত থাকায়। পরে জার নিকলাই তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করেন—সেদিন পিটার্সবুর্গে উপস্থিত থাকিলে তুমি কি করিতে? —তৎক্ষণাৎ দ্বিধাহীন উত্তর আসিয়াছিল—সেনেট স্কোয়ারে যোগ দিতাম। অভিজাতশ্রেণীর নেতৃত্বে এই আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াও প্রায় শতবর্ষ পরবর্তী সফল অভ্যুত্থানকে কি পরিমাণে প্রভাবিত করিয়াছিল তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে লেনিনের প্রশস্তি স্মরণীয়। দুঃখের বিষয় তলস্তোই এই উপন্যাস লিখিয়া যান নাই। ইহার আংশিক অস্তিত্বের কথাও আমার জানা ছিল না। কিন্তু ১৯৬০ সালে প্রকাশিত অধ্যাপক ইয়েমিলফ লিখিত প্রবন্ধে সন্ধান পাওয়া গেল যে তলস্তোই ইহার কয়েক পরিচ্ছেদ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় পিয়ের ও নাতাশা-র ব্যক্তিত্ব ও প্রেম সাংসারিক সুখদুঃখের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকিতে পারে নাই, বৃহত্তর জীবনের পরিধিতে বিস্তৃত হইয়া যায়। পিয়ের ও নাতাশা যোগ দেন দেকাব্রিস্ট আন্দোলনে, দুজনেই নির্বাসিত হন সাইবেরিয়ায় ও তথাকার বন্দীজীবনের সমস্ত দুঃখযন্ত্রণা সমানভাবে বহন করেন। ইহার অধিক কিছুই পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ইহাতেই বোঝা যায় তলস্তোই-এর মন ও মতামত স্থবির ছিল না, ছিল চলিষ্ণু।

এই চলিষ্ণুতার উজ্জ্বলতর প্রমাণ তলস্তোই-এর দ্বিতীয় বৃহৎ উপন্যাস—'আনা কারেনিনা'। ইহার রচনারম্ভ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস—অর্থাৎ 'সংগ্রাম ও শান্তি' রচনারম্ভের প্রায় দশ বৎসর পরে। এই দশ বৎসরে রুশদেশে ধনতন্ত্রের দ্রুতগতি প্রসার হইতেছিল যাহা তলস্তোই-এর স্বপ্নময় আশাবাদের জগতে আনিয়া দেয় ভূকম্পন। 'আনা কারেনিনা' এই ভূকম্পনের সাহিত্যিক প্রতিচ্ছবি। ঊনিশ শতকের সপ্তম দশকে যে ঝড় রুশদেশের সামাজিক জীবনকে তছনছ করিয়া দিতেছিল তাহারই পরিমাপ করিয়াছেন তলস্তোই অকুতোভয়ে; অকুতোভয়ে কিন্তু সুগভীর বেদনায়। নির্ভীকতা ও বেদনার এই দ্বান্দ্বিক অনুস্যূতি-ই ট্রাজিক অনুভূতির গভীরতম উৎস। 'আনা কারেনিনা' বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিডি। অধ্যাপক ইয়েমিলফ ইহাকে সঙ্গতভাবেই তুলিত করিয়াছেন হ্যামলেটের সহিত। আপাতদৃষ্টিতে 'আনা কারেনিনা' অভিজাতশ্রেণীর স্বামীত্যাগিনী ভ্রষ্টা নারীর ভাগ্যের ইতিবৃত্ত। কিন্তু তাহার অন্তিম অপঘাতে সমগ্র বিশ্বের পাঠকবর্গের অন্তর মথিত ও নয়ন

অশ্রুসজল। তকে কি গ্রন্থকার তাহার অপরাধকে ক্ষমার চক্ষে দেখিয়াছিলেন? তলস্তোই-এর চিন্তাজগতে এ প্রশ্নের আবির্ভাবও অকল্পনীয়; পারিবারিক পবিত্রতা তাঁহার জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, যে আদর্শে, তাঁহার মতে, বিশাল মানব-সমাজেরই গড়িয়া ওঠা উচিত। এ পাপকে ক্ষমা করা তো ন্যায়বোধের মূলোৎপাটন। অথচ কি অন্যায় করিয়াছিল তলস্তোই-এর এই মানস-দুহিতা? সে চাহিয়াছিল তাহার জীবনে তাহার সমস্ত সত্তা দিয়া ভালোবাসার সার্থকতা। নারীর এই প্রেমাবেগের মাহাত্ম্য যেমন করিয়া তলস্তোই বুঝিতেন বিশ্বসাহিত্যে তাহার তুলনা অতি বিরল। ইহাকেও তলস্তোই সরাসরি অভিযুক্ত করিতে পারেন না অন্যায় বলিয়া, পাপ বলিয়া। অভিজাত সমাজে ব্যাভিচারের প্রচলন তলস্তোই-এর অজ্ঞাত ছিল না। 'আনা কারেনিনা'-র অনেক পৃষ্ঠায় তাহার উল্লেখ আছে। তবে কেন একমাত্র আনা-র নিয়তি হইল আত্মহত্যা? কারণ, সে প্রেমকে ব্যাভিচারে পরিণত করিতে চাহে নাই, সমাজের লোকাচারের সহিত রফা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহে নাই। তাহার প্রেমের দাবি ছিল অকুণ্ঠ, সেই দাবির সত্যতায় পরিপূর্ণ বিশ্বাসে সে একাকিনী, সমাজের নিপীড়নী শক্তির সম্মুখীন হইতে সাহস পাইয়াছিল। তাহার নিয়তির ক্রূর পরিহাস এই যে তাহার প্রেমের সাফল্যের সমাধান তাহার পরিবেশের মধ্যেই উপস্থিত ছিল। ল্যেভিন-এর সহিত তাহার মিলন হইলে দুজনের জীবনই হইতে পারিত সার্থক। ল্যেভিন-চরিত্র যে গ্রন্থকারেরই "অপর আত্মা" ইহার ইঙ্গিত লোফ তলস্তোই তাহার নামকরণের ভিতরে রাখিয়া গিয়াছেন। 'আনা কারেনিনা'-র তথা-কথিত "দুই গল্পের" ইহাই হইল গোপন যোগসূত্র, এবং ইহাকে গোপন রাখাই ছিল ওস্তাদ-শিল্পী তলস্তোই-এর মনোগত অভিপ্রায়। এই সম্ভাব্য মিলনের পথে দুস্তর বাধা, সামাজিক বাধানিষেধ। মার্কস বলিয়া গিয়াছেন, নারীর সামাজিক সম্মানের ও অধিকারের মাত্রা দিয়া যে কোন সমাজের প্রগতির পরিমাপ করা সম্ভব। আনা তাহার আত্মহত্যা দিয়া প্রমাণিত করিল তখনকার রুশ-সমাজের আমূল পরিবর্তনের আবশ্যকতা, যেমন হ্যামলেটের গোপন হত্যা সূচিত করে বুর্জোয়া সমাজের অক্ষমতা পরিপূর্ণ মানবিক আদর্শকে জীবিত রাখার। লোহার পথে লোহার রথের চাপে আনা-র নারীদেহের চরম বিলুপ্তি—ইহার দায়িত্ব, তলস্তোই-এর দৃষ্টিভঙ্গীতে, কোনো ব্যক্তিবিশেষের আচরণে নহে, রুশদেশে সামগ্রিকভাবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিষ্করুণ অগ্রগতিতে।

ব্যক্তিগত জীবনেও তলস্তোই এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইতে পারিতেছিলেন না। 'আনা কারেনিনা' রচনা-সমাপ্তি ও তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি প্রায় সমসাময়িক—১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ। স্বশ্রেণী হইতে বিচ্যুত হইবার সংকল্প এই সময় হইতে ক্রমশঃ দৃঢ়তর হয়। স্বগৃহে স্ত্রী, পুত্রকন্যা, পৌত্র-পৌত্রী ইত্যাদির দ্বারা পরিবৃত থাকিয়াও তিনি ক্রমশঃ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। বেশভূষায়, আচার-ব্যবহারে, চিন্তায়-কর্মে তিনি হইয়া ওঠেন কৃষকশ্রেণীর আত্মীয়। পারিবারিক মায়ামমতা তাঁহাকে আকর্ষণ করিলেও তাঁহাকে অশান্ত করিয়া তুলিত তাঁহার আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ—অভিজাত জীবনযাত্রার সহিত সংঘর্ষ কৃষকী মতবাদের। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্যে এই মতবাদের রং ক্রমশ গাঢ়তর হয়। শিল্পের মাধ্যমে তাঁহার বক্তব্যকে আরো প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত করার উদ্দেশ্যে তিনি হাত দেন নাটক লেখায়। কিন্তু জনপ্রিয়তার আকর্ষণে তলস্তোই কখনও তাঁহার শিল্প-বিবেককে খণ্ডিত করেন নাই। তিনি মাত্র পাঁচখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক লিখিয়াছিলেন ও আর একখানি অসমাপ্ত রাখিয়া যান। অনেকগুলি প্রকাশিত হয় তাঁহার মৃত্যুর পরে। সবগুলিই মস্কো, লেনিনগ্রাদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বত্র এখনও মঞ্চস্থ হয়। তাহাদের আন্তর্জাতিক খ্যাতির বিস্তারও কম উল্লেখযোগ্য নয়। দুটি নাটককে গ্রন্থকার নিজে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন ; একখানি ট্র্যাজিডি, "অন্ধকারের আধিপত্য", অপরটি ট্র্যাজি-কমেডি—"আলোক-প্রাপ্তির ফলাফল।" নাটকের উপভোগ সম্পূর্ণ হয় না, যথোপযুক্তভাবে রঙ্গমঞ্চে তাহার অভিনয় না দেখিলে। এই উপভোগের সুযোগ রুশদেশের তলস্তোই-ভক্তরা এখনও প্রায়ই পান। "অন্ধকারের আধিপত্য" অভিনীত হয় মালি থিয়েটারে, ও "শিক্ষাপ্রাপ্তির ফলাফল"—আর্ট থিয়েটারে। মালি থিয়েটারে "অন্ধকারের আধিপত্যে"-র অভিনয় দেখিতে পাওয়া নাট্যামোদীর পক্ষে এক চরম অভিজ্ঞতার সমতুল্য। তখন বুঝিতে পারা যায় কেন বার্নার্ড শ ও এমিল জোলা এ নাটকটির গুণগানে প্রায় উন্মত্তের ন্যায় উচ্ছ্বসিত, কেন রুশদেশের নাট্য-সমালোচনায় ইহাকে "রাজা লীয়র"-এর সমপর্যায়ভুক্ত ভাবিতে সাহস করা হয়। আর্ট থিয়েটার অভিনীত "শিক্ষাপ্রাপ্তির ফলাফলে"-ও সানন্দে উপভোগ করা যায় নাট্যশিল্পের পরাকাষ্ঠা। "অন্ধকারের আধিপত্য" প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, 'শিক্ষাপ্রাপ্তির ফলাফল" ১৮৮৯-তে। প্রকার বিভিন্ন হইলেও উভয়ের একই উদ্দেশ্য—কৃষকসমাজের জীবনচিত্রে ধনতান্ত্রিক "সভ্যতা"-র বৈনাশিক প্রভাব। 'আনা কারেনিনা' রচনার

পরের দশ বছরে সর্বপ্রকার শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তলস্তোই-এর মতামত কত শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল তাঁহার এই দুটি নাটক তাহার সাক্ষ্য চিরকাল বহিতে থাকিবে।

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রচনারম্ভ হয় তাঁহার তৃতীয় বৃহৎ উপন্যাসের—'পুনরুজ্জীবন'। কিন্তু শেষ করিতে লাগিল প্রায় দশ বৎসর। ইহার নায়িকা কাতুশা মাসলোভা পাপীয়সী নারী। আনা-র মতো সে পতিপরিত্যাগিনী ভ্রষ্টা পত্নী নহে, সমাজপরিত্যক্তা গণিকা। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া যে উপন্যাস রচিত হইল—তাহাতে তলস্তোই লিপিবদ্ধ করিলেন উনিশ শতকের শেষ পর্বের রুশীয় সমাজের তীব্র সমালোচনা। সামাজিক অধঃপতনের সাহিত তাল রাখিয়া সমালোচনার ব্যাপকতা ও তীক্ষ্ণতাও উচ্চ নিখাদে চড়িতে লাগিল। কোন স্তরই বাদ গেল না। অভিজাত জমিদারবর্গ, শ্রমশিল্পের মালিকশ্রেণী, ও বিশেষ করিয়া জারতন্ত্রের ও ধর্মযাজনার ভণ্ডামী তাঁহার লেখনীর কশাঘাতে জর্জরিত হইয়া উঠিল। ১৮৯১—৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বিরাট দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল, তলস্তোই সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া তখন আর্তত্রাণে লাগিয়া গিয়াছিলেন, সেই সময়ে জারের উক্তি যে রাশিয়াতে দুর্ভিক্ষ নাই, আছে কেবল স্থানীয় খাদ্যাভাব, তাহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে। এই সময়ে দেশব্যাপী যে লোক-গণনা হয় তাহাতেও তলস্তোই অংশগ্রহণ করিয়া মস্কো শহরের দরিদ্রশ্রেণীর বাস্তব অবস্থার প্রত্যক্ষ পরিচয় পান। তিনি লিখিয়াছিলেন—"যদি মস্কো শহরের লোকেরা দশে দশে, শতে শতে, হাজারে হাজারে, অযত্নে অযত্নে, শীতে ও ক্ষুধায় কষ্ট পায় ও প্রাণ দেয়, তাহার জন্য দায়ী তাহারা নহে; দায়ী তাহারাই যাহারা প্রাসাদে বাস করে ও গাড়ি হাঁকাইয়া বেড়ায়।" আর খ্রীষ্টধর্মের ব্যাখ্যাতা হইয়াও তলস্তোই যে নির্দয়ভাবে ধর্মযাজকদের চার্চ পরিচালনার গলদ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেছিলেন তাহাতে প্রতিক্রিয়াশীলদের যুগপৎ ত্রাসের ও ক্রোধের অবধি রহিল না। তাহারা সাময়িকপত্রে প্রকাশ্যভাবে প্রশ্ন তুলিল -"আমাদের দেশে আমরা দেখিতেছি দুজন জারের রাজত্ব—দ্বিতীয় নিকলাই ও ল্যেফ তলস্তোই; কার শক্তি বেশী?" শক্তিপরীক্ষায় বিলম্ব হইল না। "পুনরুজ্জীবন" প্রকাশের কিছুকাল পরেই ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে তলস্তোই রুশ-চার্চ হইতে বিতাড়িত হইলেন, ধার্মিক শ্রেণীর তালিকা হইতে তাঁহার নাম দূরীভূত হইল। তাঁহার উপর বর্ষিত হইল চার্চের অভিশাপ। এই সংবাদ প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গেই বর্ষিত হইতে লাগিল

রুশদেশের সর্বপ্রান্ত হইতে সমর্থনসূচক তারবার্তা, পত্র ও অভিনন্দন তলস্তোই-এর ঠিকানায়। তাহাদের মধ্যে ছিল নবজাগ্রত শ্রমিকশ্রেণীর সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। এক কাচের কারখানার কর্মীরা তাহাকে পাঠান একতাল সবুজ কাচ। তাহাতে সোনার অক্ষরে মুদ্রিত ছিল—"গভীর সম্মানাস্পদ ল্যেভ নিকলায়েভিচ। আপনি সেই সব মহাপুরুষদের একজন যাঁহারা আপন যুগের অগ্রবর্তী হইয়া চলেন। অতীতে তাঁহাদিগকে অগ্নিতে দাহ করা হইত, কারাগারে বা নির্বাসনে নিষ্পেষণ করা হইত। ফারিসি ধর্মধ্বজীরা আপনাকে তাহাদের যেমন খুশি ও যাহা হইতে খুশি বহিষ্কার করিয়া দিক। রুশীয় জনগণ চিরদিন গর্ববোধ করিবে যে মহৎ আপনি তাহাদের আপন প্রিয়জন।" এই উপহার তলস্তোই-কে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছিল। উত্তরে তিনি জানাইয়াছিলেন যে উপহারে মুদ্রিত বাণী তাহার নিকট সবিশেষ আনন্দদায়ক।

ইহার পরে দেখিতে দেখিতে আসিয়া পড়িল ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। জারতন্ত্রের উচ্ছেদকল্পে প্রথম রুশ-বিপ্লব সৈনিক, কৃষক ও শ্রমিকের অপূর্ব বীরত্ব সত্ত্বেও অবসিত হইল ব্যর্থতায়। ব্যর্থ হইলেও তলস্তোই তাহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে "১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুশ-বিপ্লব মানবজাতির পক্ষে গভীরতর তাৎপর্যপূর্ণ ও পরিণামে অধিকতর মঙ্গলদায়ক, মহান ফরাসী বিপ্লবের চেয়েও।" অত্যাচার নূতন জীবন পাইয়া উন্মত্ত জিঘাংসায় দেশময় যে বিভীষিকার তাণ্ডব বহাইয়া দিল দিল ইতিহাসে তাহা মন্ত্রী 'স্তোলিপিন-এর কীর্তি" নামে কুখ্যাত। জারের আদেশে বিপ্লবীদের প্রাণদণ্ড নিত্যনিয়মিত ঘটনা হইয়া দাঁড়াইলে তলস্তোই-এর অকুতোভয় সত্যনিষ্ঠা তাঁহাকে নীরব থাকিতে দিল না। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইল তাহার প্রবন্ধ—"চুপ থাকিতে পারি না"। একটি উদ্ধৃতি হইতেই ইহার বক্তব্য ও ব্যঞ্জনা ভাস্বর হইয়া উঠিবে। "এভাবে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। অন্ততপক্ষে আমি এভাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারি না, আমি পারি না আমি থাকিব না। সেইজন্যই আমি লিখিতেছি এই প্রবন্ধ, এবং আমার সমস্ত শক্তি দিয়া আমি ইহাকে প্রচার করিব রাশিয়ায় ও তাহার বাহিরে, যাহাতে দুইয়ের একটি ফল ফলিতে পারে। হয় এই অমানুষিক অত্যাচারের অবসান হইবে; নয়, শ্বেতবস্ত্রে আমার দেহকে আচ্ছাদিত করিয়া টুল হইতে লাথি মারিয়া শূন্যে পাঠানো হইবে যাহাতে আমার ঝুলন্ত ভার আঁটিয়া বসাইবে ফাঁসির তৈলাক্ত

রজ্জুকে আমার শুষ্ক-শীর্ণ গলদেশে।" প্রথম রুশ-বিপ্লবের কিছুকাল পূর্ব হইতেই তাঁহার রাজনৈতিক মতামতে গভীর পরিবর্তন দেখা যাইতেছিল। ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের শোষণের ও লুণ্ঠন-লীলার তীব্র প্রতিবাদ তিনি জানাইয়াছিলেন তাঁহার "কি করা উচিত?" পুস্তিকায়। তিনি লিখিয়াছিলেন—"বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধান কর্তারা দাবি করেন যে তাঁহারা সকলেই চাহেন শান্তি, শান্তির জন্য গুরুগম্ভীর আবেদনে তাঁহাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। কিন্তু তাহারই সমকালে বা অব্যবহিত পরেই তাঁহারা তাঁহাদের আইন সভায় প্রস্তাব আনেন অস্ত্রসজ্জার জন্য ব্যয়বৃদ্ধির। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের এইসব আয়োজন কেবল শান্তিকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্য।" প্রথম রুশ-বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বেই তিনি লিখিয়াছিলেন—"বর্তমান সমাজব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্য। বিধ্বস্ত হইবেই এই প্রতিযোগিতার কাঠামো, বদলে আসিবে কমিউনিস্ট সহযোগিতা; বিধ্বস্ত হইবেই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা; বদলে আসিবে সমাজবাদ; বিধ্বস্ত হইবেই এই জঙ্গীবাদী ব্যবস্থা, বদলে আসিবে নিরস্ত্রীকরণ ও মোকাবিলা।"

১৯০৮ সালে পূর্ণ হইল তলস্তোই-এর অশীতি বৎসর। পৃথিবীর বহুদেশে প্রতিপালিত হইল তাঁহার জন্মোৎসব। জারের একান্ত প্রচেষ্টা হইল যাহাতে রাশিয়াতে কোনরূপ উৎসব না হয়। কিন্তু ব্যর্থ হইল রাষ্ট্রশক্তির এই ঔদ্ধত্য। রাশি রাশি টেলিগ্রাম, চিঠি, মানপত্র পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় ও মস্কোর আবাস ভবনে। কাতারে কাতারে লোক আসিল ইয়াস্নায়া পলিয়ানায় কেবল দূর হইতে তাঁহাকে দেখিতে ও নীরবে জানাইয়া যাইতে তাহাদের অন্তরের পিটার্সবুর্গের একটি কারখানার শ্রমিকরা তাঁহাকে পাঠাইল অভিনন্দন: "আপনার অপূর্ব সুন্দর জীবনের অশীতিবর্ষীয় উৎসবের দিনে, যখন আপনার মহান প্রতিভাপূর্ণ প্রতিমূর্তির সম্মুখে গভীর শ্রদ্ধায় অবনত হইতেছে সমগ্র বিশ্ব ও কোটিকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে আপনার নাম, তখন কেবল সেই দেশে, আপনার জন্মভূমি হইবার বিরাট গর্ব ঘটিয়াছে যাহার ভাগ্যে, কাহারো অধিকার নাই তাহার কণ্ঠ ধ্বনিত করিতে, আপনাকে অভিনন্দন জানাইতে। তবু অত্যাচারের কৃষ্ণমূর্তি দাসেরা, স্বাধীনতা ও সত্যের হত্যাকারীরা, স্বর্গের ও মর্তের যতরকম শাস্তির ভয় আমাদিগকে দেখাক না কেন, আজিকার দিনে আমরা চাহি না, আমরা পারি না নীরব থাকিতে।"

আশি বছরের অটুট স্বাস্থ্যে এতদিনে ভাঙন ধরিল। তবুও বিরাম নাই কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমের। আর বিরাম নাই অন্তর্দ্বন্দ্বের, নিজের জীবনযাত্রার সহিত কৃষকের জীবনযাত্রার পার্থক্যে। অবশেষে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এক রাত্রে ইহা চরমে উঠিল। গভীর নিশীথে শকট চালককে জাগাইয়া ঘোড়ায়-টানা গাড়িতে তিনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া পড়িলেন চিরকালের মতো ইয়াস্নায়া পলিয়ানা পরিত্যাগ করিয়া। যাইবার আগে স্ত্রীর জন্য লিখিয়া রাখিয়া গেলেন পত্র ঃ

"আমার প্রস্থানে তুমি কষ্ট পাইবে, তাহাতে আমি দুঃখিত। কিন্তু বুঝিয়া দেখ ও বিশ্বাস করো যে অন্যরূপ আচরণ আমার পক্ষে অসম্ভব। গৃহে আমায় অবস্থান একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে। আর সবকিছু বাদ দিয়াও যে বিলাসের পরিবেশে আমি বাস করি তাহাতে আমি আর থাকিতে পারি না। আমার বয়সের বৃদ্ধেরা যাহা সাধারণতঃ করিয়া থাকে আমি তাহাই করিতেছি ঃ জীবনের শেষদিনগুলি নির্জনতায় ও প্রশান্তিতে কাটাইবার জন্য সাংসারিক জীবনযাত্রা ছাড়িয়া যাইতেছি।

"আমার কথা বুঝিয়া দেখিও, ও যদি তুমি জানিতে পারো কোথায় আছি তাহাতেও আমাকে ফিরাইবার চেষ্টায় তথায় আসিয়ো না। তোমার আসাতে তোমার ও আমার দুজনারই অবস্থা মন্দতর হইবে, কিন্তু তাহাতে আমার সিদ্ধান্ত বদলাইবে না। আটচল্লিশ বছর ধরিয়া আমার সহিত অকপট জীবনযাপনের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। তোমার প্রতি যাহাকিছু অন্যায় আমি করিয়াছি তাহার জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি, যেমন আমি সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতেছি যাহাকিছু অন্যায় তুমি আমাকে করিয়াছ।" রাশিয়ার শীতে তখনকার দিনের রেলগাড়ির তৃতীয় শ্রেণীতে চলিতে চলিতে বিরাশি বছর বৃদ্ধ তলস্তাই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হইলেন। ছোট রেল স্টেশন আস্তাপোভোর স্টেশনমাষ্টার তাঁহাকে আশ্রয় দিলেন স্বগৃহে। সেখানেই ২০শে নভেম্বর তাঁহার শেষনিশ্বাস নির্গত হইল। পরে ইয়াস্নায়া পলিয়ানার পূর্ব নির্বাচিত স্থানে তাঁহার নির্দেশমতো ধরনে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হইল।

তলস্তোই-এর ডায়ারিতে লিখিত আছে ঃ "ব্যাপারটা যদিও তুচ্ছ তবুও জানিয়ে যেতে চাই আমার মরণের পরে কি ব্যবস্থা আমার কাম্য। আমার দেহকে প্রোথিত করার সময় কোনরূপ অনুষ্ঠান আমার অভিপ্রেত নয়।

কফিনটি যেন কাঠের হয়, ও যাহার ইচ্ছা সেই যেন ইহাকে বনের মধ্যে নালার ধারে বয়ে নিয়ে যেতে পারে।"

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শরতের এক অপরাহ্ণে বৃষ্টিধৌত আকাশের অম্লান আলোয় এই অনাড়ম্বর মহনীয় সমাধির সামনে একাকী দাঁড়াইয়া আমার মন আনন্দে ও দুঃখে আপ্লুত হইয়াছিল। আনন্দ এই জন্য যে আমার মতো বাংলাদেশের একজন সাধারণ সাহিত্যসেবীর পক্ষে সম্ভব হইয়াছে এই পুণ্যতীর্থের বায়ুমণ্ডলকে অন্তরে টানিবার সুযোগ পাওয়া। আর দুঃখ এইজন্য যে তলস্তোই দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, মাত্র সাতবছরের ব্যবধানে, রুশ-বিপ্লবের চরম সাফল্য, তাঁহার ঘৃণিত জারতন্ত্রের চরম উচ্ছেদ, তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় কৃষককুলের চরম অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা। বার্নার্ড শ-এর মতো দীর্ঘায়ু তাঁহার ভাগ্যে থাকিলে নিঃসন্দেহ তিনি পাইতেন লেনিনের সশ্রদ্ধ সংগ, যে লেনিন সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াও সার্থক করিয়াছেন তলস্তোই-এর উদার মানবিকতার স্বপ্ন, ও তাঁহার বিশাল সাহিত্যকৃতির প্রকৃত মূল্য কিভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে তাহার প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন যে লেনিন।

বিশ্বশান্তি পরিষদের আহ্বান ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্‌যোগে ১১।১২।৬০ তারিখে আয়োজিত সভায় প্রদত্ত বক্তৃতার অনুসরণে লিখিত।

গোর্কি স্মরণে

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকেরা—গোর্কি যাহাদের অন্যতম—তাঁহাদের জীবিত-কালেই অর্জন করিয়া যান অমরত্ব, ব্যবস্থা করিয়া যান তাঁহাদের ভবিষ্যৎ স্মৃতিরক্ষার। স্বীয় রচিত সাহিত্যই তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিস্তম্ভ। পুশকিন তাঁহার "স্মৃতিস্তম্ভ" কবিতায় যে ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা গোর্কির বেলাতেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য ঃ

মরিব না আমি একেবারে—সুপবিত্র বীণার ঝংকারে
আত্মা মোর রবে বাঁচি ধূলিরেও ধ্বংসে পরাজিয়া,
আমার প্রশস্তিগীত ঝঙ্কারিবে সারা বিশ্বময়,
যদি থাকে পৃথিবীতে এক কবি-হিয়া।

তবুও যখন দেখা যায় যে সাহিত্যিকের খ্যাতি কেবল সাহিত্যের মধ্যেই নিবদ্ধ নাই, জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে তখন যে সমাজ সাহিত্যের প্রতি এই সশ্রদ্ধ নিবেদনের ব্যবস্থা করে তাহার গুণগ্রাহিতায় আমাদের মন কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজধানী বিশাল মস্কো শহরের কেন্দ্রস্থিত প্রধানতম রাজপথ—উলিৎসাগোর্কভা—যে মাক্‌সিম গোর্কির নামে উৎসর্গীকৃত, ইহাতে বোঝা যায় সোভিয়েত জনগণের মধ্যে সাহিত্যের সমাদর কত ব্যাপক। মনে রাখিতে হইবে, মস্কো শহরে গোর্কির

স্মৃতি রক্ষার এই একটি মাত্র নিদর্শন নহে। বেলারস্কায়া রেল ষ্টেশনের সম্মুখবর্তী প্রাঙ্গনে তাঁহার ব্রঞ্জ মূর্তি সোভিয়েত ভাস্কর্য-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ক্রমস্কি সেতুর পাদদেশ হইতে মস্কভা-নদীর তীর বাহিয়া মাইলের পর মাইল ব্যাপিয়া যে সুদীর্ঘ প্রমোদ-উদ্যান লেনিন ইউনিভার্সিটির প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত তাহারও নামকরণ হইয়াছে গোর্কির নামানুসারে। সুবিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটারের নামের সহিত গোর্কির নাম বিজড়িত, নাট্যকার গোর্কির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের স্থায়ী মাধ্যম হিসাবে। বিশ্বসাহিত্য অধ্যয়নের ও গবেষণার মস্কোস্থিত ইনস্টিটিউটের উদ্ভাবক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোর্কি স্বয়ং। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর এই ইনস্টিটিউট যে তাঁহারই নাম সগৌরবে বহন করিবে ইহা যেমন সর্বোতোভাবে উপযোগী তেমনই চিরন্তন মূল্যবোধের অভিব্যক্তি। গোর্কির সাহিত্য ও সোভিয়েত সংস্কৃতি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।

মানুষ হিসাবে ও লেখক হিসাবে গোর্কির মহত্বের নিদর্শন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃত থাকিলেও তাহাদের মূল খুঁজিতে গেলে যাইতে হয় পূর্বতন নিজনি-নভ্ গোরদ্ শহরে, যাহার বর্তমান নামকরণ হইয়াছে—গোর্কি। এই শহরটি রুশ দেশের জনসাধারণের অতীত জীবন যাত্রার ও বর্তমান বৈপ্লবিক প্রগতির সংযোগস্থল হিসাবে এক অপূর্ব তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। ভলগার তীরবর্তী এ শহরে বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প উভয়ই কেন্দ্রীভূত। লেনিনের পিতা ইলিয়া নিকলায়েভিচ উলিয়ানফ বহু বৎসর এই শহরে শিক্ষকতা করেন গোর্কির জন্মের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গোর্কির জন্মের দু বৎসর পরেই ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের জন্ম হয় সন্নিকটবর্তী সিম্বিরস্ক শহরে। দুজনেরই শৈশব কাটে ভলগাতীরের উদার আকাশের তলে উন্মুক্ত প্রান্তরের পরিবেশে। ভগলা যেন তাঁহাদের জীবনকে একই আদর্শে ভরিয়া দিয়াছিল শৈশব হইতে, যদিও শৈশবে তাঁহাদের কখনও দেখাশোনা হয় নাই। অথচ দেখাশোনা হইবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট, আলেক্সিয়েই মাক্সিমোভিচ পেশাকফ নামক শিশুটির জীবন যাত্রার ধারা তৎকালীন অন্য পাঁচজন শিশুর মত হইল। কিন্তু 'সোনালী শৈশব' গোর্কির জীবনে যেন কখনই আসে নাই। তিনি প্রায় জন্ম হইতেই জীবনযুদ্ধের যোদ্ধা। নিজনি শহরে যে ক্ষুদ্র গৃহে দাদামশায় ও দিদিমার দরিদ্র সংসারে তাঁহার শৈশবের অধিকাংশ কাটিয়াছিল, স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপে তাহা এখনও

গোর্কি স্মরণে

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখকেরা—গোর্কি যাহাদের অন্যতম—তাঁহাদের জীবিতকালেই অর্জন করিয়া যান অমরত্ব, ব্যবস্থা করিয়া যান তাঁহাদের ভবিষ্যৎ স্মৃতিরক্ষার। স্বীয় রচিত সাহিত্যই তাঁহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিস্তম্ভ। পুশকিন তাঁহার "স্মৃতিস্তম্ভ" কবিতায় যে ভাব ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা গোর্কির বেলাতেও সম্পূর্ণ প্রযোজ্য ঃ

মরিব না আমি একেবারে—সুপবিত্র বীণার ঝংকারে
আত্মা মোর রবে বাঁচি ধূলিরেও ধ্বংসে পরাজিয়া,
আমার প্রশস্তিগীত ঝঙ্কারিবে সারা বিশ্বময়,
যদি থাকে পৃথিবীতে এক কবি-হিয়া।

তবুও যখন দেখা যায় যে সাহিত্যিকের খ্যাতি কেবল সাহিত্যের মধ্যেই নিবদ্ধ নাই, জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে তখন যে সমাজ সাহিত্যের প্রতি এই সশ্রদ্ধ নিবেদনের ব্যবস্থা করে তাহার গুণগ্রাহিতায় আমাদের মন কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের রাজধানী বিশাল মস্কো শহরের কেন্দ্রস্থিত প্রধানতম রাজপথ—উলিৎসাগোর্কভা—যে মাক্সিম গোর্কির নামে উৎসর্গীকৃত, ইহাতে বোঝা যায় সোভিয়েত জনগণের মধ্যে সাহিত্যের সমাদর কত ব্যাপক। মনে রাখিতে হইবে, মস্কো শহরে গোর্কির

স্মৃতি রক্ষার এই একটি মাত্র নিদর্শন নহে। বেলারুস্কায়া রেল ষ্টেশনের সম্মুখবর্তী প্রাঙ্গনে তাঁহার ব্রঞ্জ মূর্তি সোভিয়েত ভাস্কর্য-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ক্রমস্কি সেতুর পাদদেশ হইতে মস্কভা-নদীর তীর বাহিয়া মাইলের পর মাইল ব্যাপিয়া যে সুদীর্ঘ প্রমোদ-উদ্যান লেনিন ইউনিভার্সিটির প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত তাহারও নামকরণ হইয়াছে গোর্কির নামানুসারে। সুবিখ্যাত মস্কো আর্ট থিয়েটারের নামের সহিত গোর্কির নাম বিজড়িত, নাট্যকার গোর্কির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশের স্থায়ী মাধ্যম হিসাবে। বিশ্বসাহিত্য অধ্যয়নের ও গবেষণার মস্কোস্থিত ইনষ্টিটিউটের উদ্ভাবক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোর্কি স্বয়ং। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর পর এই ইনষ্টিটিউট যে তাঁহারই নাম সগৌরবে বহন করিবে ইহা যেমন সর্বতোভাবে উপযোগী তেমনই চিরন্তন মূল্যবোধের অভিব্যক্তি। গোর্কির সাহিত্য ও সোভিয়েত সংস্কৃতি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।

মানুষ হিসাবে ও লেখক হিসাবে গোর্কির মহত্ত্বের নিদর্শন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রায় সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃত থাকিলেও তাহাদের মূল খুঁজিতে গেলে যাইতে হয় পূর্বতন নিজ্‌নি-নভ্‌ গোরদ্‌ শহরে, যাহার বর্তমান নামকরণ হইয়াছে—গোর্কি। এই শহরটি রুশ দেশের জনসাধারণের অতীত জীবন যাত্রার ও বর্তমান বৈপ্লবিক প্রগতির সংযোগস্থল হিসাবে এক অপূর্ব তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। ভলগার তীরবর্তী এ শহরে বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প উভয়ই কেন্দ্রীভূত। লেনিনের পিতা ইলিয়া নিকলায়েভিচ উলিয়ানফ বহু বৎসর এই শহরে শিক্ষকতা করেন গোর্কির জন্মের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে গোর্কির জন্মের দু বৎসর পরেই ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের জন্ম হয় সন্নিকটবর্তী সিমবিরস্ক শহরে। দুজনেরই শৈশব কাটে ভলগাতীরের উদার আকাশের তলে উন্মুক্ত প্রান্তরের পরিবেশে। ভগলা যেন তাঁহাদের জীবনকে একই আদর্শে ভরিয়া দিয়াছিল শৈশব হইতে, যদিও শৈশবে তাঁহাদের কখনও দেখাশোনা হয় নাই। অথচ দেখাশোনা হইবার সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট, আলেক্‌সিয়েই মাক্‌সিমোভিচ পেশাকফ নামক শিশুটির জীবন যাত্রার ধারা তৎকালীন অন্য পাঁচজন শিশুর মত হইল। কিন্তু 'সোনালী শৈশব' গোর্কির জীবনে যেন কখনই আসে নাই। তিনি প্রায় জন্ম হইতেই জীবনযুদ্ধের যোদ্ধা। নিজ্‌নি শহরে যে ক্ষুদ্র গৃহে দাদামশায় ও দিদিমার দরিদ্র সংসারে তাঁহার শৈশবের অধিকাংশ কাটিয়াছিল, স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপে তাহা এখনও

সুরক্ষিত। সেখানে প্রদর্শিত দ্রব্যাদির মধ্যে দেখা যায় প্রাথমিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তরণের 'অতি-উত্তম' কৃতিত্ব-পত্র আলেক্সিয়েই পেশকফ্-এর নামে। জীবনে এই একটিবার শিশু গোর্কি স্কুলের পরীক্ষা দিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। দশবৎসর বয়স হইতেই তাঁহাকে সাংসারিক ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থোপার্জনে মন দিতে হয়। গোর্কির জীবনের সেই অধ্যায় যে কিরূপ কণ্টকর ছিল তাহা এখন সুবিদিত। তখনকার সামাজিক জীবনের অকথ্য কদর্যতার ভেতরে গোর্কির ব্যক্তিগত জীবনের শুচিতা ও সাহসিকতা পরে, বৃদ্ধ সাহিত্যগুরু ল্যেফ তলস্তোই ও তখনকার শ্রমিক-বিপ্লবের বীর নেতা লেনিন, উভয়কেই অভিভূত করে। প্রধানতঃ লেনিনের অনুপ্রেরণায় রচিত হয় গোর্কির আত্মচরিত। তলস্তোই বলিয়াছিলেন—তোমার নির্বাচিত সাহিত্যিক ছদ্মনাম—গোর্কি, অর্থাৎ 'তিক্ত'-সত্য নয়, কারণ, তুমি গরলের মধ্যেও অমৃতের স্বাদ পাইয়াছ। তলস্তোই গোর্কির মুখে এমন অনেক তথ্য শুনিয়াছিলেন যাহা আত্মচরিতেও স্থান পায় নাই। তাঁহার মতে, গোর্কির পক্ষে লেখক না হইয়া গুণ্ডার দলের সর্দার হওয়াই ছিল স্বাভাবিক।

তবুও যে গোর্কির জীবনে এই অ-স্বাভাবিক পরিণতি ঘটিয়াছিল তাহার প্রধান কারণ দুইটি—সত্যনিষ্ঠা ও জ্ঞানস্পৃহা। তাঁহার অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা তাঁহাকে টানিয়া লইল বিপ্লবের পথে, আর তাঁহার অদম্য জ্ঞানস্পৃহা তাঁহাকে দিল সাহিত্য সৃষ্টির আবেগ। ল্যেরমনতফ্ ও পুশকিন-এর প্রভাবে সাহিত্য সৃষ্টির প্রথম ঝোঁক যায় কবিতার দিকে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে একুশ বছর বয়সে এক সুবৃহৎ মহাকাব্য রচনা করিয়া পড়িতে দেন তখনকারের প্রখ্যাত সাহিত্যিক কেরোলেঙ্কো-কে। কেরোলেঙ্কো তাহা ফেরত দিলেন এই বলিয়া যে উহাতে লেখকের পক্ষে জীবনের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়ের কোন অবকাশ নাই। গোর্কি হতাশ হইয়াও এ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই পাণ্ডুলিপি নষ্ট করিয়া ফেলিয়া বাহির হইলেন পদব্রজে রুশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা পর্যবেক্ষণ করিতে। পরে তিনি সহাস্যে বলিরাছিলেন, আমার সেই মহাকাব্যটির মাত্র একটি লাইন আমার এখনও মনে আছে—"আমি এসেছি এ পৃথিবীতে করতে কেবল প্রতিবাদ।" এই লাইনটি মনে থাকার কারণ হয়তো এই যে ইহা মন্ত্রাকারে গোর্কির জীবনের একটি বৃহৎ আদর্শকে রূপায়িত করে, অন্যায়ের প্রতিকার ছিল গোর্কির জীবনব্রত।

আনুষ্ঠানিক ভাবে কবি হইতে না পারিলেও জনসাধারণের জীবনের সহিত সচেতন ভাবে প্রত্যক্ষতর পরিচয়ের ফলে গোর্কি'র গল্প বলিবার ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল। যেখানেই যান তাঁহার মৌখিক গল্পের মুগ্ধ শ্রোতার সংখ্যা বাড়িয়া চলিল দিনের পর দিন। তিফলিস শহরে এক বন্ধু তাঁহাকে চাপিয়া ধরিলেন গল্প লিখিবার জন্য। তাঁহার অনুরোধ ছিল—তুমি যেমন বলে যাও, লেখো ঠিক তেমনি সহজভাবেই। এইভাবে লিখিত ও প্রকাশিত হইল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে গোর্কি'র প্রথম গল্প 'মাকার চুদ্রো'। তখন হইতেই গোর্কি'র সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ। দ্বিতীয় গল্প প্রকাশিত হইল মস্কোর এক কাগজে। গোর্কি'র সাহিত্য-খ্যাতির ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপিত হইল এইভাবে। ইহার পর হইতে গোর্কি'র রচিত গল্পের ধারা বন্যার গতিতে দেশপ্লাবিত করিয়া দিল। কেরোলেংকো এখন তাঁহাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বাহবা দিলেন, আর তাঁহার অনুরক্ত পাঠকদের মধ্যে গণ্য হইলেন চেহফ ও তলস্তোই। সমসাময়িক জীবন-সত্যকে প্রতিফলিত করিয়া জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার বর্ণনা ছিল তখনকারের রুশ-সাহিত্যের অপরিহার্য বিষয়বস্তু। কিন্তু গোর্কি তাহাতে আনিলেন এক নূতন সুর—সে সুর বিপ্লবী চেতনার। তাঁহার রচনায় ধ্বনিত হইতে লাগিল এক উদগ্র প্রশ্ন—ইহার জন্য দায়ী কে? প্রশ্নের উত্তরে ধ্বনিত হইতে লাগিল প্রতিকারের আহ্বান—চাই সাহসিকতা, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ। প্রাচীন কাহিনী হইতে গৃহীত দানকো-র জ্বলন্ত হৃদয়ের ইতিবৃত্ত, গদ্যচ্ছন্দে বিরচিত 'শিকারী পাখীর গান' ও বিশেষ করিয়া ১৯০১-২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও প্রকাশিত 'ঝড়ের পাখির গান'—দেশকে মাতাইয়া তুলিল। জারতন্ত্র নির্বিকার হইয়া থাকিতে পারিল না। হুকুম হইল গ্রেফতারের। চারিদিক হইতে বহিল তুমুল প্রতিবাদের ঝড়, যাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইলেন চেহফ ও তলস্তোই।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শুরু হইল লেনিনের সহিত গোর্কি'র যোগাযোগ। প্রথমে অপ্রত্যক্ষ ও পরে গভীরভাবে ঘনিষ্ঠ। ভলগা-অঞ্চলের দুই সুসন্তানের এক ঐতিহাসিক আলিঙ্গন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারী "রক্তাক্ত রবিবারের" বিরুদ্ধে গোর্কি'র জ্বলন্ত প্রতিবাদ প্রকাশিত হইলে আবার জার-তন্ত্রের আদেশ হইল গোর্কি'কে কারারুদ্ধ করার। এবারে প্রতিবাদের ক্ষেত্র হইল বিস্তৃততর। সারা ইউরোপের সাংস্কৃতিক বিবেক বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল,—যাহার চরম প্রকাশ আনাতোল ফ্রাঁন্সের বিবৃতিতে। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে পার্টি'র নির্দেশে গোর্কি গেলেন দেশের বাহিরে প্রবাস জীবনে। ইংলণ্ড,

ফ্রান্স, ইতালি ও পরে আমেরিকা পরিভ্রমণ করিলেন। এই পর্বে কাপ্রি দ্বীপ হইল সাময়িক নিবাসভূমি। এইখানে লিখিত হইল তাঁহার যুগান্তকারী উপন্যাস 'মা'। লেনিন ইহা পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই পড়িয়া বলিয়াছিলেন—বইটি "চমৎকার, অত্যাবশ্যক ও অত্যন্ত সময়োপযোগী।" কাপ্রি থাকিতেই গোর্কি সংবাদ পান তলস্তোই-এর মৃত্যুর ও লেখেন তাঁহার স্মৃতি কাহিনী। কাপ্রিতেই লেনিন আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন গোর্কির সান্নিধ্যে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর গোর্কি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্‌কালে। জারতন্ত্রী রাশিয়ার লেখক হিসাবে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি সত্ত্বেও, তাঁহার জীবনযাত্রা মোটেই সহজ ছিল না। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইবার আগেই ঘটিয়া গেল রুশ বিপ্লব লেনিনের নেতৃত্বে। শিক্ষা ও সাহিত্য সংগঠনের গুরুদায়িত্ব স্বভাবতঃই আসিয়া পড়িল গোর্কির উপর। কর্মদক্ষতায় গোর্কি হইয়া উঠিলেন লেনিনের নির্ভরযোগ্য সহচর। কিন্তু গোর্কির শারীরিক অসুস্থতা বাদ সাধিল। ১৯২১-২২ খ্রীষ্টাব্দে আবার গোর্কিকে দেশ ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে হইল লেনিনের উপদেশে চিকিৎসার জন্য। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যু সংবাদ আসিয়া পেঁাছিল যখন আবার তিনি বাস করিতেছিলেন লেনিনের স্মৃতিপূত কাপ্রিতে। সেখানেই লেখা হইল লেনিন সম্বন্ধীয় তাঁহার স্মৃতিপুস্তিকা। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন স্বদেশে। বেলারুস্কায়া রেলস্টেশন ও তাহার চত্বর উদ্বেল হইয়া উঠিল তাঁহাকে সংবর্ধনা করার জন্য সমাগত অভূতপূর্ব জনসমাগমে। শ্রীমতী ভেরা মুখিনা কৃত ব্রঞ্জমূর্তিটি আজও এই ঘটনার স্মৃতি মস্কোবাসীকে মনে করাইয়া দেয়।

দেশে ফিরিয়া গোর্কি সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। এক সময়ে যৌবনে তিনি বাহির হইয়াছিলেন পর্যটনে দেশের অবস্থা জানিবার জন্য। আবার তিনি বাহির হইলেন পুনরায় স্বদেশের সর্বত্র পরিদর্শনের জন্য। নূতন সোভিয়েত-রাষ্ট্রতন্ত্রে জন-সাধারণের জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটিতেছে তাহা অধ্যয়ন করা ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। গোর্কির এই পর্যটনের পর্বে রবীন্দ্রনাথ গিয়াছিলেন মস্কোয় মাত্র দুই সপ্তাহের জন্য। আমাদের পরম পরিতাপের বিষয় যে এত কাছাকাছি আসিয়াও এই দুই বিশ্ব-সাহিত্যিকের সাক্ষাৎকার ঘটে নাই।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পরিদর্শন শেষ করিয়া গোর্কি মস্কোয় ফিরিয়া আবার শিক্ষা ও সাহিত্য সংগঠনে মন দিলেন স্তালিনের সহকর্মী রূপে। স্তালিন

ছিলেন গোর্কি সাহিত্যের একান্ত অনুরক্ত পাঠক। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে গোর্কির ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত একটি কাব্য গাথা—'কুমারী ও মৃত্যু' পড়িয়া তিনি ইহাকে ভাবের দিক হইতে গ্যেটের বিখ্যাত কাব্য নাটক 'ফাউস্ট'-এর উপরে স্থান দেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ হইয়াছিল গোর্কির চল্লিশ বৎসরের লেখক-জীবন। এই আনন্দ-উৎসব উপলক্ষে গোর্কির জন্মস্থান নিজ্‌নি-নভ-গোরদ্‌-এর নামান্তর হইল—গোর্কি। গোর্কির নাট্যকলার প্রধান প্রদর্শনক্ষেত্রে মস্কো আর্ট থিয়েটারের নামে গোর্কির নাম দিয়া বিভূষিত হইল।

স্তালিনের সক্রিয় সমর্থনে ও গোর্কির নেতৃত্বে আহূত হইল প্রথম সোভিয়েত লেখক-সম্মেলন। এই সম্মেলনে নির্দিষ্ট হইল সোভিয়েত লেখকগণের রচনার রীতি ও বৈশিষ্ট্য—যাহা এখন সোশালিস্ট রিয়ালিজম নামে বিশ্ববিদিত। সংগঠিত হইল সোভিয়েত লেখক ইউনিয়ন যাহার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন গোর্কি তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত। প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ব-সাহিত্য ইনষ্টিটিউট, যাহা এখন পরিচালিত হয় সোভিয়েত লেখক ইউনিয়নের কর্তৃত্বে। গোর্কীর জীবনের শত সহস্র কাজের মধ্যেও তাঁহার নিজস্ব সাহিত্য-সৃষ্টির স্রোত কখনও নিরুদ্ধ হয় নাই। উপরন্তু এখনকার অনেক খ্যাতনামা লেখক তাঁহাদের তরুণ বয়সে গোর্কির নিকট কত যে ব্যক্তিগত উপদেশ ও সহায়তা পাইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। গোর্কির জীবনের প্রগাঢ় ও বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা হইতে তাঁহারা যেন, ব্যাঙ্কের মতো, পাইতেন এক পূর্বতন জীবনের সঞ্চিত সম্পদ।

এই বিরাট মহাপুরুষের জীবনাবসান হইল ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যাসিষ্ট ষড়যন্ত্রের ফলে। ইহা ফ্যাসিজ্‌মের চরম কলঙ্ক। গোর্কির মৃত্যুহীন গৌরবের সহিত এই কলঙ্কও অমর হইয়া থাকিবে।

[ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার উদ্যোগে আয়োজিত গোর্কি স্মৃতি সভায় ২৮।৩।৬১ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতার অনুসরণে লিখিত।]

লুনাচারস্কির নন্দনতত্ত্ব

১৯১৭ সালের সেই গৌরবময় দশদিন যা সারা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল তার পরবর্তীকাল থেকে ভারতবর্ষের যাঁরা রুশ বিপ্লবের গতিপথ লক্ষ করে আসছেন আনাতোলি লুনাচারস্কির নাম তাঁদের কাছে অজানা থাকতে পারে না। তিনি সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী রূপে এবং লেনিনের বিশ্বস্ত বন্ধু ও অনুগামীরূপে নিশ্চয়ই সুপরিচিত। কিন্তু প্রখ্যাত তত্ত্ববিদ্ এবং "চোখ ধাঁধান পাণ্ডিত্যের" অধিকারীরূপে তাঁর খ্যাতি এতদিন প্রধানত বিশ্বাস-নির্ভর ছিল। আলোচ্য গ্রন্থখানি ইংরেজী-জানা পাঠকসমাজের কাছে সরেজমিনে সাক্ষ্য দেবে কেন লেনিন গোর্কির কাছে লুনাচারস্কিকে "একজন অসাধারণ গুণবান ব্যক্তি" বলে বর্ণনা করিতে দ্বিধা করেন নি, যদিও তখনও লুনাচারস্কি মার্কসবাদে পুরোপুরি আত্মস্থ হতে পারেন নি। পরবর্তীকালে লুনাচারস্কি কখনও স্বীকার করিতে দ্বিধা করেননি যে লেনিনের শিক্ষাই তাঁর সর্বপ্রকারের বিচ্যুতি এবং ভুল ধারণা দূর করেছিল।

লুনাচারস্কির জন্ম ১৮৭৩ সালে, অর্থাৎ লেনিনের জন্মের তিন বৎসর পরে। মৃত্যু ১৯৩৩ সালে; তিনি সত্যিই এক সুবিপুল উত্তরাধিকার রেখে গেছেন আমাদের জন্য। ধ্রুপদী এবং সমসাময়িক সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও ভাস্কর্যের নানাবিধ সমস্যা সম্পর্কে তিনি প্রায় পনেরো শত প্রবন্ধ লিখেছেন।

লুনাচারস্কির জীবন-কাল ছিল এমন একটা সময় যখন পুরাতন রুশ সমাজের শিল্পকলা ইতিহাসের পংক্তিভুক্ত হয়েছে এবং নতুন পৃথিবীর শিল্পকলা জন্ম নিচ্ছে। সমালোচক হিসাবে তিনি যেন এই দুই সংস্কৃতি-জগতের সেতুবন্ধ রচনা করেছেন। "নন্দনতাত্ত্বিক ধারাবাহিকতা এবং প্রচলিত নন্দনতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের লঙ্ঘন" উভয়বিধ ধারণাই লুনাচারস্কির সমালোচনার পরীক্ষাপত্রে স্থান পেয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা যা দিয়ে গেছেন তা যেমন তিনি গ্রহণ করেছেন তেমনি ভবিষ্যতের শিল্পকলার অনির্বচনীয় সৌন্দর্যেরও তিনি আভাস দিয়ে গেছেন। পরিতাপের বিষয় স্তালিনের একনায়কী প্রভুত্বের যুগে এই অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক ঐতিহ্য সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে। মাত্র কিছুকাল আগে পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি আবার লুনাচারস্কির জীবন ও রচনার অনুশীলনের প্রতি নিবিষ্ট হয়েছে ; বর্তমানে তাঁর সংগৃহীত রচনাবলীর আট খণ্ডে বিভক্ত একটি সংস্করণ প্রস্তুয়মান।

লুনাচারস্কির নির্বাচিত কিছু রচনা সংবলিত এই ইংরেজি সংস্করণটি তাঁর সুবিশাল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশেরই পরিচয় দেয়। তাঁর অনেক সুগভীর তাত্ত্বিক রচনাই এই সংকলনে সন্নিবিষ্ট করা যায় নি। কিন্তু সংকলক একটা ভালো কাজ করেছেন, তিনি সংকলনের অন্তর্ভুক্ত কোনো রচনাই সংক্ষেপিত করেন নি ; তিনি নির্বাচিত রচনাগুলিকে তিনটি নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করেছেন। (১) সাহিত্য-তত্ত্ব প্রসঙ্গ (২) রুশ ও সোভিয়েত লেখক প্রসঙ্গ (৩) বিদেশী শিল্প ও সাহিত্যরথী প্রসঙ্গ।

এই তৃতীয় অংশটির যে ভারতীয় পাঠকদের কাছে বিশেষ এক আকর্ষণ থাকবে তা সহজেই অনুমেয়। এই অংশের রচনাবলীর মধ্যে আছে জর্জ বার্নার্ড শ' (১৯৩১, রেনোয়াঁর ছবি (১৯৩৩), মারসেল প্রুস্ত (১৯৩৪) রিচার্ড ভাগনার (১৯৩৩), জোনাথান সুইফট্ ও তাঁর 'এ টেল অব এ টাব', বেকন ও শেকস্‌পীয়রের নাটকের চরিত্রাবলী (১৯৩৪-এ প্রকাশিত), 'হিরোজ অব অ্যাকশন অ্যাণ্ড মেডিয়েশন' এই নামে টিশিয়ানের আঁকা পোপ তৃতীয় পলের প্রতিকৃতি সম্পর্কে আলোচনা। শুধু বৈচিত্র্যের দিক থেকে বিচার করলেও যে কোনো পাঠক বলে উঠতে পারেন : "Here indeed is God's plenty !" আমাদের বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না যখন মনে রাখি এই জটিল বিষয়গুলি আলোচিত এবং বিশ্লেষিত হয়েছে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের সুনির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে।

দ্বিতীয় অংশে আগেই বলা হয়েছে, সংকলিত হয়েছে রুশিয়ার ধ্রুপদী এবং আধুনিক লেখকদের সম্পর্কে নিবন্ধাদি। এই প্রবন্ধগুলি যখন প্রথম লিখিত হয়েছিল তখন স্বভাবতই রুশীয় পাঠকদের কাছে তার আকর্ষণ অনেক বেশি ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা আধুনিক ভারতীয় পাঠকদেরও চমৎকৃত না করে পারে না। কারণ এইসব রুশ লেখক আজ বিশ্ব-বিশ্রুত। সংস্কৃতিবান এমন কোনো সমসাময়িক মানুষের কথা কল্পনা করা যায় না যিনি বলবেন পুশ্‌কিন, দস্তয়েভস্কি আলেকসান্দার ব্লখ, ম্যাকসিম গোর্কি বা মায়াকোভস্কি সম্পর্কে কৌতূহলী নন। আর এইসব শ্রুতকীর্তি ব্যক্তি সম্পকে, অনেক কথা বলা এবং লেখা হলেও, তাঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই লুনাচারস্কি কিছু না কিছু নতুন এবং মৌলিক কথা বলেছেন এবং তা তাঁর বিশিষ্ট মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই।

তৃতীয় অংশটি কিন্তু, বইটি যা দিয়ে শুরু, বলতেই হয় সব পাঠকের কাছে সুপাচ্য নয়। এই অংশে মাত্র দুটি প্রবন্ধ আছে : (১) মার্কসীয় সমালোচনা সম্পর্কে সিদ্ধান্তসমূহ এবং (২) চের্নিশেভস্কির নীতিতত্ত্ব ও নন্দনতত্ত্ব—একটি সমসাময়িক মূল্যায়ন। বলা বাহুল্য এই প্রবন্ধ দুটি সম্যকরূপে অনুধাবন করা দূরে থাক, দন্তস্ফুট করতে হলেও যথেষ্ট পূর্ব-প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। কিন্তু একথা বিনা দ্বিধায় বলা যায়, যাঁদের এই প্রস্তুতি আছে তাঁরা যদি কষ্ট করে এই প্রবন্ধ দুটি পড়েন তা হলে তাঁদের শ্রম সার্থক হবে। তাঁদের হয়তো একটি মাত্রই অভিযোগ থাকবে যে রুশ ভাষা জানা না থাকায় তাঁরা এতকাল এই মূল্যবান রচনাগুলির রসাস্বাদনে বঞ্চিত থেকেছেন। এই ইংরেজী সংস্করণটি তাঁদের সেই অভাব দূর করবে।

বাংলায় হার্ডার ও গোটে

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে বিগত আঠারো ও উনিশ শতকের জার্মানির দুই বিশ্রুতকীর্তি মহাপুরুষের পরিচিতি-গ্রন্থ প্রকাশ নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইংরাজী সাহিত্যের সহিত বাঙালী শিক্ষিত পাঠকসাধারণের যোগ প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ। য়ুরোপীয় সাহিত্যের দিকপালের সহিত পরিচিত হইতে হইলে আমাদের অনন্যোপায় হইয়া ইংরেজ অনুবাদকের ও সমালোচকের দ্বারস্থ হইতে হয়। প্রাচীনদের কথা বাদ দিয়া বলা যায় যে ভিকটর হ্যুগো বা বালজাক, লেওপার্দি বা কার্দুচ্চি, পুশকিন বা টলস্টয় প্রভৃতি সম্বন্ধে মনে রাখিবার মতো বই বাংলায় লেখা হয় নাই। তাই হার্ডার (হের্ডর? হের্ডের?) ও গ্যেটে (গোয়েট? গ্যয়েটে?) এর জীবনকথা ও রচনাবলী অবলম্বনে এই গ্রন্থ দুইখানি প্রণয়নের জন্য বাঙালী পাঠক লেখক দুইজনের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।

জার্মান সাহিত্যে ভাববিকাশের ধারা অনুধাবন করিলে দেখা যায় সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দীতে জার্মান মানস-লোক ব্যাপিয়া ছিল এক জড়তা ও বিদেশী ধ্যানধারণা ও আচারব্যবহারের দাসত্ব। ইহার কারণ অবশ্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ "ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধ" (১৬২৮-১৬৪৮), যাহাতে সারা দেশে চলে ধ্বংসের তাণ্ডব, শহরগুলির সমৃদ্ধির পথ হয় ব্যাহত, ও জনসাধারণের সামাজিক শ্রীবৃদ্ধি কয়েক

জাতীয়তার বাণীমূর্তি হার্ডার—শ্রীদিলীপকুমার মালাকার। শ্রীগুরু লাইব্রেরী। এক টাকা

কবিগুরু গোটে—১ম ও ২য় খণ্ড—কাজী আবদুল ওদুদ জেনারেল প্রিণ্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স লিঃ, ও ভারতী সাহিত্যভবন। ৫৲ও ৩৷৷০।

পুরুষের মতো পিছাইয়া যায়। যে সাহিত্য-আন্দোলনের জন্য জার্মানির নাম জগদ্বিখ্যাত, বলা যাইতে পারে ১৭৪০ সাল হইতে তাহার সূচনা। ক্লপস্টক, লেস্‌সিং প্রভৃতির সহিত হার্ডারও ইহার অন্যতম প্রধান নেতা। তাঁহাকে "ঝড় ও ঝঞ্ঝা" আন্দোলনের মূল উৎস বলিলে মোটেই অন্যায় হয় না। এই আন্দোলনে হার্ডার-এর বৈপ্লবিক অবদান হইতেছে সাহিত্যে ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদ বিষয়ে তাঁহার অসামান্য উপলব্ধি। কল্পনাকুশলী কবি হিসাবে তাঁহার স্থান উচ্চ শ্রেণীতে পড়ে না, যদিও তাঁহার ছন্দ-নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। অনুবাদক হিসাবে তাঁহার কৃতিত্ব অবিস্মরণীয়। পৃথিবীর বহু আদিম জাতির কবিতা তিনি জার্মান পাঠকের গোচরে আনেন। যে কোন দেশের প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি তাঁহার আগ্রহ ছিল অপরিমিত। প্রাচীন ভারতের 'শকুন্তলা' ও 'গীতা' সহজেই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সতেরো শতকের বিদেশী অনুকরণপ্রিয়তার প্রতিবাদে তিনি স্বদেশবাসীকে তাহাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে চোখ ফিরাইতে শেখান। ঐতিহাসিক বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী হওয়ায় তিনি কোন দেশের কোনো যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যকে, এমন কি প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের মহিমাকেও, চিরন্তন ও বিশ্বব্যাপী আদর্শ বলিয়া মানিতেন না। তাই গ্রীক আর্টের বৈপ্যরীত্যে তিনি ঝোঁক দিতেন গথিক আর্টের উৎকর্ষের উপর। কবিতাকে তিনি ভাবিতেন যেন এক প্রোটিয়াস, গ্রীক পুরাণের বহুরূপী দেবতা, যাহার রূপের বদল হয় বিভিন্ন জাতির ভাষা, আচার ব্যবহার, ধরণ ধারণ, মেজাজ ও ভৌগলিক পরিবেশ, এমন কি তাহার উচ্চারণভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য অনুসারে। তাই তাঁহার বিশ্বাস ছিল প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্ট হয় জনকতক লেখকের প্রচেষ্টায় নয়, সমগ্র জনসাধারণের প্রেরণায়। এই হিসাবে তিনি "লোক" সাহিত্য বা "জাতীয়" সাহিত্যের প্রবর্তক। সুতরাং তাঁহার জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ বা উগ্র নহে, তাহা বিশ্বমানবসভ্যতার পরিপন্থী নহে। বরং তিনি গভীর গবেষণা করিয়া ছিলেন কিভাবে মানবজাতির ভাবপ্রকাশক ভাষার আবিষ্কার হয়, কিভাবে ধর্ম ও পুরাণ কথা প্রথম মানব সমাজে আবির্ভূত হয়। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের ও পুরাণতত্ত্বের ভিত্তিস্থাপনা অনেকাংশে তাঁহার দ্বারাই হইয়াছিল, সভ্যতার ইতিহাসে তাঁহার এ যশ অমর হইয়া রহিয়াছে।

দুঃখের বিষয় মালাকার মহাশয় তাঁহার সুনির্বাচিত বিষয়বস্তুর যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এলোমেলো ভাষায় খাপছাড়া ধরণে লেখায় বিষয়ের গৌরব রক্ষা করার চেষ্টা পর্যন্ত দেখা যায় না। যেমন "হার্ডারের

ভাবুকতা", "মানুষ হার্ডার", "ভাষা ও সাহিত্য" নিবন্ধগুলি যথাক্রমে এক পৃষ্ঠা, ও তিন পৃষ্ঠায় সারা হইয়াছে। "হার্ডারের বাণী" পরিচ্ছেদে যে সকল উদ্ধৃতি নির্বাচন করা হইয়াছে তাহাতে হার্ডার-এর প্রতিভার প্রতিকৃতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। সমস্ত বইখানির প্রধান উদ্দেশ্য তাহার নামকরণেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মালাকার মহাশয় হার্ডারকে উগ্র জাতীয়তাবাদের উত্তরসাধক হিসাবেই পূজা করিয়াছেন। অন্য দিকগুলিকে প্রায় অবহেলা করিয়া।

লেস্সিং, শিলার, গ্যেটের বিশ্বজনীন দৃষ্টির প্রতিবাদে হার্ডারকে খাড়া করিয়া তিনি সাড়ম্বরে লিখিতেছেন: "সেদিনের জার্মানীর বিশ্বপ্রেমের বাতিক হইতে মুক্ত ছিলেন একমাত্র হার্ডার। সেইজন্যই নিখাদ স্বদেশপ্রেমের পুণ্য-পরশে মিথ্যা বিশ্বপ্রেম শূন্যে উড়িয়া গিয়াছিল। জার্মানীর ঘর-দুয়ার হইতে আস্তাকুঁড় অবধি, জ্ঞানী হইতে অজ্ঞ অবধি, গাছপালা, ধূলিমাটি হইতে প্রাসাদ অবধি সব কিছুই যে বিশ্বপ্রেমের ছোঁয়াচে ভূতগ্রস্তের মত হইয়া পড়িয়াছিল তাহাকে মুক্ত করিলেন হার্ডার।" মালাকার মহাশয় জার্মান ভাষায় অভিজ্ঞ—তাহা জাহির করিবার ভূরি ভূরি নিদর্শন অনেক সময় অনাবশ্যক ভাবে এই চটি বইখানিতে প্রক্ষেপ করিয়াছেন; তবুও এই জার্মান মনীষীকে সম্যক-ভাবে বুঝিতে ও বিচার করিতে পারেন নাই। বাঙালী পাঠকের পক্ষে ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়। আর ভূমিকায় অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার মহাশয় তাঁহার লেখনী-সিদ্ধ চোয়াড়ে ভাষায় যে অসংলগ্ন বিশ্বপাণ্ডিত্য ও স্থূল আত্মম্ভরিতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা এই হার্ডার-পূজায় ঢাকের বাদ্যের মতো, না বাজিলেই মিষ্ট লাগিত।

ওদুদ সাহেবের "কবিগুরু গ্যেটে" দুই খণ্ডে সমাপ্ত প্রকাণ্ড-কলেবর গ্রন্থ, প্রায় বিশ বৎসরের একাগ্র অভিনিবেশের ফল। ইহা একই সঙ্গে চরিতকথা ও সাহিত্য-পরিচয়। মালাকার মহাশয়ের মতো জার্মান জানার অভিমান ওদুদ সাহেবের নাই। কিন্তু ইংরাজী ভাষায় গ্যেটে সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রাপ্তব্য তাহাতো তিনি সংগ্রহ করিয়াছেনই, তদুপরি জার্মান অভিজ্ঞ পণ্ডিতদের দ্বারাও তিনি তাঁহার রচনা পরখ না করাইয়া প্রকাশের জন্য দৌড়ান নাই। গ্যেটের সুদীর্ঘ জীবন যেমন একদিকে অন্তর্লোকের অনুভূতি-সংকটে সমৃদ্ধ, অন্যদিকে তাঁহার বিদ্যানুশীলনের পরিধি ও শিল্প সৃজনের বহুমুখিতা স্তম্ভনকর। ওদুদ সাহেব অত্যন্ত ধীর ভাবে ভক্তপূজারীর মতো সানন্দ ঔৎসুক্যের সহিত তাঁহার উপাস্য দেবতার জীবনের প্রতিটি পর্বের ও ক্রমের আলোচনা করিয়াছেন।

প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের বিবরণ, সংক্ষিপ্তসার আলোচনা ও অনেকস্থলে বিস্তৃত অনুবাদ দিয়া গ্রন্থখানিকে এমন উপাদেয় করিয়া তুলিয়াছেন যে বাঙালী পাঠক সাময়িকভাবে জার্মান ও ইংরাজী না জানার দুঃখ ভুলিয়া থাকিবে। যে কোনো দেশের বিরাট প্রতিভার সহিত সংস্পর্শে আসা পাঠক-সাধারণের পক্ষে কল্যাণকর। গ্যেটের মতো বিশ্বপুরুষের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ ঘটাইয়া দেওয়ায় ওদুদ সাহেব আমাদের ধন্যবাদার্হ।

হঠাৎ ভাবিতে অবাক লাগে একজন বাঙালী রসগ্রাহী পণ্ডিত কি করিয়া একজন জার্মান লেখকের রচনায় এমন অধ্যবসায়ের সহিত অভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন এত বৎসর ধরিয়া? ইহার উত্তর পাওয়া যায় ওদুদ সাহেবের পূর্বতন রচনায়। ইংরেজপূর্ব যুগ বাদ দিলে নব্য বাংলার ইতিহাসে দুই জন মহাপুরুষ তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিলেন—রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ। বলা যাইতে পারে, গ্যেটের মধ্যে তিনি খুঁজিয়া পাইয়াছেন সেই সাধনারই স্পষ্টতম রূপ। তাই দেশ ও কালের সমস্ত ব্যবধান সত্ত্বেও গ্যেটে তাঁহার অত্যন্ত আপনার জন। যে জীবন-সাধনায় ওদুদ সাহেব বিশ্বাসবান তাহাতে "কেন্দ্রীভূত হয়েছে আমাদের অতীত ও বর্তমানের বোধ, ভবিষ্যতের আশা, আর জগতের সঙ্গে আমাদের অচ্ছেদ্য যোগ।" তিনি বিশ্বাস করেন, "গ্যেটের স্বাস্থ্য ও সবল মুক্তবুদ্ধি হয়ত আমাদের দেশকেও সাহায্য করবে জীবনের দায়িত্ব, প্রতিভা, ধর্ম, স্বদেশপ্রেম, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের যোগাযোগ—সব কথাই আরো ভালো করে বুঝতে, যেমন ইয়োরোপের ও আমেরিকার চিৎপ্রকর্ষ তাঁর প্রভাবে লাভবান হয়েছে।"

ওদুদ সাহেব ঠিকই বুঝিয়াছেন। বাংলা সংস্কৃতির যে কল্পের সূচনা রামমোহন ও পরিণতি রবীন্দ্রনাথে, তাহার সহিত জার্মানির গ্যেটে-শাসিত যুগের গভীর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু তিনি ইহাকে ইতিহাসের আকস্মিকতার অতিরিক্ত অন্য কিছু বলিয়া দেখেন নাই। অন্তত ইহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন নাই। তিনি এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত যে "অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপের যে নব মানবিকতার সাধনা—নিউ হিউম্যানিজম—পাশ্চাত্যে তার শ্রেষ্ঠ ফল গ্যেটে, আর প্রাচ্যে তার শ্রেষ্ঠ ফল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগরণ যার ব্যাপকতম প্রকাশ রবীন্দ্রনাথে।"

কিন্তু এই নিউ হিউম্যানিজম্ ইতিহাসে আপতিক ব্যাপার নহে, ইহার কার্যকারণ শৃংখলা আজ সুবিদিত। যে কালে ফিউডাল সমাজব্যবস্থার সহিত

সংঘাত বাধিয়াছে বুর্জোয়া ব্যবস্থার, তখনই সেখানে উদ্ভব হইয়াছে মানবিকতার, ইতিহাসে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। ফিউডালতন্ত্রের শাসন উপেক্ষা করিয়া বুর্জোয়া তন্ত্রের প্রথম প্রকাশ হয় ইংলণ্ডে। তাই ইংলণ্ডের সাহিত্যেই আমরা প্রথম দেখিতে পাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, জাতি-স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মানবিকতাবোধ। ইংলণ্ডের প্রভাবেই পরে ফ্রান্সে ও জার্মানিতে এই সংঘর্ষ প্রকট হয়। সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও সৃষ্ট হয় নূতন সাহিত্য ও চিন্তাধারা, যাহা মূলত ইংরেজী সাহিত্য ও চিন্তাধারার প্রতিচ্ছায়া। ভলতেয়ার, রুসো, লেস্‌সিং শ্লেগেল, সকলেই ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবিত। শেক্সপীয়ারের রচনার সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয় না থাকিলে গ্যেটের প্রতিভার পূর্ণবিকাশ হইত কিনা সন্দেহ; গ্যেটেও যে শেক্সপীয়ারের মধ্যে প্রবেশ করিবার অন্তর্দৃষ্টি পাইয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ, তাঁহার সমসাময়িক কালে জার্মানিতে ফিউডালতন্ত্রের বিরুদ্ধে নবোদ্ভূত জার্মান বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিবাদ শুরু হইয়া গিয়াছে। তাই শেক্সপীয়ারের নাটকাবলী যে সামাজিক বক্তব্যের বাহক তাহা তাঁহার নিকট ভিন্ন জগতের বলিয়া বোধ হয় নাই; বরং তাহারই মাধ্যমে তিনি নিজের কালের প্রকাশোন্মুখ নূতন মানসের সত্য রূপ অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তাই প্রথম বয়সে গ্যেটে সামাজিক বিদ্রোহের কবি, শৃংখল মোচনের কবি। ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত তারুণ্যের প্রকাশ নহে, তখনকার তরুণ জার্মানীর মর্মকথা, বুর্জোয়া বিপ্লবের অন্তরের বাণী।

কিন্তু বুর্জোয়া বিপ্লবের প্রকৃতিই এই যে তাহা মাঝপথে থামিয়া যায়। ফিউডাল প্রভুদের বিরুদ্ধে তাহা বিপ্লবী, কিন্তু শোষিত জনগণের স্বাধীনতা স্পৃহার সম্পর্কে তাহা প্রতি-বিপ্লবী। সেই কারণে দেখিতে পাই, বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্যামী কবি মধ্য বয়সে ফরাসী বিপ্লবের প্রতি বিরূপ ও বিপ্লব-হন্তারক নেপোলিয়নের গুণমুগ্ধ। দেশের পরাধীনতাও তাঁহাকে বিচলিত করে না তিনি এমনই বিশ্বমানবতার উপাসক, নিরালম্ব সত্য-সুন্দরের পূজারী। ক্রমশ গ্যেটের জীবন দেশের জনজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তিনি ক্রমশ অভিজাতবর্গেরও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। তাঁহার রচনায় আঙ্গিকের উৎকর্ষ যত বাড়িতে লাগিল, সামাজিক বাস্তবতায় তাহা তত দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। জার্মান ভাষাকে তিনি দিলেন অপূর্ব ঐশ্বর্য, কিন্তু জার্মান জনগণ বঞ্চিত রহিল সে অমৃতে। তাঁহার ঈশ্বরোপম সৃজনী ক্ষমতা সময়ের পদক্ষেপে

লাভ করিল বন্ধ্যাত্ব। জার্মানির নবতর চেতনার বিকাশে তাহা আর ফলপ্রসূ হইল না।

গ্যেটের অব্যবহিত পরের যুগের কবি, এই নবতর চেতনার কবি ছিলেন হাইনে। তাঁহার মতো গ্যেটে-ভক্ত সেদিনের জার্মানীতেও বিরল ছিল। গ্যেটের মৃত্যুর পর রচিত এক প্রবন্ধে হাইনে লিখিতেছেন ঃ

"যৌবনের মতো বৃদ্ধ বয়সেও গ্যেটের চোখদুটি ছিল দেবতার মতো। কাল তাঁহার শিরকে বরফে সাদা করিতে পারিত, কিন্তু নত করিতে পারিত না। তাঁহার মস্তক থাকিত সর্বদা সগর্বে উন্নত; তিনি কথা বলিলে মনে হইত যেন তাহা আরো উন্নত হইতেছে। বাহু বিস্তারিত করিলে বোধ হইত, তাঁহার অঙ্গুলি যেন আকাশের তারকারাজিকে পরিচালিত করিতেছে নিজ নিজ পথে। লোকে বলিত, তাঁহার মুখে আছে আত্মপ্রিয়তার নির্মম লক্ষণ; কিন্তু সে লক্ষণও চিরন্তন দেবতাদের, বিশেষত দেবাধিপতি জুপিটারের, যাঁহার সহিত আমি আগেই গ্যেটের তুলনা করিয়াছি। সত্য বলিতেছি, ভাইমারে যখন আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাতে যাই ও তাঁহার সামনে দাঁড়াই, অজ্ঞাতসারেই আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছিলাম—চঞ্চুতে বিদ্যুৎ লইয়া ঈগলটি তাঁহার পাশে আছে কি না। আমি তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে যাইতেছিলাম গ্রীকভাষায়; কিন্তু যখন দেখিলাম তিনি জার্মান বুঝিতে পারেন, তখন জার্মানে বলিয়া ফেলিলাম, য়েনা হইতে ভাইমারের পথের প্লামগুলি অতি উপাদেয়। কত না শীতের রাত্রি ধরিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, কখনও যদি গ্যেটের সাক্ষাৎ পাই কত কি গভীর ও মহৎ কথা তাঁহাকে শুনাইব। যখন সত্যসত্যই সাক্ষাৎ মিলিল, তখন শুধু বলিলাম, স্যাক্সনির কুলগুলি চমৎকার। গ্যেটে হাসিলেন। তাঁহার হাসি ফুটিল সেই ঠোঁটে যাহা চুম্বন করিয়াছে সুন্দরী লেডা, ইউরোপা, ডানাই, সেমিলি, আরো কত রাজকন্যাকে, এমনকি সাধারণ নিমফ্‌দিগকে।"

এ হেন দেবতাভক্তি সত্ত্বেও গ্যেটের জীবনকালে হাইনে বাধ্য হইয়াছিলেন গ্যেটেকে আক্রমণ করিতে। হাইনে বলিতেছেন, "আমার সপক্ষে আমি এইটুকু বলিতে পারি আমি মানুষ গ্যেটেকে আক্রমণ করিয়াছি, কবি গ্যেটেকে নয়। তাঁহার কাব্যের আমি কখনও নিন্দা করি নাই। তাহাতে আমি কখনও কোন ত্রুটি দেখিতে পাই নাই, সেই সমস্ত সমালোচকের মতো যাহারা সুমার্জিত লেনস্ লইয়া চাঁদে কলঙ্ক খুঁজিয়া বেড়ায়। আমার চোখ অত চোখা নয়!"

তবুও যে মতবিরোধ ঘটিয়াছিল তাহার কারণ সময়ের ও সমাজের গতি। কাব্যজীবনে গ্যেটের অবিসংবাদিত প্রতিষ্ঠা 'ফাউস্ট'-এর প্রথম খণ্ডের রচনায়। ইউরোপীয় সাহিত্যে এই নাটকটি যে উচ্চাসন অধিকার করে তাহা বিশ্বসাহিত্যে হ্যামলেট-এর অনুরূপ। ধনতন্ত্রের আবির্ভাবে মানুষের চেতনায় যে আত্মদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল হ্যামলেট তার সর্বোত্তম প্রকাশ। আর ফাউস্ট হইতেছে মধ্যযুগীয় ধর্মপ্রাণতার বিরুদ্ধে আধুনিক বুদ্ধিপ্রাণ যুগের বিজ্ঞান সাধনার সংঘাতের সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী। গ্যেটের জীবনকালেই য়ুরোপীয় ফিউডালিজম ভাঙিতে শুরু করিয়াছিল। তাই ফাউস্ট ছিল সমগ্র ইউরোপের (ইংলণ্ড ছাড়া) প্রগতিশীল জনমনের স্ফুটনোন্মুখ আশাআকাঙ্ক্ষার রূপময় প্রকাশ। যাহারা শেক্সপীয়ার পড়িতে পারে না তাহারা ফাউস্টের মারফৎ খানিকটা সেক্সপীয়ারের রসের সন্ধান পাইত। তবুও নাটক হিসাবে ফাউস্টকে হ্যামলেটের সমপর্যায়ে ফেলা চলে না। কবি হিসাবেও গ্যেটে শেক্সপীয়ারের সমতুল্য নহেন। ইংলণ্ডে গ্যেটে-কাল্‌টেরও প্রধান উদ্যোক্তা কার্লাইলও সে দাবী করেন নাই। তাঁহার মতে বিশ্বকবি হিসাবে একমাত্র দান্তেই শেক্সপীয়ারের তুল্যমূল্য। গ্যেটে আধুনিক অর্থাৎ উনিশ শতকের শিক্ষিতশ্রেণীর কবি, "হিরো য়্যাজ এ ম্যান্ অব টেলার্স।"

গ্যেটের সুদীর্ঘ জীবনাবসানের পূর্বেই জার্মানীর সমাজবিন্যাসে শিক্ষিত-শ্রেণীর ভূমিকায় পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। শিক্ষিতশ্রেণী প্রধানত বুর্জোয়া-শ্রেণীর অনুচর, ফিউডাল তন্ত্রবিরোধী। ফিউডালতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শিক্ষিতশ্রেণী বুর্জোয়াদের প্রধান অস্ত্র। কিন্তু যে আত্মবিকাশের অধিকার বুর্জোয়াশ্রেণী ফিউডাল প্রভুদের বিরুদ্ধে দাবী করিয়া বিপ্লব ঘটায়, সেই অধিকার যখন শ্রমজীবীশ্রেণী তাহাদের নিকট দাবী করিতে যায় তখন বুর্জোয়াশ্রেণী বাঁকিয়া বসে, তাহাদের মুখে শোনা যায় অন্য বাণী। তাই তখন তাহাদের কবির রচনায় রূপায়িত হয় বিপ্লবের প্রবল আবেগ নয়, শান্তির ললিত বাণী। নূতন করিয়া গড়ার উন্মাদনা নয়, চিরন্তন শৃংখলারও ও সনাতন স্থিতিশীলতার মহিমা কীর্তন। 'ফাউস্ট'-এর দ্বিতীয় খণ্ড ইহারই নাটকীয় প্রকাশ।

গ্যেটে-সাহিত্যের এইদিকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া হাইনে বলিতেছেন ঃ

"গ্যেটের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির নিরবচ্ছিন্ন মূল্য (ইন্‌ট্রিন্‌জিক ভ্যালু)

আমি তখনও (অর্থাৎ বিতর্ককালে) অস্বীকার করি নাই। আমার স্বদেশকে তাহারা সুন্দর করিয়াছে, প্রস্তর মূর্তি যেমন করে বাগানকে; কিন্তু তাহারা প্রস্তর মূর্তিই। তাহাদের সহিত প্রেমে পড়িতে পার, কিন্তু তাহারা বন্ধ্যা। গ্যেটের কবিতা হইতে কর্ম প্রসূত হয় না, যেমন হয় শিলারের কবিতায় *। কর্ম শব্দের সন্তান, আর গ্যেটের সুন্দর শব্দগুলি নিঃসন্তান, আর্ট-সর্বস্বতার অভিশাপ। পিগম্যালিয়ন গড়িয়াছিলেন সুন্দরী নারী মূর্তি; শিল্পী নিজেই তাহার প্রেমে পড়িলেন, মূর্তি প্রাণ পাইল তাঁহার চুম্বনের প্রভাবে; কিন্তু যতদূর আমরা জানি তাহার সন্তান হয় নাই। এই সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য শার্ল নোদিয়ে কোন এক সময়ে করিয়াছিলেন বলিয়া মনে পড়িতেছে। গতকাল সেগুলি আবার মনে পড়িল যখন আমি লুভ্র্-এর নীচের তলার হল্-এ পুরাতন দেবদেবীর মূর্তিগুলির মধ্যে বেড়াইতেছিলাম। কি অদ্ভুত! এই দূর অতীতের মূর্তিগুলি আমাকে মনে পড়াইয়া দিল গ্যেটের কবিতাবলীর কথা; তারাওত এমনই ত্রুটিহীন, এমনই মহিমময়, এমনই প্রশান্তিপূর্ণ; মনে হয় তারাও যেন অনুভব করে সদুঃখে যে তাহাদের অনাবেগ কাঠিন্য যেন তাহাদিগের বর্তমানের উষ্ণ স্পন্দিত জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, তাহারা যেন আমাদের আনন্দবাথার সহভাগী নয়, তাহারা যেন মানবীয় নয়, দেবত্ব ও প্রস্তরের সংগমজাত দুর্ভাগ্যের দল।"

গ্যেটের মৃত্যুর স্বল্প ব্যবধানে রচিত এই সমালোচনার অন্তর্দৃষ্টিতে বিস্মিত হইতে হয়। যে বুর্জোয়া শ্রেণীর মনোবৃত্তি ছিল গ্যেটের কবিজীবনের সর্বপ্রধান উপজীব্য তাহাদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে। সংগ্রামশীল জনগণের সহায়তায় ফিউডালতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটাইয়া বুর্জোয়াশ্রেণী অনায়াসে তাহার প্রতিষ্ঠা বিস্মৃত হইল, কাড়িয়া লইল শ্রমজীবীদের সমস্ত অধিকার ও তাহাদের দমনের জন্য পরাজিত ফিউডাল প্রভুদের সহিত আপোষ করিতেও পিছাইল না। তাহাদেরই কবি-প্রচারিত সত্য সুন্দরের আদর্শের কোন সম্মানই তাহারা রাখিল না।

ওদুদ সাহেবের চোখ এড়ায় নাই যে জার্মান জাতির ভবিষ্যতগতি গ্যেটে-প্রদর্শিত পথে হয় নাই। কেন যে হয় নাই তাহা তিনি তলাইয়া বুঝিয়া দেখিবার

* হাইনে শিলারকে গ্যেটের সমতুল্য কবি বলিয়া ভাবিতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, শিলারকে গ্যেটের চেয়ে বড় ভাবার চেয়ে বোকামি আর কিছুই হইতে পারে না। গ্যেটেকে ছোট করার জন্যই অনেক সময় তাঁহাকে বড় করা হয়।

চেষ্টা করেন নাই কেন বোঝা যায় না। শুধু এটুকু বলিয়াই খালাস যে ইতিহাসে অমন দেখা যায়। "জগতে এমন ঘটনা নূতন নয়। ভারতের ঋষি বলেছিলেন সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। কিন্তু সেই ভারতে দেখা দিল উৎকট অস্পৃশ্যতা। মুসলমানের লাভ হয়েছিল এই নির্দেশ—ধর্মে বলপ্রয়োগ নিষেধ; কিন্তু মুসলমানের ইতিহাসে মতের অসহিষ্ণুতা আজো চোখে পড়বার মতো। এই সব অবশ্যম্ভাবী দুঃখ বিপত্তির ঊর্ধ্বে সত্য আর সত্যময় জীবনের প্রসন্ন অধিষ্ঠান, যেমন ঝড় ঝঞ্ঝার দুর্যোগে অবিচলিত সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের মহিমা।"

এই উদ্ধৃতিটীর মধ্যে ওদুদ সাহেবের সাহিত্যিক ও দার্শনিক মূল্য বিচারের সমস্ত শক্তি ও দুর্বলতা নিহিত আছে। মধ্যযুগীয় ধর্মের গোঁড়ামি তাঁহার নাই, একথা অকুণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইউরোপের আঠারো ও উনিশ শতকের "মুক্ত" বুদ্ধির উদারনৈতিক মোহ তাঁহাকে আজিও অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাই তাঁহার বুঝিতে বাধে যে "অবশ্যম্ভাবী দুঃখ বিপত্তির ঊর্ধ্বে সত্য আর সত্যময় জীবনের প্রসন্ন অধিষ্ঠান"—ইহা নিছক কল্পনাবিলাস। এই স্তরে সমগ্র মানবজাতির দৈনন্দিন জীবনকে উত্তোলিত করিতে পারাই প্রত্যেক ব্যক্তি-মানবের অবশ্যকর্তব্য কর্ম। এই লক্ষ্যের পথে যে কবি যে পরিমাণে অনুপ্রাণনা যোগাইতে পারিবেন তিনি তত মহৎ। ইহার চেয়ে বড় কর্তব্য কোন কবির থাকিতে পারে না। এই পথে সব চেয়ে বড় বাধা শ্রেণী বিশেষের আধিপত্য। তাই বৃহৎ কবিকে সর্বদাই লড়াই করিতে হইয়াছে শোষক শ্রেণীর বিপক্ষে, শোষিত শ্রেণীর সপক্ষে। শেক্‌স্‌পীয়ার বা বা দান্তে ইহার ব্যতিক্রম নহেন। সেই জন্যই তাঁহারা বিশ্ব-পূজিত মহাকবি। ইতালীর নবজন্মের ক্ষীণ অরুণালোকেই দান্তের চোখে প্রতিভাসিত হইয়াছিল তখনও শক্তিশালী মধ্যযুগের চরম অবসানের চিত্র; আর ইংলণ্ডে প্রথম প্রবল ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শেক্‌স্‌পীয়ারের কাব্যে ফুটিয়াছে সমগ্র ধনতন্ত্রী সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের পূর্ণাঙ্গ প্রতিকৃতি, এমন কি তাহারও অবসানের আভাস পর্যন্ত।

এই মোহমুক্ত নির্মায়িক কবিদৃষ্টি গ্যেটের আয়ত্তের বাহিরে ছিল। তাঁর জীবনদর্শন একান্ত আত্মকেন্দ্রিক। তাই তাঁহার ভিল্‌হেল্‌ম্‌ মাইস্‌টার-এ বা ফাউস্টে তিনি বালজাক বা শেক্‌স্‌পিয়ারের বস্তুনিষ্ঠা অর্জন করিতে পারেন নাই। ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে বুর্জোয়া শ্রেণী ইউরোপে ক্রমশ শক্তিশালী হইয়া যখনই জনসাধারণের প্রগতির আস্পৃহাকে দমন করিতে

চাহিয়াছে তখনই তাহারা গ্যেটে-সাহিত্যের গুণগানে মুখর হইয়া শাশ্বত সত্য জীবনের আদর্শের মহিমা প্রচার করিয়া, শান্তি স্থিতির মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া আগামী বিপ্লবের গতিরোধ করিতে চাহিয়াছে। গ্যেটের কাব্যমুগ্ধ যে সব সমালোচকের মন্তব্য ওদুদ সাহেব সোৎসাহে সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের সামাজিক অবস্থান চিন্তা করিয়া দেখিলে এ সত্য সহজেই তাঁহার চোখে পড়িত।

বাংলা দেশে রামমোহন-রবীন্দ্রনাথের যুগ ফিউডালতন্ত্রের প্রতিবাদে বুর্জোয়াতন্ত্রের অভিযানের যুগ। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, গ্যেটের মৃত্যু ঘটে ১৮৩২ সালে, রবীন্দ্রনাথের ১৯৪১-এ। এই এক শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর মানবসমাজে অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে। ধনতন্ত্রের বিশেষত্বই এই যে, তাহা আপনার ভিত্তিকে দ্রুত না বদলাইয়া পারে না। ইহাই তাহার অস্তিত্বের শর্ত। সমাজ-জীবনে শ্রেণীসংগ্রামের তীক্ষ্নতা বৃদ্ধির অনুপাতে এক পুরুষের জীবনদর্শন পরের পর্যায়ে ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত ইহা চলিতেই থাকিবে। তাই ওদুদ সাহেবের প্রাণপাত পরিশ্রম সত্ত্বেও বর্তমানের বাংলা দেশে গ্যেটের প্রভাব অনুভবযোগ্য হইবে বলিয়া মনে হয় না।

এই বিচারে জার্মান-কবি হিসাবে গ্যেটের সম্মান খর্ব করা হয় নাই। জার্মান সাহিত্যে তিনি আজও অদ্বিতীয় কবি। গ্যেটেকে বাদ দিয়া কোনো জার্মানভাষীর পক্ষে পূর্ণ আত্মপ্রকাশক্ষম হওয়া সম্ভব নয়; আধুনিক কোনো জার্মান কবির পক্ষে গ্যেটের ঋণ অস্বীকার করা অসাধ্য। কিন্তু আমরা বাঙালীরা জার্মান ভাষার চর্চা করি না। আমরা গ্যেটেকে জানিব অনুবাদে। হয়ত বা অনুবাদের অনুবাদে। সাহিত্যিক মন ইহাতে কতটুকু প্রভাবিত হইতে পারে? অ্যানস্টার, বেয়ার্ড টেলার, আনা সোয়ানউইক, কাহারো অনুবাদই ইংরাজীতে স্থায়ী সাহিত্যের পদবীভুক্ত হয় নাই, যেমন হয়েছে পোপের ইলিয়াড, বা ফিট্‌স্‌জেরাল্ড-এর ওমরখৈয়াম। কিন্তু ইহারা ঠিক অনুবাদ নহে, নূতন ভাষায় নূতন সৃষ্টি। ওদুদ সাহেব গ্যেটের উক্তিতে সাহস পাইয়াছেন—অনুবাদে যে সাহিত্য মর্যাদাহীন হয় তাহা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়। এ উক্তির সত্যতা অতিশয় সীমাবদ্ধ। যে সাহিত্য প্রধানত গীতিধর্মী—লিরিক্যাল, তাহার বেলায় এ উক্তি খাটে না। আর গ্যেটের রচনায় বহু বিচিত্রতা সর্বথা-স্বীকৃত হইলেও তাহা যে মুখ্যত গীতিপ্রবণ, তাহা ওদুদ সাহেব নিজগ্রন্থে বহুবার উল্লেখ করিয়াছেন।

রোমঁ্যা রোলাঁ

(১৮৬৬—১৯৪৪)

রয়টারের তারযোগে রোলাঁর মৃত্যুসংবাদ পুনরায় প্রচারিত হইয়াছে। গান্ধীজীর অনাস্থা সত্ত্বেও এ দুঃসংবাদের প্রতিবাদ হয় নাই—প্রতিবাদের দুরাশা পোষণ করা কঠিন। রোলাঁর তিরোধান, এই অকরুণ সত্যের জন্য আমাদের মনকে প্রস্তুত করাই যুক্তিযুক্ত। কি ভাবে তাঁহার জীবনাবসান ঘটিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ এদেশে আসিয়া পেঁাছায় নাই। কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে নাৎসী জার্মানীর নৃশংসতা তাঁহাকে মৃত্যুর পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। তাই রোলাঁর এ মৃত্যুতে আমরা শোকের চেয়ে বেশী করিয়া অনুভব করিতেছি গর্ব্ব ও গৌরব। সোভিয়েট ইউনিয়নের বাহিরে ফাশিষ্টবাদের ও নাৎসীতন্ত্রের বিরোধী ও সমালোচক রোলাঁর মত এমন আর কেহ ছিল না। এতদিনে সেই কণ্ঠ ও সেই লেখনী চিরতরে রুদ্ধ হইল।

মনে পড়ে ১৯২৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারীর কথা। তখনও হিটলারের পালা শুরু হয় নাই, তাঁহার অগ্রজ মুসোলিনী আসর জমাইয়া বিরাজ করিতেছেন। প্যারিসের বিপুল ফাশিষ্ট-বিরোধী জনসমাবেশ। ইহার উদ্যোগকর্ত্তা ছিলেন আলবের্ট আইনষ্টাইন, আঁরি বারবুস, রোম্যাঁ রোলাঁ, ও পল লাঁজ্ভ্যাঁ। আজ আইনষ্টাইন স্বদেশ হইতে বিতাড়িত, বারবুস ও রোলাঁ অন্তর্হিত ও লাঁজ্ভা ফরাসী কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য।

বিশ শতকের সূচনা হইতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে সকল কথাসাহিত্যিক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো চিন্তা-জগত আলোকিত করেন আজ তাঁহাদের কথা স্মরণ করিলে রোলাঁর অবিসংবাদিত প্রাধান্য স্বতঃই প্রতিভাত হয়। শ' ওয়েল্‌স্‌, গলস্‌ওয়ার্দ্দি য়োহান, বোয়ের, ক্নুট হামসুন, সেলমা লাগেরলফ, হাউপট্‌মান ও সুডেরমান, মেতরলিংক ও দানুনৎসিও—বর্ত্তমানের চিন্তাজগতে ইঁহাদের কতটুকু প্রভাব! টমাস মান ও আনাতোল ফ্রাঁস বহুদূর পর্য্যন্ত রোলাঁর পথের পথিক ছিলেন, পরে তাঁহারাও পিছাইয়া পড়েন। কেবল বারবুস ও গোর্কি'র কথা স্বতন্ত্র। রোলাঁর সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধের কথাও আপনিই আসিয়া পেঁছিবে।

আধুনিক ফরাসী সংস্কৃতির পরিণত ফল রোলাঁ—এ উক্তিতে একটুও অতিরঞ্জন নাই। প্রথম ফরাসী বিপ্লব এবং অধুনাতম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এই দুইয়ের মধ্যে আপন সংবেদনশীল সর্ব্বগ্রাহী প্রতিভার সহায়ে রোলাঁ সেতুবন্ধন ঘটাইয়াছিলেন। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার জ্বলন্ত বাণী শিশু রোলাঁর নিকট পেঁছিয়াছিল নীরস স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের পুঁথির পাতার ভিতর দিয়া নহে, ফরাসী বিপ্লবের চূড়ান্ত কবি ভিক্‌তর য়ুগোর জীবন্ত প্রভাবে। য়ুগোর মৃত্যুকালে রোলাঁ প্রাপ্তবয়স্ক যুবক। সৃজনী প্রতিভার শীর্ষবিন্দু অতিক্রম করিয়া গেলেও য়ুগোর রচনা-ক্ষমতা শেষপর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। ফরাসী বিপ্লবের সাহিত্যিক ধারা রোমাণ্টিসিজম্‌, সেই রোমাণ্টিসিজম্‌-এর বহুমুখী প্রতীক ছিলেন ভিকতর য়ুগো। কিন্তু ১৮৭০ সালে জার্ম্মানীর হাতে লাঞ্ছিত পরাজিত বিধ্বস্ত ফ্রান্সে বিপ্লবের সে আবেগ সে উচ্ছ্বাস সে আত্মময়তার স্থান কোথায়? তখন যে যুগ আসিয়াছিল তাহা আবেগ সংকোচনের, আত্মসমীক্ষণের, নির্ম্মায়িকতার, বিজ্ঞাননিষ্ঠার। তাই সে যুগের প্রতিভূ কবি লেক'ৎ দে লিল; য়ুগোর মৃত্যুর পর তিনিই ফরাসী আকাদেমীর "চল্লিশ অমরের" মধ্যে তাঁহার শূন্য আসনের অধিকারী হন, তিনি ছিলেন রোমাণ্টিকতা-বিরোধী। তাঁর মত ছিল এই—আর্ট ও সায়েন্স যদি নিতান্ত এক হইয়া না যাইতে পারে—তাহা হইলেও উহাদের যথাসম্ভব পরস্পরের নিকটে আসার প্রবণতা সর্বদাই থাকা উচিত।

বিজ্ঞানচর্চ্চায় বিপ্লব ফরাসী দেশে শুরু হয় রোলাঁর জন্মের দু চার বছর পূর্ব্বেই। ১৮৬২ সালে ডারুইনের যুগান্তকারী 'অরিজিন অব দি স্পিসীজ'-এর ফরাসী অনুবাদে তার সূচনা। যে দুইজন চিন্তানায়ক—রেনাঁ ও তে'ন—

তখনকার শিক্ষিত ফরাসীচিত্ত অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা দুই জনেই ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ। বিজ্ঞানের চোখ দিয়া রেনাঁ খৃষ্টধর্মের বিশ্লেষণ করিতে গেলেন। ইহাতে রেনাঁ এমন সংকটে পেঁছিলেন যে মৃদুহাস্যের সহিত তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইল, 'আমার জীবন এখনও সেই ধর্মের অনুশাসনে চালিত যাহাতে আমার আর আস্থা নাই'। তে'ন বিশ্বাস করিতেন, সাহিত্যবিচারকেও প্রাণিতত্ত্বের মতো বিধিবদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত করা অসম্ভব নয়। সাহিত্যেও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন আছে। সাহিত্যিকের সমাজের নিকট নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে আলোচনাও এই সময়ে ফরাসী দেশে প্রকট হইয়া উঠে, প্রধানতঃ টলষ্টয় ও ডসটয়এভস্কির রচনাবলীর অনুবাদে তাহা আরম্ভ হয়।

তরুণ মেধাবী ছাত্র রোলাঁ এই সংঘাতময় পরিবেশের মধ্যে বাড়িয়া ওঠেন। আর্টের বিভিন্ন বিভাগ—সাহিত্য, চিত্র, স্থাপত্য, সঙ্গীত,—ইহাদের প্রত্যেকের বিষয়ে তাঁহার আগ্রহ ছিল অপরিমিত, জ্ঞান ছিল অতুলনীয়। পিয়ানো-বাদনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। যুবক রোলাঁ অচিরেই সুবিখ্যাত সোরবন শিক্ষালয়ের শিল্প-বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করিলেন। ইউরোপীয় সংগীতের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ এখনও প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত।

১৮৯৭ সালে ফ্রান্সে সুধীবর্গ দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়া গেলেন হঠাৎ এক বিস্ফোরণে—যাহাকে বলা হয় "ড্রেফুস ঘটনা"। একদল হইলেন জাতীয় ঐতিহ্যবাদী, ইহাদের নেতা মরিস বারেস ও শার্ল মোরা ; অন্য দল আন্তর্জাতিক বিপ্লববাদী, তাঁহাদের নেতা, এমিল জোলা ও আনাতোল ফ্রাঁস। প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দিলেও পরোক্ষভাবে রোলাঁ দ্বিতীয় দলের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন।

ইহার প্রধান কারণ, রোলাঁর মানস-প্রকৃতি রূপায়িত হইয়াছিল ফরাসী বিপ্লবের আদিম অনুপ্রেরণায়। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণীকে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন অন্তরের অন্তর দিয়া সার্বভৌমভাবে। ইহার প্রয়োগে কোনোরূপ বাধা তাঁহাকে অসহিষ্ণু করিত। জাতিতে জাতিতে বিরোধ এই মন্ত্রের পরিপন্থী বলিয়া তাঁহার চোখে ছিল অন্যায়, অসত্য ও সর্বথা পরিত্যাজ্য। সাহিত্যিকের যে আত্মাভিমান তাহাকে জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে, মৈত্রীর পরিপন্থী বলিয়া রোলাঁ তাহাকে সহ্য করিতে পারিতেন না। এ প্রসঙ্গে তাঁহার বক্তব্য তিনি পরে তাঁহার "১৪ই জুলাই", "দাঁত*" প্রভৃতি নাটকে ও নাটক সম্বন্ধীয় আলোচনায় বিশদ করিয়া বলেন।

দ্বিতীয় কারণ, জাঁ জরেস-এর প্রভাব। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব পর্য্যন্ত ফরাসী জনসাধারণের ও বিদ্বৎ-সমাজেরও উপর এই সোশালিষ্ট নেতার প্রভাব ছিল অনন্যসাধারণ। ইনি একদিকে যেমন ছিলেন জন-নেতা, অন্যদিকে ছিলেন বাগ্মী, সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক। ইঁহার যুদ্ধ-বিরোধী প্রচেষ্টার উপর রোলাঁর এত বিশ্বাস ছিল যে তিনি একসময়ে ভাবিতেন অকস্মাৎ অজ্ঞাত-শত্রুর গুলির আঘাতে জরেসের অকালমৃত্যু না ঘটিলে হয়ত ১৯১৪-এর মহাযুদ্ধও স্থগিত থাকিতে পারিত—জার্ম্মান ও ফরাসী শ্রমিক-সাধারণ জরেসের নেতৃত্বে শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিত, যুদ্ধ বন্ধ করিত। অন্ততঃপক্ষে তাঁহার মৃত্যুতে শান্তির শেষ সম্ভাবনা রক্তাক্ত পরিণতিতে বিলীন হইয়া গেল।

রোলাঁর সর্ব্বাধিক পরিচিত গ্রন্থ 'জাঁ ক্রিস্তফ'। ইহার রচনাকাল ১৯০৪—১২। ইহার দুইটি প্রধান চরিত্রের একজন জার্ম্মান সংগীতকার, অন্যজন ফরাসী সংস্কৃতিবিৎ। তাহাদের বন্ধুত্ব ও তর্কালোচনার ভিতর দিয়া রোলাঁ অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টির সহিত ইউরোপীয় সভ্যতার তথা মানবসভ্যতার যে আসন্ন সংকটের চিত্র আঁকিয়াছেন তাহারই অনিবার্য্য পরিণতি ঘটিল ১৯১৪ সালে। জরেস-প্রণোদিত সোশালিজম্-এর দিকে আকৃষ্ট হইলেও রোলাঁ তখনও রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অনাসক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সত্যনিষ্ঠ-মন নিরপেক্ষ পর্য্যবেক্ষণের ফলেই সেই সংকটের আসল রূপটি চিনিতে পারিয়াছিল। তাহারই ব্যাপক ও অকপট প্রকাশ হিসাবে জাঁ ক্রিস্তফ চিরদিন সাহিত্যামোদীর শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিবে। কারণ, রোলাঁর নায়ক ত কেবল সংকটে নিষ্ক্রিয় দর্শক নন, তিনি যে বীর, তিনি যে যোদ্ধা, তিনি তাঁহার প্রাণ দিয়াও সংকটকে অতিক্রম করিতে উদ্‌গ্রীব। কোনো মিথ্যা, কোনো ছলনাই তাঁহাকে মোহাবিষ্ট করিতে পারে না। সত্যের এই অকুণ্ঠ অনুধাবন, ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন হইয়া এই অবিচলিত কর্ত্তব্যসাধন—শেষ পর্বে গ্রাৎসিয়া-এপিসোডের মিস্টিক উল্লাস সত্ত্বেও ইহাকেই বলা চলে জাঁ ক্রিস্তফ-এর মূল সুর। এই সুরই তিনি ধরাইয়া দিয়াছেন সহজ আশাবাদী টেনিসনের লাইনকে সামান্য পরিবর্ত্তিত করিয়া—টু স্ট্রাইভ, টু সীক, নট টু ফাইন্ড, নট টু ঈল্ড্। জানি, সংগ্রামে বিজয়ের আশা একেবারেই নাই। জানি নরলোক হইতে অনৃতের অন্যায়ের গ্লানি কোনোদিনই বিদূরিত হইবার নয়, তবুও প্রকৃত মনুষ্যত্ব যার আছে তার নিস্তার নাই, এই অসমান সংগ্রাম তাহার চালাইতেই হইবে, স্বার্থবুদ্ধির সমস্ত বন্ধন হইতে মনকে মুক্ত

রাখিতে হইবে, ইহাই তাহার নিয়তির নির্দেশ, ইহাই তাহার ভগবানের বিধান, ইহার পালনেই তাহার চরম সার্থকতা।

জাঁ ক্রিস্‌তফ-এর বিষয়বস্তুর দাবী এমনই নির্ম্মম যে দশখণ্ডব্যাপী বিরাট-কলেবর গল্পটিতে লঘু হাস্য-পরিহাসের স্থান নাই বলিলেই চলে। অথচ ফরাসী জাতির পরিহাস-প্রিয়তা, ফরাসী সাহিত্যের হাস্যরস সুবিদিত। হাস্যরস পরিবেশনেও রোলাঁর যে কিরূপ দক্ষতা ছিল তাহা 'কোলা'ব্রেইঞ' না পড়িলে উপলব্ধি করা যায় না। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর এই কাল্পনিক স্ফূর্ত্তিবাজ বারগাণ্ডীবাসীর দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গীর ভিতর দিয়া রোলাঁ যে হাস্যরস ফোটাইয়াছেন তাহা ঠিক সাধারণ লিপিচতুর লেখকের স্বল্পায়াসসাধ্য চমক-নৈপুণ্য নয়। তাহার তুলনা খুঁজিতে স্মরণ করিতে হয় রাবলে বা দিদেরো-কে। এ হাসিরও পিছনে আছে বৃহৎ সত্যাশ্রয়ী মন, যার কাছে কোনো ধারণাই এত বড় নয় যে তাহাকে লইয়া হাসা যায় না, কোনো প্রতিষ্ঠানই এত পবিত্র নয় যে তাহাকে লইয়া ব্যঙ্গ করা চলে না। ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা, মলিনতা বা বিদ্বেষ এ হাসির কাছেই ঘেঁষিতে পারে না। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের দীপ্তির মতো ইহা যে কোন বস্তুর রূপকেও যেমন উদ্ভাসিত করে, তৎসংলগ্ন ছায়াকেও তেমনি ঘনীভূত করিয়া দেখাইয়া দেয়।

কোলা ব্রেইঞ ১৯১৮-এ প্রকাশিত হইলেও রচিত হইয়াছিল ১৯১৪-এ। ১৪ সালের পর হইতে রোলাঁর রচনার মোড় ঘুরিয়া যায়। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহার পলিটিক্‌সে দীক্ষা হয় মহাসমরের প্রথম শোণিত-ধারায়। তাহার পূর্ব্বে তাঁহার মতে পলিটিক্‌স ছিল হীনজনের ব্যবসায়। কবি যারা, শিল্পী যারা, মনস্বী যারা তাদের স্বাভাবিক আবাস হইবে স্বপ্নের জগতে, কল্পনালোকে। জার্ম্মান কবির অনুসরণে তিনিও গাহিতে পারিতেন, "মাইন রাইশ ইস্‌ট ইন ডের লুফ্‌ট"—আমার রাজত্ব উচ্চাকাশে। তখন তাঁহার কাছে প্রধান সমস্যা ছিল কি উপায়ে এই উচ্চাকাশের সহিত ধরণীতলের সংযোগসাধন করা যায়। টলস্‌টয় লিখিয়াছিলেন, যে-আর্ট মাত্র জনকয়েককে তৃপ্তি দেয় জনসাধারণকে তুষ্ট করে না তাহা গ্রেট আর্ট হইতে পারে না। ইহা পড়িয়া অধ্যাপক রোলাঁ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি ত ভালো করিয়াই জানেন কতখানি সাধনা ও প্রতিভা থাকিলে গ্রেট আর্টের অবিকৃত মর্ম্মগ্রহণ সম্ভব হয়। অথচ ইহাও ত স্পষ্ট যে গ্রেট আর্টের মহিমা যদি মুষ্টিমেয় এলিট-দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে সেই আর্টের সামাজিক মূল্য

কতটুকু হইয়া দাঁড়ায়। সন্দেহের ভঞ্জনার্থে জিজ্ঞাসুভাবে, বিনীত ছাত্রের মতো রোলাঁ টলস্টয়কে পত্রে প্রশ্ন করেন ও টলস্টয় উত্তরে তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয়া ধৈর্যের সহিত আপন প্রতিপাদ্য বুঝাইবার চেষ্টা করেন। অবশ্য পত্রালাপে সাহিত্য-বিচারের এই মূলগত সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় নাই ; বস্তুতঃ তখনকার একান্ত ধনতান্ত্রিক শ্রেণীবিভক্ত সমাজের আবহাওয়ায় তাহার প্রকৃত সমাধানের সন্ধান পাওয়া টলস্টয় বা রোলাঁ কাহারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। তথাপি এই সূত্রে অন্ততঃ একটি শিক্ষা রোলাঁ টলস্টয়ের নিকট হইতে পাইলেন যে, জনসাধারণকে তুচ্ছ করাই সাহিত্যিক আভিজাত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ নয় ; বৃহৎ সাহিত্যের থাকা চাই এমন ব্যাপক আবেদন যাহা একই কালে কৌতূহলী পাঠক ও তীক্ষ্ণধী সমালোচক দুয়েরই আনন্দের উপাদান যোগাইতে পারিবে। এই গ্রেট আর্টের রহস্য সাধারণ পাঠকের নিকট উদ্ঘাটিত করার উদ্দেশ্যে রোলাঁ লিখিয়াছিলেন তিনটি জীবনী-আলেখ্য—সঙ্গীত, স্থাপত্য ও সাহিত্যের তিন দিকপালের—বেঠোফেন, মিকায়েল আন্জেলো ও টলস্টয়। বেঠোফেনের জীবনে, তিনি দেখাইলেন, সৎসাহসের প্রসারশক্তি, নৈতিক সংগ্রামে আনন্দের উদ্দীপনা, আপন চেতনায় ভগবৎ-উপলব্ধির উন্মাদনা। মিকায়েল আনজেলোর জীবনে তিনি ফোটাইলেন একটি করুণ ট্রাজেডি—বিরাট সৃষ্টিক্ষমতার সহিত দুর্বল ইচ্ছাশক্তির সংঘাতের ট্রাজেডি। প্রতিভার ক্ষেত্রেও দুর্বলতাকে যে সমর্থন করা যায় না—ইহা দেখাইতে রোলাঁ কার্পণ্য করেন নাই। টলস্টয়ের জীবনে তিনি প্রকাশ করিলেন কেমন করিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের অন্যতম অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষীবলের দরদী কথক হইতে পারেন। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই মনে পড়ে টলস্টয় সম্বন্ধে লেনিনের অভিমত—এই অভিজাত কাউণ্টটির আবির্ভাবের পূর্বে রুশ সাহিত্যে খাঁটি 'মুঝিক'-এর কথা শোনা যায় নাই।

গ্রেট আর্টের প্রসারের সাহায্যে মানবিকতায় বিস্তার, জাতিতে জাতিতে সম্প্রীতি, রোলাঁর এই সুখস্বপ্ন বিচূর্ণ হইয়া গেল ১৯১৪-এর ২৮শে জুনের বজ্রনির্ঘোষে, সারায়েভোতে অষ্ট্রীয়ার আর্চ-ডিউকের গুপ্তহত্যায়। ক্রিস্তফ ও অলিভিয়ে, জার্মান ও ফরাসী, পরস্পর নিবিড় বন্ধুত্ব করার পরিবর্তে কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুইজনে। যে সকল সাহিত্যিক এতদিন ধরিয়া মানবিকতার স্তবগানে ছিলেন মুখর, তাঁহারাই এখন তরবারির চেয়ে তীক্ষ্ণতর লেখনীর সঞ্চালনে যুদ্ধং দেহি রবে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, 'মাই কান্ট্রি,

রাইট অর্ রং'-মন্ত্রের মাদকতায়। জাতীয়তার যূপকাষ্ঠে মানবতার এই অপমৃত্যু, রোলাঁকে বিস্মিত করিল, ব্যথিত করিল। সত্যনিষ্ঠ সমালোচনার অপরাধে তিনি দুইটি সভ্যজাতিরই বিরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে আশ্রয় লইতে হইল। নিরপেক্ষ সুইট্‌সারল্যাণ্ড-এর উচ্চতা হইতে যুধ্যমান জাতি দুইটির উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল রচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন সেগুলি "যুদ্ধের ঊর্দ্ধে" নামক গ্রন্থে সংকলিত আছে। তাহাতে দেখা যায়, রোলাঁ শান্তিকামী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার কাম্য শান্তি যুদ্ধকে এড়াইয়া নয়, যুদ্ধের পাশবিকতাকে মানবিকতার অস্ত্রে নিহত করিয়া। সংস্কারমুক্ত যুক্তিসিদ্ধ বুদ্ধিজীবীর সমবেত প্রভাবেই হত্যা-লালসাকে দমিত করা যায়, ইহাই ছিল রোলাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। তাই ভের্‌সাই সন্ধিতে ইউরোপের রাজনীতিতে শান্তি আসিলেও রোলাঁর মনে শান্তি আসিল না। সন্ধিপত্রের অন্তরালে আবৃত ছিল যে দাবানলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা তাঁহার হৃদয়বান দৃষ্টিকে তাহা ঠকাইতে পারে নাই। তখনকার আশা-আকাঙ্ক্ষার, আশঙ্কা-উদ্বেগের কথাচিত্র লিপিবদ্ধ হইয়া আছে তাঁহার 'ক্লেরাঁবো' নামক উপন্যাসে, যাহার অপর নাম 'সকলের বিপক্ষে এক', অর্থাৎ সংঘবদ্ধ বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতিবাদ।

মহাসমরের পরিসমাপ্তির পূর্ব্বেই পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটিয়া গেল এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা, উহাই রোলাঁর বিশাল হৃদয়ের ভাবসমুদ্রে সৃষ্টি করিল নূতন মন্থন ও আলোড়ন। রুশ বিপ্লবের সহিত নাড়ীর টান রোলাঁ অনুভব করিয়াছিলেন একেবারে প্রথম হইতেই। এই প্রচণ্ড রাষ্ট্রিক বিক্ষোভ যে মূলতঃ সমগ্র মানব-সমাজের পক্ষে কল্যাণকর, ইহাতে সন্দেহ তাঁহার মনে একদিনও জাগে নাই। তবু তিনি ছিলেন বহুদিন পর্য্যন্ত রুশ সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমালোচক। রুশ বিপ্লবের অন্তর্নিহিত অভীপ্সা তাঁহাকে দুর্জ্জয়বেগে আকর্ষণ করিলেও সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রকাশ্য নির্ম্মমতা তাঁহাকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহত করিত। তাঁহার মানসিক গঠন ও পরিণতির ইতিহাস ভাবিয়া দেখিলে ইহার জন্য তাঁহাকে অপরাধী করা যায় না বরং বিস্মিত হইতে হয় তাঁহার ঔদার্য্যের পরিধিতে। তাঁহার শ্রেণীর অন্য কোন লেখকের হৃদয় হইতে রুশ-বিপ্লব অনুরূপ সমর্থন পাইয়াছিল? সত্য বটে তখনকার ফ্রান্সের অন্যতম খ্যাত লেখক আঁরি বারবুস রুশ বিপ্লবকে মনে প্রাণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গভীর অন্তর্দৃষ্টির জন্য জন্য বারবুস ভবিষ্যৎ-বংশীয়দের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া রহিলেন। কিন্তু মনে

রাখিতে হইবে বারবুস রোলাঁর চেয়ে বয়সে ছোট ছিলেন ও তাঁহার ছিল সমরাঙ্গনে সৈনিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। রুশ বিপ্লবের প্রকৃতি-বিচার লইয়া বারবুস-পরিচালিত 'ক্লার্তে'-গোষ্ঠীর সহিত রোঁলার যে বিতণ্ডার উদ্ভব হয় তাহার তিক্ততার জন্য দায়িত্ব হইতে প্রথমোক্ত দলকে সম্পূর্ণ রেহাই দেওয়া যায় না। সোভিয়েট-সমালোচনায় সাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধিতা হইতে রোলাঁর বিপক্ষতায় যে মৌলিক ভাবগত পার্থক্য আছে তাহা বারবুস-এর দল না মানায় রোলাঁ বিপর্যস্ত বোধ করিতেন। তিনি ভাবিতেন তিনিও তো বারবুস-এর মতোই বিপ্লবী, রুশ বিপ্লবে বুর্জোয়া-শত্রুতা যে তাহারও ছিল চক্ষুশূল। কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের একান্ত উপাস্য রোঁলা নির্বিত্ত শ্রেণীর একাধিপত্য মানিতে বাধা পাইতেন। ইতিহাসের যে অলঙ্ঘ্য দ্বান্দ্বিক নিয়মে ফরসী বিপ্লবের ডিমক্রাসী রুশবিপ্লবের ডিক্‌টেটরশিপ-এর পর্য্যায়ে পরিণত হয় তাহা তখনও রোলাঁর দার্শনিক দৃষ্টির বাহিরে ছিল। জানা নাই, তখন মার্কস-এর 'গোটা' কর্ম্মসূচীর সমালোচনা বা লেনিন-এর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থ দুটি তাঁহার হাতে পড়িয়াছিল কি না।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের আচরণ সম্বন্ধে রোলাঁর এই অপজ্ঞানের জন্য গোর্কির দায়িত্বও কিছু কম নয়। ইউরোপীয় সাহিত্যক্ষেত্রে তখন গোর্কির প্রতিষ্ঠা তর্কাতীত। রোলাঁ তাঁহাকে অগ্রজের মতো শ্রদ্ধা করিতেন। রুশ সমাজের নিম্নস্তরের জন্য গোর্কির গভীর সমবেদনা তাঁহাকে এক স্বতন্ত্র গৌরব আনিয়া দিয়াছিল। তাছাড়া গোর্কি ছিলেন লেনিনের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ। অথচ রোলাঁ দেখিলেন, গোর্কি সোভিয়েটকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া বিদেশে আসিয়া বাস করিতেছেন। বারবুসের সহিত বিতর্কে রোলাঁর অনেক মতের সহিত গোর্কির মতের মিল ছিল। সুতরাং অকপট চেষ্টা সত্ত্বেও রোলাঁ নিজের ত্রুটির সন্ধান পাইতেন না। কিন্তু গোর্কির বোধি-প্রাপ্তি হইল লেনিনের মৃত্যুতে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্বরূপ তাহার ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া অক্লান্ত অবারিত আত্মনিয়োগে তিনি নিজেকে ও সোভিয়েটকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিলেন। গোর্কির এই প্রত্যাবর্ত্তন সোভিয়েট রাষ্ট্রের দ্রুত উর্দ্ধগতি, ইউরোপ ভুখণ্ডে বিবর্দ্ধমান বিশৃংখলা পরে রোলাঁরও দিব্যদৃষ্টি উন্মোচন করে।

এই দৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হওয়ার আগে পর্য্যন্ত রোলাঁর ছিল আধ্যাত্মিক ঘুরপাক খাওয়ার পর্ব্ব। ইউরোপের ভবিষ্যতে হতাশ্বাস হইয়া তিনি চারিদিক

চাহিয়া দেখিলেন মুক্তির সন্ধানের আশায়। হঠাৎ চোখে পড়িল আধুনিক ভারতের অধ্যাত্মসম্পদ—গান্ধী, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রামকৃষ্ণ। ঐহিক শক্তিতে আস্থা হারাইলেই আধ্যাত্মিক শক্তিতে আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়—ইহাই ইতিহাসের সাক্ষ্য। রোলাঁর পক্ষেও ব্যতিক্রম ঘটিল না। আপন স্বভাবসিদ্ধ আবেগের সহিত তিনি তাঁহার নূতন আবিষ্কারের বাণী ইউরোপে প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহারও মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তাঁহার প্রকৃতিগত ঝোঁক আধ্যাত্মিক সমাধিমগ্নতার চেয়ে আদর্শনৈতিক কর্ম্মযোগের দিকেই বেশী। তিনি বিশ্বাস করিতেন গান্ধীবাদের সহিত লেনিনবাদের সমন্বয় সম্ভব।

রোলাঁর সংগ্রামপ্রবণ চিত্ত এ অবলম্বনে বেশীদিন টিকিয়া থাকিতে পারিল না। ইউরোপীয় রাজনীতির অগ্নিগর্ভ সমস্যার দাবীতে আধ্যাত্মিক জীবনের অসম্পূর্ণতা প্রকট হইয়া পড়িল। তিনি শ্যেনদৃষ্টিতে ইহার বিচিত্র গতি অনুধাবন করিতেছিলেন। ধূর্ত্ত মুসোলিনীর মিষ্ট আপ্যায়নে প্রতারিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ফাশিষ্টবাদের দীর্ঘ প্রশস্তি প্রকাশিত হইতে দিলেন। শ্রদ্ধাভাজন রবীন্দ্রনাথের অপ্রীতিভাজন হইবার আশঙ্কা সত্ত্বেও রোলাঁ তাঁহার চোখের ঠুলি খুলিয়া দিয়া ফাশিষ্টবাদের নগ্ন কদাকার উদ্ঘাটিত করিয়া দিতে বিরত হইলেন না। 'বিমুগ্ধ আত্মা' উপন্যাস সিরিজে রোলাঁর এই যুগের মানসিক অভিজ্ঞতাগুলি গল্পাকারে চিত্রিত আছে। জাঁ ক্রিস্তফ-এর যুগের দুর্নিবার আত্মবিশ্বাসের অভাবে এই উপন্যাসগুলি তাহার তুলনায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু শেষ খণ্ড (লা'নোসিয়াত্রিস, ঘোষণাকারিণী) আছে পুত্র মার্ক-এর ফাশিষ্টের গুলিতে অপমৃত্যুর পর মাতা আনেৎ-এর বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন, ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতিশীল জন-শক্তির সমাবেশের উদ্যোগ, দারুণ সংকট মাঝে নব-জীবনের শঙ্খধ্বনি—ইহাই সাহিত্যিক মূল্য রোলাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তির অন্যতম। এ বই যে হিটলার রাষ্ট্রে নিষিদ্ধ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে!

যতদূর জানা যায়, রোলাঁ-র জীবিতকালে শেষ প্রকাশিত পুস্তক হইতেছে, "আমি থামিব না"। ১৯১৯ হইতে শুরু করিয়া পনের বৎসরের পরিভ্রমণের ইতিহাস এই গ্রন্থের বাইশটি প্রবন্ধ, একটি মুখবন্ধ ও একটি উপসংহারে নিবদ্ধ। ইহার অপর নাম, রোলাঁ ইঙ্গিত করিয়াছেন, ষষ্ঠি বর্ষীয়ের ডায়েরী। স্বাভাবিক বিনয়বশে তিনি মুখবন্ধে লিখিতেছেন:—"এই পুস্তকে অত্যাধিকভাবে 'আমি' 'আমি' করা হইয়াছে। কিন্তু যে আমি-র বিবর্ত্তন-কাহিনী এখানে বিবৃত হইল সে কেবল একা আমি নয়, সে আমাদের সমস্ত যুগ। আমাদের

যুগ যে পথে চলিয়াছে, তাহার উদ্যম, তাহার যন্ত্রণা, তাহার বিভ্রম, তাহার অন্ধতা ও তাহার পুনরাবিষ্কৃত আলোক, আমার বিশ্বাস ইহার অনেকাংশ ইহাতে পাওয়া যাইবে।" বস্তুতঃ যে সকল প্রশ্ন আমাদের যুগকে জর্জ্জরিত করিতেছে—যুদ্ধ, শান্তি, সাম্রাজ্যবাদ, ফাশিজম্, কমিউনিজম্—রোলাঁর আলোচনা ইহাদিগকে লইয়াই। সমগ্র মানবজাতির কোটি কোটি বৎসরের অর্জ্জিত সভ্যতা আজ সঙ্কটাপন্ন, মরণাপন্ন, সংরক্ষিত স্বার্থেয় বলদর্পিত রূঢ় অভিযানে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আজ অসহায়। এই সার্ব্বভৌম সংগ্রামে বুদ্ধি-জীবীর কোন পথ নাই নিরপেক্ষ থাকিবার। হাতের কাজ ও মাথার কাজ আজ একই সর্ব্বনাশের সম্মুখীন। কর্ম্মজগত ও ভাবজগত আজ অচ্ছেদ্যভাবে এক। তাঁহার মতে "কমিউনিজম হইতেছে বর্ত্তমানে সামাজিক কর্মপন্থার একটিমাত্র বিশ্বব্যাপী পার্টি যাহা, কোন রফা না করিয়া ও কিছুই গোপন না রাখিয়া, পতাকা বহন করিতেছে এবং বিচারিত ও বীরোচিত ন্যায়পরতার সহিত পর্ব্বতের উচ্চশিখর-বিজয়ের পথে চলিয়াছে।" তাই তিনি নির্দ্দেশ দিতেছেন, "যে শক্তি আজ পৃথিবীকে নূতন করিয়া গড়িতেছে তাহার পক্ষে সক্ষম সৈনিকত্ব করার চেয়ে বড় কাজ মননশীল ব্যক্তির থাকিতে পারে না।" আজন্ম ভাববাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অনুসরণের পর ষাট বছর বয়সে মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বনিয়াদ হইতে ষ্টালিনের এক-নায়কত্ব পর্য্যন্ত অকুণ্ঠ স্বীকরণ—সংস্কার-বিমুক্তির আত্মাভিমান পরিহারের এমন অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ ইতিহাসে বিরল। এই মুক্তির দ্বারে আসিয়া পৌঁছিতে যে অন্তবিহীন পথ রোলাঁকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল তাহার নাটকীয়তাবর্জ্জিত মর্ম্মস্পর্শী কাহিনী অকপট আন্তরিকতার অনাড়ম্বর ঐশ্বর্য্যের সহিত বর্ণিত হইয়া এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। রোলাঁর অন্যান্য রচনার তুলনায় এই বইটি আমাদের দেশে যথেষ্ট প্রচারিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ এটিকে বাদ দিয়া রোলাঁর মহত্ত্ব বিচার এভারেষ্টকে বাদ দিয়া হিমালয়ের উচ্চতা বিচারের মতো নিরর্থক ও হাস্যকর।

এহেন লেখককে হাতে পাইলে হিটলার তাঁহার কি ব্যবস্থা করিবেন অনুমান করা অসম্ভব নয়। ভুবনবিদিত বন্দীনিবাসে রোলাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তিকে বিধ্বস্ত করিবার যে আয়োজন হইয়াছিল তাহা এখন অপ্রকাশিত, কিন্তু তাহার বিফলতা সুপ্রকাশ। সেখান হইতে রোলাঁর শেষ প্রকাশ্য উক্তি সাম্রাজ্যবাদের কারাগার হইতে গান্ধীজীর সসম্মান মুক্তিতে অভিনন্দন। পরাধীন ফ্রান্সের বাণীমূর্তি শৃঙ্খলিত ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমাদের

কথা, ফরাসী জনগণের সমবেত বীরত্বে স্বদেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার তিনি দেখিয়া গেলেন। আক্ষেপের কথা, হিটলারী জার্মানীর উচ্ছেদ তাঁহার অগোচরে রহিয়া গেল, বিশ্বব্যাপী জনমুক্তির গৌরবময় ভবিষ্যৎ তাহার জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতাকে হারাইল।

যে সাহিত্যগুরু জীবন ভরিয়া মৈত্রী-সাধনা করিয়াছেন, বুদ্ধের মতো; সত্যের ব্রতে প্রাণ দিয়েছেন, সোক্রাটিসের মতো—তাঁহাকে প্রণাম।*

* ৬ই জানুয়ারী তারিখে ফাশিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের উদ্যোগে আহূত স্মৃতিসভার প্রদত্ত বক্তৃতার ভিত্তিতে রচিত।

॥ ইয়েট্‌স্‌-এর কবিতা (১৮৬৫-১৯৩৯) ॥

ডবলিউ. বি ইয়েট্‌স্‌ ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির যে ভূমিকা রচনা করেছিলেন, সেটি পড়ে আমরা বেশ বুঝতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের মহান্‌ গীতিকাব্য, প্রতিভা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁর যে অনুরাগ তা' শুধুমাত্র রোদেন্‌ষ্টাইন্‌-এর সংস্পর্শে এসে আকস্মিক ভাবে জাগ্রত হয়নি; জীবনের প্রারম্ভেই নানাভাবে নানারূপে ইয়েট্‌স্‌ ভারতীয় চিন্তাধারার সহিত পরিচিত হন এবং ভারতের সঙ্গে এই যে তাঁর সংযোগ সূত্র স্থাপিত হয়, জীবনের শেষ পর্যন্ত এই সংযোগ অব্যাহত ছিল। তাঁর প্রথম দিকের রচিত গীতিকাব্য 'Crossway' (১৮৮৯)-এর মধ্যে, ভারতীয় বিষয়বস্তু নিয়ে তিনি তিনটি রচনা করেন—অনুসূয়া ও বিজয়া, ঈশ্বর সম্বন্ধে ভারতবাসী (The Indian upon God), এবং প্রেমিকার প্রতি ভারতবাসী (The Indian to his Love)। কুড়ি বৎসর উত্তীর্ণ হবার আগেই এগুলি রচনা করেন এবং তাঁর আখ্যায়িকাকাব্য 'The wandering of Oisin' যার সম্বন্ধে পরে তিনি মন্তব্য করেন যে, "ক্রমশ আমার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে যেন আইরিশ"—সেটিও তখন প্রকাশিত হয়নি। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই যে, ভারতীয় বিষয় নিয়ে তিনি যে নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা করেছেন (অনুসূয়া ও বিজয়া), তার প্রথম দৃশ্যে এই কথাই যেন ফুটে উঠতে

চাইছে যে "দুটি রমণী একটি পুরুষকে ভালবাসে। কিন্তু এই দুই নারীর মধ্যে বিরাজ করছে যেন একটি আত্মা। তাই এক নারী যখন কর্মরতা, অন্য নারী তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তাদের বলা যেতে পারে, একজন যেন দিবা, আর একজন যেন রাত্রি। রোজেস্‌-অন্তরীপের এক ব্যক্তিকে আমি দুটি স্যালমন মাছ বহন করে নিয়ে যেতে দেখি এবং তখনই এই চিন্তাটি আমার মাথায় আসে। 'এক ব্যক্তির দুই আত্মা' কিন্তু আমি বলি যে, না, দুটি মানুষের এক আত্মা।" এই যে ভাব-কল্পনা তাঁর মনে উদয় হয়েছিল, তা' আর বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। তবে ঐ বিপরীতধর্মী দুটি চিন্তাধারা তাঁর মনে পরবর্তী কালেও বিরাজ করতে থাকে—দিন ও রাত্রি, চন্দ্র ও সূর্যরূপে।

বর্তমানে যাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলা হয়—এ সম্পর্কে প্রথম জীবনেই তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ও অনুরক্তি ছিল। এই সূত্রে এক বাঙালীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তিনি হলেন মোহিনী মোহন চ্যাটার্জী—যাকে ইয়েট্‌স্‌ অবিস্মরণীয় করে রেখে গেছেন তাঁর "মোহিনী মোহন চ্যাটার্জী" নামক কবিতায়। ইনি তৎকালীন কলিকাতার বিদগ্ধ সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। পেশার দিক থেকে ইনি ছিলেন কলিকাতায় আইনজীবী। এই লাভজনকবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও তাঁর যে অতুলনীয় কাব্যানুরাগ ছিল তা তুচ্ছ করা যায় না। তিরিশের দশকের শেষ দিকে যে "কবি পরিষদ" গড়ে ওঠে তিনিই ছিলেন তার প্রধান প্রতিষ্ঠাতা। যখন তিনি লণ্ডনে ছিলেন, তখন তিনি একবার ইয়েট্‌স্‌-এর পরিচালিত এক সাহিত্য সমিতির সভ্যদের উৎসাহে, ডাবলিন্‌-এ আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইয়েটস্‌ তখন সেখানে জীবাত্মা সম্বন্ধে গবেষণা ও অজ্ঞেয়বাদ নিয়ে অধ্যয়ন করেছিলেন। চ্যাটার্জী মহাশয়কে সেখানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসার কারণ হল, তিনি নাকি প্রাচ্য-দেশের ব্রাহ্মণ দার্শনিক। বাঙলার বিদ্বৎসমাজে তখন অজ্ঞেয় তত্ত্বের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। ব্রাহ্মণ-দার্শনিক সম্পর্কে ইয়েট্‌স্‌ তাঁর 'Reveries' (১১৩ পৃঃ) পত্রিকাতে লিখেছেন -- দর্শনের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।—তৎক্ষণাৎ আমার মনে হয়েছিল, যে এলোমেলো কল্পনাগুলি যেন কতকটা যুক্তিসিদ্ধ ও সীমাহীন। তিনি আমায় শিখিয়েছিলেন যে সচেতনা শুধু যে বাহিরেই বিস্তৃতি লাভ করে, তা নয়; আমাদের কল্পনা ও চিন্তা-ধারাকেও বিশেষভাবে মহনীয় ও গভীর করে তোলে।" এর কিছুকাল পরে তাঁর "The Winding Stair and other poems" (১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) প্রকাশিত হয়। "মোহিনী মোহন চ্যাটার্জী" কবিতাটিও তার মধ্যে ছিল—

"I asked if I should pray,
But the Brahmin sa d,
'Pray for nothing, say
Every night in bed,
"I have been a slave,
Nor is there anything
Fool, rascal, knave,
That I have not been
And yet upon my breast
A myriad heads have lain.

That he might set at rest
A boy's turbulent days
Mohini Chatterjee
Spoke these, or words like these,
I add in commentary,
'Old lovers yet may have
All that time denied—
Grave is heaped on grave
That they be satisfied—
Over the blackended earth
The old troops parade,
Birth is heaped on birth
That such cannonade
May thunder time away
Birth-hour and death-hour meet
Or, as great sages say,
Men dance on deathless feet."

এটা সহজেই বোঝা যায় ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি এই যে কবিতাটি রচনা করেন, তা প্রকৃতপক্ষে মোহিনী চ্যাটার্জীর সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছিল, তারই

যথাযথ বিবরণ নয়, তবে সে সময়ে জীবন সম্পর্কে তাঁর যে একটি বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গি ছিল তার প্রতীক হিসেবে এটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই পৃথিবীতে মানবের অস্তিত্ব বিষয়ে যে গভীর সমস্যাটিকে ইয়েট্স্ ব্যক্ত করতে চান, তার সেই নিগূঢ় রহস্য প্রকাশে অত্যন্ত সহায়তা করেছে ঐ অপরিচিত বাঙালী নামটি।

ইয়েট্স্ আর একজন বাঙালীর নাম এনে ফেলেছেন ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের রাজ্যে। 'দি অক্স্ফোর্ড বুক অব মডার্ন ভার্স''—১৮৯২-১৯৩৫' সেটি প্রথম ছাপা হয় ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে—ইয়েট্স্-এর দ্বারা সংগৃহীত সুন্দর সংকলন। তার ভূমিকায় ইয়েট্স্ লিখেছেন,—"কবি টেনিসনের মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব থেকে, জীবিত বা মৃত যত উৎকৃষ্ট কবি আছেন, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি তাদের কবিতা যেন এতে সংগৃহীত হয়।" এই সমস্ত 'মহৎ কবিদের' সমাবেশের মধ্যে ইয়েট্স্ এমন তিনজন কবির সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন যাঁরা আসলে ইংরেজ ছিলেন না। তাঁরা হলেন—স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীপুরোহিত স্বামী ও মনোমোহন ঘোষ। প্রথম দুজনকে নিজের কবিতার অনুবাদক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মনোমোহন ঘোষেরই (১৮৭০-১৯২৪) একক বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাঁর কবিতাগুলি মূল ইংরেজী ভাষাতেই লিখিত। সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে ইয়েট্স্-এর মধ্যে যে উদার মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় তা' বরং এ ক্ষেত্রে অজানিত অতিকার্পণ্যেই সীমাবদ্ধ। ৩৭৮টি কবিতার সংকলনের মধ্যে তিনি ঘোষ মহাশয়ের মাত্র ষোলটি ছত্রের একটি কবিতা নিয়েছেন।

Who is it talks of ebony,
Who of the raven's plume ?
The glory of your tressis black
Will yield to neither room

So thick the amerosial dusk of you
Glooms in your locks, soul, sight,
The world itself is swallowed up
In darkness and delight.

Tell me no more that black must be
Light's baffle, colour's loss,
Your tresses shoot into the sun
A richly purple gloss.

It was the sunshine white of you
Which cast that wealth of shade,
There from the burning light of you
The world and I am laid.

ঘোষ মহাশয়ের কাব্যগ্রন্থ "প্রেম ও মরণের গানের" ("Songs of Love and Death") শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে—প্রকাশ করেন অক্সফোর্ডের ব্যাসিল ব্লাকওয়েল। তার দু বছর আগে কলিকাতায় লেখকের মৃত্যু হয় এবং তাঁর স্মরণে গ্রন্থের ভূমিকায় লরেন্স বিনিয়ন যা লিখেছিলেন—সেই কথাই ইয়েটস্ তাঁর "গীতাঞ্জলির" ("Song offerings") ভূমিকায় বলেছেন। বিনিয়ন ও ঘোষ মহাশয় লণ্ডনের সেণ্টপলস্ স্কুলে সহপাঠী ছিলেন। ঘোষ মহাশয় যদিও বিনিয়ন অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর ছাত্র ছিলেন, কিন্তু যেহেতু দুজনেই ছিলেন ক্লাসিক কবিতার ভক্ত সুতরাং এই কাব্যপ্রীতির সূত্রেই দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। "মনোমোহন ঘোষ কোনোদিনই গ্রীণসদের (Greens) ভুলতে পারেন নি, এবং শেষ জীবন পর্যন্ত ইউরোপীয় সাহিত্য ও কাব্যালোচনায় তিনি আনন্দ পেতেন।"

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ঘোষ যখন অক্সফোর্ডের ক্রাইষ্টচার্চের ছাত্র তখন ব্ল্যাক-ওয়েল 'প্রাইমাভেরা' (Primavera), নামে ছোট একটি কাব্যসংকলন প্রকাশ করেন, তাতে যাঁদের লেখা ছিল, তাঁরা হলেন—ষ্টিফেন ফিলিপস্ (Stephen Phillips), মনোমোহন ঘোষ, আর্থার ক্রিপস্ (Arthur Cripps), এবং লরেন্স বিনিয়ন (Laurence Binyon)। পলমল গেজেট-এ (Pall Mall Gazette) অস্কার ওয়াইলড্ (Oscar Wilde)-এর এক অনুকূল সমালোচনা প্রকাশ করেন। তিনি তাতে বিশেষ প্রশংসা করে বলেছিলেন—"সাহিত্যিক প্রতিভা-সম্পন্ন বিদগ্ধ পণ্ডিত এই তরুণ ভারতবাসী, ক্রাইষ্টচার্চকে অনেকখানি সংস্কৃতিসম্পন্ন করে তুলতে সক্ষম হয়েছে।" এ ছাড়াও তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, "আমাদের সাহিত্যে মনোমোহন ঘোষের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে

রইল।" অক্‌স্‌ফোর্ডের পড়াশুনো শেষ করে ঘোষ মহাশয় কিছুকাল লণ্ডনে বসবাস করেন। ঐ সময় তিনি সর্বদাই শিল্পী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন যেমন, লিওনেল জনসন (Lionel Johnson), আর্নেস্ট ডসন (Ernest Dowson)। এ ছাড়া তিনি ইংলণ্ডে যে কোন একটি পদ গ্রহণের জন্যও উৎসুক ছিলেন। যাঁরা ডবলিউ. বি. ইয়েট্‌স্‌-এর "আত্মজীবনী" পড়েছেন, তাঁরা কেউই ভুলতে পারবেন না যে, ঐ সাহিত্যিক মণ্ডলীর সংগে ইয়েট্‌স্‌-এর কত ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ভারতে ফিরে এসে ঘোষ মহাশয়ের মনে হয়েছিল, তিনি যেন নিজের মাতৃভূমিতেই নির্বাসিত। তিনি বিনিয়নকে এক পত্রে লেখেন—"ভারতে যে ইংরেজরা আছেন, তাঁদের সংগে শুধুমাত্র মুখের পরিচয় কিংবা কার্যসূত্রে চেনাশোনা। আর ভারতীয়দের সংগে আমার খাঁটি ইংরেজী ভাবাপন্ন জীবনের সুর মেলাতে পারছি না। আমি তাঁদের কাছে বিজাতীয়।" কিন্তু বিনিয়ন বলেছেন যে, যদিও কোন ভারতীয়ই আমাদের ভাষায় এমন কবিত্বের ছোঁওয়া লাগাতে পারেন নি,—তবুও তিনি ছিলেন ভারতীয়। "আমাদের কাছে তিনি ছিলেন যেন ইংরেজ সংগীতজ্ঞদের সংগীত সভার এক বিশেষ সদস্য। তিনি যেন কিছুটা স্বতন্ত্র, একক কিন্তু প্রতিধ্বনি মাত্র নন। তাঁর কবিতা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কথা হল যে, তা একদিক থেকে যেমন ভারতীয়, আর একদিক থেকে তেমনি ইংরেজও বটে। আমি বুঝতে পারি না যে, ইয়েট্‌স্‌ তাঁর প্রথম দিককার রচিত "লণ্ডন"-এর মত কবিতা কেন লক্ষ্য করেন নি, যাতে এই ধরনের ছত্র দেখা যায়—

> Violets, daisies,
> What is your charm to the passionate
> charm of faces,
> The ravishing reality, this earthliness divine ?

অথবা তাঁর পরবর্তীকালের গীতিকবিতা "শরৎ" (Autumn), যার আরম্ভে বলেছেন—

> By thy wave I linger
> Silent stream !
> Autumn's golden finger
> Paints my dream.

Here, where I sank Lazy
Deep in grass,
No surviving daisy
Tells what was,—
Kingcup blaze of meadow
Cuckoo-call,
It is all a shadow
I recall ?

অথবা আর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে—যেটির একটি বিশেষ আবেদন আছে ইয়েট্স্-এর প্রতীক ব্যবহারের ক্ষেত্রে—তিনি মরণের প্রতীক-রূপে গ্রহণ করেছেন—'শ্বেত ঘোড়ার সওয়ারকে'—

How did I lose you, sweet ?
I hardly know.
Roughly the storm did beat.
Wild winds did blow.
I with my loving arm
Folded you safe from harm
Cloaked from the weather,
How could you dear foot drag ?
Or did my courage sag ?
Heavy our way did lag,
Pacing together...
Come back, dear love, come back !
Hoarsely I cry ;
After that rider black
I peer and sigh ;
After that phantom steed
I strain with anxious heed,
Heartsick and lonely.

Into the storm I peer
Through wet woods moaning drear.
Only the wind I hear;
The rain see only.

॥ ২ ॥

লরেন্স বিনিয়নের মতে কবি হিসাবে মনোমোহন ঘোষ ছিলেন, একদিকে যেমন ভারতীয়, অন্যদিকে তেমনি ইংরেজ। ডবলিউ. বি. ইয়েট্‌স্‌ সম্বন্ধেও জোর দিয়ে বলা চলে, তিনি একদিকে যেমন ছিলেন আইরিশ, অন্যদিকে তেমনি ইংরেজ। বিশেষতঃ তাঁর কাব্যসাধনার প্রথম পর্ব থেকে শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত—এমন কি তার পরেই এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তিনি ডাবলিন সহরে, প্রোটেষ্ট্যান্ট মাতাপিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও বালক বয়সে তিনি লণ্ডনেই থাকতেন কিন্তু ছুটির দিনগুলি তাঁর অতিবাহিত হ'ত—পশ্চিম আয়ার্ল্যাণ্ডের স্লিগো (Sligo) নামক অঞ্চলে। এই বন্য প্রাকৃতিক পরিবেশেই তাঁর মনটি গড়ে ওঠে। সেখানে কৃষক থেকে জমিদার প্রত্যেকেই, সেই পুরোনো জগতের বাসিন্দা—যাদের জীবন লোকসংগীত ও লোকগাথার রসে সমৃদ্ধ। ফলে তাঁর বালক মনটি সর্বদাই পরীর রাজ্যে ঘুরে বেড়াত। তাঁর সমগ্র জীবনটিকেই যেন যাদুমন্ত্রে বশীভূত করে ফেলেছিল যে জন্যে আধুনিক জীবনধারা তাঁর কাছে মনে হত অভব্য। একে যথার্থ জীবনের পথ বলে তাঁর কোনদিনই মনে হয়নি। জীবনের প্রারম্ভেই তিনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে এক দারুণ বিতৃষ্ণা মনে মনে পোষণ করতেন। তাঁর মনে হত এই বিজ্ঞানই মানব জীবন থেকে স্বপ্নের অস্তিত্বকে লুপ্ত করে দিচ্ছে—

Of old the world on dreaming fed :
Grey Truth is now her painted toy ;

তিনি ফরাসী প্রতীকধর্মী লেখকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, বিশেষতঃ ষ্টিফেন ম্যালার্মে'র মতবাদ ও বিশ্বাসকে তিনি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন—

Words alone are certain good.

এই প্রতীকধর্মিতার প্রভাববশতই তিনি কিছুদিনের মধ্যে প্রাচীন আয়ারের

(Eire) পুরা কাহিনীগুলি আবিষ্কার করতে সক্ষম হন। তিনি গোলাপ ফুলকে সময়ের রাস্তা বেয়ে কাছে আনতে আহ্বান করছেন।

The no more blinded by man's fate,
I find under the boughs of love and hate,
In all poor foolish things that live a day,
Eternal beauty wandering on her way,

তিনি স্থির করেন যে, "প্রাচীন আয়ারের পুরা কাহিনী, প্রাচীন রীতিতে গাইবেন।" তাঁর স্বকীয় প্রতীক হিসাবে, তিনি গোলাপকে গ্রহণ করেন—"আমার এক একটি দিন, এক একটি গোলাপ—লাল গোলাপ, গর্বিত গোলাপ, দুঃখিত গোলাপ" তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বলে যে, "তাঁর এই গোলাপের ধারণা, শেলি ও স্পেনসারের 'Intellectual Beauty'-র থেকে ভিন্ন ধরনের। তিনি বলেছেন—আমি মানুষের দুঃখ কষ্টকে দূর থেকে দেখিনি নিজের মন দিয়ে তা অনুভব করেছি। আইরিশদের দুঃখময় জীবনের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে তিনি বলেছেন যে, এই সভ্য জগত পরিত্যাগ করে, চল যাই বনে-জঙ্গলে-জলে—সে যেন মায়াময় রাজ্য। "মানুষের দুঃখ দৈন্যের গভীরতা যে কত, তা মানুষ জানে না।" ইয়েট্‌স্‌-এর তরুণ বয়সে রচিত 'Lake Isle of Innisfree'র মধ্যে একান্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে, ইংলণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ডের মানুষের দুঃখদুর্দশাপূর্ণ জীবন ও মধ্যবিত্ত জীবনের বর্বরতা সম্পর্কে তাঁর সুগভীর ধারণা। এখানে যে তিনি নির্জনতাকে ভালবেসেছেন ও বিজন শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে যে জীবনে গ্রহণ করতে চেয়েছেন, তা' খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। যখন তিনি Innisfree-র ডাক শুনেছেন, তখন কিন্তু তিনি বাস করছেন, মধ্য লণ্ডনের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে। অথচ এই ডাক তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে পেঁৗছেছিল। তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রকাশ দেখি 'Ireland in the Coming Times'এর মধ্যে। তিনি বলেছেন—

Know, that I would accounted be
True brother of a company
That sang, to sweeten Ireland's wrong,
Ballad and story, ran and song,
Nor be I any less of them,……
cast my heart into my rhymes

That you, in the dim coming times,
May know how my heart with them
After the red-rose-bordered hem.

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ইয়েট্‌স্‌-এর বয়স যখন ৪৪ বৎসর তখন তাঁর কাব্যগ্রন্থ "Wind Among The Reeds" প্রকাশিত হয়। যথার্থ সমালোচকদের মতে এটিই হল তাঁর প্রথম দিককার কাব্যধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ। এর মধ্যে তিনি তাঁর নিজের ও প্রিয়তমার দেহে, যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তার জন্যে আক্ষেপ করেছেন এবং জগত লুপ্ত হয়ে যাক—এই কামনাই জানিয়েছেন। "একদিন সে ছিল প্রাণোচ্ছল বালিকা। যার চুলে ছিল আপেল ফুলের অরুণিমা—সে আমার নাম ধরে ডাকত। কিন্তু সেই ঔজ্জ্বল্য কোথায় একদিন হারিয়ে গেল।" কিন্তু কবি সেই সৌন্দর্য অনুসন্ধান থেকে বিরত হননি, এ বিষয়ে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ—

Though I am old with wandering
Through hollow lands and hilly lands,
I will find out where she has gone,
And kiss her lips and take her hands;
And walk among long dappled grass,
And pluck till time and times are done
The silver apples of the moon,
The golden apples of the sun.

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, তাঁর সৌন্দর্য্য-সাধনা যদিও রোমাণ্টিক কিন্তু কোথাও তিনি বিমূর্ত হয়ে ওঠেন নি। তার কারণ হল, তখনকার আয়ার্ল্যাণ্ড উপনিবেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। এইজন্য ঐ কাব্যগ্রন্থের আর একটি গীতি কবিতার নাম আমরা পাই "The Lover tells of the Rose in His heart" এখানে ব্যক্তি বিশেষের প্রেমের সঙ্গে মিলে গেছে শেলির বিশ্বজনীন প্রেম স্বপ্ন। কিন্তু তা উচ্চারিত হয়েছে একক কণ্ঠে, এবং সেটি ইয়েট্‌স্‌-এরই কণ্ঠ। সেখানে আইরিশ সামাজিক জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে সমৃদ্ধ সংহত কল্পনার মাধ্যমে।

All things uncomely and broken, all things
worn out and old,

The cry of a child by the roadway, the creak of a
lumbering cart,
The heavy steps of the ploughman, Splashing
the wintry mould,
Are wronging your image that blossoms a rose
in the deeps of my heart.
The wrong of unshapely things is a wrong too great
to be told;
I hunger to build them anew and sit
on a green knoll apart,
With the earth and the sky and the water,
re-made, like a casket of gold,
For my dreams of your image that blossoms
a rose in the deeps of my heart;

এই মহান গীতি কাব্যটি বস্তুধর্মিতা ও সৌন্দর্যানুভূতির সম্মিলিত প্রকাশ, —এতে সমাজবোধটি প্রতীকের অন্তরালে নিহিত আছে। কবি তাঁর নিজের কাব্য সংকলনে এটিকে কেন যে নির্বাচন করেন নি তা আমার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্যের ও অসীম অনুশোচনার বিষয়। আমি লরেন্স বিনিয়নের কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি পলগ্রেভের অপ্রতিদ্বন্দ্বী কাব্য সঞ্চয়ন—"The Golden Treasury of Modern Lyrics,—এর মধ্যে এটিকে সংযোজন করেছেন।

ইয়েট্স্ তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে জগতকে নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং তিনি যে কবি প্রতিভা নিয়ে আয়ার্ল্যাণ্ডে জন্মগ্রহন করেছিলেন সেজন্য তিনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করতেন। সেখানে জনসাধারণের মধ্যে যে কেলটিক বা আইরিশ রেনেসার আবর্ত সৃষ্টি হয়—তার মধ্যমণি ছিলেন তিনি। এই আন্দোলনের মধ্যে দেখা যায় জাতীয় চেতনার জাগরণ এবং এছাড়া এর সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যও রয়েছে যথেষ্ট। তবে রাজনৈতিক দিক থেকে তখন আয়ার্ল্যাণ্ডে 'হোম-রুল' দাবী করা হচ্ছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এই আন্দোলনের নেতা পার্নেল (Parnell) যে শক্তি ও সাহস

দেখিয়েছেন তার তুলনা মেলে না। পার্নেল ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে অভূতপূর্ব উজ্জ্বল ও সুন্দর ব্যক্তিত্ব নিয়ে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করেন এবং তখন থেকেই তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল 'হোম-রুল' লাভ করা। এর অর্থ হল আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসীরা গ্রেট-বৃটেন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েও আইনসঙ্গত ভাবে শাসন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। এই আন্দোলনে তারা কর্তৃপক্ষকে সর্বভাবে ভীতি প্রদর্শন করে, এমন কি 'বয়কট' অস্ত্রটিও প্রয়োগ করে। বাংলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে আমরা এই অসহযোগ প্রথার সঙ্গে পরিচিত। আমাদের নেতাদের মতো পার্নেলও বার কয়েক কারা-বরণ করেন। কিন্তু তাতে আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখা যায়নি। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে আয়ারর্ল্যাণ্ডে ও ইংলণ্ডে প্রায় গৃহযুদ্ধের উপক্রম হয়। কিন্তু ইংলণ্ডে এই সমস্যাটি নিবারিত হয়, আর একটি ঘোরতর সমস্যার সম্মুখীন হয়ে,—সেটি হল —প্রথম মহাযুদ্ধ। অথচ আয়ার্ল্যাণ্ডে এই দ্বন্দ্ব ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাণ্টদের মধ্যে প্রবল রূপ ধারণ করল এবং ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে, তা কিছুটা গৃহযুদ্ধের আকার গ্রহণ করল। কিন্তু আকস্মিক একটি দুর্ঘটনায় আয়ার্ল্যাণ্ডের ঘটনাটির অসম্মানজনক পরিণতি দেখা দিল। পার্নেল যিনি ছিলেন, জনসাধারণের আদর্শ—হঠাৎ দেখা গেল যে তিনি এক বিবাহিতা মহিলার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত। যেই মাত্র এই অখ্যাতি রটতে আরম্ভ হল অমনি তাঁর যারা অনুসরণকারী, সকলেই তাঁকে পরিত্যাগ করল। জনসাধারণের কাছে তিনি পেলেন ভর্ৎসনা, তারা তাঁকে নির্বাসনে পাঠাল। পার্নেলের এই অপযশ সত্ত্বেও ইয়েট্‌স্‌ বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর মধ্যে রাজনৈতিক নেতাসুলভ মহত্ত্ব নিহিত আছে। তিনি ডাবলিনের সংবাদপত্রগুলির অপপ্রচার ও ডাবলিনের অধিবাসীদের এই ভণ্ডামি ও খেয়ালীপনা দেখে অত্যন্ত রুষ্ট হয়েছিলেন। যাঁকে তারা আদর্শপুরুষ বলে মনে করত, এক মুহূর্তেই তাঁকে তারা পরিত্যাগ করল। ইয়েট্‌স্‌-এর সঙ্গে কিন্তু রাজনীতির কোনই যোগ ছিল না। তিনি ছিলেন কর্মঠ মানুষ। শুধু মাত্র স্বপ্ন-সৃষ্টি নয়—কাজ করতেও তিনি ভালবাসতেন। তিনি ছিলেন সৃজনধর্মী শিল্পী—সাংস্কৃতিক জগতে জাতীয়তা-বোধের সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি আইরিশ লিটারারি থিয়েটার (Irish Literary Theatre) (১৮৯৯) পরবর্তী 'অ্যাবি থিয়েটার' (Abby Theatre) (১৯১০)-এর সক্রিয় প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। এই আইরিশ লিটারারি থিয়েটারে, বর্তমানের প্রখ্যাত নাট্যকার J. M. Synge-এ নাটকের

অভিনয়—এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ynge-কে আবিষ্কার ও অনুপ্রাণিত করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাদেরই প্রাপ্য এ কথা ইয়েট্‌স্‌ বলেছেন। এই জন্যই Synge তাঁর সমস্ত জীবন, আইরিশ সাহিত্য রচনায় উৎসর্গ করেন। এ ছাড়া ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে Maud Gonne-র সহিত ইয়েট্‌স্‌-এর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। বস্তুত ইয়েট্‌স্‌-এর চেষ্টা ও প্রভাবেই তাঁর নাটক সেখানে অভিনীত হয়। Maud Gonne-র রূপের খ্যাতি ছিল, এছাড়াও তিনি বুদ্ধি বৈদগ্ধ্যপূর্ণ, আবেগ সম্পন্না মহিলা ছিলেন ; বহুদিন ধরে তাঁরা এক সঙ্গে কাজ করেছেন। আইরিশ থিয়েটারের জন্যে কিংবা আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাদেশিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক অধিবেশনে তাঁরা এক সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। ইয়েট্‌স্‌-এর কাছে তিনি ছিলেন যেন স্বয়ং সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাঁর কবিতার প্রেরণাদাত্রী। প্রথম দর্শনেই ইয়েট্‌স্‌ তাঁর প্রতি প্রণয়াসক্ত হন এবং পুরোনো দিনের মহৎ আদর্শের অনুবর্তী হয়ে তাঁকে ভালবাসেন। ইয়েট্‌স্‌ কি ভাবে তাঁকে প্রণয় নিবেদন করেছেন, তার দুটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল—

A Poet to his Beloved

I bring you with reverent hands
The books of my numberless dreams,
White woman that passion has warn
As the tide wears the drave-groy sands,
And wits heart marc old than the harn
That is brimmed from the pale fire of time :
With woman with numberless dreams
I bring you my passionate rhyme.

He wishes for the Cloths of Heaven

Had I the heaven's embroidered cloths,
Enwrought with goldcn and sihea light.
The blue and the dim and the Iark cloths
Of night and light and the half-light,
I would spread the cloths under your feet ;
But I being poor, have only my dreams ;

I have spread my dreams under your feet ;
Tread softly because you tread on my dreams.

তবুও তিনি ইয়েট্স্কে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি একজন আইরিশ জাতীয় নেতা জন ম্যাক্ ব্রাইডকে (John Mac Bride) বিবাহ করেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যতদিন না ইয়েট্স্-এর বিবাহ হয়েছিল, ততদিন ইনিই ছিলেন, ইয়েট্স্-এর জীবনে প্রধান নারী। একজন সুদক্ষ সমালোচক এন্থনি থোয়াইট (Anthony Thwaite) বলেছেন, "হয়তো তারও পরে—কে বলতে পারে।" তিনি আরও বলেছেন যে, "এই মহিলাকে দেখবার পর থেকে ইয়েট্স্ হয়ে উঠলেন এক জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা এবং রাজনৈতিক বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে লাগলেন। কিন্তু এই মানসিক বিবর্তনের জন্য তিনি তাঁকে বা ম্যাকব্রাইড্কে—কাউকেই দায়ী করলেন না। তিনি নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করলেন। নিজের ভীরুতা ও সারল্যের জন্যই রাজনৈতিক বিষয়টি, তাঁর কাছে বোধগম্য বলে মনে হত না।"

বাস্তবিক পক্ষে এ সত্যটি কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, ইয়েট্স্-এর পাণ্ডিত্য ও আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রতি সুগভীর ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও, তিনি রাজনীতির কিছুই বুঝতেন না। তাঁর রাজনীতি বিষয়ক চৈতন্য সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যায় যে, স্বদেশ প্রেমিকের ব্যর্থ আবেগ এবং যে নারীকে আবেগাত্মক প্রেমের কাব্যসুন্দরী বলে তিনি গণ্য করতেন সেই আবেগের বিমিশ্রিত চেতনা। তাঁর ১৯০৪ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত কবিতা, সংগৃহীত হয়েছে তাঁর "In the Seven Woods" (১৯০৪)-এ। তাঁর 'The Green Helmet and Other Poems' (১৯১০) এবং 'Responsibilities-এর মধ্যে ভ্রম-নিরসন ও প্রায়শ্চিত্ত লাভের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সংগৃহীত কবিতাগুলি—"Never Give All the Heart", "O Do Not Love Too Long"—ইত্যাদি ; এদের নামকরণেই কবির আত্মবিলাপ প্রকাশ পাচ্ছে। তাঁর "Green Helmet" কাব্যগ্রন্থের "No Second Troy" কবিতায় কবি প্রশ্ন করেছেন, "আমি তাকে কেন দোষারোপ করব যে, সে আমার দিনগুলি দারুণ অশান্তিতে ভরিয়ে তুলেছে" ; Brown Penny" কবিতায় তিনি ঘোষণা করেছেন যে, "প্রেম বড় জটিল বিষয়। এমন বিজ্ঞ কেউ নেই, যে এর প্রকৃত মর্মটি উপলব্ধি করতে পারে।" ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর "Responsibilities" কাব্য সংগ্রহটি আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

যার মধ্যে তিনি প্রাচীন নাটক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন—"স্বপ্নের মধ্যেই আমাদের কর্তব্যের আরম্ভ" এর মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর প্রথম জীবনের স্বপ্নাবিষ্ট দৃষ্টির যে পরিবর্তন ঘটল, তাই বোঝাতে চেয়েছেন এবং এই স্বপ্ন দিয়েই আরম্ভ, পরিণতি নয়, এই কথাই বলতে চেয়েছেন। তারপর তিনি তাঁর খেদোক্তি প্রকাশ করেছেন—

Pardon that for a barren passion's pare,
Althongh I have come close on fortynine,
I have no child, I have nothing but a book,
Nothing but that to prove your blood and mine.

"September 1913" কবিতায় নিয়তির কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন এবং আক্ষেপ করেছেন—

Romantic Ireland's dead and gone
It's with O' Leary in the grave.

তাঁর কবিতার অনুকরণকারীদের তিনি কঠোর ভাবে ব্যঙ্গ করে বলেছেন—

I made my song a coat
Covered with embroideries
Out of old mythologies
From heel to throat ;
But the fools caught it,
Wore it in the world's eyes
As through they'd wrought.
Song, let them take it,
For there's more enterprise
In walking naked.

তাঁর হৃদয় ঘটিত ব্যাপারে তিনি এত বেশি আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং স্বদেশের বিষয়েও তিনি যথেষ্ট নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন, যে জন্যে তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি যে, বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন এবং তার ফল স্বরূপ পৃথিবী-ব্যাপী সমস্ত দেশের একটা সামাজিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কবিতা রচনা করিতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় তিনি লিখেছিলেন—

I think it better that in times like these
A poet's mouth be silent, for in truth
We have no gift to set a statesman righ t;
He has had enough of meddling who can please
A young girl in the violence of her youth,
Or an old man upon a winter's night.

॥ ৪ ॥

তাঁর " The Wild Swans at Coob" কাব্য গ্রন্থের কবিতাগুলি রচিত হয় ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ও প্রকাশিত হয় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে, এর থেকেই শেষ উদ্ধৃতিটি গ্রহণ· করা হয়েছে। সাধারণ ভাবে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দটিকে সাহিত্য সমালোচকরা—নতুন ইয়েট্স্, 'আধুনিক ইয়েট্স্, ভবিষ্যৎ বক্তা ইয়েট্স্'-এর আবির্ভাবের বৎসর বলে গণ্য করেছেন। ·The Wıld Swan' এই নামকরণের মধ্যে দিয়েই ব্যক্ত হয়েছে এর মর্মকথা—এর মধ্যে জড়িত আছে আইরিশদের স্বপ্ন ও স্মৃতি, এ ছাড়া জড়তা এবং ভুল-ভ্রান্তির ছাপাও রয়েছে। আয়ার্ল্যান্ডে গৃহযুদ্ধের সময় তিনি যে বাস্তবের সম্মুখীন হয়েছিলেন তার ফলে তাঁর পূর্বের যে ধারণা "সকল স্বপ্নই সত্যে রূপায়িত হয়—সেই অবাস্তব ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তাঁর সেই স্বপ্ন, এখন "ভগ্ন আশায়" (Broken Dreams) পরিণতি, এটি হল তাঁর প্রথম জীবনে Maud Gonne-র প্রতি যে গভীর আবেগ তারই সম্বন্ধে রচিত চমৎকার একটি কবিতা। কিন্তু হায়, সেও জরাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে—

"There is grey in your hair.
Young man no longer suddenly catch thin breath
When you are passing.

কবির মনে সে এখন পুরোনো দিনের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে—

The last stroke of midnight dies,
All day in the one chair
From dream to drem ond rhyme to rhyme
I have ranged
In rambling talk with an image of air :
Vague memories, nothing but memories.

কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, এখানে বাণী ভঙ্গি পরিবর্তিত আকারে দেখা দিয়েছে পূর্বের সে কমনীয়তা ও আবেগোচ্ছ্বাসের পরিবর্তে দেখা দিয়েছে, সংযত সংহত বাহুল্য বর্জিত প্রকাশন যাকে ইয়েট্স্ একদিন জানতেন সেই ধূসর রঙের Connemara কাপড়ে আচ্ছাদিত ধীবর সে তাঁর কাছে—"এক সময় মানুষ ছিল—এখন সে স্বপ্নে রূপান্তরিত" তাই কবি প্রতিজ্ঞা করেছেন—

"Before I am old,
I shall have written him one
Poem may be as cold
And passionate as the dawn."

পরে আমরা দেখি যে, ইয়েট্স্ তাঁর সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছিলেন। তাঁর সেই ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত গ্রন্থ হল—"The Tower (১৯২৮) এবং "The Winding Stair" (১৯৩৩); পরবর্তী জীবনে এগুলিই তাঁর উল্লেখ-যোগ্য সৃষ্টি।

॥ ৫ ॥

প্রকৃতপক্ষে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দটি শুধু ইয়েট্স্-এর জীবনেই নয়, সমগ্র জাতের সচেতন ব্যক্তির মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন ধারায় এক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই সোভিয়েত ইউনিয়নের আবির্ভাব ঘটল এবং তার যে অভিনব মতবাদ তা ঐতিহাসিক জগতে জাগিয়ে তুলল একটা আলোড়ন। তৎকালীন জননেতারা যে মত পোষণ করতেন, তাঁদের সেই ধারণার বিরুদ্ধে, সেই প্রচলিত মতবাদকে অস্বীকার করে সে যেন এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা আহ্বান করল। তখন সমগ্র জগতে জনগণের ভাগ্য এক সংকটজনক অবস্থায়। এই সমস্যা এত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ যে কেউই এ বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারেনি। প্রত্যেকেরই কোন মতবাদ গ্রহণ করবে এ বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণের আবশ্যকতা হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ লেখক তাঁদের হতাশাপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করেছেন। টমাস হার্ডি, যিনি তখন অশীতিপর বৃদ্ধ, তিনি ১৯২২ খৃষ্টাব্দে যে গীতিকাব্য প্রকাশ করেন, তার ভূমিকায় বিষণ্ণ সুরে বলেছেন—"মানুষের মন অগ্রগতির পথে না গিয়ে বরং

পিছিয়েই পড়ছে।" বিজ্ঞানের বিজয়দৃপ্ত অগ্রগতির সমর্থক, বলিষ্ঠ লেখক এইচ. জি. ওয়েল্‌স্‌—তিনি চললেন ক্রেমলিন প্রাসাদের রহস্যাচ্ছাদিত সেই ব্যক্তিটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সাক্ষাতের পর তিনি ঘোষণা করেন যে,—লেনিন তাঁর স্বপ্নময়ী বিরাট পরিকল্পনাকে যে তড়িৎগতিতে রূপদান করতে চান—সেটি একটি উন্মাদনাপূর্ণ অদ্ভুত পরিকল্পনা বিশেষ। তিনি বলেন যে, রাশিয়া চিরকালই রহস্যাচ্ছাদিত হয়ে থাকবে। ই. এম. ফস্টার (E. M. Foster) শিল্পীসুলভ আন্তরিকতার সুরে তাঁর পরিণত উপন্যাস 'এ প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' (A Passage to India)-তে এই আশা ও ভরসা প্রকাশ করেছেন যে, সভ্য জগৎ একদিন একসূত্রে গ্রথিত হতে পারে বটে কিন্তু মানুষের মধ্যে শ্রেণীগত বিভেদ লোপ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু তিরিশের দশকে তিনি তাঁর প্রবন্ধের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে, "যদি তিনি আরও দীর্ঘজীবী হতেন ও যৌবনের উদ্দীপনাপূর্ণ শক্তি লাভ করতে পারতেন, তা হলে হয়তো কম্যুনিস্টদের মত ও পথকে জীবনে গ্রহণ ও স্বীকার করে নিতেন" (ডাঃ, এ, সি, কলিন্স, বিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস)। সুতরাং ডবলিউ. বি ইয়েট্‌স্‌-এর কাছে এটি কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়, কারণ তিনি মানবজগতের জটিলতা সম্বন্ধে কোনদিনই বিশেষ চিন্তা করেন নি—তাই তিনি "The Second Coming" কবিতায় এই বর্বর যুগের রক্তাক্ত হিংস্র ও বিশৃঙ্খল জীবনকে দেখেছেন—

Things fall apart ; the centre cannot hold ;
Mere anarchy is loosed upon the world,···
...Somewhere in sands of the desert
A shape with lion body and the head of a man,
A gaze blank and pitiless as the sun,
Is moving its slow thighs, while all about it
Reel shadows of the indignant desert birds.
The darkness drops again ; but now I know
That twenty centuries of stony sleep
Were vexed to nightmare by a rocking cradle,
And what rough beast, its hour come at last,
Slouches towards Bethlehem to be born ?

যদিও এই "দানবশাসিত" জীবনের ভয়ংকরতা তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে—কিন্তু তবুও তিনি হতাশায় ভেঙে পড়েন নি। এই কবিতার গভীর অর্থ তর্কাতীত নয়, কিন্তু ইয়েট্‌স্‌ নিজে এ সম্বন্ধে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের এক পত্রে কিছু লিখেছিলেন, তার থেকেই তাঁর মতটি প্রমাণিত হচ্ছে এই যে, "কম্যুনিষ্ট, ফ্যাসিষ্ট, জাতীয়তাবাদী, যাজক ও নাস্তিক সম্প্রদায় সকলেই এই ধ্বংসের জন্য দায়ী। আমিও নীরব ছিলাম না। আমার একমাত্র বাহন কবিতার মধ্যে দিয়ে আমি বলেছি। আমার কবিতা যদি তোমার কাছে থাকে—তাহলে খুলে দেখ, আমার 'The Second Coming' কবিতাটি। এটি অন্ততঃ ষোল কি সতের বৎসর পূর্বে রচিত এবং যা ঘটবে—তার সম্বন্ধে এতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।" এই মন্তব্য দেখলে কি বোঝা যায় না যে ইয়েট্‌স্‌-এর "সমসাময়িককালে কিভাবে অতীতের সঙ্গে আবদ্ধ, তার সম্বন্ধে একটা সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল?" (গ্রাহাম মার্টিন, লণ্ডন বিশ্ব-বিদ্যালয়)। এই কারণে সেই দুর্দিনেও বিপর্যস্ত ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁকে হতাশ করতে পারে নি। তাই আনন্দ ও আবেগ সহকারে তিনি একক মনের শক্তি প্রকাশ করে বলেছেন—

"It is time that I wrote my will;
I choose upstanding men
That climb the streams until
The fountain leap, and at dawn
Drop their cast at the side
Of dripping stone: I declare
They shall inherit my pride,
The pride of people that were
Bound neither to cause nor to state
Neither to slaves that were spat on,
Nor to the tyrants that spat."

এই ছত্রগুলি তাঁর "Tower" কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীকালে যে পরিচ্ছন্ন রচনাভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়—এতেও তাঁর সেই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইয়েট্‌স্‌-এর পরবর্তী জীবনের রচনাগুলি কিন্তু নিঃসন্দেহে দুর্বোধ্য রচনা। স্পষ্টতা থেকে অস্পষ্টতায় যেতে তাঁর খুব বেশি সময় লাগে

নি। এটিকে ঠিক বলা যেতে পারে 'পিচ্ছিল পদক্ষেপ'। তাঁর সুনিপুণ রচনা পড়তে পড়তে, পাঠকের আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে বুঝি বেশ সহজ সরল কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাবে যে, এই সরলতার অন্তরালে রয়েছে গভীর পাণ্ডিত্য ও মাঝে মাঝে অজানা অচেনা ইতিহাস ও পুরাণ কথার উল্লেখ। তাঁর মানসিক সহযোগিতার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে—তাঁর স্ত্রী আইরিশ পুরাণ কথা সংগ্রহ করেছিলেন সেটাই হল এই সমস্ত পুরাণ কথার ভিত্তি। একদিকে যেমন সমসাময়িক লোকপ্রিয় জ্যোতিষবিদ্যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল, অন্যদিকে তেমনি ছিল Oswald Spengler's-এর 'Decline of the West'। এর মধ্যে চন্দ্রের আঠাশটি অবস্থার বর্ণনা করা হয়েছে, যার সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সভ্যতার ইতিহাস জড়িত - এইভাবেই বৃত্তটি পূর্ণতা লাভ করেছে—

And I declare my faith :
I mock Platinus' thought
And cry on Plato's teeth,
Death and life were not
Till man made up the whole,
Made lock and stock and barrel
Out of his bitter soul,
Age, sun and moon and star, all
And further add to that
That, being dead we rise,
Dream and so create
Translunar Paradise.

এখানেও সেই "Tower" কবিতার মতই দেখা যায়, একই নির্মল অন্তরীক্ষ লোকের বর্ণনা, যা সাধারণ লোকের ধারণার বাইরে। "The Winding Stair" কবিতায় ইয়েট্‌স্‌ স্পষ্টই বলেছেন—

I declare this tower is my symbol ;
I declare
This winding, gyring, spiring treadmill
of a stair is my ancestral stair ;

That Goldsmith and the Dean, Berkeley and Burke
have travelled there.

যে কেউ অনায়াসেই প্রশ্ন তুলতে পারে যে, এই সমস্ত প্রসিদ্ধ নামগুলির মধ্যে একমাত্র সবলেই আইরিশ ব্যতীত অন্য বৈশিষ্ট্যই বা কি! কিন্তু এই এই ধরনের ছত্রের পূর্বের ছত্রগুলিও কম রহস্যপূর্ণ নয়—

Alexandria's was a barren tower, Babylon's
An image of the moving heaven's a log-book
of the sun's Journey and the moon's.
And Shelley had his towers, thought's crowned
powers he called them once.

তাঁর উল্লেখযোগ্য সনেট কবিতা 'Leda and the Swan' সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি যে, এটি সোজাসুজি পড়ে উপভোগ করবার জন্য নয়—এটি হল মহামহিম হংসের সঙ্গে মানবকন্যার যৌন সম্বন্ধ বিষয়ক কবিতা। আমরা দেখতে পাই যে ইয়েট্‌স্‌ প্রাচীন ও খ্রীষ্টীয় পাশ্চাত্য ইতিহাসের প্রত্যেক কালচক্রের আরম্ভে ভগবানের মরণশীল সন্তান নারীর ধারণাকে পক্ষীর ছদ্মবেশে প্রকাশ করেছেন। এই সাদৃশ্য হল লেডা (Leda) ও ভার্জিন মেরী, যিশু ও ভগবান, হংস ও ঘুঘুপক্ষী এবং ট্রয়ের হেলেন ও যিশুখৃষ্ট। এখানে ইয়েট্‌স্‌ তাঁর পছন্দসই প্রতীক দুর্গের (Tower) সম্বন্ধে বলেছেন—"আমি এই গ্রন্থে এবং অন্যত্র যে দুর্গের কথা বলেছি, বিশেষত যেখানে একটি দুর্গের কথা আছে সেখানে সেটি প্রতীক বিশেষ। এবং ঘুরপাক দেওয়া সিঁড়ির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে দর্শনশাস্ত্রের জটিলতার, কিন্তু কিভাবে এই চিন্তা ও তার প্রকাশ তাঁর মনে এল তা ব্যাখ্যা করে বোঝাবার প্রয়োজন নেই। শেলি যেখানেই দুর্গের উল্লেখ করেছেন সেখানে তিনি প্রতীক রূপেই সেটি ব্যবহার করেছেন। Swedenborg ঘুরোনো সিঁড়ির কথা বলেছেন ; Tomas Aquinus ইত্যাদি অনেক লেখকই বলেছেন।" ইয়েট্‌স্‌-এর দার্শনিক চিন্তাপ্রধান কবিতা "A dialogue of self and soul"— সেটি পড়লে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ইয়েট্‌স্‌ সাধারণ পাঠকদের কাছে তাঁর কবিতা সুবোধ্য হল কি না—সে বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ করতেন না। ঐ কবিতায় "My Soul'-এর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

For intellect no longer knows
Is from the *ought*, or *knower* from the *known* ;

কিংবা Byzantium কবিতায় বলেছেন—

I hail the superhuman ;
I call it death-in-life and life-in-death.

কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি কবিতার মধ্যে নিজস্ব মতবাদ প্রকাশ করেছেন—এ কথা অস্বীকার করতে পারেন নি—

Only an aching heart
Conceives a changeless work of art,

তাই আমরা তাঁর পরবর্তী কালের রচিত 'Crazy Jane' নামক সাতটি ক্ষুদ্রাবয়ব গীতিকাব্যের সমষ্টি পাই। এই কবিতার মধ্যে তিনি নিজের মনকে সম্পূর্ণ মেলে ধরেছেন। ক্রেজি জেন (Crazy Jane) হল এক মাথা পাগলা বৃদ্ধা—সে সর্বদাই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার বিষয়ে গান গাইত—যৌবনে জ্যাক্-এর সঙ্গে তার প্রণয় ঘটনা, একজন শ্রমিক এবং বিশপের দ্বারা তাদের বিচ্ছেদ। একজন সমালোচক সংক্ষেপে বলেছেন যে—"সে হল ইয়েটস্-এর কিং-লিয়ার এবং ফুট এর একত্র সম্মিলন। তার মধ্যে দিয়ে তিনি সর্বজন-সমক্ষে তাঁর মতবাদ সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন।"

ইয়েট্স্-এর পঞ্চাশ বৎসর ব্যাপী সৃষ্টিশীল জীবনে, তিনি কখনও স্বপ্নচারী থেকে দেশপ্রেমিকে পরিণত হয়েছেন—কখনও বা দেশপ্রেমিক থেকে পরিণত হয়েছেন দার্শনিকে। সারাজীবন তিনি ভাবকল্পনা ও আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। ইয়েট্স্-এর জীবন দর্শন বলতে যা বোঝা যায় তা তাঁর কাব্যে ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। তার সঙ্গে মিলেমিশে আছে সরলতা উদাসীনতা, রহস্যময়তা এবং Auden যাকে বলেছেন—মূঢ়তা।

—তোমার দান চিরকাল বেঁচে থাকবে কিন্তু তুমি আমাদের মতোই নির্বোধ।

চিন্তার দ্বন্দ্ব ও আবেগবাহুল্যের জন্য তিনি নিজের কাছেই নিজে ছিলেন এক রহস্য বিশেষ। তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের এই রহস্যই প্রকাশ পেয়েছে—১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে Drumcliffe-এর সমাধিক্ষেত্রের আত্মস্মারক কবিতাতে—

"Cast a cold eye
On life, on death,
Horseman, pass by :"

["বিশ্বভারতী কোয়ার্টার্লি" থেকে গৃহীত ও মূল ইংরেজী থেকে বাংলায় অধ্যাপিকা মঞ্জুশ্রী সিংহ কর্তৃক অনূদিত।]

রবীন্দ্রনাথ ও নন্দনতত্ত্ব

'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছিলেন ১৩৩৯ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত 'আধুনিক কাব্য' নামক প্রবন্ধে এবং তখন ইহার দ্যোতনাকে সুস্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন যে বিদেশীয় শব্দের ইহা প্রতিশব্দ-Aesthetics—তাহাকে বন্ধনীর মধ্যে স্থাপনের। 'নন্দনতত্ত্ব' ও 'এস্থেটিকস' মূলগতভাবে সমার্থক কি না, এই দার্শনিক বিচারের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু কাব্য-সাহিত্যের বিচারে যাহাকে বলা যাইতে পারে এস্থেটিক দৃষ্টিভঙ্গী তাহার প্রয়োগ চলিয়া আসিতেছে অতি প্রাচীনকালে হইতেই। কারণ, কাব্য-সাহিত্যের বিচারে বহিরঙ্গ স্তর ভেদ করিয়া গভীরতর স্তরে উপনীত হইলেই এমন সব প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হয় যাহাদের বিস্তার সাহিত্যের চেয়ে ব্যাপকতর। যেমন, রস কাহাকে বলে, সৌন্দর্য কাহাকে বলে, ললিতকলা কাহাকে বলে, ইত্যাদি। এই সকল প্রশ্নের সামগ্রিক বিচারের উদ্দেশ্যে ইওরোপে প্রধানত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দর্শনশাস্ত্রের একটি বিশেষ বিভাগের উদ্ভব হয়, যাহার নাম 'এস্থেটিকস'—। চিত্র, সংগীত, নৃত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পকলার-ও বিচার ইহার অন্তর্ভুক্ত। 'নন্দনতত্ত্ব' শব্দটিকে এই বিশিষ্ট অর্থে বোঝাই ছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘজীবনব্যাপী সৃষ্টিশীলতা যে সাহিত্যের গণনাতীত প্রকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, সংগীত, চিত্র ও নৃত্যছন্দ প্রভৃতিতেও

যে তাঁহার নব নব অবদান পুঞ্জীভূত হইয়া আছে—ইহা আজ বিশ্ববিদিত। তাঁহার এই পরমবিস্ময়কর বহুমুখিনতা সত্ত্বেও ইহাও অস্বীকার করা যায় না যাহা তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন তাঁহার জীবনের 'বিদায়কালে'—"একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।" নানাবিধ শিল্পকলার সহিত যে প্রত্যক্ষ পরিচয় রবীন্দ্রনাথের ছিল বিশ্বমানবের ইতিহাসে তাহার তুলনা অতি বিরল। তবুও তাঁহার আলোচনা-ভিত্তিক রচনা সম্ভারের অধ্যয়নে দেখা যায় নন্দনতাত্ত্বিক চরিত্রের প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যিক সমস্যার বিশ্লেষণেই তাঁহার চিত্ত ছিল উন্মুখ ও লেখনী স্বচ্ছন্দগতি। বর্তমান প্রবন্ধে তাই স্বাভাবিকভাবেই সাহিত্য-বিচারের মাধ্যমে সৌন্দর্যসৃষ্টির সমস্যা প্রাধান্য পাইবে।

নন্দনতত্ত্বের ইতিহাসে ইহা সুস্পষ্ট যে অন্তত প্রাক্-আধুনিক যুগে যাঁহারা তাত্ত্বিক হিসাবে আচার্যস্থানীয়, যেমন ভরত ও আরিস্টোটল, হেগেল ও অভিনবগুপ্ত, শিল্পসৃষ্টির ইতিহাসে তাঁহাদের স্থান নাই। অন্যদিকে মহৎশিল্পী হিসাবে যাঁহাদের আসন বিশ্বপূজ্য, যেমন কালিদাস ও চণ্ডীদাস, দান্তে ও শেক্স্পীয়র, তাঁহাদের শিল্পতাত্ত্বিক মতামত প্রায় অজ্ঞাত, মূলত অনুমানসাপেক্ষ। উভয় ক্ষেত্রে কীর্তিমান ব্যক্তিদের আবির্ভাব দেখা যায় আধুনিক যুগেই। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরই অন্যতম। কাব্যে সৌন্দর্যসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নন্দনতাত্ত্বিক নানা প্রশ্ন তাঁহার চেতনায় নাড়া দিয়াছিল ও তিনি এই সম্পর্কে নানাবিধ অধ্যয়নেও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে রচিত হয় প্রায় ৬৫ বৎসর আগে, অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি কবিতা যাহাকে নন্দনতত্ত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের ভূমিকারূপে ব্যবহার করা যায়। কবিতাটির উপাধি 'পূর্ণিমা', ১৩০২ সালের ১৬ই অগ্রহায়ণ, এক পূর্ণিমার রাত্রিতে রচিত, এবং 'চিত্রা'-য় সংকলিত। আশঙ্কা হয়, কবিতাটি 'সঞ্চয়িতা'-র অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় তাহার প্রাপ্য প্রসিদ্ধি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তাই সেটিকে এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা গেল।

"পড়িতেছিলাম গ্রন্থ বসিয়া একেলা
সঙ্গীহীন প্রবাসের শূন্য সন্ধ্যাবেলা
করিবারে পরিপূর্ণ। পণ্ডিতের লেখা
সমালোচনার তত্ত্ব; পড়ে হয় শেখা
সৌন্দর্য কাহাকে বলে—আছে কি কি বীজ

কবিত্ব কলায় ; শেলি, গেটে, কোলরিজ
কার কোন্ শ্রেণী। পড়ি পড়ি বহুক্ষণ
তাপিয়া উঠিল শির, শ্রান্ত হলো মন,
মনে হোলো সব মিথ্যা, কবিত্ব কল্পনা
সৌন্দর্য সুরুচি রস সকলি জল্পনা
লিপি-বণিকের ; অন্ধ গ্রন্থকীটগণ
বহু বর্ষ ধরি শুধু করিছে রচন
শব্দ মরীচিকা জাল, আকাশের পরে
অকর্ম আলস্যাবেশে দুলিবার তরে
দীর্ঘরাত্রিদিন।

অবশেষে শ্রান্তি মানি
তন্দ্রাতুর চোখে, বন্ধ করি গ্রন্থখানি
ঘড়িতে দেখিনু চাহি দ্বিপ্রহর রাতি,
চমকি আসন ছাড়ি নিবাইনু বাতি।
যেমনি নিবিল আলো, উচ্ছ্বসিত স্রোতে
মুক্তদ্বারে, বাতায়নে চতুর্দিক হতে
চকিতে পড়িল বক্ষে কক্ষে চক্ষে আসি
ত্রিভুবন বিপ্লাবিনী মৌন সুধা হাসি।
হে সুন্দরী, হে প্রেয়সী, হে পূর্ণ পূর্ণিমা,
অনন্তের অন্তর-শায়িনী। নাহি সীমা
তব রহস্যের। এ কী মিষ্ট পরিহাসে
সংশয়ীর শুষ্ক চিত্ত সৌন্দর্য উচ্ছ্বাসে
মুহূর্তে ডুবালে। কখন দুয়ারে এসে
মুখখানি বাড়ায়ে, অভিসারিকার বেশে
আছিলে দাঁড়ায়ে, এক প্রান্তে, সুররানী,
সুদূর নক্ষত্র হতে সাথে করে আনি
বিশ্বভরা নীরবতা। আমি গৃহকোণে
তর্কজাল বিজড়িত ঘন বাক্যবনে
শুষ্কপত্রপরিকীর্ণ অক্ষরের পথে
একাকী ভ্রমিতেছিনু শূন্য মনোরথে,

তোমারি সন্ধানে। উদ্‌ভ্রান্ত এ ভকতেরে
এতক্ষণ ঘুরাইলে ছলনার ফেরে।
কি জানি কেমন করে লুকায়ে দাঁড়ালে
একটি ক্ষণিক ক্ষুদ্র দীপের আড়ালে
হে বিশ্বব্যাপিনী লক্ষ্মী। মুগ্ধ কর্ণপুটে
গ্রন্থ হতে গুটিকত বৃথা বাক্য উঠে
আচ্ছন্ন করিয়াছিল কেমনে না জানি
লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌন বাণী।"

এই কবিতাটি হইতে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় ইওরোপীয় রোমাণ্টিক যুগের নন্দনতত্ত্ব বিরূপ আগ্রহের সহিত রবীন্দ্রনাথ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে কবি রবীন্দ্রনাথের মতে প্রত্যক্ষ অনুভূতির অভাবে সমালোচনার তত্ত্ব সর্বৈব বৃথা।

অথচ দেখা যায়, একা রবীন্দ্রনাথ নন, শেলি-গেটে-কোলরিজ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিরাও বহু অমূল্য সময় অপচয় করিয়াছেন এই পথে। কিন্তু সত্যই কি "অপচয়"? সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে সৃষ্টি ও বিচার কি প্রকৃতই পরস্পরবিরোধী? মূল্যজ্ঞানের, বিচারবোধের অভাবে কি মহৎশিল্পের সৃষ্টি সম্ভব? অপর দিকে, অনুভূতির ব্যাপকতার ভাবাবেগের গভীরতার অভাবে কি সমালোচনা ব্যক্তিগত মতামতের সংকীর্ণ সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে? তাই মনে হয়, যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি, রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রকৃত কবিতার উৎস, প্রকৃত নন্দনতত্ত্বের উৎসও তাহাই। শিল্পকর্মের সৃষ্টি ও শিল্পতত্ত্বের বিচার—অন্তরের গভীরে প্রোথিত একই মূল হইতে ইহারা উদ্ভূত; পার্থক্য আসে পরে, একই কাণ্ড হইতে বিস্তৃত ভিন্নমুখ বৃহৎ বৃহৎ শাখার মতো।

নন্দনতত্ত্বের একটি প্রধান ধারার মূল বক্তব্য এইরূপ: শিল্পসৃষ্টিতে শিল্পীর প্রধান উদ্দেশ্য আত্মপ্রকাশ। শিল্পী যাহা আপন অন্তরে উপলব্ধি করেন, আপন শিল্পপ্রতিভায় তাহাকে রূপ দিয়া আপনার বাহিরে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই রূপেন-কর্মেই তাঁহার চরম আনন্দ, চরম সার্থকতা। রবীন্দ্রচনার অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই জানেন, এইরূপ মতের সমর্থনে নানা উক্তি তাঁহার সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাবলীর যত্রতত্র ছড়ানো আছে। কেবল প্রয়োজনের তাগিদে এখানে সেগুলির কয়েকটি উদ্‌ধৃত হইতেছে।

"আমি আছি এক, বাইরে আছে বহু। এই বহু আমার চেতনাকে বিচিত্র

করে তুলছে, আপনাকে নানা কিছুর মধ্যে জানছি নানা ভাবে। এই বৈচিত্র্যের দ্বারা আমার আত্মবোধ সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। বাইরের অবস্থা একঘেয়ে হলে মানুষকে মন-মরা করে।

শাস্ত্রে আছে, এক বললেন, বহু হব, নানার মধ্যে এক আপন ঐক্য উপলব্ধি করতে চাইলেন। একেই বলে সৃষ্টি। আমাতে যে এক আছে সেও নিজেকে বহুর মধ্যে পেতে চায়, উপলব্ধির ঐশ্বর্য তার সেই বহুলত্বে। আমাদের চৈতন্যে নিরন্তর প্রবাহিত হচ্ছে বহুর ধারা. রূপে রসে নানা ঘটনার তরঙ্গে; তারি প্রতিঘাতে স্পষ্ট করে তুলছে 'আমি আছি' এই বোধ। আপনার কাছে আপনার প্রকাশের এই স্পষ্টতাতেই আনন্দ। অস্পষ্টতাতেই অবসাদ।

বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়। আর যে রস সে অহেতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ আকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার কাঠি-ছোঁয়া সামগ্রীকে জাগ্রত করে জানে আপনারই সত্তায়। তাই সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ-দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে বলে জানি নে।" (সাহিত্যতত্ত্ব, প্রবাসী, ১৩৪১, বৈশাখ) নন্দনতত্ত্বের এই বিশেষ ধারার সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রয়োগে ও বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন অপূর্ব দক্ষতা। রূপনার প্রতিভা, "রূপদক্ষ"[১] হইবার নৈপুণ্য, অতি অল্প লোকেরই করায়ত্ত। ইহার প্রকৃতি রহস্যাবৃত। ইচ্ছাশক্তি দিয়া, অধ্যবসায় দিয়া ইহাকে অর্জন করা যায় না। এই রহস্যালোকে রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন অজস্র আলোকপাত নানা উপমায় নানা উদাহরণে, যাহাতে তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধগুলি হইয়া উঠিয়াছে উপাদেয়, নূতন একজাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির মতো। এই প্রসঙ্গে সহজেই মনে পড়ে 'পঞ্চভূতের ডায়ারি'-র কথা। বিচারবুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়, সংলাপের নাটকীয়তায় ও সরস প্রকাশভঙ্গির ঔজ্জ্বল্যে এ গ্রন্থটি কেবল রবীন্দ্র-সাহিত্যে নয়, বিশ্বসাহিত্যেও, আমার বিশ্বাস, অতুলনীয়।

কিন্তু এ কথা কিছুতেই ভোলা চলে না যে নন্দনতত্ত্বের বা সাহিত্য-বিচারের মূল উদ্দেশ্য নূতনতর সাহিত্যসৃষ্টি নয়। নন্দনতত্ত্ব শেষ বিচারে দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত, তাহার বিশিষ্ট অঙ্গ। নন্দনতত্ত্বের যে ধারাটি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক মতামতে প্রতিফলিত তাহা মূলত ভাববাদী, তাহা

১। "এই "রূপদক্ষ" কথাটি আমার নূতন পাওয়া। In ... অর্থাৎ একটা প্রাচীন লিপিতে পাওয়া গেছে, আর্টিস্টের একটা চমৎকার প্রতিশব্দ।"—রবীন্দ্রনাথ

সমাজ ও ইতিহাস নিরপেক্ষ, সুতরাং অবৈজ্ঞানিক। মনে রাখিতে হইবে, সাহিত্যে বা শিল্পে সৃজনীপ্রতিভা যুক্তি বা বিজ্ঞান দিয়া অর্জন করা না গেলেও সাহিত্যের ও শিল্পের বিচার, অর্থাৎ নন্দনতত্ত্ব তত্ত্বহিসাবে, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে, যুক্তিমার্গকে, উপেক্ষা করিতে পারে না। সাহিত্য-বৃত্তিকে অহৈতুক, সাহিত্যের উৎকর্ষকে অনির্বচনীয় ও তাহার আনন্দকে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর বলিলে নন্দনতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি শিথিল হইয়া যায়।

এই ভাববাদী দার্শনিক ভিত্তির অন্যান্য গুরুতর অসম্পূর্ণতাও আছে। কোনো লেখকের আত্মার প্রকাশ কেন ও কিভাবে অগণিত বিভিন্ন পাঠকের আত্মাকে সংক্রামিত বা অভিভূত করিতে পারে, একই লেখকের মূল্যায়ন কেনই বা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন প্রকারের হয়, ও এই ধরনের নানা প্রশ্নের হদিস বিশুদ্ধ ভাববাদের পাদপীঠ হইতে পাওয়া যায় কি না তাহা গভীর বিচারসাপেক্ষ। ইহাও আমাদের অভিজ্ঞতা যে সব শিল্পকর্মের আনন্দমূল্য এক স্তরের নয়। কবিমাত্রেই নন কালিদাস বা রবীন্দ্রনাথ। কেবল শিল্প-চাতুর্য বা আঙ্গিক-কুশলতা দিয়াও বিচার সম্পূর্ণ হয় না। তাহা হইলে হয়তো ভারবি কি মাঘকে বসাইতে হয় কালিদাসের চেয়ে উচ্চতর স্থানে, শেলির চেয়ে সুইনবার্ণকে। এ ধরনের প্রশ্ন যে রবীন্দ্রনাথের মনেও দেখা দিয়াছিল তাহা জানিতে পারা যায় তাঁহার 'সাহিত্যে নবত্ব', 'আধুনিক কাব্য' প্রভৃতি নানা প্রবন্ধে। পাওয়া যে যায় তার একমাত্র কারণ এই যে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণত ভাববাদী, সমাজ ও ইতিহাস নিরপেক্ষ, বিজ্ঞানবিমুখ ছিলেন না। তাঁহার জীবনের সুবিপুল কর্মকাণ্ডের কথা বাদ দিয়াও তাঁহার সাহিত্যিক প্রবন্ধাবলীতেও ইহার নিদর্শন না থাকিয়া পারে নাই। আবার কয়েকটি উদ্ধৃতি নেওয়া যাক।

ক। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, আমরা জ্ঞানত কি অজ্ঞানত মানুষকেই সবচেয়ে বেশি গৌরব দিয়ে থাকি? আমরা যদি কোনো সাহিত্যে অনেকগুলো ভ্রান্তমতের সঙ্গে একটি জীবন্ত মানুষ পাই সেটাকে কি চিরস্থায়ী করে রেখে দিই নে? জ্ঞান পুরাতন ও অনাদৃত হয় কিন্তু মানুষ চিরকাল সঙ্গদান করতে পারে। সত্যকার মানুষ প্রতিদিন যাচ্ছে এবং আসছে, তাকে আমরা খণ্ড খণ্ড করে দেখি, এবং ভুলে যাই, এবং হারাই। অথচ মানুষকে আয়ত্ত করার জন্যেই আমাদের জীবনের সর্বপ্রধান ব্যাকুলতা। সাহিত্যে সেই চঞ্চল মানুষ আপনাকে ধরে রাখে; তার সঙ্গে আপনার নিগূঢ় যোগ চিরকাল অনুভব করতে পারি।

খ। প্রত্যেক মানুষের পক্ষে মানুষ হওয়া প্রথম দরকার। অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের যে লক্ষ লক্ষ সম্পর্কসূত্র আছে, যার দ্বারা প্রতি নিয়ত আমরা শিকড়ের মতো বিচিত্র রসাকর্ষণ করছি, সেইগুলোর জীবনশক্তি বাড়িয়ে তোলা, তার নূতন নূতন ক্ষমতা আবিষ্কার করা, চিরস্থায়ী মনুষ্যত্বের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ যোগসাধন করে ক্ষুদ্র মানুষকে বৃহৎ করে তোলা—সাহিত্য এমনি করে আমাদের মানুষ করছে। সাহিত্যের শিক্ষাতেই আমরা আপনাকে মানুষের ও মানুষকে আপনার বলে অনুভব করছি।

গ। প্রকাশটাই হচ্ছে সাহিত্যের প্রথম সত্য। কিন্তু ঐটেই কি শেষ সত্য?

সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশমাত্র. কিন্তু তার পরিণাম সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ। আমরা কেবল দেখিনে প্রকাশ পেলে কি না, দেখি, কতখানি প্রকাশ পেলে। দেখি. যেটুকু প্রকাশ পেয়েছে তাতে কেবল আমাদের ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়, না, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির তৃপ্তি হয়, না, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং হৃদয়ের তৃপ্তি হয়। সেই অনুসারে আমরা বলি অমুক লেখায় বেশি অথবা অল্প সত্য আছে। কিন্তু এটা স্বীকার্য যে, প্রকাশ হওয়াটা সাহিত্যমাত্রেরই প্রথম ও প্রধান আবশ্যক। বরঞ্চ ভাবের গৌরব না থাকলেও সাহিত্য হয়, কিন্তু প্রকাশ না পেলে সাহিত্য হয় না। বরঞ্চ মুড়ো গাছও গাছ, কিন্তু বীজকে গাছ বলা যায় না।

যে নিবন্ধমালা হইতে এই উদ্ধৃতিগুলি গৃহীত তাহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। ইহারা রচিত হয় নাই সাধারণের সমক্ষে মুদ্রিত প্রকাশের প্রচলিত তাগিদে. রচিত হইয়াছিল কবিবন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিতের সহিত পত্রযোগে সাহিত্যবিষয়ে আলোচনার জন্য। রবীন্দ্রনাথ লোকেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "লেখা সম্বন্ধে তুমি যে প্রস্তাব করেছ সে অতি উত্তম। মাসিকপত্রে লেখা অপেক্ষা বন্ধুকে পত্রলেখা অনেক সহজ।" পরে উভয়েরই পত্রাবলী নিবন্ধাকারে প্রকাশিত হয় 'সাধনা' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায়। এই যৌথ প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের অংশ 'পত্রালাপ' নামে প্রথমে 'সাহিত্যের পথে' সংকলনের প্রথম সংস্করণে ও অধুনা 'সাহিত্য' সংকলনের নবতম সংস্করণে স্থান পাইয়াছে। কিন্তু লোকেন্দ্রনাথের অংশ বর্তমানে লোক-চক্ষুর প্রায় অগোচর। গ্রন্থপরিচয়ে বিশ্বভারতী প্রকাশনের সম্পাদক কেবল এইটুকু বলিয়াই দায়মুক্ত হইয়াছেন: "কৌতূহলী পাঠক 'সাধনা'য় লোকেন্দ্রনাথের

পত্রপ্রবন্ধগুলিও পাইবেন ; 'সাহিত্যের সত্য', 'সাহিত্যের উপাদান' এবং 'সাহিত্যের নিত্যলক্ষণ' শিরোনামে ১২৯৮ চৈত্র ১২৯৯ জ্যৈষ্ঠ এবং ১২৯৯ শ্রাবণ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছিল।" আপন রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংস্করণের সম্পাদনায় আপন ঘনিষ্ঠতম সাহিত্যিক বন্ধুর প্রতি এই অবহেলায় রবীন্দ্রনাথ যে কি পরিমাণ বেদনার্ত হইতেন তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। একটি বিশেষ যুগের রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকীর্তির বিকাশে লোকেন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল তুলনাতীত। 'পত্রালাপ'-এর পর্বে, ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে লোকেন্দ্রনাথ ছিলেন বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের পুরোভাগে। কেবল ইংরেজি সাহিত্য নয়, সমগ্র ইওরোপীয় সাহিত্যে তাঁহার ছিল প্রত্যক্ষ ও প্রগাঢ় অধিকার। তিনিই ছিলেন তখনকার যুগে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অনুরাগী ও শ্রেষ্ঠ সমালোচক। তঁহার সাহিত্যিক মতামতকে রবীন্দ্রনাথ কতদূর শ্রদ্ধা করিতেন তাহার অবিস্মরণীয় নিদর্শন থাকিয়া গিয়াছে বিশ্ববিখ্যাত 'উর্বশী' কবিতার প্রকাশনে। এখন সকলেই জানেন এই কবিতাটি আটটি স্তবকে সম্পূর্ণ। অথচ বহু বৎসর ধরিয়া কবিতাটি মুদ্রিত হইত ছয়টি স্তবকে, শেষ দুইটি স্তবক বাদ দিয়া। একমাত্র লোকেন্দ্রনাথের অভিমত-অনুসারে রবীন্দ্রনাথ নিজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতাকে এইভাবে ছিন্ন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কোনো এক সংখ্যা 'পরিচয়'-এ 'কবিতায় বক্তব্য' নামক প্রবন্ধে আমি এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলাম। এখানে তাহার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। এখন আমার বক্তব্য কেবল এইটুকু যে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বাঙালীর মধ্যে লোকেন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি আর কেহ যদি বিশ্বকবির সাহিত্যিক চেতনাকে প্রভাবিত করিয়া থাকেন, তাহা আমার অজ্ঞাত। দুঃখের বিষয় লোকেন্দ্রনাথের নিজস্ব রচনার প্রায় কিছুই বাঙালী পাঠকের কাছে উপস্থিত নাই। রবীন্দ্র-প্রতিভার সৌরজগতে লোকেন্দ্রনাথের প্রভাব যেন একটা লুপ্তগ্রহের অস্তিত্বের মতো। তাঁহাকে বাদ দিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যের বিবর্তনের বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথেরই রচনা হইতে ভিন্ন প্রকৃতির দুই ধরনের উদ্ধৃতিমালা দিয়া, আশা করা যায়, দেখানো গিয়াছে যে নন্দনতত্ত্বের মৌলিক প্রশ্নাবলীর বিচারে তাঁহার মানসলোকে ছিল স্বতোবিরোধিতা বা দ্বৈতভাব। এই দ্বৈতভাবের উপস্থিতি, দেখা যায়, কোনো কোনো বিজ্ঞ ও রসজ্ঞ রবীন্দ্র-সমালোচককে বিব্রত করিয়াছে। বর্তমান বৎসরে শারদীয় বিশেষ সংখ্যার 'স্বাধীনতা'-য়,

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'শিল্পবোধে গান্ধী টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক মনোজ্ঞ প্রবন্ধে লিখিতেছেন ঃ

"শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে শিল্পীর ব্যক্তিজীবন যে বৃহৎ সমাজজীবনের সঙ্গে অংগাংগীভাবে যুক্ত এবং এই কারণেই শিল্পকর্মও যে সামাজিক অন্যান্য সকলপ্রকার কর্মের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত রবীন্দ্রনাথ এই কথাটা সব সময় স্বীকার করিতে চাহেন নাই, বরঞ্চ তাঁহার ভিতরে এই কথাটা অস্বীকার করার প্রবণতাই দেখা দিয়াছে অধিক সময়ে। সময়ে সময়ে রবীন্দ্রনাথকে খুব জোর করিয়াই এই কথা আমরা বলিতে দেখিয়াছি যে শিল্প-প্রতিভা সকল সমাজ ও ইতিহাস বিবর্তন নিরপেক্ষ শিল্পীর সম্পূর্ণ নিজস্ব ধর্ম। * * * কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সৃষ্টিকে সমগ্রভাবে বিচার করিলে ইহাই রবীন্দ্রনাথের শিল্পবোধের শেষ কথা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। (অথচ) গানে কবিতায় আলোচনায় এ-জাতীয় কথা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না।"

এই বিরোধিতার সমাধানকল্পে দাশগুপ্ত মহাশয় উক্ত প্রবন্ধে যে প্রণালীর প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা নন্দনতত্ত্ব-বিচারে হেগেলীয় দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির অনুরূপ। এই পদ্ধতিতে দেখানো হয় যে কোনো বৃহৎ আইডিয়া চিরন্তন স্থিতিশীল নয়, তাহারই অস্তিত্বের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় তাহার বিপরীত আইডিয়া। সুতরাং আইডিয়ার জগতে প্রগতির জন্য বস্তুজগতের বা সমাজ-জীবনের প্রভাব গৌণ। আজ ইহা সকলেরই সুবিদিত, এই আকাশচারী হেগেলীয় দ্বান্দ্বিককে মার্কস ও এংগেলস কিভাবে মাটিতে নামাইয়া আনিয়া স্থাপিত করেন বৈজ্ঞানিক বনিয়াদের উপর। রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃত চরিত্র বুঝিতে গেলে আমাদেরও প্রয়োজন আছে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগের, এবং এই প্রচেষ্টায় আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক হইতে পারে লেনিনের প্রবন্ধাবলী, তলস্তোই-এর বিচারে।

লেনিনের সূত্রানুযায়ী রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দ্বন্দ্বের বিচারে সংক্ষেপে ইহাই বলা যায় যে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁহার ব্যক্তিগত বা স্বেচ্ছানির্দিষ্ট ব্যাপার নয়। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের যে যুগে রবীন্দ্র-প্রতিভা সৃষ্টিশীল সে যুগের বাঙালীসমাজের অভ্যন্তরে ছিল ক্রমবর্ধমান স্বতোবিরোধিতা। এই স্বতোবিরোধিতার অপূর্ব শিল্পসম্মত ভাস্বর প্রতিফলন হইতেছে সমগ্র

রবীন্দ্রসাহিত্য। সমাজের দৈনন্দিন জীবনে যেমন একই কালে প্রচলিত ছিল গরুর গাড়ির ও রেলের গাড়ির ব্যবহার, রবীন্দ্রমানসেও তেমনই একই সঙ্গে ক্রিয়াশীল ছিল সনাতন উপনিষদের প্রতি আনুগত্য ও আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ। রেলের গাড়ির তুলনায় গরুর গাড়ির প্রচলন ব্যাপকতর হইলেও রেলের গাড়ির প্রভাবই ছিল ভবিষ্যতের অভিমুখে। উপনিষদের বিশ্ববীক্ষাও তেমনই রবীন্দ্রমানসে ব্যাপকতর হওয়া সত্ত্বেও ইওরোপ হইতে আগত বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষাকে আত্মস্থ করিতে পারাই রবীন্দ্রপ্রতিভার তর্কাতীত গৌরব। এই দুই বিভিন্ন কালধর্মী বিশ্ববীক্ষাকে সমীকরণের প্রচেষ্টা সহজে সাধিত হয় নাই। নানা দ্বিধাদ্বন্দ্ব, নানা আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে সমগ্র মানবসমাজের পূর্ণ কল্যাণের লক্ষ্যপথে। মনে রাখিতে হইবে, যে বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষা ভারতে আসিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুসরণে, তাহার ভিতরেও ছিল প্রকাণ্ড বিরোধিতা। তাহার একদিক ছিল ভারতের সনাতন সমাজ-ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধ্বংসশীল, অন্যদিকে ভবিষ্যতের স্বাধীন জাতিগঠনের অভীপ্সার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টিশীল। কেবল ইহাই নহে। মানব-ইতিহাসের সামগ্রিক বিচারে ফিউডালবাদী সমাজ-ব্যবস্থার তুলনায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা উন্নততর পদক্ষেপ হইলেও, ইহার মানবিক অগ্রগতির অনিবার্য শর্ত ছিল শ্রেণী-স্বার্থের ঘনিমা, শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠাতেই হইতে পারে যাহার একমাত্র পরিণাম। এই পরিণামের স্বপ্ন ও ইহার জন্য সংগ্রামকে বলা যায় বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষার মহত্তম অংশ। ঔপনিষদিক বিশ্ববীক্ষা ও আধুনিক বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষা একই পর্যায়ের না হওয়ায় রবীন্দ্রনাথের সচেতন সংবেদনশীল মানসলোকে ইহাদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত না হওয়াই হইত অস্বাভাবিক, অনৈতিহাসিক। এই দ্বন্দ্বকে ভারতীয় আদর্শের সহিত ইওরোপীয় আদর্শের দ্বন্দ্ব বা প্রাচ্যের সহিত প্রতীচ্যের দ্বন্দ্ব, এইভাবে দেখিলে, মনে হয়, ঠিকভাবে দেখা হইবে না। সম্প্রতি যে তর্ক উঠিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের কাব্য-অনুপ্রেরণা কতখানি ভারতীয় ও কতখানি পশ্চিমী, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের পাদপীঠ হইতে তাহাকে মনে হয় অবাস্তব, ভিত্তি-হীন। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠদান যেমন সমগ্রভাবে মানবীয়, ইওরোপের বুর্জোয়া সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠদান সেইরূপ সমগ্রভাবে মানবীয়। ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির যে যুগোপযোগী মানবিক আবেদন ছিল তাহা বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ইওরোপীয় রেনেসাঁসের

মানবিকতাও সেই রূপে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। ইংরেজ শাসনের সূত্র ধরিয়া ভারতে বুর্জোয়া অর্থনীতি অনুপ্রবেশ করিলে ভারতীয় সমাজ বিশ্ববুর্জোয়াসমাজের অঙ্গীভূত হইল। বহু শতাব্দীব্যাপী ফিউডাল ভাবধারার মর্মে গিয়া আঘাত করিল নবাগত বুর্জোয়া মূল্যবোধ, ও তাহার ফলে সৃষ্ট হইল বিশ্বমানবিকতার একটি বিশিষ্ট রূপ। বিদেশাগত আপেল ফলের চাষ ভারতের ভূমিতে ফলাইল ভারতীয় আপেল—যাহা জীনাস হিসাবে বিদেশীয় হইলেও স্পীশিজ হিসাবে ভারতীয়। স্মরণ করা যাক রবীন্দ্রনাথের উক্তি: "হোমরের মহাকাব্যের কাহিনীটা গ্রীক, কিন্তু তার মধ্যে কাব্যরচনার যে আদর্শটা আছে যেহেতু তা সার্বভৌমিক এই জন্যেই সাহিত্যপ্রেম বাঙালীও সেই গ্রীক কাব্য পড়ে তার রস পায়। আপেল ফল আমাদের দেশের অনেক লোকের পক্ষেই অপরিচিত, ওটা সর্বাংশই বিদেশী—কিন্তু ওর মধ্যে যে ফলত্ব আছে সেটাকে আমাদের অত্যন্ত স্বাদেশিক রসনাও মুহূর্তের মধ্যে সাদরে স্বীকার করে নিতে বাধা পায় না।" এখানে এই মন্তব্যের প্রয়োজন আছে যে রবীন্দ্রনাথের রসনা স্বাদেশিক হওয়া সত্ত্বেও কালোপযোগী শিক্ষায় ছিল মানবিক, তাই আপেলের স্বাদকে মুহূর্তের মধ্যে সাদরে স্বীকার করিয়া লইতে তাহা বাধা পায় নাই। কিন্তু যে সকল ভারতীয় পণ্ডিত একান্তভাবে ভারতীয়, কালোপযোগী শিক্ষায় বঞ্চিত, তাঁহাদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য খাটে না। ভারতীয় হইয়াও ভারতে-জাত আপেল ফলকে তাঁহারা সুচক্ষে দেখিতে পারেন কিনা, ভারতীয় পূজা-আচারে এই উপভোগ্য ফলটির এখনও কোনো শাস্ত্রসম্মত স্থান আছে কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও জিজ্ঞাসা করা যায়, উপনিষদের বাণীর যে ধরনের ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ প্রচার করিতেন তাহাকে কি বলা যায় সনাতন? বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শ্রী হেমন্ত গঙ্গোপাধ্যায় বিগত শারদীয় সংখ্যা 'আন্তর্জাতিক' পত্রে 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে বলিতেছেন: "একথা ধ্রুবসত্য যে রবীন্দ্রনাথ যে অর্থে উপনিষদের মন্ত্রগুলি ব্যবহার করেছেন তা আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণার সহিত মেলে না। 'মানব সত্য' প্রবন্ধটি যদি "মানুষের ধর্মের" সারাংশ হয়ে থাকে তবে এই সত্য কোনো অলৌকিক পারলৌকিক মুক্তির বাণী নয়, ইহলোকের মহামানবের পরম সৌভ্রাত্র ও শান্তির বাণী।" সনাতন বিশ্ববীক্ষার সহিত রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববীক্ষার এইখানেই পার্থক্য।

এই পার্থক্যের আর একটি মনোজ্ঞ নিদর্শন আছে রবীন্দ্রনাথের এক

কবিতায়। ভারতীয় কাব্যের ক্ষেত্রে কালিদাসই রবীন্দ্রনাথের গুরু, ভার্জিল যেমন ছিলেন দান্তের, ইহা সঙ্গতভাবেই বলা যায়। যে নবরত্নের মধ্যে কালিদাস ছিলেন প্রথম রত্ন সে যুগে জন্ম হইলে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই প্রস্তুত ছিলেন সে শ্রেণীতে হইতে দশমরত্ন অর্থাৎ 'নবমী রত্ন'। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার জন্ম হইয়াছে এক হাজার বছর পরে বিক্রমাদিত্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে নয়, ইংরেজের রাজধানী কলিকাতায়। তাই তিনি পরিহাস ছলে হইলেও বলিতে পারিয়াছেন এই সত্য কথাটি যে, "কালিদাসকে হারিয়ে দিয়ে গর্বে বেড়াই নেচে।" এই গর্বের কারণ এই নয় যে রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে কবি হিসাবে তাঁহার প্রতিভা কালিদাসের কবি প্রতিভা হইতে উচ্চতর, কারণটি এই যে তিনি জানিতেন যে তাঁহার যুগ কালিদাসের যুগের চেয়ে উন্নততর। "তাঁহার কালের স্বাদ-গন্ধ আমি তো পাই মৃদুমন্দ, আমার কালের কণামাত্র পান নি মহাকবি।" রবীন্দ্রনাথের আনন্দের প্রকৃত কারণ এই যে তিনি উত্তরাধিকারী নন কেবলমাত্র ভারতের কালিদাসের, তিনি উত্তরাধিকারী বুর্জোয়া জগতের শ্রেষ্ঠ মানবিক কবিদের।

রবীন্দ্রনাথের [illegible] উপরে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের প্রভাব ছিল অসামান্য, ইহা [illegible] কথা। প্রত্যেক মনোযোগী বাঙালী পাঠক জানেন কীটস-এর "beauty is truth, truth beauty". এই [illegible]মূলক উক্তিটিকে [illegible] রবীন্দ্রনাথ [illegible] করিয়াছেন। উক্তিটি যতই বিখ্যাত হোক ইহার [illegible] ইংলন্ডের পণ্ডিত-মহলে এখনও এ বিষয়ে [illegible] পৌঁছাইয়াছেন কি না আমার জানা নাই। অথচ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রুশীয় সাহিত্যসমালোচক চের্নিশেভস্কি [illegible] ভাববাদী [illegible] বিরুদ্ধে মানবজীবনের সত্যের সহিত সুন্দরের যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন তাহা হইতে যেন কীটস্-এর উক্তির রহস্য উদ্ঘাটিত হয়।

"Beautiful is that being in which we see life as it should be, according to our conception, beautiful is the object which expresses life, or reminds us of life. By real life we mean not only man's relations to the objects and beings of the objective world, but also his inner life. Sometimes a man lives in a dream, in that case the dream has for him the significance of something objective."

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবিত্ব' নামক প্রবন্ধে চের্নিশেভস্কি-র এই ব্যাখ্যা আমি যখন উদ্ধৃত করি তখন আমার জানা ছিল না যে ইহার প্রায় অনুরূপ উক্তি রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও আছে। অথচ ইহা বোধ হয় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ চের্নিশেভস্কি-র রচনার সহিত পরিচিত ছিলেন না। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের ঊনবিংশ অধিবেশনের উপলক্ষে যে অভিভাষণ রবীন্দ্রনাথ লেখেন, তাহা পরে 'পঞ্চাশোর্ধ্বম্' নামে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। তাহাতে আছে ঃ

> "যেটাকে মানুষ পেয়েছে সাহিত্য তাকেই যে প্রতিবিম্বিত করে, তা নয় ; যা তার অনুপলব্ধ, তার সাধনার ধন, সাহিত্যে প্রধানত তারই জন্য কামনা উজ্জ্বল হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। বাহিরের কর্মে যে প্রত্যাশা সম্পূর্ণ আকার লাভ করে নি, সাহিত্যের কলারচনায় তারই পরিপূর্ণতার কল্পরূপ নানা ভাবে দেখা দেয়।"

সাহিত্যের ছাত্রমাত্রেরই জানা কথা, অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সুষমাকে জীবনের সত্যে রূপায়িত করার প্রেরণা শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া সাহিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ। বিশেষ করিয়া পরাধীন দেশে জন্মিলে স্বদেশের ও স্বজাতির গ্লানি ও লাঞ্ছনা প্রকৃত কবির চেতনাকে বর্তমানের অভিশাপ হইতে ভবিষ্যতের সার্থকতার সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে প্রাণময় করিয়া তোলে। স্বদেশের মুক্তির আকুতির সঙ্গে সর্বমানবীয় মুক্তির আহ্বান এক হইয়া যায়। কবির কবিতা তখন কেবল আর আত্মপ্রকাশের আনন্দে তৃপ্তি পায় না, তাহা হইয়া ওঠে শক্তিমান প্রহরণ—অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসুন্দরের বিরুদ্ধে। তাই বলা যায়, ১৯১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে লন্ডনে রবীন্দ্রনাথের সহিত ইয়েটস-এর প্রথম সাক্ষাৎ হইতে যে নিবিড় আত্মিকতার সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাহা কোনোক্রমেই ছিল না আকস্মিক। ভারত ও আয়র্লণ্ড, দুই দেশই তখন ইংলন্ডের শাসনাধীন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে আইরিশ উদাহরণের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। তাই তখনকার পরাধীন আয়র্লন্ডের জাতীয় কবি ইয়েটস পরাধীন ভারতের জাতীয় কবির অন্তরের বাণী আপন অন্তর দিয়া বুঝিতে পারিলেন। সত্যের সহিত সুন্দরের বিরোধ কি নিবিড়ভাবে ইয়েটস্-এর অন্তরকে মথিত করিত তাহা দেখা যায় হ্রস্ব একটি লিরিকে, 'The Wind Among the Reeds' হইতে গৃহীত।

"All things uncomely and broken, all things worn out and old,

The cry of a child by the roadway, the creak of a lumbering cart,
The heavy steps of the ploughman, splashing the wintry mould;
Are wronging your image that blossoms a rose in the deeps of my heart,
The wrong of unshapely things is a wrong too great to be told ;
I hunger to build them anew and sit on a green knoll apart,
With the earth and the sky and the water, remade, like a casket of gold
For my dreams of our image that blossoms a rose in the deeps of my heart."

চিরকালের সৌন্দর্যের প্রতীক গোলাপকে অবলম্বন করিয়া ইয়েটস্-এর এই সংগ্রামী কবিতা কি মনে পড়াইয়া দেয় না চিরকালের মঙ্গলের প্রতীক শঙ্খকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা, 'বলাকা' হইতে গৃহীত।

"চলেছিলেম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তিস্বর্গ।
এবার আমার হৃদয়ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হব নিষ্কলঙ্ক।
পথে দেখি ধুলায় নত
তোমার মহাশঙ্খ।
...
জানি জানি, তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্ষে
জানি শ্রাবণ-ধারা-সম
বাণ বাজবে বক্ষে।

কেউবা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁদবে ত্রাসে
সুপ্তির পর্যঙ্ক
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ।
তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক প্রাক্কালে রচিত এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ স্বাগত আহ্বান জানাইয়াছেন এক নূতন বিশ্বযুগকে। বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পূর্বেই ১৯১৭ সালের রুশ-বিপ্লবে যাহার ঐতিহাসিক সূচনা। বিশ্বব্যাপী ধনবাদের অন্তিম পরিণতি যে বিশ্বব্যাপী সমাজবাদে, বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও মানবিকতা যে সমৃদ্ধতর ও পূর্ণতর হইবে সমাজবাদী মানবিকতায় তাহা তখন স্পষ্ট বোধগম্য না হইলেও এখন দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু এই সুমহান পরিণামের পথে এখনও আছে বহুকালব্যাপী সংগ্রাম ও সংঘর্ষ। এই বিঘ্ন-রুক্ষ পথে চলিতে গিয়া মানবজাতি যেন অসময়ে অবসন্ন না হইয়া পড়ে, যেন ইয়েটস্-এর গোলাপের স্বপ্নকে ও রবীন্দ্রনাথের শঙ্খের আহ্বানকে বিস্মৃত না হয়, আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন উৎসবের ইহাই হইল শেষ শিক্ষা।

রবীন্দ্র-শান্তি মেলায় আলোচনা-পর্যায়ের ১০ই নভেম্বরের অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণের অনুসরণে লিখিত—লেখক।

বাংলা ইংরাজী ও সংস্কৃত

সমগ্র সভ্যজগতে আমাদেরই বোধহয় একমাত্র দেশ যেখানে মাতৃভাষায় জ্ঞানচর্চা করিতে চাহিলে তর্কের উদ্ভব হয়। তাহার প্রধান কারণ অবশ্য ইংরাজ রাজত্ব ও ইংরাজী ভাষা। আমাদের শিক্ষাপ্রণালী এমনই ভাবে গঠিত যে জ্ঞানার্জনের সকল দ্বারগুলিই ইংরাজী ভাষার অর্গলে আবদ্ধ। এই অর্গলটি খুলিবার শক্তি সঞ্চিত না হইলে আমরা সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি কোন বিষয়েরই অন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার পাই না। এমন কি সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতাও ইংরাজী ভাষার কৃতিত্বের মাপকাঠিতে বিচার করিতে আমরা কুণ্ঠিত নহি। পৌর্ব্বাপর্য্য-বিপর্য্যয়, ইহার অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নহে বিদ্যায়তনের বাহিরেও ইংরাজী ভাষার মোহ আমাদিগকে এমনই পাইয়া বসিয়াছিল যে, শিক্ষিত মহলে পত্রালাপ ও অনেকস্থলে কথাবার্ত্তাও রাজভাষাতেই পরিচালিত হইত। বাংলাদেশে এমন সংসার এখনও লোপ পায় নাই যেখানে ছেলে-মেয়েরা বাপ-মায়ের সহিত ইংরাজীতেই আলাপ করে, ও বাড়ীর কাহারও অ্যাকসেণ্ট্ যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ না হইলে তাহার সহিত হিন্দী ব্যবহার করে, পাছে বাংলা বলার হীনতায় লিপ্ত হইতে হয়।

মাতৃভাষার অবহেলা ক্ষোভের কারণ বটে, তবুও এই বিদেশীয় ভাষা অনুশীলনে বাঙালীমনের গুণগ্রাহিতারই পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজশাসনের বিরুদ্ধে আমাদের বিরূপতা যতই তীব্র হউক, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না, ইংরাজী সাহিত্যের তুল্য ঐশ্বর্যশালী সাহিত্য পৃথিবীতে কমই আছে, সমৃদ্ধতর সাহিত্য নাই বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। বাঙালী ইংরাজীকে গ্রহণ করিয়াছিল, ব্যবসায়বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া লাভের আশায় নহে, তাহার কাব্য-সাহিত্যের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া। বাঙালী যেরূপ তন্ময়ভাবে ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের চর্চা করিয়াছে, অন্য কোন জাতি কোন বিদেশী ভাষাকে আয়ত্ত করিতে সেরূপ চেষ্টা করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। রুশিয়ার শিক্ষিত সম্প্রদায় এক সময় ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে মাতৃভাষাকেও অবহেলা করিত, কিন্তু কোন রুশ লেখক ফরাসী ভাষায় এমন কিছু লিখিতে পারেন নাই, যাহা ফরাসীসাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাইতে পারে। অথচ বাঙালী সুরেন্দ্রনাথের ইংরাজী বক্তৃতা শুনিয়া লর্ড কার্জনের ঈর্ষা হইয়াছে; বাঙালী লেখকের ইংরাজী গদ্য ইংরাজ পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে; আর বাঙালী কবি ইংরাজীতে এমন কবিতা লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, যাহা ইংরাজী কাব্যচয়নে সগৌরবে আসন গ্রহণ করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী গদ্য, তাহার নানা বিজাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ত্রুটি সত্ত্বেও ইংরাজী সাহিত্যে এমন একটি অভিনব রূপ-সম্পদ দান করিয়াছে, যাহাকে অস্বীকার করিলে বিংশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের ধারণা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সাহিত্যের দিক্ দিয়া দেখিলে বাঙালীর এ-কৃতিত্ব স্বরাজ-অর্জনের অপেক্ষাও মহত্তর—ইহা দিগ্বিজয়।

সুধু ইহাই নহে। বঙ্গ-সাহিত্য আজ বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যগুলির অন্যতম বলিয়া গণ্য। তাহার এ সম্মানের জন্য ইংরাজী সাহিত্যের নিকট বাঙালীর ঋণ অপরিশোধ্য। যেদিন ছাব্বিশ বৎসর বয়সে সংস্কৃত আরবী ফারশী ভাষায় সুপণ্ডিত রামমোহন ইংরাজী বর্ণমালার সহিত পরিচিত হইতে আরম্ভ করিয়া লাতিন গ্রীক হিব্রু পর্যন্ত আয়ত্ত করিয়া লইলেন, সেইদিন হইতে বাঙালীর চিন্তাধারা যে পশ্চিমাভিমুখী হইয়াছিল তাহা পুনরায় সম্পূর্ণরূপে দিক্ পরিবর্তন করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইয়োরোপের ও বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের সাহিত্য বিজ্ঞান ও দর্শন তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আসিয়া বাঙালীর জীবন-বেলায় আঘাত করিয়াছে, তাহার জীবন-বেদকে আলোড়িত করিয়াছে।

এই আলোড়নের ফলেই আজ বাংলার সমাজ পরিবর্তনের দুর্দম বেগে টলমল, তাহার রাষ্ট্রনীতি স্বাধীনতার তীব্র কামনায় বিপ্লব-পন্থী, তাহার সাহিত্য সুন্দরের উন্মাদনায় বিভোর।

কিন্তু নিশীথের অন্ধকারে যে-দীপের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, দ্বিপ্রহরের দিবালোকে তাহাকে জ্বালাইয়া রাখাই মূঢ়তা। বাংলার নির্বাপিত প্রাণপ্রদীপকে দীপ্ত করিয়া তুলিবার জন্য ইংরাজী ভাষার দীপশলাকার প্রয়োজন ছিল। আজ যখন জাতীয় জীবন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, আজও কি আমাদের জ্ঞানালোকের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে, পরভাষার নিকট ভিক্ষা মাগিতে হইবে? জাতীয় সমুত্থানের কোনই সার্থকতা থাকিবেনা যদি আমরা আমাদের মাতৃভাষাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ বিশ্বসম্পদে গরীয়ান্ করিয়া তুলিতে না পারি। আমাদের সমস্ত জ্ঞান-প্রচেষ্টার এখন একমাত্র উদ্দেশ্য এই হওয়া উচিত যে যেখানে যাহা কিছু জানিবার আছে, বুঝিবার আছে, উপভোগ করিবার আছে, সমস্তই যেন আমরা শুধু বাংলা ভাষার সহায়তায় জানিতে, বুঝিতে, উপভোগ করিতে পারি।

এ-পথের পথিক হইতে হইলে প্রথম প্রয়োজন, সমস্ত শিক্ষায়তনে—উচ্চ-মধ্য-নিম্ন-নির্বিশেষে—বাংলা ভাষার যতদূর সম্ভব একান্ত প্রচলন। যাহা কিছু বাংলায় পড়ানো সম্ভব, তাহার জন্য যেন অন্য ভাষার প্রয়োগ না হয়। আর প্রয়োজন, বাংলা ভাষার অসম্পূর্ণতার দিকে শিক্ষিতজনের খরদৃষ্টি, ও সম্প্রসারণের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত সাধনা।

সুদীর্ঘ বিলম্বের পর এতদিনে দেশের দৃষ্টি এই দিকে পড়িয়াছে। আদ্য পরীক্ষা পর্যন্ত সমুদয় পাঠ্য যাহাতে বাংলায় পঠিত হয়, বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাহার জন্য চেষ্টা চলিতেছে। আশা করা যায়, নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া শীঘ্রই উহা বিধিবদ্ধ ও সাধিত হইবে। ইংরাজী ভাষা অবশ্যশিক্ষণীয়ই রহিল, তবে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি অন্যান্য বিষয় সমস্তই বাংলার মারফৎ শিখাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। আর একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এই যে, সংস্কৃত ভাষা এতদিন আবশ্যিক ছিল, এখন তাহাকে ঐচ্ছিকের কোঠায় ফেলা হইল।

ইহা লইয়া দেশের শিক্ষা-সংশ্লিষ্ট এক শ্রেণীর মধ্যে চাঞ্চল্যের, এমন কি আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহাদের বিশ্বাস, সংস্কৃত অবশ্য পাঠ্য না থাকিলে এত কম ছাত্র উহা পড়িতে চাহিবে যে, পণ্ডিতমহাশয়গণের দুরূহ জীবন

দুরূহতর হইয়া উঠিবে। এই ধারণা করুণার উদ্রেক করে, শ্রদ্ধার নহে, কাজেই এ-প্রসঙ্গে আর কিছু না বলাই শোভন। তাঁহাদের দ্বিতীয় আর একটি গুরুতর আপত্তি আছে। তাঁহারা বলেন, সংস্কৃত না পড়িলে বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের উন্নতি অসম্ভব। কেননা, বাঙালীর সমাজ, ধর্ম, দর্শন সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশাসনে পরিচালিত ; ভাষা, সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানের প্রভাবে প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত ; তাহার পরিশীলিত ঐতিহ্য সংস্কৃত গ্রন্থের অন্তরে সুরক্ষিত।

স্পষ্টই বোঝা যায়, ইহারা বাঙালী বলিতে বাঙালী হিন্দুকে বোঝেন, যদিও হয়ত তর্কের খাতিরে স্বীকার করিবেন, সংস্কৃতের মত আরবী বা ফারশীও অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। কিন্তু বাঙালী, জাতিধর্মনির্বিচারে বাঙালী হইয়া উঠুক, ইহাই কি সর্বথা বাঞ্ছনীয় নহে ? এই মিলনের জন্য বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অপেক্ষা প্রশস্ততর কোন্ ক্ষেত্র আছে ? এই মিলনের জন্য বাংলা ভাষাকে এমন করিয়া গড়িয়া তোলা চাই যে, তাহা যেন সকল বাঙালীরই মনের ভাষা, প্রকাশের ভাষা হইয়া উঠিতে পারে। তাহার জন্য প্রয়োজন হইলে, পৃথিবীর যে-কোন ভাষা হইতে যে-কোন-কিছু আহরণ করিতে আমরা যেন লজ্জিত না হই। কিন্তু সর্বাগ্রে স্বীকার করা দরকার, বাংলা ভাষার উদ্ভব যেখান হইতে বা যেমন করিয়া হোউক না কেন, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। তাহার স্বাধীন সত্তা মানিয়া লইয়া তবে এই আহরণ-গুণানা প্রয়োগ করা উচিত। বাংলা ভাষার প্রকৃতির সহিত যাহার বিরোধ তাহাকে আমরা যেমন অকুণ্ঠে বিসর্জন দিব, যাহার সহিত তাহার মিল, তাহাকে তেমনই অকুণ্ঠে বরণ করিয়া লইব ; এই উদ্দেশ্যে, দেশের পারশীলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিক যত ভাষার প্রচার হয় ততই শুভ। কিন্তু কোনটিকেই অবশ্যপাঠ্য করিয়া তুলিবার প্রয়োজনীয়তা আমরা দেখি না—এমন কি যাহার সহিত বঙ্গভাষার সম্বন্ধ নিগূঢ়তম সেই সংস্কৃতকেও না। সংস্কৃত পন্থীদিগকে আমরা সবিনয়ে জানাইতে চাহি, সংস্কৃত অভিধানের যে-কোন পদ, সংস্কৃত ব্যাকরণের সান্ধ সমাস কৃৎ-তদ্ধিতের যে-কোন নিয়ম, প্রয়োজন হইলেই আমরা গ্রহণ করিব, কিন্তু সংস্কৃত বর্ণমালার আক্ষরিক রূপ ও তাহার শব্দরূপ ধাতুরূপের বিশাল ভার অবশ্যপাঠ্য করিয়া ছাত্রদের স্কন্ধে চাপাইতে চাহি না। আমাদের মনে হয়, যে-ভাবে পূর্বে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য বাংলা পড়ানো হইত, সে-ভাবে পড়াইলে, সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য না হইলেও শিক্ষার্থীর অভাব

হইবে না। আর যদি ছাত্রেরা সংস্কৃত না-ও পড়ে, তাহা হইলে যে-লোক বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', মাইকেলের 'মেঘনাদবধ', তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী', কালিসিংহের 'মহাভারত' ও রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্যে'র বাংলা আয়ত্ত করিতে পারে, তাহাকে বাংলা অনুবাদের ভিতর দিয়া সংস্কৃত পরিশীলনের সারমর্ম জ্ঞাপন করা নিতান্ত কঠিন হইবে না।

ইংরাজী তাহা হইলে অবশ্যশিক্ষণীয় থাকিবে কেন? যতদিন ইংরাজ এদেশের রাজা, ততদিন এ-তর্কের কোন সার্থকতা নাই। তবুও স্বীকার করিতে হইবে, শিক্ষার দিক্ হইতে প্রশ্নটির কোন উত্তর দেওয়া হইল না। আসল কথাটী এই যে, বাঙালীকে ত শুধুই বাঙালী থাকিলে চলিবে না, তাহাকে বিশ্বের অন্য জাতির সহিত মিশিতেই হইবে - ভাবের আদান-প্রদান, পণ্যের আদান-প্রদান করিতেই হইবে। ইংরাজী ভাষা এ-বিষয়ে আমাদের প্রধান সহায়। কিন্তু যে-ভাবে ও যে-ধরনের ইংরাজী আমাদের দেশে সাধারণতঃ শেখানো হয় আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। আমাদের শেখা দরকার কাজ-চালানো ইংরাজী, অথচ আমরা শিখি—অর্থাৎ শিখিবার হাস্যকর ব্যর্থ চেষ্টা করি—সাহিত্যিক ইংরাজী। সাধারণ বাঙালী সাহিত্যিক ইংরাজীকে লেখায় বা কথায় ঠিকমত ব্যবহার করিতে পারে না বলিয়া ইংরাজ-মহলে "বাবু-ইংরাজীর" প্রতি কটাক্ষের অন্ত নাই। ইংরাজী সাহিত্যের বহুল প্রচার আমরা কামনা করি; তবুও বলিব, এই সাহিত্যিক ইংরাজী ছাত্রগণের অবশ্যপাঠ্য না হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞানের উন্নতিতে ও বাণিজ্যের তাগিদে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ আজ পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। অবস্থা এরূপ সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ভাষা-সমস্যার সমাধান না করিলেই নহে। অনেকদিন হইতেই একটা সর্ব্বজনীন ভাষা গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতমণ্ডলে চলিতেছে। উদ্ভাবনও হইয়াছে অনেক, কোনটীই কিন্তু কর্মক্ষেত্রে বেশী টিকিতে পারে না। ভাষাতাত্ত্বিকের মস্তিষ্কে উদ্ভূত হইয়া তাহারা সংসারে প্রবেশ করিতেছে অকালভূমিষ্ঠ শিশুর মত অবিকশিত অবস্থায়। দৈনন্দিন ব্যবহার ভাষার প্রাণ, অথচ এমন একদল লোকও নাই যাহারা স্বভাবতঃ এ-ভাষাগুলি ব্যবহার করে। অনেকগুলি চেষ্টা আবার দু-তিনটী সুপরিচিত ভাষার জগাখিচুড়ী মাত্র—একান্ত নিজস্ব বিশেষত্ববর্জিত। সর্ব্বজনীনভাবে এরূপ ভাষা চলিবার সম্ভাবনা কতটুকু, সহজেই বোঝা যায়।

কিন্তু সম্প্রতি কেম্‌ব্রিজ্‌-এর মড্‌লিন্‌ কলেজের সুবিখ্যাত অধ্যাপক সি, কে, অগ্‌ডেন্‌ এই কূট সমস্যার এক সুচারু সমাধান করিয়া দিয়াছেন—অন্ততঃ এইরূপই আমাদের বিশ্বাস। বেব্‌লস্তম্ভের আমল হইতে যে ভাষা-বিভ্রাট আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া কথিত, হয়ত ইঁহার চেষ্টায় তাহার নিরাকরণ হইবে। ইহা আজ সর্ব্বজনবিদিত সত্য যে, ইংরাজী ভাষা লোক-সংখ্যায় অন্য সব ভাষাকে বহুদূরে পশ্চাতে হটাইয়া দিয়াছে। অধ্যাপক অগ্‌ডেন্‌-এর বিশ্বাস, কয়েকটি অভ্যন্তরীণ বাধা দূর করিতে পারিলেই ইহা একবারে সর্ব্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে। তাই সমস্ত ইংরাজী ভাষাকে তন্ন তন্ন করিয়া ঘাঁটিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে, ইংরাজী ৮৫০ টী শব্দ দিয়াই সাধারণতঃ মানুষের ভাষা-ব্যবহারের সমস্ত প্রয়োজন মেটানো যায়; আর যে বৈয়াকরণিক নিয়মাবলী-অনুযায়ী এই শব্দগুলি প্রয়োগ করিতে হইবে তাহারা একটি পৃষ্ঠার মধ্যেই অনায়াসে স্থান করিয়া লইতে পারে। তাঁহার এই উদ্ভাবনায়—যাহার নাম হইয়াছে Basic English—ইংলন্ডে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা তিনি তাঁহার Debabelisation পুস্তিকায় করিয়াছেন। তাহার মুখবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

Basic English is an attempt to give to everyone a second, or international language, which will take as little of the learner's time as possible.

It is a system in which everything may be said for all the purposes of everyday existence: the common interests of men and women, general talk news, trade, and science.

To the eye and ear it will not seem in any way different from normal English, which is now the language of 500,000,000, persons.

There are only 850 words in the complete list, which may be clearly printed on one side of a piece of note-paper. But simple rules are given for making other words with the help of those in the list; such as *designer*, *designing* and *designed*, or *air-plane* from *air* and *plane*.

The word order is fixed by other short rules, which make it clear from an example such as

"I will put the record on the machine now."

What is the right and natural place for every sort of word ?

Whaever is doing the act comes first ; then the time word; such as *will*; then the act or operation *put*, *take*, or *get* ; then the thing to which something is done, and so on.

It is an English in which 850 words do all the work or 20,000 , and has been formed by taking out everything which is not necessary to the sense. *Disembark*, for example, is broken up into *get off a ship*. *I am able* takes the place of *I can* ; *shape* is coverd by the more general word *form* ; and *difficult* by the use of *hard*.

By putting together the names of simple operations—such as *get*, *give*, *come*, *go*, *put*, *take*—with the words for directions like *in*, *over*, *through*, and the rest, two or three thousand complex ideas like *insert* which becomes put in, are made part of the learner's store.

Most of these are clear to everyone. It would be hard, for example, to go wrong about the way to put *disembark* or *debarquer*, into Basic English. But in no other language is there an equal chance of making use of this process. That is why Basic is designed to be the international language of the future.

In addition to the Basic words themselves, the learner has, at the start, about fifty words which are now so common in all languages that they may be freely used for any purpose. Examples are *Radio*, *Hotel*, *Telephone*, *Bar*, *Club*. Records like the one now on your machine will make it clear what the sounds are to be like.

For the needs of any science, a short special list gets the expert to a stage where internationl words are ready to hand.

Those who have no knowledge of English will be able to make out the sense of *Radio Talk*, or a *business letter*, after a week with the word-list and the records; but it may be a month or two before talking and writing are possiele.

An Englishman will make an adjustment to Basic ways of thought in a very short time, but at first he will have to take some trouble to be clear and simple.

In fact, it is the business of all internationally-minded persons to make Basic English part of the system of Education in every country, so that there may be less chance of war, and less learning of languages—which, after all, for most of us, are a Very unnecessary waste of time.

বাংলা প্রবন্ধে এই সুদীর্ঘ ইংরাজী সঙ্কলনের কৈফিয়ৎ আবশ্যক। সে কৈফিয়ৎ, বেসিক ইংলিশ-এর আসল চেহারার সহিত বাঙালী পাঠককে পরিচিত করিয়া দেওয়া। কারণ, পরিচয় না দিলে বোঝা দুঃসাধ্য। এই প্রবন্ধের আগাগোড়াই বেসিক ইংলিশ-এ লিখিত। এ-ভাষার বিরুদ্ধে আর যে আপত্তিই থাকুক, ইহাকে অস্বাভাবিক বলা চলে না। ইহাতে এমন একটি কথাও নাই যাহা সাধারণ ইংরাজ সাধারণতঃ ব্যবহার করে না।

ইংরাজী ভাষা সহজ হইবার পথে আর একটি প্রকাণ্ড বাধা আছে, অধ্যাপক অগ্‌ডেন-এর উদ্ভাবনা যাহার সর্বাঙ্গীণ নিষ্পত্তি করিতে পারে নাই—অর্থাৎ ইংরাজীর বানান ও উচ্চারণ-বেদনা। প্রত্যেকটি বর্ণ প্রত্যেক স্থলে সমভাবে উচ্চারিত হইবে, ইহাই হইল আদর্শ নীতি। সব ভাষাতেই কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। কিন্তু ইংরাজীতে বানান ও উচ্চারণে বিভেদ অনেক সময় দিনরাত্রির মত বিপরীত। তাই আর একজন অধ্যাপক—ইনিও ইংরাজীকে সর্ব্বজনীন করিতে অভিলাষী যদিও নিজে সুইডেনবাসী—ইংরাজীর বানানরীতির সংশোধন করিয়া একটি খসড়া তৈরি করিয়াছেন। তাহারও বহুল প্রচার হওয়া আবশ্যক। তাই অধ্যাপক জ্যাক্‌রিশন্‌-এর আংগ্লিক্‌ ইংরাজীর (Anglic English) কিছু নমুনা প্রদত্ত হইল।

The prezent orthografy has mor than 500 Waez of speling the 40 Od soundz that okur in English wurdz in kurent use Anglic has 65. Spaes is saeved to the extent of wun or tuu lienz on a printed paej. Anglic has aulready been submited to numerus praktikal tests. Leeding eduekaeshonists and reprezentativz of the Pres, who hav been prezent at korsez givn in Stockholm and Uppsala, hav testified that Anglic is a moest efektiv meenz of teeching English to forinerz. After 20 lesnz the puepilz had aquierd a wurking nolij of English, and were aebl to reed not oenly Anglic but aulso eezy spesimenz of English in the egzisting speling.

তবে বেসিক ইংরাজীর স্বপক্ষে এইটুকু বলিবার আছে, ৮৫০টা কথার বানান ও উচ্চারণ শিখিতে কোন শিক্ষার্থীরই আপত্তি হওয়া উচিত নহে, বিশেষতঃ যখন এ-ভাষার সাহায্যে পৃথিবীর সমস্ত জাতির সহিত বাক্-বিনিময়ের সম্ভাবনা। কাজেই অবশ্য পাঠ্যভাবে ইংরাজী শিখিতে হইলে আমাদের সাহিত্যিক ইংরাজী না শিখিয়া এই বেসিক ইংরাজী শেখানো উচিত। আর ইংরাজী সাহিত্যে অনুরাগীদিগকেও আমরা সাবধানে বলিয়া রাখি, বেসিক ইংরাজী সাহিত্যিক ইংরাজীর প্রতিবন্ধক নয়, সহায়ক; সাহিত্যাগার অভ্যন্তর দিকে বেসিক ইংরাজী হইতে সাহিত্যিক ইংরাজীর দূরত্ব মাত্র একটি পদক্ষেপ, এমন কি অর্ধপদক্ষেপও নহে।

স্বাধীন বাংলা ও বিদেশী সংস্কৃতি

বিদেশী শাসন চিরদিনই বিদেশী সংস্কৃতির বাহক হইয়া থাকে। প্রশ্ন এই, বিদেশী প্রভুত্বের অবসানে বাংলা দেশের সংস্কৃতির গতি হইবে কোন মুখে ও তাহাতে বিদেশী প্রভাব হইবে কি ধরনের।

পলাশীর যুদ্ধের পর হইতে বাংলা দেশেই বৃটিশ রাজত্বের প্রথম প্রতিষ্ঠা। কিন্তু দেশজয়ের সংগে সংগেই ইংরাজ বণিক বাঙালীর চিত্তজয় করিতে পারে নাই। তখনো পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতি ছিল নিতান্ত ঘরোয়া। গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত লোক-সংস্কৃতির বনিয়াদের উপর নির্মিত হইয়াছিল উচ্চশ্রেণীর শিক্ষা ও সভ্যতার সৌধ। তাহার উপাদানে মিশ্রণ ঘটিয়াছিল প্রাচীন হিন্দু, মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইসলাম ঐতিহ্যের। কিন্তু ইহাদের সকলেরই শিকড় ছিল বাংলার মাটিতে, যদিও তাহাদের উদ্ভব হইয়াছিল বাংলার বাহিরে। এই বাঙালী সভ্যতাকেই ইংরাজ তখন আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিত, কারণ ইংরাজ তখনও বণিক, লেনদেন তাহার প্রধান কারবার। দেওয়ানীর কথা দূরে থাক, এমন কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময়ও ইংরাজী শিক্ষার চলন বাংলা দেশে শুরু হয় নাই। রাজা রামমোহন রায়কে ইংরাজী শিখিতে হয় প্রধানত নিজের চেষ্টায় ও অনেকটা পরিণত বয়সে। অথচ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বলা যাইতে পারে বাংলার অর্থনৈতিক ভিত্তির বৈপ্লবিক পরিবর্তন ও নূতন বাংলা গঠনের প্রথম

বাস্তব পদক্ষেপ। রামমোহন এদেশে বিদেশী সংস্কৃতির প্রচলনের প্রধান প্রবর্তক। খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণের সহিত তর্কে উপযুক্ত হইবার জন্য তিনি ল্যাটিন, গ্রীক ও হিব্রু পর্যন্ত আয়ত্ত করেন। তাঁহার ঋষিকল্প ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির সগৌরব নিদর্শন এই যে তিনি দেশবাসীকে ইংরাজী শিখিতে বলেন পশ্চিমের জ্ঞানভাণ্ডারে, বিশেষত বিজ্ঞানভান্ডারে প্রবেশাধিকারের জন্য, নকল ইংরাজ বনিবার জন্য নহে। তবুও এই উৎকট উন্মত্ততা, নূতন ভাবের জগতে নূতন জন্মলাভ করিবার সুতীব্র বাসনা, পাইয়া বসে তাঁহার পরবর্তী পর্যায়ের পুরুষদিগকে। কশীপ্রসাদ ঘোষ হইতে বঙ্গদেশীয় ইংরাজকবি হইবার যে অভীপ্সা সূচিত হয় তাহারই শেষ প্রতিনিধি কবি-অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ। ইঁহার বিশেষত্ব এই যে, দীর্ঘকাল বাংলা দেশে বাস করিয়া, বঙ্গ-রমণী বিবাহ করিয়া, বাঙালী ছাত্রদের শিক্ষক থাকিয়া ও রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য পাইয়াও তিনি মনে প্রাণে ইংরাজ ছিলেন। বাঙালী সংস্কৃতি তাঁহার অন্তর্লোকে বিন্দুমাত্র স্থান পায় নাই। হিমালয়ের বিশ্বম্ভর মূর্তি তাঁহার কবিচিত্তকে আলোড়িত করিত, তাহারও কারণ গিরিরাজের একান্ত নিঃসঙ্গতা। ফুলে ফলে পাখীতে ভরা প্রকৃতির কথা ভাবিতে গেলেই তাঁহার চিত্ত অধিকার করিত ইংলণ্ডের সুদূর স্মৃতি। তাই বার্ধক্যে পৌঁছিয়াও তিনি লিখিয়াছিলেন—

Kingcups, daisies,
Cuckoo-call
Is it all a-shadow
I recall.

তাঁহার সহোদরভ্রাতা শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে কিন্তু এ মন্তব্য খাটে না। ইংরেজী ভাষা তাঁহার ভাবপ্রকাশের বাহন হইলেও বাংলা ও ভারতীয় সংস্কৃতির নিগূঢ় জ্ঞানে তাঁহার রচনা সমৃদ্ধতর। কিন্তু মনমোহন ঘোষ বাঙালী হইয়াও নিষ্কলুষ ইংরেজী কবি, এই অসাধ্য-সাধনই প্রথমে অস্কার ওয়াইল্ড ও পরে জন ফ্রীম্যান-এর চমক উৎপাদন করিয়াছিল।

মনমোহন ঘোষের এই সাফল্য বন্ধ্যা, তাহার আর প্রসার হইতে পারে না। বঙ্গভারতীর অসীম সৌভাগ্য—মাইকেল মধুসূদন এই বন্ধ্যা পথে থামিয়া গেলেন। তাই তাঁহার প্রতিভা বৃহত্তর অসাধ্য-সাধন করিল। তাই তিনি ইংরাজী সাহিত্যে গৌণ কবি না হইয়া নব্য বাংলার কবিগুরু। তাঁহার প্রভাবকে

পরিহার করিয়া কোন বাঙালী কবির পক্ষে বাংলা ভাষায় পারঙ্গম হওয়া সম্ভব নয়। তাঁহার কবিতা অধ্যয়নের জন্যই, তাঁহার কাব্যকীর্তির মূল্য নির্ধারণের জন্যই, ভবিষ্যতের স্বাধীন বাংলার কাব্যামোদীকে ইংরাজী সাহিত্যে ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে পরিশীলিত হইতে হইবে। নব্য বাংলার অন্যতম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা সম্বন্ধেও অনুরূপ মন্তব্য প্রযোজ্য। স্কট বা লীটন-প্রমুখ ইংরাজী উপন্যাসকারের কথা না ধরিলেও মিল, বেন্থাম, কোঁৎ ও রুশোকে বাদ দিয়া কি বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুধাবন করা সম্ভব? আর রবীন্দ্রনাথকে লইয়া যদি আমরা গৌরব করি বিশ্বকবি বলিয়া, তাহা হইলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে সমস্ত কবি বিশ্বকবিত্বের পর্যায়যুক্ত—যেমন হুগো, গ্যেটে, পুশকিন, ইহাদের প্রত্যক্ষ-ভাবে পর্যালোচনা না করিলে কি আমাদের কবিপ্রশস্তি স্বজাতিদম্ভের নামান্তর হইবে না?

নব্য বাংলা সংস্কৃতির কোষ্ঠী-বিচার করিতে বসিলে ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের প্রভাব উল্লেখ করিতে হয় প্রথমেই—ইহা আকস্মিক ব্যাপার নহে। এতকাল যাহাকে পাশ্চাত্য ভাবধারা বলা হইয়াছে তাহার বিশেষত্ব এই নয়-যে তাহা ভৌগোলিকভাবে পশ্চিম হইতে আগত। আসলে তাহা এক নূতন পর্যায়ের ভাবধারা। পূর্বগামী ফিউডালতন্ত্রের শৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া ইংলণ্ডেই প্রথম রূপায়িত হয় সমগ্র মানবজাতির নূতন পর্যায়ের সাহিত্য বুর্জোয়া সাহিত্য। এই সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে সভ্যতার ইতিহাসে ইংরাজ জাতির দান এক গৌরবময় দীর্ঘ অধ্যায় চিরদিন অধিকার করিয়া থাকিবে। যে জাতি যখনই ফিউডালতন্ত্র ভাঙিয়া বুর্জোয়া বিকাশের পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহাকে তখনই করিতে হইয়াছে ইংরাজী সাহিত্যের ঋণ স্বীকার। কার্লাইল-এর এ দম্ভোক্তি মিথ্যা নয় যে যদি বাছিয়া লইতে হয় ভারত সাম্রাজ্যের ও শেক্সপিয়ারের মধ্যে দুইটির একটিকে, তাহা হইলে ইংরাজ বাছিয়া লইবে শেক্সপিয়ারকেই। বাংলা-দেশে ইংরাজ আসিল এই বিরাট বুর্জোয়া ভাবধারার বাহক হইয়া। তাই যাহাকে আমরা নব্য বাংলা সাহিত্য বলি তাহা প্রধানত হইয়া উঠিল ইংরাজী বুর্জোয়া সাহিত্যের ইতিহাসের একটি ক্রোড়াংক মাত্র; যে বক্তব্য ইংরাজীতে ইতিপূর্বে বলা হইয়া গিয়াছে তাহারই প্রকাশ বাংলা ভাষায়। ইংরাজী বুর্জোয়া সংস্কৃতির বিশেষ সীমাবদ্ধতা এইখানে যে সে সাহিত্যে যেমন সমৃদ্ধ, চিত্র, সংগীত ভাস্কর্য প্রভৃতিতে তেমনি দুর্বল। এ মন্তব্য যে নব্য বাংলা সংস্কৃতি সম্বন্ধে সহজেই খাটে তাহা বোধ হয় তর্কাতীত। ইংরাজের পরিবর্তে যদি

ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে ফরাসী জার্মান বা ইতালীয় জাতি বাংলা দেশে বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে বহন করিয়া আনিত, তাহা হইলে খুব সম্ভব আমাদের চিত্রকলা, সংগীত, ও ভাস্কর্য ইত্যাদ নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিত। স্বাধীন বাংলায় নিশ্চয়ই আমাদের সংস্কৃতিকে একপেশে হইতে দিব না; আমাদেব নিশ্চয়ই দৃষ্টি থাকিবে যাহাতে আমাদের সংস্কৃতিব বিকাশ হইবে সর্বাঙ্গীন। তাহার জন্য ঠিক যেমন করিয়া এতদিন ইংরাজী সাহিত্যের চর্চা আমাদের দেশে পুরুষানুক্রমে সর্বমনপ্রাণ দিয়া হইয়াছিল, প্রায় সেই রকম আবেগ ও আগ্রহের সহিত আমাদের সাধনা করিতে হইবে ইওরোপীয় সংগীত, চিত্র ও ভাস্কর্য প্রভৃতি শিল্পকলার। কেবল এই পথেই মনে হয় আমাদের ললিতকলার বিভিন্ন বিভাগে যে ক্ষীণদশা আসিয়াছে তাহার প্রতিকার হইতে পারে। বাংলাদেশের লোকসাধারণের জীবনযাত্রার মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃতির যে সকল রূপময় প্রকাশ আজো মুমূর্ষু অবস্থায়, তাহাদিগকে ভিত্তি করিয়াই অবশ্য গড়িয়া উঠিবে এই নবমানবিকতার স্বাদেশিক সৌধ।

ইংরাজী কাব্যসাহিতের পঠনপাঠনে ও আলোচনায় প্রচলিত পন্থার সংস্কারের প্রয়োজন হইবে স্বাধীন বাংলায়। ইহা সত্য যে বিদ্যাগার হিসাবে বাংলাদেশে ইংরাজী সাহিত্য আলোচনার গর্ব করিবার মতো ইতিহাস আছে। হিন্দু কলেজের গ্যালারীতে ডি. এল. রিচার্ডসনের ওথেলোর আবৃত্তির কিয়দংশ বাহির হইতে শুনিয়াই লর্ড মেকলে তাঁহার স্বদেশ ছাড়িয়া ভারতবর্ষে আসা সার্থক ভাবিয়াছিলেন। "ভারতবর্ষের আমি সব কিছু ভুলিতে পারি, কিন্তু রিচার্ডসনের শেক্সপিয়ার পড়া কোনদিনই ভুলিতে পারিব না" ইহা মেকেলেরই উক্তি। রিচার্ডসন ছিলেন হিন্দু কলেজের সেই যুগের শিক্ষক যখন 'ইয়ং বেঙ্গল' মনেপ্রাণে ইংরাজ বনিয়া যাইতে প্রস্তুত। কথিত আছে, মাইকেল রিচার্ডসনের এমনি পূজারী ছিলেন যে তাঁহার হস্তলিপি পর্যন্ত অনুকরণ করিতেন। রিচার্ডসন ইংরাজী কাব্য পড়াইতেন ইংরাজ ছাত্রকে যেমন করিয়া ইংরাজী শিক্ষক পড়ায়। তাহার মধ্যে বাঙালী বা ভারতীয় সংস্কৃতির তিলমাত্র স্থান ছিল না। অথচ তিনি যে খাত কাটিয়া দিয়াছিলেন যুগপরিবর্তন ঘটিলেও সেই খাতেই আমাদের দেশে ইংরাজী কাব্য পাঠন চলিতে লাগিল। শিক্ষক ও ছাত্র দুই-ই বাঙালী অথচ পাঠনকালে এই ধারণা স্বীকৃত হইল যেন তাহারা উভয়েই ইংরাজ। শিক্ষণ ও পরীক্ষণ, উভয়েই মূলে রহিল এই মারাত্মক অভ্যাস। ফলে বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষক ও ছাত্রের

গুণগত উৎকর্ষ দ্রুতপদক্ষেপে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জনেন, বাংলাদেশে ইংরাজী-জ্ঞান আজ কোথায় নামিয়াছে। তবুও ইহার আত্যন্তিক প্রতিকার না হইয়া অসাধু অনাচারের প্রসার প্রতিবৎসর বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা যে পরিমাণে বাংলাদেশে হইয়াছে, তাহার তুলনায় ঐ বিষয়ে গবেষণা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। এমন কি অধ্যাপক পার্সিভালের মতো বিশ্বকোষীয় পণ্ডিতও আজীবন শেক্সপিয়ার পড়াইয়া বিশ্বকবি সম্বন্ধে এমন বিস্ময়কর নূতন কিছু বলিয়া যাইতে পারেন নাই যাহা বিশ্বজনের দরবারের হাজির করা যাইতে পারে। অথচ ফরাসী, জার্মান পণ্ডিতেরা এমন আলোচনা ইংরাজী সাহিত্য সম্বন্ধে করিয়াছেন যাহা ইংরাজ-জাতীয় পণ্ডিতেরাও অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। ফরাসী, জার্মান স্বাধীন জাতি। ইংরাজী সাহিত্য আলোচনায় তাহাদের সে তাগিদ ছিল না যাহা আমাদের দেশে ছিল। তবুও তাহারা যে কীর্তি অর্জন করিয়াছে আমাদের তাহা অনায়ত্ত রহিয়া গেল কেন ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। উত্তরে বোধ হয় বলা যায়—রাজনৈতিক পরাধীনতা এক্ষেত্রেও আমাদের দুর্গতির কারণ। ফরাসী বা জার্মান পণ্ডিতের ইংরাজী সাহিত্যের পর্যালোচনা কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক মূল্যজ্ঞানের প্রেরণায়। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহারা এমন কিছু মহার্ঘ্য দ্রব্য পান যাহাতে বিদেশী হইয়াও সভ্য মানুষ হিসাবে মাতিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী সর্বদাই থাকে স্বদেশের সংস্কৃতির মাটিতে প্রোথিত। স্ব-ভাষার মাধ্যমে তাঁহারা বিদেশী সাহিত্যের আলোচনা করেন ও গবেষণার ফল প্রকাশ করেন আপন মাতৃভাষাতেই। সুতরাং তাঁহাদের আলোচনা ও চিন্তার ফল ইংরাজী সমালোচকের উপর একান্ত নির্ভরশীল থাকে না। এমন অনেক সাংস্কৃতিক সমস্যা তাঁহাদের দৃষ্টিপথে পড়ে যাহা ইংরাজ পণ্ডিতের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। কাজেই তাঁহারা দিতে পারেন ইংরাজের নিকট পরিচিত বিষয়েও নূতন আলো ও নূতন ইঙ্গিত। স্বাধীন বাংলায় ইংরাজী সাহিত্যের অনুশীলন আমরা বাদ দিতে পারিব না আমাদেরই সাহিত্যের নিবিড় অনুশীলনের অঙ্গ হিসাবে। কিন্তু এখন হইতে এই অনুশীলন হইবে মাতৃভাষার মাধ্যমে ও বাঙালীর সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে—ইহা আশা করা নিশ্চয়ই বাতুলতা নয়।

কি ভাবে এই নূতন পন্থা প্রয়োগ করা যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবিতকালেই

তাহার পরীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টির কথা বাদ দিয়াও রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী সাহিত্যে অধিকার ছিল অনন্যসাধাধারণ। ইংরাজ কি করিয়া ইংরেজী সাহিত্য পড়ে তাহা তিনি জানিয়াছিলেন হেনরী মর্লি-র অধ্যাপনায়। একথা সত্য, তিনি কোনদিনই ইংরাজী গদ্য লিখিতে পারেন নাই ইংরাজের মতো, যেমন পারিয়াছেন জওহরলাল বা রাধাকৃষ্ণণ। কিন্তু তাঁহারা দুজন ত একভাষী, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দ্বিভাষী। কোন প্রতিভাশালী কবির পক্ষে একই সঙ্গে একাধিক ভাষায় স্মরণীয় কাব্য সৃজন সম্ভব কিনা সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। এটুকু বলা যাইতে পারে মাইকেল যেমন ইংরাজ কবি হইতে গিয়া হইয়া উঠিলেন বাঙালী কবি, রবীন্দ্রনাথ তেমনি বাঙালী কবি থাকিয়াও ইংরেজী সাহিত্যে স্থান অধিকার করিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে ইংরেজী কবিতা পড়াইবার সময় রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় পন্থা উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। বিশ্বভারতীর উদ্যোগে আহূত সভায় তিনি আপন ধরনে ব্রাউনিং-এর কবিতার রসগ্রহণে উপস্থিত শিক্ষিতমণ্ডলীকে অনাস্বাদিত আনন্দ দিয়াছেন। বিদেশী কবিতাকে মাতৃভাষায় পুনরায় সৃজন করিতে পারায় যে আনন্দ তাহা সেই কবিতার সেই ভাষার প্যারাফ্রেজে পাওয়া যায় না, ইহা স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণিত হইল। ইহাতে সন্দেহ নাই যে স্বাধীন বাংলায় ইংরাজী সাহিত্য চর্চায় আমাদিগকে সনাতন প্রচলিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া ররীন্দ্রনাথ প্রদর্শিত পন্থাই অবলম্বন করিতে হইবে।

বিগত ১৮ই জুলাই ইংলণ্ডেশ্বরের স্বাক্ষর ও ১৫ই আগস্ট আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর হইতে যে স্বাধীনতা দ্বিধাবিভক্ত বাঙালীর ভাগ্যে জুটিয়াছে তাহা নিগূঢ়ভাবে সীমাবদ্ধ হইলেও ভবিষ্যৎ প্রসারের আশু সম্ভাবনা তাহাতে নিহিত আছে। অবশ্য তাহার জন্য প্রয়োজন সম্মিলিত জনশক্তির সংঘবদ্ধ প্রয়োগ। সার্থক হইলে তবেই আমরা পাইব পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা। এই গণতান্ত্রিক স্বাধীনতায় ধনবাদ একেবারে বিলুপ্ত হইবে না, তাহারও নির্দিষ্ট স্থান থাকিবে। সুতরাং স্বাধীন বাংলায় অদূরে ভবিষ্যতে যে সংস্কৃতির বিস্তার হইবে তাহা ধনতান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রতিষেধ নহে, সম্প্রসারণ। সুতরাং ধনবাদী জগতে যে কোন দেশে যে কোন কলাবিদ্যায় যাহা কিছু সম্পদ অর্জিত হইয়াছে স্বাধীন বাংলায় সংস্কৃতিবান পুরুষেরা তাহাকে অঙ্গীকার করিয়া নূতনতর বাংলা সংস্কৃতি গঠনে সহায়তা করিতে পারিবেন। দেশব্যাপী শিক্ষাপদ্ধতিতে ইহার জন্য সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিজম্-এর পরাজয়ের পর পৃথিবীতে একটি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। ধনতন্ত্রের একচ্ছত্র অধিকারে রুশবিপ্লব প্রকাণ্ড আঘাত হানিয়াছিল বটে, কিন্তু সমাজবাদ পৃথিবীর একটিমাত্র দেশের বাহিরে প্রসারিত হইতে পায় নাই। বর্তমান যুদ্ধোত্তপর্বের প্রধান বিশেষত্ব সমাজবাদী রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের অভূতপূর্ব প্রভাব বৃদ্ধি, এবং ইওরোপ ও এশিয়া উভয় মহাদেশের বহু দেশেই নূতন অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের বিচিত্র অভিযান। ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে একেবারে চূর্ণ না করিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করা প্রভূত সংখ্যক জনগণের স্বার্থে, ইহাই হইল এই নূতন গণতন্ত্রের মর্মকথা। স্বাধীন বাংলায় এই প্রগতিশীল ভাবধারার অভিধান অনতিক্রম্য। রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই জনগণের দাবী ও তাহার পরিপূরণ ইতিহাসের গতিতে অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। বুর্জোয়া অর্থে বাংলা দেশ স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার জনসাধারণের বহুমুখদাবী মুখর হইয়া উঠিবে যাহার লক্ষণ সীমাবদ্ধ স্বাধীন অবস্থাতেও পরিস্ফুট। শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন শুধুমাত্র অর্থনীতি ও রাজনীতিতে পরিতৃপ্ত থাকিবে না, সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুপ্রেরণায় ও উদাহরণে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত শ্রমিক কৃষক প্রতিষ্ঠানের যোগ হইবে অবশ্যম্ভাবী। সকল দেশেই জনগণের স্বার্থ এক প্রকৃতির বলিয়া শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন স্বভাবতই এক সঙ্গে স্বাজাতিক ও আন্তর্জাতিক। তাই স্বাধীন বাংলার জনগণ, তাহার জাগ্রত শ্রমিক ও কৃষক শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুশীলনে একদিকে চাহিবে তাহার জাতীয় ও আঞ্চলিক শিল্পরূপের পুনরুজ্জীবন, অন্যদিকে চাহিবে বিভিন্ন দেশের অগ্রসতিবান জন-সংস্কৃতির সহিত সৃজনশীল পরিচিতি। দেশ ও বিদেশের সংস্কৃতির মিলনে স্বাধীন বাংলার জনজীবন তখনই হইয়া উঠিবে ঐশ্বর্যবান। 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে' তখনই হইবে বাংলা মায়ের সার্থক অভিষেক।

শিক্ষাব্যবস্থায় ভাষা-সমস্যা

এ কথা বোধহয় বিনা তর্কে বলা যাইতে পারে যে 'শিক্ষিত বাঙালী' বলিতে আমরা এমন লোকের কথা সহজে ভাবি না যাঁহার শিক্ষা মাতৃভাষাতেই সীমাবদ্ধ, ইংরেজির সহিত যাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় নাই। অথচ সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয়, জাতি হিসাবে বাঙালী নিরতিশয় সাহিত্য-অভিমানী, শিক্ষিত বাঙালী অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী। এই দ্বিভাষিত্ব আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বিশেষ লক্ষণ। হিন্দু কলেজের আমল হইতে ইহা চলিয়া আসিতেছে। নূতন বাংলার আদিকবি মধুসূদন শেষ বয়স পর্যন্ত ব্যক্তিগত পত্রাবলীতে কদাচিৎ বাংলা ব্যবহার করিতেন। তরুণ রবীন্দ্রনাথের সদ্য-প্রকাশিত "বৌঠাকুরানীর হাট" পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে যে সুবিচারপূর্ণ পত্র লেখেন, তাহাও ছিল ইংরেজিতে। 'পরিচয়'-এর ত্রৈমাসিক পর্বে সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিত জনৈক ইংরেজ বন্ধুকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল বাংলা ভাষায় আলোচনার জন্য তাঁহার অসুবিধা হইতেছে কি না, তিনি সহাস্যে উত্তর দেন: বেশি কিছু নয়, বাংলা ভাষার শব্দসম্পদ কি শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ইংরেজি থেকেই নেওয়া? মনে রাখা দরকার ঠিক সেই সময়ে 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর লেখকবর্গের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজি শব্দ বর্জন করিয়া বিশুদ্ধ বাংলা ভাষার মাধ্যমে আপনার বক্তব্যকে প্রকাশ করা। এই দ্বিভাষিত্বের অবসান ঘটিয়াছে, এমন কথা আজিও বলা যায় না।

এই অবস্থায় ক্ষুব্ধ হইলেও বিস্মিত হওয়া চলে না। যে শিক্ষা-ব্যবস্থা এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত তাহা ইংরেজ-শাসনের সৃষ্টি। বিদেশী শাসকের শাসন-পদ্ধতির সহায়করূপে ইহার উদ্ভব। এ-দেশের লৌকিক সংস্কৃতিকে পরিপুষ্ট করার কোনো সদুদ্দেশ্য ইহার পিছনে ছিল না। ইহা সত্ত্বেও বাংলার জাতীয় জীবন ইহাতে পঙ্গু না হইয়া ভবিষ্যতে অগ্রগমনের পথে পদক্ষেপের শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিল, এ গৌরবময় ঐতিহ্য ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে।

ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নীতিতে দেখা যায়, যে সামাজিক ব্যবস্থা কোনো এক যুগে খুলিয়া দেয় মুক্তির পথ, যুগান্তরে তাহাই হইয়া দাঁড়ায় বন্ধনের নিগড়। যে দ্বিভাষিত্ব কোনো এক সময় সঞ্চার করিয়াছিল প্রাণশক্তি, এখন প্রয়োজন তাহার সংকার-সাধন, ইংরেজি ভাষার সম্মোহ হইতে বাংলাকে রক্ষা করা, বাংলার ব-দ্বীপের মতো বাংলা ভাষার প্রাণ-গঙ্গাকে বহুমুখে প্রধাবিত করিবার পথ অবারিত করা।

দ্বিভাষিত্বের এই নাগপাশ দীর্ণ করিতে হইলে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। কারণ, ইহাতে ইংরেজি ভাষার শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনের যাবতীয় বিষয়ের অনুশীলন, ভাষাশিক্ষার প্রয়োজন এই অনুশীলনের মাধ্যম হিসাবে। ইংরেজ-শাসনের মহিমায় এই সহজ সত্যটি বহুদিন আমাদের শিক্ষাজগৎ হইতে নির্বাসিত ছিল। বৈষয়িক জ্ঞানার্জন ছিল গৌণ, মুখ্য ছিল ইংরেজি ভাষার নিপুণ ও নির্ভুল প্রয়োগ। এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে এমন এক সময় ছিল যখন ইংরেজি ভাষার সহায়তা ব্যতীত নানা বিষয়ের প্রবেশপথ উন্মুক্ত করা যাইত না। কিন্তু শিক্ষার্থী মাত্রকেই যে-কোনো বিষয় শিক্ষা করিতে গেলে প্রথমেই আয়ত্ত করিতে হইবে ইংরেজি ভাষায় বুঝিবার ও বুঝাইবার ক্ষমতা, এ-হেন অদ্ভুত ব্যবস্থা বহুদিন ধরিয়া প্রচলিত থাকা কেবল পরাধীন দেশেই সম্ভব। অবশ্য পরাধীন অবস্থাতেও ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠিয়াছিল। আমাদের দেশের চিন্তাশীল মনীষীদের কাছে ইহা অবিদিত ছিল না যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বাহন মাতৃভাষা। তাঁহাদের প্রতিবাদে আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরেজি ভাষার আধিপত্য কিছুটা খর্ব হইলেও মোটামুটি কায়েম রহিয়া গেল ; তাহার একটি কারণ, বিদেশী সরকারের অনমনীয়তা। অন্য কারণটি এই যে বিদেশী ভাষার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বহু ছাত্র নানা বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিয়াছিল, যাহার ফলে

এই ব্যবস্থার কুফল অনেক পরিমাণে লোকচক্ষের অগোচরে থাকিয়া যায়। এই আংশিক সাফল্যের কারণও সুস্পষ্ট। ইংরেজি শিক্ষাই ছিল তখন সাংসারিক জীবনে উন্নতির একটিমাত্র পথ। এই শিক্ষায় মেধাবী ছাত্রের সাফল্যের পুরস্কার প্রায় হাতে-হাতে মিলিত আর সাধারণ লেখাপড়া শিখিয়াও কাহাকে বড় বসিয়া থাকিতে হইত না, একটা না একটা কাজ জুটিয়া যাইতই। জুটিয়া যে যাইত তাহার কারণ শিক্ষিত শ্রেণীর সংখ্যাল্পতা। দেশের বিশাল জনসাধারণের তুলনায় ইহাদের মোট সংখ্যা ছিল অতি তুচ্ছ। বিদেশী শাসকের লুণ্ঠন-অতিরিক্ত ভুক্তাবশেষ ইহারাই কাড়াকাড়ি করিয়া খাইত, আপন-আপন যোগ্যতানুসারে, দেশের জনসাধারণের ভাগ্যে যাহাই ঘটুক না কেন। ইংরেজি শিক্ষিতগণের এই আর্থিক ও মানসিক ব্যবধানে সৃষ্ট হইল এক পরস্পর-বিরোধী পরিস্থিতি যাহার সুযোগ লইতে বিদেশী শাসক কখনও অবহেলা করে নাই।

দ্বান্দ্বিক দর্শনের একটি নীতিতে বলে, পরিমাণগত পরিবর্তনের ফলে কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে গুণগত পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। আমাদের দেশে দেশে ইংরেজি শিক্ষিতগণের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে এই গুণগত উৎক্রান্তির মুহূর্ত আসিয়া পড়িল। যত লোকে কাজের উপযুক্ত হইল, তাহাদের উপযোগী কাজ তত মিলিল না। চাহিদা অপেক্ষা জোগানের উদ্বৃত্তি হওয়ায় ইংরেজি শিক্ষার আর্থিক মূল্যে নামিতে শুরু করিল। এই অর্থনৈতিক অধোগমনের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিল শিক্ষিত শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলন, ইংরেজি-শাসনের বিরুদ্ধে গোষ্ঠীবদ্ধ প্রতিবাদ। প্রবল বিদেশী শাসকের সহিত স্বীয় স্বার্থে সংগ্রাম করিতে গেলেও অপরিহার্য হইয়া পড়ে জনসাধারণের সমর্থন ও সহযোগ। তাই জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষাও এই শিক্ষিত শ্রেণীর দাবিদাওয়ার মধ্যে স্থান পাইতে লাগিল। জনশিক্ষা এই দাবির অঙ্গ। এই দাবি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ন্যায় ও সুবিধা, উভয়েরই তাগিদে জাতীয় নেতারা অনিচ্ছুক বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে এই দাবি পেশ করিতে লাগিলেন। ইহারই চরম প্রকাশ, সুভাষচন্দ্রের অনুপ্রাণনায় জওহরলালের নেতৃত্বে পরিচালিত কংগ্রেসী জাতীয় পরিকল্পনার শিক্ষা-সম্পর্কীয় পুস্তকে। পরম আশ্চর্যের বিষয়, এই মূল্যবান গ্রন্থটি বাজারে দাম দিয়াও সহজে পাওয়া যায় না। এই গ্রন্থে জাতীয় নেতারা ঘোষণা করিয়াছেন, যদি কখনও তাঁহারা দেশের শাসনভার হাতে পান তাহা হইলে কিভাবে দেশের

শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢালিয়া সাজিবেন। জাতীয় নেতাদের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি সার্থক হইয়াছে, আজ শাসন-ক্ষমতা তাঁহাদের করায়ত্ত। তবুও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় কতটুকু অদলবদল তাঁহারা করিতে পারিয়াছেন ?

উক্ত গ্রন্থে জাতীয় নেতারা বলিতেছেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁহাদের মূল দাবি ঃ বিনা বেতনে ও আবশ্যিকভাবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা। অর্থাৎ অবিভক্ত ভারতের প্রত্যেকটি বালক-বালিকাকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত অষ্টবর্ষব্যাপী শিক্ষার ভার লইতে হইবে দেশের শাসকবর্গকে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে এই দাবি নিছক আবেগ বা কল্পনা-প্রসূত নহে। অনেক সভ্যদেশে এ ব্যবস্থা অনেক আগে হইতেই প্রচলিত আছে। সুতরাং সহজেই আশা করা যায়, যাঁহারা এই দাবি করিয়াছিলেন, ক্ষমতা হাতে পাইলে তাহাকে প্রয়োগ করিতে তাঁহাদের দ্বিধাগ্রস্ত হইবার কোনো কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে, ভারত-বিভাগের অজুহাতে ক্ষমতার গদিতে আরোহণ করিয়া তাঁহাদের মনোবৃত্তি বদলাইয়া গিয়াছে। জনশিক্ষার বিস্তারে আর সে আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। শিক্ষামন্ত্রী স্বয়ং কবুল করিতেছেন, তাঁহার হাতে উপযুক্ত অর্থ নাই, যে অজুহাত শুনিতে আমরা ইংরেজ আমল হইতেই অভ্যস্ত। আরো দেখিতেছি, যেটুকু তাঁহার হাতে আছে তাহা ব্যয়িত হয় জনশিক্ষার বিস্তারে নয়, নানা আনুষঙ্গিক উপসর্গের তুষ্টি-সাধনে। ইহাও ঠিক ইংরেজ আমলেরই অনুরূপ। দেশের জনসাধারণের স্বার্থ আগের মতো এখনও উপেক্ষিত।

আমাদের স্পষ্ট করিয়া বোঝা দরকার যে উপরি-উক্ত সর্বজনীন শিক্ষার দাবি পূরণ করা না হইলে শিক্ষাক্ষেত্রে অন্য সমস্ত প্রকার সংস্কারই তলহীন পাত্রে জলঢালার মতো একান্তভাবে ব্যর্থ হইতে বাধ্য। ইহার জন্য যত অর্থ ব্যয় করা প্রয়োজন তাহা করিতেই হইবে, অন্যথায় শিক্ষা-সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যারই সমাধান হইবে না। দ্বিভাষিত্ব সমস্যার সমাধানও নির্ভর করিতেছে এই সর্বজনীন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তনের উপর।

ছয় হইতে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রত্যেকটি শিশুকে রাষ্ট্রের ব্যয়ে শিক্ষিত করিতে হইলে যে শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত করিতে হইবে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে শিক্ষার্থীগণকে বহুবিধ বিষয়ের সহিত পরিচিত করাইয়া দেওয়া। এই পর্বের নাম দেওয়া যাইতে পারে শিক্ষার প্রথম পর্ব। ইহাকে বর্তমানে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষার সহিত ঘুলাইয়া ফেলা উচিত নহে। এই প্রথম পর্বের শিক্ষার

ফলে, জাতির সমস্ত শিশু এমন শিক্ষা পাইবে যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে দেশের কর্মক্ষম অধিবাসী হইতে পারে, এমনকি যদিও তাহারা পরে আর উচ্চতর শিক্ষা না পায়। বলার দরকার করে কি যে এই পর্বে সমস্ত অধীতব্য বিষয়ের শিক্ষা ও পরীক্ষা হওয়া উচিত মাতৃভাষার মাধ্যমে ? ইংরেজি শিক্ষার কোনো প্রয়োজন এই পর্বে আছে, তাহা মনে হয় না বিচারসিদ্ধ। এই পর্বের শেষে চৌদ্দ বৎসরে যে ব্যাপক পরীক্ষা হইবে তাহার পাঠ্যাবলী, ইংরেজি ও সংস্কৃত বাদ দিলে, বর্তমান ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুল ফাইনাল অপেক্ষা কোনো অংশে ন্যূন না হইয়া বরং বিস্তৃততর হইতে পারে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানাবিধ বিষয়—তত্ত্বগত ও পরীক্ষণ-গত—তখন পাঠ্যাবলীর অন্তর্গত করা চলিবে। তাহাতে ছাত্রদের বোধশক্তি ছাড়া কমিবে না।

প্রশ্ন উঠিবে, চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত বাঙালী ছাত্রকে কি তাহা হইলে বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শিখিতে হইবে না ? বাঙালীরা কি তাহা কূপমণ্ডূক হইয়া যাইবে না ?

উত্তরে বলা যায়, শিক্ষার এই প্রথম পর্বকে দুটি উপপর্বে ভাগ করা যায়, শিক্ষার্থীর বয়স অনুসারে : (১) ছয় হইতে এগারো ; (২) এগারো হইতে চৌদ্দ।

এগারো বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত যাহা কিছু শিখানো হইবে তাহাতে বাংলা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা চলিবে না। এই ব্যবস্থায় জ্ঞানবৃদ্ধি কতখানি সম্ভব তাহা যাঁহারা পুরনো কালের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার সহিত পরিচিতি আছেন তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। বিশেষ করিয়া বাংলা ভাষার চর্চা। শব্দরূপ ধাতুরূপ দিয়া সংস্কৃত ভাষার সন্ধি-সমাস কৃৎ-তদ্ধিতের নিয়মগুলি বাংলার মাধ্যমেই শিখানো হইত যাহাতে পরে সংস্কৃত শেখার পথ অতি সহজ হইয়া যাইত, অথবা সংস্কৃত ব্যাকরণ না শিখিলেও বাংলার যেটুকু অংশ সংস্কৃতের উপর নির্ভরশীল তাহা বুঝিতে মোটেই বেগ পাইতে হইত না। ইংরেজি শিক্ষার অভাব মিটাইতে হইবে অন্যভাবে। বহুল পরিমাণে অনুবাদ ও সংক্ষিপ্তসারের সহায়তায়। দেশের মধ্যে যাহারা ইংরেজীশিক্ষিত, তাহাদের প্রধান কর্তব্য হইবে এই অভাব দূরীকরণের বহুবিধ প্রচেষ্টা কিন্তু যেহেতু বাংলা রাজ্য নিখিল ভারতীয় রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল, সেইজন্য বাঙালী ছাত্রকে হিন্দী শিখিতে হইবে আবশ্যিকভাবে বারো হইতে চৌদ্দ পর্যন্ত। চৌদ্দের পরে যখন অর্থাভাবে অধিকাংশ ছাত্রের শিক্ষা সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তখনও

তাহারা বঙ্গীয় ও ভারতীয় সমস্ত রাষ্ট্রীয় প্রশ্নে ভাষার জ্ঞানের অভাবে যোগদান হইতে বঞ্চিত হইবে না। এই প্রসঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন, যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী তাহাদেরও ভারতের অন্য যে কোনো একটি ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয়ভাবে পাঠ করা উচিত বারো হইতে চৌদ্দ এই পর্বে।

শিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব হইবে পনেরো হইতে সতেরো। যে সব ছাত্রের আর্থিক সঙ্গতি আছে বা যাহারা জলপানি ইত্যাদি পাইয়াছে তাহারাই প্রবেশ করিবে এই পর্বের শিক্ষায়তনগুলিতে। এই পর্বের পাঠ্যাবলী বর্তমান ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পাঠ্যাবলী হইতে ব্যাপকতর হইবার পথে কোনো বাধা দেখা যায় না। এখানেও শিক্ষার পরীক্ষার প্রধান বাহন হইবে বাংলা। হিন্দী হইবে অন্যান্য বিষয়ের মতো একটি শিক্ষণীয় বিষয়, ঐচ্ছিক, কিন্তু আবশ্যিক নহে। এই পর্বে শুরু হইবে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা। নানাবিধ বিষয়ে ও দুইটি ভাষায় জ্ঞানলাভের ফলে এই বিদেশী ভাষাটি শেখার কষ্ট আগের চেয়ে অনেক কম হইবে ইহা আশা করা যায়। তাহা ছাড়া আমাদের ইংরেজি শেখার পক্ষেও পরিবর্তন ঘটিবে। ইংরেজি শেখার মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে ইংরেজি বই পড়িয়া বুঝিতে পারা ও তাহা হইতে বিষয় অনুসারে জ্ঞান আহরণ করা। ইহার জন্য যে ধরনের ইংরেজি রচনার প্রয়োজন তাহাই হইবে পরীক্ষার বিষয়। ইংরেজি কবিতা পড়িয়া তাহার ব্যাখ্যা বা রসোপলব্ধি ইংরেজিতে রচনা করার মতো অযৌক্তিক শাসনের যন্ত্রণা হইতে ছাত্রেরা অব্যাহতি পাইলে তাহাদের শিক্ষার আনন্দ অনেক পরিমাণে বাড়িয়া যাইবে। এই পর্বে তাই ইংরেজি ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক হইলেও তাহা গুরুতর ভাবে পরিণত হইবে না বলিয়াই মনে হয়। কারণ মাতৃভাষা ছাড়া একই কালে একটির বেশি নূতন ভাষা শিখিতে হইবে না অবশ্যশিক্ষণীয় ভাবে, যদিও এখন যাহারা স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেয়, তাহাদের শিখিতে হয় তিনটি, হিন্দী, ইংরেজি ও সংস্কৃত।

প্রশ্ন উঠিবে, তাহা হইলে সংস্কৃত শিক্ষার কি হইবে? বাঙালী ছাত্র কি তাহা হইলে তাহার পিতৃপুরুষের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত হইবে?

এই ভীতি যে অমূলক তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোঝা যায়। ভারতীয় ঐতিহ্যের মর্মকথা যতদিন কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষার কঠিন কোষে আবদ্ধ থাকিবে ততদিন তাহা আমাদের জনসাধারণের জ্ঞানে সত্য হইয়া উঠিতে পারে না। সংস্কৃতবিদ্‌গণের উচিত, এই ঐতিহ্যসম্পদকে বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয়

ভাষার ভিতর দিয়া বহুলভাবে বিকীরিত করা। ভারতীয় ঐতিহ্যকে যাহারা বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিবে তাহাদের শিক্ষার জন্য সংস্কৃতভাষা চর্চার ব্যবস্থা থাকিবে তৃতীয় পর্বে, আঠারো হইতে কুড়ি, যাহা হইবে প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। বিশ্বের সকল বিষয়ের জ্ঞান-ভাণ্ডারের দ্বার এখানে উন্মুক্ত থাকিবে সকল প্রকার শিক্ষার্থীর জন্য। বাংলা, হিন্দী ও ইংরেজি, তিনটি ভাষাতেই জ্ঞানার্জনের প্রস্তুতি লইয়া এখানে আসিবে ছাত্রেরা, যদিও তাহাদের মুখ্য মাধ্যম হইবে তাহাদের মাতৃভাষা। দ্বিতীয় পর্বের পর ডাক্তারি, ইন্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ব্যবহারিক ও বৃত্তিগত বিষয়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পক্ষেও কোনো ভাষাগত বাধা থাকিবে না, প্রাচীন ও আধুনিক অন্যান্য দেশী ও বিদেশী ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থাও বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকিবে, জ্ঞানস্পৃহা যাহাতে কোথাও ভাষা জ্ঞানের অভাবে ব্যাহত না হয়। নানা ঐতিহাসিক কারণে ইংরেজি সাহিত্যের সহিত বাংলা সাহিত্যের চর্চার বিশেষ ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন আছে। এই বিভাগে কেবল বই পড়া নয়, যাহাতে ছাত্রেরা ইংরেজিতে সাহিত্যিক রচনা, বিতর্ক, আবৃত্তি ও সপ্রতিভ কথোপকথন করিতে পারে তাহার জন্য উপযুক্ত আয়োজন করিতে হইবে। এই ধরনের ইংরেজি শিক্ষা বাংলার সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছাইয়া নিবার পথেও বিশেষ কার্যকরী হইবে। ইংরেজি ভাষার অত্যাচারে জনশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার মধ্যে যে আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে তাহার সুখকর পরিসমাপ্তি এইভাবে ঘটিতে পারে যদি আমরা বাংলা হিন্দী ইংরেজী ও সংস্কৃত, কাহারো প্রকৃত দাবিকে উপেক্ষা না করিয়া প্রত্যেকটিকে তাহার উপযুক্ত স্থানে বসাইতে পারি।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ

কার্ল মার্কস আজ পৃথিবীর দেশে দেশে সমাজবিপ্লবীগণের শ্রেষ্ঠতম গুরু বলিয়া পূজিত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে সমাজবিপ্লবী প্রচেষ্টায় যোগ দিয়া নেতৃত্ব অর্জ্জনের পূর্ব্বে মার্কস দর্শনশাস্ত্রের অভিনিবিষ্ট ছাত্র ছিলেন। পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক কার্য্যাবলী তাঁহার বস্তুবাদী দর্শনেরই নৈয়ায়িক ও লৌকিক প্রয়োগ। কাজেই মার্কসবাদ স্পষ্টরূপে আয়ত্ত করিতে হইলে শুধু ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যাতেই তুষ্ট থাকিলে চলে না, দার্শনিক ভিত্তি, অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদকেও পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়। নাহলে যে পদে পদে বিচ্যুতি ঘটার সম্ভাবনা আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রের ইতিহাসে তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে।

সাম্যবাদী কার্য্যাবলী বলিতে আমরা সাধারণতঃ ইউনিয়ন গড়া, আন্দোলন চালানো, ধর্ম্মঘটের আয়োজন ইত্যাদি বুঝি। তাহার সহিত দর্শনশাস্ত্রের এমন কি নিকট সম্বন্ধ যে দর্শনের আলোচনা ছাড়া প্রকৃত মার্কসবাদী কর্ম্মী হওয়া যায় না?

প্রত্যেক কর্ম্মীর নিশ্চয়ই এই অভিজ্ঞতা যে কর্ম্মের পথে মাঝে মাঝে সংকট উপস্থিত হয়, যখন বাছিয়া লইতে হয় কোন পথ ঠিক, কোন পথ ভুল। আন্দোলনের জীবন মরণ অনেক সময় এই নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করে।

সংকটকালে আমরা কি ভাবে চলিতে পারি ? না ভাবিয়া চিন্তিয়া যে পথটি আমার নিজের পক্ষে সুবিধার মনে হয় তাহা ধরিয়া চলিতে পারি। নেতা যে পথ দেখাইয়া দেন, না ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই পথে চলিতে পারি। এই দুই পথে ভাবনার দায় এড়ানো যায় বটে, দুযেতেই বিপদ অনেক। প্রথম পথে বিপদ এই, প্রত্যেক্যের সুবিধার সহিত অন্যান্যের সুবিধার সংঘাত হইবার ষোল আনা সম্ভাবনা। ফলে ঐক্য ভাঙিয়া যায় ও আন্দোলনের শেষ হয়। দ্বিতীয় পথে বিপদ এই যে নেতা যদি নিজের সুবিধামতো স্বার্থের খাতিরে অন্যদের ভুল পথে চালান ? তা ছাড়া নেতার সাধুত্বে সন্দেহ না করিয়া বলা যায়, নেতাও মানুষ, তিনিও ত ভুল করিতে পারেন ; ভুল সাধু উদ্দেশ্যে করিলেও ভুল, তাহার ফলে অনিষ্ট হইয়া থাকে। তিনি ভুল করিলে সংশোধনের উপায় কি ? অতএব প্রশ্ন জাগে ভুল পথ ঠিক পথ বাছিবার সত্য মিথ্যা নির্ধারণ করিবার, এমন কোন উপায় আছে কিনা যাহা দ্বারা সকলের ভুল—নিজেরই হোক বা নেতারই হোক—সংশোধন করা যায়, বা সংকটকালে ভুল না করিয়াই ঠিক পথ বাছিয়া সফলকাম হওয়া যায়। মার্কস-বাদীগণের দাবী এই যে মার্কসীয় শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা করিলে সকল শ্রমিক সমস্যার সম্যক্ সমাধানের সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

মার্কস্‌বাদ কি তবে কেবল তাহাদেরই অবলম্বন যাহারা সাক্ষাৎভাবে শ্রমিক-আন্দোলনে নিযুক্ত ? উত্তরে বলা যায়, ইতিহাসতঃ মার্কসবাদ হেগেলের দর্শন হইতে উদ্ভূত, তাহার সংশোধিত উন্নততর সংস্করণ। হেগেলের দর্শন সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে, জীবনের এমন কোনো বিভাগ নাই যেখানে তাহার প্রভাব খাটে না। তাই মার্কসীয় দর্শন সম্বন্ধে একথা অধিকতর প্রযোজ্য।

দর্শনের সহিত জীবনের কি সম্বন্ধ ? মোটামুটি বলা যাইতে পারে, দর্শনের সহায়তায় আমরা জীবনেও সবক্ষেত্রে সত্যকে চিনিতে পারি। দর্শনের কাজ সত্যের অনুসন্ধান। প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা এমন কি কঠিন কাজ ? আমরা প্রত্যেকে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা যে অব্যবহিত অভিজ্ঞতালাভ করি তাহাই আমাদের নিকট সত্য। এ উক্তি একান্ত মিথ্যা নয় সভ্যতার এক যুগে এ দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহার অসত্যতা সহজেই বোঝা যায়। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ সত্য হইলে মানিতে হয়, পৃথিবী সমতল, সূর্য্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, ইত্যাদি। সুতরাং সবক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা চলে না, তাহাকে বুদ্ধি দিয়া শোধিত

করিতে হয়। বুদ্ধির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝিতে পারি যে প্রতীয়মানতার সহিত বাস্তবতার বিরাট পার্থক্য। যে শাণিত ও সুনিয়মিত বুদ্ধির প্রয়োগে আমরা প্রতীয়মানতার আবরণ ভেদ করিয়া বাস্তবতায় পেঁীছিতে পারি তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে বিজ্ঞান। সভ্যতার আদি যুগগুলিতে দর্শন ও বিজ্ঞানে কোন তফাৎ করা হইত না। জড় বিজ্ঞানের অন্য নাম ছিল প্রকৃতি-দর্শন। ক্রমে জ্ঞান বিস্তারের ফলে ও সহায়তাকল্পে সত্যানুসন্ধানকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়, ও প্রত্যেক বিভাগের বিশেষ জ্ঞানের নাম হয় তদ্বিষয়ক বিজ্ঞান। দর্শন কথাটির অর্থ দাঁড়ায়, পৃথক-বিজ্ঞানের অতীত সকল-বিজ্ঞানের লক্ষ্য চরম সত্যের অনুধাবন।

চরম সত্য ব্যাপারটি কি? ইহার দ্বারা বোঝা যায়, আমাদের অভিজ্ঞতায় এমন অনেক কিছুই আসে যাহা সত্য নয়, যাহা মিথ্যা বা মায়া; আরও এমন অনেক কিছু আসে যাহা খণ্ডশঃ সত্য হইলেও সমগ্রভাবে সত্য নয়, চরম সত্য নয়। দর্শনের কাজ হইল এই সব প্রকার ভেদগুলিকে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া। কাজেই দর্শন শাস্ত্রের প্রথম কাজ হইল, কি করিয়া সত্যকে জানা যায় তাহার প্রণালী উদ্ভাবন করা।

এই প্রণালীটি কি? এ সম্পর্কে লেনিন বলেন, "জন্মের পর চেতনাসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের জগত আমাদের মনের উপর অসংখ্য ছাপ ফেলে, সোজা-সুজি যেন বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো, ক্রমে কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন করিতে শিখি। ক্রমে গুণবোধ বিকশিত হয়। যাহাতে আমরা বস্তু বা ঘটনাকে সংজ্ঞা দিতে পারি: পরে আসে পরিমাণবোধ। তাহার পর অনুশীলন ও অনুধাবনের দ্বারা আমরা ভাবিতে শিখি সাযুজ্য ও পার্থক্য, ভিত্তি, সার, প্রভৃতি প্রশ্ন সম্বন্ধে। জ্ঞানের এই ধারাগুলি সবই যায় জ্ঞাতা হইতে জ্ঞেয়ের দিকে, পরীক্ষণের দ্বারা ইহাদের যাচাই হয়, ও যাচাইয়ের পর আমাদের সত্যোপলব্ধি হয়।" প্রথমে মনের উপর জগতের ছাপ ইন্দ্রিয়ের মধ্যস্থতায়, পরে ছাপ হইতে জগৎ সম্বন্ধে ধারণা বা আইডিয়া; এই অব্যবহিত জ্ঞান ও পরিবর্ধিত জ্ঞান, জ্ঞানের প্রত্যেক স্তরে ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ ও গুরুত্ব, দর্শনের ইতিহাসে বরাবর কেন্দ্রস্থল দখল করিয়া আছে। গ্রীকদের আমল হইতে এই প্রশ্ন চলিয়া আসিতেছে,—কোনটি সত্য, ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষ না যুক্তিবিচার? যদি ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষই সত্য হয় তাহা হইলে তাহাদের অসীম বৈচিত্র্যের মধ্য হইতে আমরা কি করিয়া বিধিবদ্ধ একত্ব সম্পাদন করি? আসলে প্রশ্নটি এই, যদি সত্য বলিতে আমরা

বুঝি যে আমাদের বোধশক্তি বাস্তবকে প্রতিবিম্বিত করে, তাহা হইলে আমরা কি করিয়া নিশ্চিত হইতে পারি যে আমাদের একাধিক বিভিন্ন ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হইতে সেই সব সাধারণ প্রত্যয় করা সম্ভব যাহা দ্বারা আমাদের পাদার্থিক জ্ঞানলাভ হয় ? স্মরণ রাখিতে হইবে যে দর্শন ও বিজ্ঞানের কাজ বিশেষ প্রত্যক্ষ হইতে সুরু করিয়া ক্রমশঃ বিস্তৃততর সাধারণ প্রত্যয়ে উপনীত হওয়া। বিশেষের সহিত সাধারণের এই দ্বন্দ্ব যুগে যুগে দার্শনিক বুদ্ধিকে এড়াইয়া আসিয়াছে। দার্শনিকেরা কেহবা একদিক কেহবা অন্যদিকে ঝোঁক দিয়াছেন, তাহাতে মূল সমস্যার সমাধান হয় নাই, জটিলতা বাড়িয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, কোন জ্ঞানই নিশ্চিত নহে, সকল জ্ঞানই আপেক্ষিক ; কাহারো মতে জঙ্গমতা বলিয়া কিছু নাই, গতি মায়া ; কেহবা, যেমন প্লেটো, বলিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গম্য বস্তুজগতের অস্তিত্ব কল্পনামাত্র, ইন্দ্রিয়াতীত ভাবজগতই একমাত্র সত্য।

প্লেটোর মতো, দৃশ্যমান পরিবর্ত্তনশীল জগৎ পর্দ্দায় প্রক্ষিপ্ত ছায়াবাজীর মতো অলীক। এই ছায়াবাজির অন্তরালে আছে পরিবর্ত্তনহীন পূর্ণ সত্তা যাহা মানুষের বুদ্ধির দ্বারা অজ্ঞেয়। সেইরূপ, সুন্দর বা শিব এজগতে কিছুই নাই , পূর্ণ সৌন্দর্য্য, পূর্ণ শিবত্ব মানুষের বোধাতীত ; আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা ভঙ্গুর জগতে সেই পরিবর্তনহীন পূর্ণ সৌন্দর্য্যের বা পূর্ণ শিবত্বের ক্ষণিক ও খণ্ডিত প্রকাশ।

অথচ প্লেটোর স্বদেশবাসী দার্শনিক হেরাক্লাইটাস ও ডিমক্রাইটাস বস্তুর জঙ্গমতাকেই নিত্য সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মতে জগতে স্থিতিশীল অপরিবর্ত্তনীয় কিছুই নাই। বস্তুর গতিশীলতার ফলেই সৃষ্টি হইতে বিনাশ এবং বিনাশ হইতে সৃষ্টি অবিরাম চলিতেছে। চেতনা ও তাহা হইতে উপলব্ধ সত্য, শিব, সুন্দর সব কিছুই পরিবর্ত্তনশীল বস্তু বিশ্বের অন্তর্গত।

গ্রীসদেশ ইউরোপীয় দর্শনের আদি তীর্থ। সেখানে দর্শনের যে দুই খাত কাটা হইল, তাহাদের স্রোতের ধারা আজও বহিয়া চলিয়াছে। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে যেমন প্রশ্ন ওঠে,—ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, না জগতের অস্তিত্ব অনাদি ; সেইরূপ দর্শনের ক্ষেত্রে বার বার প্রশ্ন উঠিয়াছে—আগে ভাব পরে সত্তা, আগে আত্মা বা চেতনা পরে প্রকৃতি বা জড়। অথবা তাহার বিপরীত ? কে কাহার হইতে উদ্ভূত ? এই একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া, এঙ্গেলস্-এর মতে, পৃথিবীর সমগ্র দার্শনিক দলকে দুইটি বৃহৎ শিবিরে ভাগ করা যায়। যাহারা মানে,

আত্মা আগে জড় পরে, অতএব জগৎ কোনও প্রকারে কাহারো দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা ভাববাদী। আর যাহাদের মতে, প্রকৃতি আগে, চেতনা তাহা হইতে সঞ্জাত, তাহারা জড়বাদী।

বহু শতাব্দীব্যাপী এই বিরাট মর্ম্মভেদের প্রকৃত হেতু এই যে যে-জগতে আমাদের বসবাস, সেখানে চেতন ও অচেতন এমন অচ্ছেদ্য ভাবে সম্পৃক্ত যে তাহাদের উভয়ের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরস্পরের যোগরহিত অবস্থায় অনুধাবন করার উপায় আমাদের নাই। অচেতন-আধার-বর্জ্জিত নিরবলম্ব চৈতন্যের কোনো অভিজ্ঞতা আমাদের বিচারবুদ্ধি স্বীকার করে না। কাজেই অনাদি অনন্ত পরম চৈতন্য—যাহা ভগবানেরই নামান্তর—বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞার বহির্ভূত। অপর পক্ষে চেতনাহীন জড়ের অস্তিত্ব আমরা দেখিতে পাই বটে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে আমরা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণ করি চেতনার সহায়তায়। অর্থাৎ বলা চলে, আমরা যাহা জানি তাহা প্রকৃত জড় নহে, তাহা আমাদের চেতনার উপর জড়ের প্রতিঘাত। সুতরাং আমরা যাহাকে জড়-বিজ্ঞান বলি তাহা প্রকৃত পক্ষে জড়ের জ্ঞান নহে। আমাদেরই চেতনার বিশেষ বিশেষ অবস্থার জ্ঞান। তাহা প্রকৃত বিজ্ঞান নহে, তাহা স্বমায়িক।

পরস্পরের অচ্ছেদ্য যোগ সত্ত্বেও জড় ও চেতনের স্বভাব সুমেরু কুমেরুর মতো বিপরীতপন্থী। জড়ের লক্ষণ—স্থায়িত্ব, অনভিযোগ নিয়মানুগত্য। আবহমানকাল ধরিয়া ধূলিকণা হইতে নীহারিকাপুঞ্জ পর্য্যন্ত একই নিয়ম মানিয়া আসিতেছে। চেতনের লক্ষণ—স্বল্পায়ুতা, জঙ্গমতা, নিয়মাতিক্রান্ত স্বেচ্ছাচারিতা। ক্ষীণতম জীবকোষ হইতে বয়স্ক নরনারী পর্য্যন্ত বৃদ্ধি ও ক্ষয় পায় আপন অন্তরস্থ শক্তির অনুপাতে, বাঁধা নিয়মের মানে নয়। পরস্পরের নিত্যযোগ বজায় রাখিয়াও এই দুইটি মেরুতে পরস্পরের নিত্যবিরোধ ; যে যান্ত্রিক বিজ্ঞান জড় জগতের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতেছে চেতনার জগতে তাহা অপ্রযোজ্য ; যে ধ্যান ও কল্পনার দ্বারা চেতনার জগতে প্রবেশ করা যায় তাহা জড় জগতে অচল। এই দ্বৈত দৃষ্টি দার্শনিক মহলে প্রচলিত ছল, হেগেলের আবির্ভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। হেগেলের লোকোত্তর প্রতিভা দর্শনের ইতিহাসে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইল। সনাতন দ্বৈতবাদের নিরসন কল্পে তিনি যে সংহিতার প্রবর্তন করিলেন তাহা মানব অভিজ্ঞতার সকল প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াও একই নিয়মশৃঙ্খলায় অনুশাসিত, জীবদেহের মতো বহুলাঙ্গ হইয়াও একাবয়ব।

হেগেলীয় দর্শন অদ্বৈতবাদী। তাহার অর্থ এই যে জড়জগত ও চেতনজগত দৃষ্টিগোচর অসংখ্য পার্থক্য সত্ত্বেও একাই নিয়মাবলীর অধীন। জড়ে ও চেতনে মূলগত বিভেদ নাই, যাহা আছে তাহা আত্মার অভিব্যক্তির বিভিন্ন স্তরের পার্থক্যমাত্র। বিশ্বচরাচরে একক কিছুই থাকিতে পারে না, প্রত্যেক বস্তু বা ধারণা বিশ্বের অবশিষ্টাংশের সহিত সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত। রসজ্ঞ সমালোচক জানেন যে কোন চিত্রের যে কোন একটি ছিন্নাংশের মধ্যে সেই চিত্রের সমগ্রতা নিহিত থাকে। তেমনি, বিশ্বের ক্ষুদ্রতম অংশের মধ্যেও সমগ্র বিশ্বের প্রকৃত রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। দৃষ্টিগোচর বিশ্বের পশ্চাতে আছে এক পরম বিশ্ব-মন। সেই বিশ্ব-মনের উদ্দেশ্য অনুযায়ী স্তরে স্তরে সমগ্র বিশ্ব অভিব্যক্ত, যেমন নাট্যকার দৃশ্যের পর দৃশ্যের ভিতর দিয়া আপন মানস-উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে উদ্‌ঘাটিত করেন। নাটকের দৃশ্য পরিবর্ত্তন নাট্যকারের খেয়াল মতো হয় না। যে বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া নাট্যকার নাটক লিখিতে বসিয়াছেন তাহাই নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয় গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কি ভাবে দৃশ্যান্তর ঘটাইতে হইবে। সে উদ্দেশ্য কোনো একটি দৃশ্যে আবদ্ধ নয়, সমগ্র নাটকের সকল অঙ্গের সঞ্চালনে সে উদ্দেশ্য প্রকটিত হয়। বিশ্বমনও সেইরূপভাবে, বৃহত্তর পরিমাণে, আপন উদ্দেশ্য বিশ্বব্যাপী বিবর্ত্তনের দ্বারা প্রকাশ করিতেছে। তাহার কার্য্যাবলীও খেয়ালী নহে, উদ্দেশ্যান্বিত, নিয়মানুগ। ব্যক্তি-মন সেই বিশ্বমনের স্বধর্ম্মী বলিয়া বিশ্বমনের নিয়ম-পরম্পরা অনুধাবন করিতে পারে। পূর্ণতম দর্শন তাহাই, যাহাতে পাওয়া যায় বিশ্ব-নিয়মের পূর্ণতম ভাষারূপ। হেগেলের দাবী এই যে তিনটি সূত্রে তিনি বিশ্ব-নিয়মকে সম্পূর্ণ প্রতিফলিত করিয়াছেন।

হেগেলের পূর্ব্বে জ্ঞান রাজ্যে তিনটি চিন্তাসূত্র প্রচলিত ছিল যাহা আরিষ্টোটলের অক্ষয়কীর্ত্তি। প্লেটোর অবাস্তব অধ্যাত্মবাদিতার প্রতিবাদে আরিষ্টোটলের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ইউরোপের চিন্তাধারাকে বস্তু-অভিমুখী করিয়া বিজ্ঞানপ্রসারে অমূল্য সহায়তা করিয়াছিল। কিন্তু কাল ধর্ম্মে আরিষ্টোটলের চিন্তাসূত্র তিনটি ছিল সংকীর্ণ, হেগেলের সময়ের জ্ঞানবিস্তারের তুলনায়। আরিষ্টোটলের যুগে গতিবিজ্ঞানের অংকুরোদ্‌গমও হয় নাই। তখন বস্তুর প্রধান লক্ষণ ছিল স্থিতিশীলতা। তাই গ্রীক দার্শনিকের প্রথম সূত্র হইল, যাহা আছে তাহা তাহাই থাকে। 'ক' চিরকালই 'ক'। সুতরাং কোন বস্তু 'ক'-গুণান্বিত হইলে তাহা কখনই 'নন্-ক'-গুণান্বিত হইতে পারে না। 'ক'

ও 'নন্-ক'-এ নিত্যবিরোধ। অধিকন্তু, 'ক' ও 'নন্-ক'-এর মাঝামাঝি তৃতীয় পন্থা কিছু থাকিতে পারে না। যাহা 'ক' নহে তাহা 'নন্-ক' হইতে বাধ্য। তদ্‌বিপরীতও অনুরূপ সত্য। আরিষ্টোটলের এই তিনটি সূত্রকে বলা হইয়া থাকে সত্তাবিধি, বিরোধবিধি, ও মধ্যপন্থাপরিহার বিধি। গতিশীলতা বাদ দিলে ইহাদের চেয়ে প্রশস্ততর বিধি জ্ঞানজগতে আর নাই।

কিন্তু গতিশীলতা বিশ্বজগতে প্রত্যক্ষ সত্য। আরিষ্টোটলের ন্যায়শাস্ত্রের সহিত মেলে না বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করা, মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। হেগেল গতিবিজ্ঞানের সহিত পরিচিত ছিলেন। গতির প্রকৃতি তাঁহাকে বিব্রত করিত। কারণ, গতির অন্তরে আছে দুর্জ্ঞেয় রহস্য, গতিশীল বস্তু কোন একটি ক্ষণে কোন একটি স্থানে আছেও বটে, নাই-ও বটে। গতিকে মানিলে আরিষ্টোটলীয় ন্যায়শাস্ত্র অপ্রযোজ্য হইয়া পড়ে। তাই হেগেলকে নব্য-ন্যায়শাস্ত্রের উদ্ভাবনা করিতে হইল গতির প্রকৃতির সহিত সুসমঞ্জসভাবে। হেগেল দেখিলেন, কোন বস্তু বা ধারণা একক ত নহেই, পরন্তু, বিশ্বের অন্যাংশের সহিত তাহাদের সম্বন্ধও সদা সঞ্চরমাণ, পরিবর্তনশীল। বিশ্বমন স্বেচ্ছাচারী না হওয়ায় বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনশীলতাও নিয়মানুগ, বিধিতব্য। এই বিধিতব্যতার প্রকৃতরূপ অনুসন্ধান করিতে গিয়া হেগেলের চোখে পড়িল যে মানবীয় জ্ঞানের মূল উৎস যে সত্তা-বোধ তাহারও অন্তরে আছে স্বতোবিরোধ। অসত্তাবোধ বাদ দিলে সত্তাবোধ নিরর্থক, 'আছে' বলিতে 'নাই'-কেও বুঝায়। সুতরাং মানবীয় চেতনার প্রথম ধাপেই সত্তাবোধ ও অসত্তাবোধ অন্যোন্য প্রবিষ্ট হইয়া একত্রাবস্থান করিতেছে। এই স্বতোবিরোধের প্রেরণায় জ্ঞানের ক্রমিক উন্মেষ হয়। সত্তাবোধ হইতে আসে আকার-বোধ। এখানেও স্বতোবিরোধ বর্তমান; আকার-বোধকে প্রসারিত করিলে আকার-হীনতায় পেঁছিতে হয়; একাকার ও নিরাকার সমার্থক। আকারবোধ হইতে ক্রমে আসে মানবোধ ও গুণবোধ। মানবোধ ও গুণবোধের অনুশীলন হইতেই বিভিন্ন বিজ্ঞান ও দর্শনের উদ্ভব ও সমৃদ্ধি।

অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের সহিত তদানীন্তন সমগ্র দর্শন বিজ্ঞানের চর্চা করিতে গিয়া হেগেল লক্ষ্য করিলেন যে সত্তা ও অসত্তার সম্বন্ধও পরিবর্তনশীল, স্থায়ী নহে। আজ যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহা তাহারই অন্তরস্থ বিরোধের প্রেরণায় বর্ধিত হইয়া এমন কিছুতে পরিণত হইতেছে যাহাতে তাহার অস্তিত্ব থাকিতেছে না। যেমন বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে ফুল, ফুল হইতে

ফল ইত্যাদি। বীজ যখন অংকুর তখন আর তাহাতে বীজত্ব রহিল না বীজত্বের অবসান হইল ; অংকুর আসিয়া বীজত্বকে অসৎ করিয়া দিল। শুধু তাহাই নহে। বীজত্বের মধ্যে বীজত্ব-ধ্বংসী যে প্রবণতা ছিল তাহারও বিনাশ হইল, তাহাও অসৎ হইয়া গেল। সত্তা ও অসত্তার বিরোধের ফলে যে পরিণাম ঘটিল তাহা একটি নূতন অবস্থা। হেগেল দেখিলেন জাগতিক পরিবর্ত্তনের অর্থ যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি নহে, একই জিনিষ বারবার ঘটিতেছে তাহা নহে। মূলতঃ একই বস্তুর দৃশ্যতঃ বিভিন্ন রূপান্তর নহে ; পরিবর্ত্তনের অর্থ প্রকৃত অভূতপূর্বের আবির্ভাব, যাহা কখনও আগে ছিল না তাহার আরম্ভ। বীজত্বের মধ্যে অংকুরত্ব একেবারেই নিহিত ছিল না। অংকুরত্ব যদি বীজত্বের স্বভাবের অবিচ্ছেদ্য অংগ হইত তাহা হইলে বীজমাত্রই অংকুর হইত। অথচ বীজ অংকুর হয় তাপ ইত্যাদির ভেদে। আবেষ্টনীর প্রভাবে বীজ যখন সত্য সত্যই অংকুর হইয়া উঠিল তখন এমন কিছু ঘটিল যাহা বীজেও ছিল না, আবেষ্টনীতেও ছিল না, তাহা একান্তই অভূতপূর্ব। ধরা যাক বীজত্বের অন্তর্দ্বন্দ্ব অংকুরত্বে পরিণত হইল। সেখানেই কি দ্বন্দ্বের অবসান ? না তাহা নহে। অংকুরত্বের অন্তরেও আছে তাহার নিজস্ব স্বতোবিরোধ, যাহার পরিণাম ফুলে, ফুলের স্বতোবিরোধ পরিণত হইল ফলে, ফল হইতে পাওয়া গেল অসংখ্য নূতন বীজ। এইভাবে আবর্ত্তনের চক্র জগৎ-ব্যাপী হইয়া নূতন হইতে নূতনতরে প্রসারিত হইতেছে, গুণগত ও মানগত পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে।

গুণগত ও মানগত পরিবর্ত্তন কি তবে দুইটি বিভিন্ন প্রকারের পরিবর্ত্তন, পরস্পরনিরপেক্ষ ? না, তাহা নহে, তাহারা পরস্পরনির্ভরশীল। গুণ ও মান নিয়তই পরস্পরকে প্রভাবিত করিয়া একে অন্যে পরিণত হইতেছে। ইহার সুস্পষ্ট উদাহরণ, বরফ, জল ও বাষ্প। তাপের পরিমাণ ভেদে বরফ জল হয়। তাই বলিয়া বরফ ও জল একই পদার্থ নয়, তাহাদের মান ও গুণ একান্ত বিভিন্ন। জল ও বাষ্প সম্পর্কেও এ মন্তব্য খাটে। গুণ ও মান সম্বন্ধরহিত নহে। তাহাদের সম্বন্ধও বিধিবদ্ধ। পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে এ বিধির ভূরি ভূরি উদাহরণ মেলে।

হেগেলের প্রতিপাদ্য তাহা হইলে এই যে জাগতিক শৃংখলা অনুধাবন করিলে দেখা যায় তিনটি বিশ্বব্যাপী নিয়মে সমস্ত বিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। তিনি সেই তিনটি নিয়মের নাম দিয়াছেন—(১) বিপরীতের একত্রিতা ও দ্বন্দ্ব, (২) অসতের অসত্তা, (৩) মানের গুণগত রূপান্তর।

জড়জগতে, জীবজগতে, মানবের সমাজ-প্রতিষ্ঠায় ও ভাববিকাশে, সর্বত্র একই দ্বান্দ্বিক বিধি কার্যশীল, এই বিরাট সিদ্ধান্ত দিয়া হেগেল ইউরোপের দর্শনশাস্ত্রকে তাহার তুঙ্গ বিন্দুতে উন্নীত করিলেন। মনে হইল যেন জ্ঞানের শেষ কথা বলা হইয়া গেল। হেগেলীয় ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিলে বলা যায় তাঁহার পূর্বাচার্যগণের মতামত ভুল নহে, খণ্ড সত্য ; হেগেলের দর্শনেই যেন তাহারা চরম সার্থকতায় উপনীত হইল—পূর্ণ সত্য তাহার পূর্ণ প্রকাশ লাভ করিল।

অথচ এ সিদ্ধান্ত হেগেলের দ্বান্দ্বিক বিধির পরিপন্থী। দার্শনিক সত্য যদি নিত্যক্রিয়াবান বিবর্তন-প্রণালীর প্রতিফলন হয় তাহা হইলে দার্শনিক চিন্তা হেগেলে আসিয়া অকস্মাৎ থামিয়া যাইতে পারে না—তাহারও বিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর বৃহৎ কৃতিত্ব এই যে তাঁহাদের দ্বারা হেগেলীয় দর্শনের এই বিবর্তন সাধিত হইল।

পরস্পর সাক্ষাতের পর আমরণ বন্ধুত্ব স্থাপনের পূর্বে মার্কস ও এঙ্গেলস দু'জনেই হেগেলের ভক্ত শিষ্য ছিলেন। হেগেলের বিরাট মহিমায় অভিভূত হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের বিজ্ঞান-প্রবণ মন কোথায় যেন বাধা অনুভব করিতে-ছিল। এমন সময় ফয়েরবাখ্ মন্তব্য করিলেন, হেগেল-সমর্থিত পরম মন অথবা ভগবান মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মানস-প্রতীক, তাহার কোন পাদার্থিক অস্তিত্ব নাই। তাহা মানবমনের উপর বস্তুবিশ্বের বিশেষতঃ সমাজ-জীবনের প্রতিক্রিয়ার কল্পায়িত চিত্র। কাজেই তাঁহার মতে, মানুষের ধর্মা-চরণের ইতিহাস সামাজিক ও লৌকিক ইতিহাসের অন্তর্গত। মার্কস ও এঙ্গেলস স্বীকার করিয়াছেন এই উক্তিতে তাঁহারা যেন হেগেলের মায়াপাশ হইতে মুক্তি পাইলেন, পাখীর ছানা যেমন মুক্তি পায় ডিমের খোলস হইতে। তাঁহাদের চোখ খুলিয়া গেল। তাঁহারা দুজনে স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধি করিলেন হেগেলীয় দর্শন কোথায় তাঁহাদের শ্বাসরোধ করিতেছিল। বন্ধুত্বের পর পরস্পর আলোচনায় এই উপলব্ধি গভীরতর ও বিস্তৃততর হইয়াছিল।

হেগেলীয় দর্শনের বিশাল অট্টালিকার ভিত্তিতে আছে ভাববাদ বা এই প্রত্যয় যে বস্তুর আগে চেতনা, বস্তু চেতনা হইতে অভিন্ন, তাহার ঘনীভূত অবস্থা। তাই বস্তুর বিবর্তন, চেতনার বিবর্তনের নামান্তর। সমস্ত বাস্তব বিবর্তনের অন্তরে চেতনার ক্রম অনুস্যূত। চেতনা-অনুপ্রাণিত বাস্তব বিবর্তন পরম মনে উপনীত হইলে তবে তাহার পরিসমাপ্তি। কিন্তু এই বাস্তব-বহির্ভূত

পরম মনের অস্তিত্বের ও ক্রিয়ার কোনো নির্ণায়িক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাহাতে বিশ্বাস ও ধর্ম্মবিশ্বাসে কোন প্রভেদ নাই। দর্শন ও বিজ্ঞান তাহা হইলে শেষ পর্য্যন্ত ধর্ম্মেরই মতো আপ্তবাক্যে পরিণত হয়। মার্কসের বিচারনিষ্ঠ মন (এখন হইতে মার্কস বলিতে আমরা সংক্ষেপতঃ মার্কস ও এঙ্গেলস দুজনকেই বুঝিব, ইহাতে এঙ্গেলস-এর লিখিত সম্মতি আছে) ইহাতে সায় দিতে পারিল না। কি করিয়া চৈতন্য হইতে জড়প্রকৃতির উদ্ভব হইল তাহার নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা হেগেল দিতে পারেন নাই। হেগেলীয় দর্শনের এইটাই দুর্ব্বোধ্যতম অংশ। দুর্ব্বোধ্যতার কারণ ভাষার বঙ্কিমতা তত নয় যত বক্তব্যের অস্বচ্ছতা। অথচ দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অনুযায়ী হেগেল জড়-জগৎ, মানব সমাজ ও মননশীলতার যে বিবর্ত্তনমুখী ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা মার্কসের সম্পূর্ণ মনঃপূত ছিল। তাই মার্কস হেগেলের সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করিয়া তাঁহার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি গ্রহণ করিলেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী বিচারে তিনি যে সিদ্ধান্তে আসিলেন তাহার মূল বক্তব্য এই যে, আমাদের চেতনা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, আমাদের জীবনই আমাদের চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিশ্বজগতে চেতনার আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই জড়ের অস্তিত্ব বিজ্ঞানসম্মত। জড়ের অন্তঃস্থ বিরোধের পরিচালনে তাহার বিবর্ত্তনের কোন এক বিশেষ অবস্থায় জীবনের ও পরে চেতনার সঞ্চার। জড় হইতে জীবজগত ও তাহা হইতে মানবগোষ্ঠী—এই ক্রমবিকাশের বিজ্ঞান-অনুমোদিত প্রমাণ আছে। কাজেই মার্কসবাদ যে ভিত্তি হইতে উঠিতেছে তাহা কাল্পনিক নহে, খেয়াল-প্রসূত নহে, আপ্তবাক্য-স্বরূপ নহে। মানবগোষ্ঠীর উদ্ভবের পর তাহার চেতনার বিকাশ নির্ভর করিয়াছে তাহার বাস্তব কর্ম্মপ্রচেষ্টার উপর। ব্যক্তিকে, বাঁচিতে হইলে, বস্তুজগতে কাজ করিতেই হয়। চেষ্টায় মানুষ যখন তাহার উপায় স্বরূপ যন্ত্র বা হাতিয়ার তৈয়ারী করিতে শিখিল, তখনই সে প্রাণিজগতে নূতন স্তরে উঠিল। তাহার চেতনার নূতন বিকাশ সুরু হইল। আমাদের ব্যক্তিত্ব আমাদের উৎপাদন শক্তির সমব্যাপী ; আমরা যাহা উৎপাদন করি ও যেভাবে উৎপাদন করি তাহাতেই আমাদের ব্যক্তিত্ব। আমাদের ধারণা, কল্পনা, চিন্তা, ভাব, ভাষা, প্রতিষ্ঠান সমস্ত মানসিক ব্যাপারই মূলতঃ আমাদের উৎপাদন শক্তির উপর নির্ভরশীল। যুগে যুগে আমাদের উৎপাদন শক্তির ক্ষেত্র ও প্রকারের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানসিক জীবনেও চেতনার ক্ষেত্র ও প্রকারের পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কাব্য দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির

ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় কালের গতিতে তাহাদের ধারায় বৈচিত্র্য গড়িয়া উঠিয়া উঠিয়াছে। ইহার কারণ এ নয় যে, একটি ধারণা হইতে অন্য ধারণা, একটি প্রত্যয় হইতে অন্য প্রত্যয় স্বতঃই উৎসারিত হয়। প্রকৃত কারণ এই যে, যে বাস্তব পরিবেশে কোনো একটি বিশিষ্ট ধারণা বা প্রত্যয় উদ্ভূত হয়, সেই পরিবেশের বিবর্ত্তনের ফলে ধারণা বা প্রত্যয়েরও বিবর্ত্তন হয়। বাস্তব পরিবেশেরও স্থির থাকিবার উপায় নাই। প্রকৃতির সহিত সংস্পর্শে আসিয়া মানুষ যতই তাহাকে মানিতেছে, তাহার বিধিনিয়ম অনুশীলন করিতেছে, ততই তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে, এবং এই প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের প্রভাবে তাহার স্বকীয় প্রকৃতিরও নব নব উন্মেষ ঘটিতেছে। অতি-আদিম যুগ হইতে অতি-আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত মানুষের রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম্মনীতি, প্রভৃতি সামাজিক গোষ্ঠীগত কর্ম্মপ্রচেষ্টার ও ভাবধারার, এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা করিলে, তাহার নাম দেওয়া হয় ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা বা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এখন বোঝা যাইবে ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা কোন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের গর্ভস্বরূপ। মানুষের সামাজিক বিবর্ত্তনের ইতিহাস বিশ্ববিবর্ত্তনের ইতিহাসের একাংশ মাত্র। হেগেল-প্রবর্ত্তিত যে বিধিত্রয় বিশ্ববিবর্ত্তনের ইতিহাসের সম্যক পরিচয় দেয়, মার্ক্স দেখাইলেন, সে বিধিত্রয়ের সম্যক প্রয়োগের জন্য আমাদের জ্ঞানানুশীলন সুরু করিতে হইবে হেগেলের বিপরীতমুখী হইয়া। এ বিধিত্রয় প্রথমে বস্তুজগতে কার্য্যকরী, কারণ বস্তুই প্রাক্, চেতনা পরাক্; বস্তু হইতে চেতনার উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রেও ইহাদের সক্রিয়তা ব্যাহত হয় নাই।

ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে আমাদের মানিতে হয়—(১) আমাদের সামাজিক ইতিহাসে যাহা কিছু ঘটে তাহার বার্ত্তা কোনো অলৌকিক পরমেশ্বর নন। (২) একা মানুষ, তিনি যত বড় প্রতিভাশালী জ্ঞানী বা বীর হোক না কেন, সামাজিক বিবর্ত্তন ঘটাইতে পারেন না। (৩) সামাজিক বিবর্ত্তন মানুষের সমষ্টিগত প্রচেষ্টার ফল। (৪) কোনো সামাজিক প্রথা বা প্রতিষ্ঠান, ধারণা বা প্রত্যয় চিরন্তন হইতে পারে না। তাহা ঐতিহাসিক হইতে বাধ্য। কোনো সামাজিক অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে তাহার উদ্ভব, এবং দ্বান্দ্বিক বিধি-অনুযায়ী তাহার নিরসন হইয়া নূতন প্রথা প্রতিষ্ঠান ধারণা বা প্রত্যয়ের উদ্ভব অবশ্যম্ভাবী। যে প্রথা বা প্রত্যয় এক যুগে সত্য ও প্রগতিশীল কালান্তরে তাহা ভ্রান্ত ও প্রতিক্রিয়াপ্রবণ হইয়া পড়ে।

স্পষ্টই বোঝা যায়, এই বৈপ্লবিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সকল শ্রেণীর পক্ষে সমান মুখরোচক হওয়া সম্ভব নয়। সামাজিক পরিবর্ত্তনে যে-শ্রেণীর সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা তাহারাই পরিবর্ত্তনের বিরোধী ও অতীতের পূজারী। বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনে যে শ্রেণীর হারাইবার কিছুই নাই, লাভ করিবার প্রচুর, তাহারাই কেবল মনে-প্রাণে বিপ্লবী হইতে পারে। এই দুই শ্রেণীর স্বার্থ কখনই এক-মুখী হইতে পারে না। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সাধনায় সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই শ্রেণী-সংঘর্ষের গুরুত্বের আবিষ্কার মার্কসের প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম অবদান। এই আবিষ্কারে সমাজবিপ্লব ইউটোপীয় হইতে বৈজ্ঞানিক হইয়া উঠিল। সমাজে অত্যাচার অনাচার ও ব্যাভিচার কিছু নূতন ঘটনা নহে যদিও তাহাদের চেহারা যুগে যুগে বদলায়। সমাজের গ্লানি অপসরণ করিয়া শান্তি-পূর্ণ আনন্দময় সমাজের কল্পনাও মানুষের পক্ষে নূতন নয়, তাহার চেহারাও যুগে যুগে বদলাইয়াছে। মার্কসের পূর্ব্বে ইউরোপে বড় বড় বিপ্লবও কম ঘটে নাই। তাহাতে মানুষে প্রাণ দিয়াছে, প্রাণ নিয়াছে। ১৮৪৮ সালে "সাম্যবাদী ঘোষণা" প্রকাশের পর হইতে সমাজবিপ্লব প্রচেষ্টায় নূতন ধারা সুরু হইল। বিপ্লবের পথে যাহা ছিল স্বপ্ন-সঞ্চারণ তাহা হইয়া উঠিল সজাগ অভিযান। ১৮৭১ সালে ফরাসী দেশে প্রথম ব্যর্থ উদ্যমের পর ১৯১৭ সালে তাহার প্রথম সফলতা রুশ-বিপ্লবে ও সোভিয়েট-প্রতিষ্ঠায়। এই গৌরবময় ঐতিহাসিক কৃতিত্বে রুশিয়ার জাতিগত বিশেষত্বের কোনো স্থান নাই। এই সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ, সুভের্ডলভ, লেনিন, ষ্টালিন প্রভৃতি সাম্যবাদীর মার্কসীয় দর্শনে প্রগাঢ় অধিকার। ইংলন্ড ফ্রান্স ও জারমানিতে শ্রমিক সংগঠন অনেক বেশী প্রাগ্রসর ছিল। কিন্তু সেখানকার নেতারা মার্কসবাদ পরিত্যাগ করিরা, সংস্কারপন্থী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার হেতু এই যে এ সকল ধনতান্ত্রিক দেশে নানা ঐতিহাসিক কারণে একদল স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন "অভিজাত শ্রমিকের" সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহাদের ধারণা ছিল এই যে শ্রমিক শ্রেণীর সংঘবন্ধতার ফলে বিপ্লব না ঘটাইয়া কেবল পার্লামেণ্টারি আন্দোলনের সহায়তায় শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা যায় ও সেই পন্থাই যুক্তিসঙ্গত। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার দোহাই দিয়া তাঁহারা "নির্বিত্ত-শ্রেণীর একাধিপত্য"—পন্থার বিরোধিতা করিলেন। তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রধান কথা, মানগত বিবৃদ্ধি হইতে গুণগত নূতন স্তরে উঠিতে গেলে একটি বিন্দু পার হইতে হয় যাহার নাম 'নোভ'-বিন্দু—যেখানে প্রকৃতিতে ঘটে একটি "উল্লম্ফন"; যাহার

সামাজিক প্রতিচ্ছবি হইতেছে বিপ্লব। "নিবি'ত্ত শ্রেণীর একাধিপত্য" তাহারই একটি অনতিক্রম্য সাময়িক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার প্রতিবাদের প্রকৃত অর্থ ধনতন্ত্রের পুচ্ছধারিত্বের বৃত্তি অবলম্বন করা, কম বেশী সংস্কারে তৃপ্ত থাকা। সংস্কারবাদ বিপ্লবের পরিপন্থী, সংস্কারবাদী হওয়ায় তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত প্রতিবিপ্লবী পর্য্যায়ে পড়িলেন।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, মার্কসবাদীরা কি তবে সর্বদাই অভ্রান্ত? এ প্রশ্ন অযৌক্তিক। কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মার্কসবাদী কখনও এমন উক্তি করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই। মার্কসবাদীর মতে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি অভ্রান্ত, কিন্তু তাহার প্রয়োগে, তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে গৌণ হইতে মুখ্যের বিভেদ না সাধিলে অন্য বিজ্ঞানের মতোই এখানে ভুল হইবার সম্ভাবনা। মার্কসবাদীরা সে ভুলের সংশোধন করে দেবতার আদেশ বা নেতার নির্দ্দেশে নয়, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদেরই উন্নততর প্রয়োগে। লেনিন বা ষ্টালিন কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্ব করেন মার্কসবাদের নির্ভুল ব্যাখ্যাতা হিসাবে, কোনো রহস্যময় বা কূটনৈতিক প্রভাবে নয়। মনে রাখিতে হইবে, মার্কসবাদ বদ্ধচক্র নয়, তাহার প্রকৃতি কম্বুরেখ। মার্কস ধনতান্ত্রিক সমাজের ঐতিহাসিক গতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন। কি ভাবে তাহার সূত্রপাত, ভূস্বত্বতান্ত্রিক সমাজ ভাঙিয়া কি নিম্মমবেগে তাহার শ্রীবৃদ্ধি, এই শ্রীবৃদ্ধির বক্ররেখা নিম্নাভিমুখী হইলে তাহার কি দানবীয় শক্তি, সাম্যবাদী সমাজের অভ্যুত্থানে কি ভাবে তাহার নিঃশেষ, সরু মোটা তুলির আঁচড়ে মার্কস তাহার চিত্র আঁকিয়াছেন। একদিকে তিনি যেমন অতীতের ইতিহাস-রচয়িতা, অন্যদিকে তিনি তেমনই ভবিষ্যতের প্রবক্তা। তাঁহার দর্শন নিয়তিবাদ নহে; যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই, মানুষ শুধু নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র, এ ধারণা তাঁহার নহে। মানুষের কর্ম্ম দিয়াই মানুষের ইতিহাস গড়িয়া উঠিতেছে, শ্রেণীহীন সমাজ-সৃষ্টি হইবে মানুষেরই সমবেত চেষ্টার ফলে শ্রেণী-সংগ্রামের বন্ধুর পথে। মার্কস ধনতন্ত্রের গোড়াপত্তন দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সাম্রাজ্যবাদী রূপ দেখেন নাই। সে যুগের বিশিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধানের ভার পড়িল লেনিনের উপর। তাই লেনিনবাদ মার্কসবাদের সম্প্রসারণ, পরিমার্জ্জন নহে। ফ্যানী কাপলান-এর হঠকারিতায় লেনিনের অকাল মৃত্যুর ফলে তিনিও সাম্রাজ্যবাদের ফাশিষ্ট রূপ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। আজ সেই স্তরের বিশিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধানের ভার পড়িয়াছে ষ্টালিনের উপর। দেখা যাইতেছে মার্কসবাদ থামিয়া নাই, যুগে

যুগে বৈজ্ঞানিক প্রথায় পরিপুষ্ট হইতেছে। বিজ্ঞানের নূতন থিওরী যেমন পূর্ব্বতন থিওরীকে বর্জ্জন করে না, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই বাস্তব-সত্যের নিবটতর হয়, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রয়োগ কৌশলও তেমনি মার্কস হইতে সুরু করিয়া ষ্টালিন পর্য্যন্ত বর্তমান শ্রেণী-বিভক্ত সমাজকে শ্রেণী-বৈষম্য রহিত সমাজের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। এমন একদিন নিশ্চয়ই আসিবে যখন বিশ্বময় শ্রেণীহীন সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শোষনের সকল পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। তখন কি তবে হইবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অবসান? মনে হয় না। কারণ তখনও ত থাকিবে সমগ্র মানব-সমাজের সহিত জড়-প্রকৃতির দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্ব কি নূতন চেতনার সঞ্চার করিবে, কি ধরনের কাব্য নাটক শিল্প বিজ্ঞান প্রণয়ন করিবে, এখন হইতে তাহা লইয়া গবেষণা করা মস্তিষ্কের অপব্যবহার ও বর্ত্তমানকে প্রতারণা। বর্ত্তমানের দাবী বর্ত্তমানেই মিটাইতে হইবে। আজ সাহিত্যে চিরন্তনত্ব ও আধুনিকত্ব, দর্শনে আপেক্ষিক ও নিরপেক্ষ সত্য, অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা ও প্ল্যানিং, রাষ্ট্রনীতিতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা, বিজ্ঞানে হেতুবাদ ও অনিশ্চয়তা বিধি প্রভৃতি প্রশ্ন উদগ্র হইয়া উঠিয়াছে। ভাবজগতে এই সংকট বুদ্ধিজীবীকে ঠেলিয়া দিতেছে বুদ্ধিকে অস্বীকার করিয়া অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসের পথে। বস্তুবাদী দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিই কেবল এই পশ্চাদ্ গতিকে অবরুদ্ধ করিতে পারে, যদিও এ ভাবসংকটের আত্যন্তিক সমাধান সম্ভব নয় সাম্যবাদী সমাজের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে। যত দিন পর্য্যন্ত সে স্বর্ণ যুগ না আসিতেছে, যতদিন পর্য্যন্ত চলিবে মানুষের প্রতি মানুষের শোষণের অধিকার, মুষ্টিমেয় শাসকের হাতে সাগরপ্রমাণ শাসিতের লাঞ্ছনা, ততদিন বিচারপরায়ণ প্রত্যেক ব্যক্তির প্রধান কর্ত্তব্য, এই বৈপ্লবিক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অনুশীলন করিয়া তাহাকে মনে প্রাণে গ্রহণ ও প্রয়োগ করা চিন্তায় ও কর্ম্মে, অনলস চিন্তায় ও বীর্য্যবান কর্ম্মে।

বিজ্ঞানাচার্যের হৃদয়বত্তা

১৯০৯ সালের মাঝামাঝি আমি তখন হিন্দু স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি। দর্জিপাড়ার বাড়ি হইতে নিত্য দু বেলা পায়ে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে হইত। এক দিন স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয়া দেখি, মা তাঁর সমবয়সী এক মহিলার সহিত গল্প করিতেছেন। আমাকে বলিলেন, 'প্রণাম কর, তোর মাসিমা।' নূতন মাসিমা হাসিয়া বলিলেন, 'তোমাকে দেখার জন্যেই এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলাম। কত ছোটটি দেখেছি, এখন কত বড়োটি হয়ে গেছ। তা তোমার লেখাপড়ায় অসুবিধার কথা শুনেছি। তুমি কাল সকালেই যেয়ো আমাদের বাড়ি। বোদে-কে বলে দেব, সে তোমার দেখাশোনা করবে।' বোদে সত্যেন্দ্রনাথের পারিবারিক ডাক নাম—বোধ হয় বৈদ্যনাথের সংক্ষিপ্ত রূপ।

সত্যেন্দ্রনাথ সেই বৎসরেই হিন্দু স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। যে দশজন ছাত্র সে বৎসরে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে মাসিক কুড়ি টাকা জলপানি পান, তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে পঞ্চম। কিন্তু ছাত্রমহলে তাঁহার খ্যাতি তখনই ছিল তাহার অনেক ওপরে। সম্প্রতি অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁহার সত্তর জন্মবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে ছাত্রজীবনের স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন যে, 'সত্যেন প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র হয়ে ভর্তি হয়েছে জেনে আমি উল্লসিত হয়ে উঠি, তার সঙ্গে আলাপ হবার সম্ভাবনায়।'

এ হেন সত্যেন বোসের কাছে পড়িতে পাইব, এ ছিল আমার কল্পনাতীত সৌভাগ্য।

সত্যেন্দ্রনাথের পরিবারের আদিনিবাস কাঁচড়াপাড়ার অনতিদূরে বড় জাগুলিয়া গ্রামে। কিন্তু সে গ্রামের সহিত তাঁর সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। তিনি বরাবর কলিকাতাতেই মানুষ। যে বাড়িতে তিনি এখন থাকেন তা-ও তাঁর পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে পাওয়া। অবশ্য ইহার বর্তমান রূপ দিয়াছেন তাঁহার পিতা সুরেন্দ্রনাথ। ১৯০৯ সালে ইহার চেহারা ছিল একেবারে আলাদা। নানা পারিবারিক কারণে সুরেন্দ্রনাথকে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টায় থাকিতে হইত কলিকাতার বাহিরে। বাড়িটি তখন ভাড়া দেওয়া হইত। স্ত্রী ও শিশু পুত্র কন্যাকে অনেক সময় বিদেশে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইত না, তাহাদের রাখিয়া যাইতেন অন্য একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়া। এই পর্বে দর্জিপাড়ায় এক সরু গলিতে একটি বাড়িতে পাশাপাশি দুই অংশে বাস করার ফলে আমার মায়ের সহিত সখীত্ব হয় মাসিমার। আমি তখন এত ছোট ছিলাম যে সে সময়ের কোনো স্মৃতি আমার ছিল না। আমার দিদি সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে কয়েক মাসের বড়। তার রং ছিল খুব ফরসা, ও চোখ কটা। তাই তার একটি আদরের নাম ছিল মেরী। দুটি পরিবার কয়েক মাস একত্রে থাকার পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, ভাড়াটিয়া জীবনের নিয়মানুসারে। ইতিমধ্যে সুরেন্দ্রনাথ চলিয়া যান আসামের সুদূর পার্বত্য অঞ্চলে রেল লাইন পাতার কাজে হিসাবরক্ষক হইয়া। আমার এক নিকট আত্মীয় পরিবারও সেখানে যান চাকুরীর তাগিদে। সাপটগ্রামে এক পরিবারের সহিত মাসিমার যোগাযোগ হয়। আলাপ-প্রসঙ্গে 'মেরী' এই অপ্রচলিত নামের বালিকার উল্লেখে মাসিমার কৌতূহল জাগ্রত হয়। তাঁদের নিকট হইতে আমাদের বাড়ির ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া তিনি আবার তাঁর পুরানো সখীকে খুঁজিয়া বাহির করেন। তাঁদের পুনর্মিলন আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

পরদিন সকালে গেলাম সত্যেন্দ্রনাথের কাছে। কাছাকাছি পড়িয়া থাকায় আমাদের মুখ-চেনা ছিল, তাই সংকোচ কাটিয়া গেল সহজেই। ঠিক হইল তখন হইতে আমি প্রত্যহ দু-বেলা সত্যেন্দ্রনাথের পড়িবার ঘরেই বসিয়া পড়াশোনা করিব। অল্পদিনেই একেবারে বাড়ির লোক হইয়া গেলাম। আত্মীয়-স্বজনের কাছে মাসিমা পরিচয় দিতেন, 'এটি আমার বোন-পো, বোদের ছোট ভাই।' মেসোমশায়কে তখনও বছরের অধিকাংশ সময় কাটাইতে হইত

নানাস্থানে, যেখানে নূতন রেল লাইন পাতা হইত। মাসিমার শরীর মোটেই সুস্থ ছিল না। আর আমার মা তো ছিলেন চির-অসুস্থ। দিদির বিবাহ হইয়া গেল পূর্ববঙ্গে, তাহাকে সেখানেই থাকিতে হইত অনেক সময়। বাবার চাকরীতে ছুটির ব্যবস্থা ছিল খুবই কম। অনেক রবিবারেও তিনি বাড়িতে থাকিতে পাইতেন না। সুতরাং দাদাই আমার জীবনের হইলেন প্রকৃত অভিভাবক।

আমি যখন স্কুলে ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, সত্যেন্দ্রনাথের তখন কলেজে ফার্স্ট ইয়ার। কিন্তু তখনই তিনি আমায় দিলেন তাঁর পড়বার ঘরের অবাধ স্বাধীনতা। এ পর্যন্ত বাংলা নভেল পড়িতাম লুকাইয়া চুরি করিয়া। এখন তাঁর ঘরের নিরাপত্তায় বসিয়া প্রথমেই দিনের পর দিন বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী গিলিয়া ফেলিলাম। স্কুলের পড়ার যখন যতটুকু দরকার তাতে আর কতটুকু সময় লাগিত। বাকী সময়ে কাজ ছিল দাদার সঙ্গে গল্প করা, তাঁর অবসর মতো। এই গল্প-আলোচনার ভিতর দিয়াই হইত আমার প্রকৃত শিক্ষা। আমার ধারণায়, দাদা সেই-প্রকৃতির লোক যাকে বলা যায় 'জাত-মাস্টার'। কোনো কিছু পড়িয়া ভালো লাগিলে তা তখনই আমায় বোঝাইতেন। যে কোনো বিষয়কে স্পষ্ট করিয়া বোঝানোর ক্ষমতা তাঁর অনন্যসাধারণ। কেবল আমি নই, সেই সময়ে কত যে ছাত্র তাঁর কাছে আসিত পড়া বুঝিয়া নিতে তা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। তাঁর নিজের পড়া যে কখন করিতেন, বোঝাই যাইত না। আসল কথা, তাঁর নিজের পড়া তিনি অনেক আগেই শেষ করিয়া রাখিতেন, কলেজের ক্লাসগুলিতে হইত তাঁর রিভিশন্-এর কাজ।

দাদা ছেলেবেলায় ছিলেন বাড়ির কাছের নিউ ইণ্ডিয়ান স্কুলের ছাত্র। মেধাবী ছাত্র হিসাবে সেখানে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। কিন্তু সেখানে তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো আর কেহ ছিল না। তাই এণ্ট্রান্স ক্লাসে ওঠার পর মেসোমশায় তাকে ভর্তি করিয়া দিলেন হিন্দু স্কুলে, যাতে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির ঠিকমতো পরীক্ষা হয়। সেটা ছিল ১৯০৭ সাল, যাতে সে ১৯০৮ সালে স্কুলের শেষ পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে। কিন্তু বিধি বাদ সাধিলেন। পরীক্ষায় ঠিক দুদিন আগে দেখা গেল সত্যেন্দ্রনাথের বসন্ত হইয়াছে। পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ হইল। তাকে আর এক বছর পড়িতে হইল হিন্দু স্কুলের ছাত্র হিসাবে। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের মন আগামী বৎসরের পরীক্ষার অপেক্ষায় কেবল পুরানো পড়ায় আবদ্ধ থাকিতে চাহিল না। কলেজে গিয়া গণিতের যে সব বিষয় পড়িতে হইবে তাহা তিনি আয়ত্ত করিতে লাগিলেন

নিজের চেষ্টায়। সংস্কৃত কাব্যপাঠের মধ্য-পরীক্ষা দিবার ইচ্ছায় কালিদাস, ভবভূতি, ভারবী প্রভৃতির কাব্যাবলী পড়িয়া ফেলিলেন। আর পড়িলেন ঐতিহাসিক গ্রীন-এর সুবিখ্যাত গ্রন্থ—'এ শর্ট হিস্ট্রী অব্ দি ইংলিশ পীপল।' এ পর্বে আমি তাঁহাকে দেখি নাই, কিন্তু ইহার ফলের সহিত আমি প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের 'মেঘদূত' হইতে আবৃত্তি আমি অনেকবার শুনিয়াছি। আর দেখিয়াছি, 'হিস্টোরিয়ানস্ হিস্ট্রী অব দি ওয়ার্ল্ড' সীরিজের ফরাসী দেশের ইতিহাসের বিপুল গ্রন্থ এক নিঃশ্বাসে পড়িয়া ফেলিতে। জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টায় তিনি সব্যসাচী, অর্থাৎ বিজ্ঞান ও মানবিক শাস্ত্র, ইহার কোনো বিভাগকেই তিনি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নন। শারীরিক কুশলতায়ও তিনি সব্যসাচী, কেননা, লেখার বা খাওয়ার ব্যাপারে তিনি দক্ষিণহস্তের ব্যবহারে সুদক্ষ হইলেও একটা পেনসিল কাটিতে গেলে তাঁর বাম হস্ত আগাইয়া আসে। ক্যারম, ব্যাডমিনটন ও টেনিস খেলাতেও তিনি বামপন্থী। হিন্দু স্কুলে তখন গণিতের শিক্ষক ছিলেন উপেন্দ্রলাল বক্সী। তাঁহার মতো বিজ্ঞান-পাগল গণিত-শিক্ষক খুব কম দেখা যায়। পরে আমরা যখন তাঁহার ছাত্র হই তিনি আমাদের ক্লাসে প্রায়ই বলিতেন, 'তোমরা কলেজে গিয়ে সবাই বিজ্ঞান পড়ো। বর্তমান জগতে বিজ্ঞান না জেনে বাস করা মিথ্যা। কলেজে না গেলে, ল্যাবরেটরিতে এক্সপেরিমেণ্ট না করলে, বিজ্ঞান শেখা অসম্ভব। আর্টস্-এর যে কোনো বিষয় তো তোমরা বাড়িতে বসে নিজেরাই পড়ে নিতে পার।' তিনি আরো বলিতেন, 'সত্যেন আমার আদর্শ ছাত্র। না, এ-ও ঠিক বলা হল না। আমি অনেক সময় ভাবি যে আমিই তার কাছ থেকে অনেক পেয়েছি।' ১৯০৯ সালে এন্ট্রাস পরীক্ষায় কিন্তু এই আদর্শ ছাত্র তাকে প্রচণ্ড ব্যথা দিয়েছিল গণিতে 'ফুল মার্কস' না-পাইয়া। ব্যাপারটি হইয়াছিল এইরূপ। পরীক্ষার খাতা জমা দিয়া সত্যেন্দ্রনাথ আসিলেন হিন্দু স্কুলে, বক্সী মহাশয় তার অপেক্ষায় আছেন। প্রশ্নপত্র হাতে রাখিয়া দুজনে মুখে মুখে অংকগুলি কষিয়া যাইতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখা গেল, একটি অংকে সত্যেন্দ্রনাথ ১১৭কে আর ভাঙেন নাই, অবিভাজ্য ভাবিয়া। বক্সী মহাশয় বলিলেন—ন তেরম্? দুজনেরই মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। অংকে ফুল মার্কস না পাইলেও সত্যেন্দ্রনাথ ইতিহাস-ভুগোলে এত বেশি পাইয়াছিলেন যে, খুব সম্ভব তাহাতে তিনিই হইয়াছিলেন প্রথম। ইহা দেখিয়া কলেজে ভর্তি হইবার সময় মেসোমশায় পরামর্শ দিয়াছিলেন আর্টস্ কোর্সে ভর্তি হইতে।

বিজ্ঞানের ভবিষ্যতের দিক হইতে যাহাই হোক, পরীক্ষায় সাফল্যের দিক হইতে মেসোমশায়ের পরামর্শ যে অসমীচীন ছিল না, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল পরে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন বিখ্যাত ইংরেজি শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসেও পড়াইতেন; অধ্যাপক মনোমোহন ঘোষ বা অধ্যাপক পার্সিভাল বি-এ ক্লাসের নিচে পড়াইতেন না। সত্যেন্দ্রনাথ যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন জানা গেল যে আর কয়েক মাস পরেই অধ্যাপক পার্সিভাল অধ্যাপনা হইতে অবসর নিয়া তাঁহার স্বদেশ ভারতবর্ষ হইতে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়া বিলাতে গিয়া বসবাস করিবেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র অধ্যাপক ঘোষের নিকট এই ইচ্ছা জানান যে তাঁরা অন্তত কিছুদিনের জন্যও পড়িতে চাহেন অধ্যাপক পার্সিভাল-এর কাছে। ছাত্রদের এই ইচ্ছা পার্সিভাল সাহেবকে জানানো হইলে এই ব্যবস্থা হয় যে, মিলটন-এর 'কোমাস্'-এর অবশিষ্ট অংশ পার্সিভাল সাহেবেই পড়াইবেন অধ্যাপক ঘোষের বদলে। ইংরেজি সাহিত্যে শিক্ষক হিসাবে অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। তবুও, আমার মনে আছে, পার্সিভাল সাহেবের ক্লাসে পড়ার পর দাদার কি অপরূপ উৎসাহ ও ভক্তি। সেবারে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসের টেস্ট পরীক্ষায় ইংরেজি রচনা অংশটি পার্সিভাল সাহেবই পরীক্ষা করিলেন স্বেচ্ছায়। সেই পরীক্ষার ফল কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল তাহা আমি পরে শুনিয়াছি আমারপ অধ্যাপক স্বয়ং প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মুখে। তিনি ছিলেন পার্সিভাল সাহেব এর একান্ত অনুরক্ত শিষ্য। তিনি আমাকে বলেন, 'পরীক্ষায় দেখা গেল দুটি ছাত্র ১০০ ভিতর ৬০ পাইয়াছে। একজন আর্টস বিভাগের, আর সায়েন্স বিভাগ থেকে সত্যেন। কিন্তু সত্যেনের খাতার উপরে সাহেব লিখিয়া দিয়াছেন ৬০+১০, এই মন্তব্য করিয়া যে এই ছাত্রটি অসাধারণ, ইহার নিজস্ব কিছু বলিবার আছে।' তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে দেখিতে চাহেন ও দেখিয়া সস্নেহ আশীর্বাদ জানাইয়া যান।

এই প্রসঙ্গে একটা ব্যক্তিগত কথা আমার না বলিরা উপায় নাই। দাদার কাছাকাছি থাকিয়াও আমি স্কুলে, কলেজে বা ইউনিভারসিটিতে কোনো পরীক্ষাতেই আশানুরূপ ফল দেখাইতে পারি নাই। দাদার বক্তব্য ছিল, "পরীক্ষার হলে তোর কি হয় বুঝতে পারি না।" এ সত্ত্বেও আমি কোনোদিন তাঁর স্নেহে ও আগ্রহে বঞ্চিত হই নাই। তার এই সহৃদয়তা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া আমি মনে করি।

তাঁর অনুচর হইয়াই আমি বাংলা সাহিত্যের গণ্ডি পার হইয়া প্রথমে ইংরেজি ও পরে ইউরোপীয় সাহিত্যের সীমাহীন প্রান্তরে পদার্পণ করি। দাদার ঘরে কখনও নূতন বই-এর অভাব হইত না। বিজ্ঞানের বইগুলির দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টি দিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইত। কারণ, বাবার আদেশে আমাকে আর্টস পড়িতে হইল, যদিও তার মধ্যে একটি বিষয় রহিল গণিত। কলেজে আমি যখন প্রথম বার্ষিকে, দাদার তখন পঞ্চম বার্ষিক। ইণ্টারমিডিয়েট ও বি-এস-সিতে দাদাই হইলেন প্রথম। কিন্তু তাঁর বি-এস-সি পরীক্ষার একটি দিনের কথা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না।

এই সময়ে হেদুয়া পুকুরের একটি কোণে এখন যেখানে ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবের প্যাভিলিয়ন, শীতের শেষে ও পরীক্ষা পর্বের অব্যবহিত পূর্বে বিভিন্ন কলেজের কিন্তু নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী ছাত্রদের একটা মণ্ডলী জমায়েত হইত প্রতি সন্ধ্যায়। এই মণ্ডলীর কেন্দ্রে ছিলেন সত্যেন বোস। ম্যাট্রিক দেবার পর আমিও তাতে যোগ দিতাম। তার আগে স্কুলের ছাত্র হিসাবে আমাকে বিকালের খেলাধুলার পর বাড়িতে ফিরিতে হইত গ্যাসের বাতি জ্বালার আগে মায়ের কড়া হুকুমে। ম্যাট্রিক দিবার পর হেদুয়ার আড্ডা হইতে সন্ধ্যা হইতেই উঠিয়া পড়িতেছি দেখিয়া দাদার প্রশ্ন—"কোথায় যাচ্ছিস ?" উত্তর দিলাম—"বাড়ি।" দাদার নির্দেশ আসিল—"বোস। দেরি হলে একদিন বকুনি খাবি দ্বিতীয় দিনও খাবি তারপর থেকে আর কেউ বকবে না।" জীবনে এই আমার প্রথম মুক্তির আস্বাদ বাড়ির শাসন হইতে। কিন্তু দাদার মুক্তির আদেশে শাসনের বাঁধনও কম ছিল না। সপ্তাহে তিনদিন শ্রমজীবীদের নাইট স্কুলে পড়াইতে যাইতে হইত, সন্ধ্যায় আড্ডার মোহে আটক থাকিবার জো ছিল না। সে যাই হোক বি-এস-সি পরীক্ষার গণিতে অনার্সের পালা চলিতেছে। সত্যেন্দ্রনাথ পরীক্ষার্থী। তিনি তখন প্রায়ই খালি গায়ে একটা চাদর চড়াইয়া আসিতেন। প্রথম দিনের পরীক্ষা বেশ ভালোভাবেই কাটিয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় দিন ? সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল, চারিদিকে গ্যাসের আলো জ্বলিতেছে, তবুও সত্যেন্দ্রনাথের দেখা নাই। আমি ভাবিতেছি, একবার তাঁর বাড়িতে গিয়া দেখিয়া আসিব কিনা। এমন সময় দেখা গেল দাদাকে। তাঁর এমন বিশীর্ণ বিষণ্ণ চেহারা আমি আর কখনও দেখি নাই। আমরা নির্বাক হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া তিনি-ই বলিলেন—"আমি সব কটা অঙ্ক কষতে পারি নি। এই প্রথম পরীক্ষার হল থেকে অঙ্ক ছেড়ে বেরিয়ে

এসেছি।" কী শুষ্ক, করুণ শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। পরে জানা গেল, কেম্‌ব্রিজের সিনিয়র র‍্যাংলার পরাঞ্জপে সাহেব এমন কঠিন ও দীর্ঘ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন যে সত্যেন্দ্রনাথের পক্ষেও তিন ঘণ্টার মধ্যে ৭৫ নম্বরের বেশি উত্তর করা সম্ভব হয় নি।

কিন্তু ইহার বৈপরীত্যে একটি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথের এম-এস-সি পরীক্ষার ফলপ্রকাশে। প্রেসিডেন্সি কলেজের কমনরুমে বসিয়া আছি, হঠাৎ দেখি দাদা সেখানে। তিনি তো তখন আর কলেজের ছাত্র নন, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম—'তুমি এখানে কি কাজে?' জানিতে পারা গেল একটু পরে যে তিনি আসিয়াছিলেন ইউনিভারসিটি অফিসে মার্কশীট্ নিতে। খুলিয়া পড়িয়া দেখি—অবাক কাণ্ড! আটটি পেপারের দুইটিতে ফুল মার্কস্ আর দু-একটিতে ৯৬-এর কাছাকাছি সবচেয়ে নিচু নম্বর হচ্ছে ৮৮। এই মার্কশীট্ এখন কোথায় আছে জানি না, ইহাকে আমি আর কখনও দেখি নাই, বা এই প্রসঙ্গে কোনো কথা কারো কাছে শুনি নাই। ইহার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হইলে, জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে করা উচিত নয় কি?

এই দলিলটিকে উদ্ধার করা হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ-এর জীবন-সংক্রান্ত অন্য একটি উল্লেখযোগ্য দলিল বোধ হয় চিরকালের মতো নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এটি আমি একদিন দেখিয়াছিলাম মেসোমশায়ের কাছে। পরে খোঁজ করিয়া জানিয়াছি যে তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন সেটি তিনি কোথায় রাখিয়াছেন। সত্যেন্দ্রনাথের যখন নামকরণও হয় নাই, তখন একজন অখ্যাত গণৎকার এই 'নবজাতকের' সম্বন্ধে এই ভবিষ্যৎ গণনা করিয়াছিলেন যে, তাহার হইবে অসাধারণ ধীশক্তি ও প্রচুর খ্যাতি, কিন্তু তাহার চক্ষু হইবে চিরকাল রোগগ্রস্ত। এটুকু লেখা ছিল একটুকরা কাগজে। দাদাও বোধ হয় এটিকে কখনও দেখেন নাই, বা দেখিলেও অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু দৃষ্টির এই দুর্বলতা না থাকিলে দাদা হয়তো একজন নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড়ও হইতে পারিতেন, এ কথা ভাবিয়া আমরা খুব মজা লাগে। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে দাদার সহপাঠী ছিলেন প্রফুল্ল রায়, যিনি পরে সিনেমা জগতে বিখ্যাত হন। কিন্তু তিনি ছিলেন কলেজ ফুটবল টিমের একটি প্রধান স্তম্ভ। শুধু তাই নয়, এরিয়ানস্ ক্লাবের ফরওয়ার্ড-খেলোয়াড় হিসাবে তাঁর নাম ছিল বাংলাদেশে সুবিদিত। হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজের মধ্যবর্তী মাঠটিতে তখন বিকালে ফুটবল খেলা হইত। হঠাৎ দেখা গেল কয়েকজন ছাত্র দুপুরবেলায়

কাজের রুটিনে ফাঁক থাকিলে ফুটবল লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। সত্যেন বোস ও প্রফুল্ল রায় দুজনেই ছিলেন এই দলে। প্রফুল্ল রায় দাদার কাছে আসিতেন পড়াশোনা করিতে ও গল্প করিতেনও প্রচুর। তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, ‘সত্যেন, তুই অবাক করলি। তুই গোলকীপার থাকলে গোল দেওয়া খুব কঠিন, এ আমি দেখেছি। আশ্চর্য তোর পজিশনের জ্ঞান।’ পরে উচ্চ হাসিয়া বলিলেন, ‘তবে আমাদের একটা সুবিধা আছে। কোনোক্রমে ধাক্কা দিয়ে তোর চোখের চশমাটা ফেলে দিতে পারলে হয়। তখন তো তুই একদম অন্ধ।’ এই ফুটবল খেলায় দাদা বেশ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এ দুপুরে-মাতন বেশি দিন টিঁকিল না। প্রিন্সিপ্যাল জেমস্ কড়া নোটিশ দিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, স্কুলের ও কলেজের পড়ানোর কাজে ব্যাঘাত হয় বলিয়া।

এই হেয়ার-গ্রাউণ্ডেই সত্যেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার প্রকাশ্য রূপ আমরা দেখিয়াছি। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে হিন্দু স্কুলের প্রাক্তন এক ছাত্রকে, যিনি তখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছিলেন, ফিজিক্সের অধ্যাপক হ্যারিসন সাহেব অকস্মাৎ অপমান করিয়া বসেন। খবরটি প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে সারা কলেজের ছাত্র-ধর্মঘট ঘটিয়া গেল। আমি তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রায় নবাগত ছাত্র। দেখিলাম, সত্যেন্দ্রনাথ বক্তৃতা দিতেছেন এই জাতীয় অপমান সহ্য না করিতে। সারা দিনের শেষে হ্যারিসন সাহেব নতি স্বীকার করায় ব্যাপার সেই একদিনেই চুকিয়া গেল। কিন্তু জেমস্ সাহেব সতর্ক হইয়া কতকগুলি নিয়ম-কানুন প্রচলন করিলেন যাহাতে পরে “ওটেন-কাণ্ডের” পথ প্রশস্ত হইল। ওটেন-কাণ্ড যখন ঘটিল ১৯১৬ সালে সত্যেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবন তখন শেষ হইয়া গিয়াছে।

ছাত্রজীবন শেষ হইবার পূর্বেই এম-এস-সি পড়িতে পড়িতে দাদার বিবাহ হয়। মেসোমশায়কে বেশির ভাগ সময় থাকিতে হইত কলিকাতার বাহিরে, মাসিমার শরীর প্রায়ই থাকিত অসুস্থ। তাই মায়ের কথা সত্যেন্দ্রনাথ ফেলিতে পারিলেন না। কন্যা নির্বাচনে পাত্রের মতামতের প্রশ্ন—পাত্রীর কথা দূরে থাক—তখনও সমাজে প্রকট হইয়া ওঠে নাই। সত্যেন্দ্রনাথও তোলেন নাই—যদিও তিনি ইবসেন, রোলাঁ, গোর্কি সাহিত্যে মশগুল ছিলেন। তখনকার যুবক সমাজের সামনে বরপণ-প্রথাই ছিল সবচেয়ে বিকট পারিবারিক প্রশ্ন। দাদা কন্যা নির্বাচনে মাসিমাকে সম্পূর্ণ অধিকার ছাড়িয়া দিয়া একটি শর্ত না করিয়া পারিলেন না যে যৌতুক হিসাবে একটি পয়সাও দাবি করা চলিবে

না। আমি জানি, তখন এক কন্যাপক্ষ কুড়ি হাজার টাকা (তখনকার দিনের) লইয়া সাধাসাধি করিতেছিল। কিন্তু মাসিমা নিরুপায়, যেহেতু এ বিষয়ে দাদা অটল। দাদার মতো মাতৃভক্ত ছেলের কাছেও মাসিমাকে হার স্বীকার করিতে হইল, কারণ সামাজিক ন্যায়-বিচার ছিল দাদার দিকেই। দাদার শ্বশুরমহাশয় এ হেন সুপাত্রকে বিনা যৌতুকে পাইয়া খুশি হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, তবে যখন তিনি শুনিলেন যে বিবাহের রাত্রে বরানুগমনে আসিবে আত্মীয়-কুটুম্ব ছাড়াও পাত্রের বন্ধুগোষ্ঠী কমপক্ষে দুইশত জন, তখন, ডাক্তার মানুষ তিনি, তাঁহার মনে সন্দেহ জাগিয়াছিল এই প্রতিভাবান যুবকটি প্রকৃতপক্ষে সুস্থমস্তিষ্ক কিনা। কে না জানে প্রতিভার সহিত উন্মাদরোগের সম্পর্ক খুব দূরের নয়। অথচ আমরা যারা সত্যেন্দ্রনাথের নিকটস্থ লোক আমাদের পক্ষে, তার বন্ধুসংখ্যা এর চেয়ে কম করিয়া ধরাই ছিল অস্বাভাবিক—যুবক মহলে এমনই ছিল তার জনপ্রিয়তা। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গিয়াছে। মেসোমশায় আসিয়াছেন ছেলের বিবাহ দিতে, আইবুড়ো ভাতের তত্ত্ব পাঠানোর ব্যবস্থা হইতেছে। এমন সময় পুরানো ঘটক আসিল খোঁজ লইতে দাদার বিবাহ ঠিক হইয়া গিয়াছে কিনা। এ সেই ঘটক যে কুড়ি হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত কন্যাপক্ষের লোক। সে আসিয়া দেখিল তত্ত্ব পাঠানোর আয়োজন হইতেছে। তাহাতে সে 'হায় হায়' করিয়া উঠিল। মেসোমশায়-এর এক রসিক আত্মীয় বলিয়া উঠিলেন—'দুঃখ করছেন কেন ঘটকমশায়, আরো পাঁচ হাজার টাকা চড়িয়ে দিন না, তাহলে আমরা এখনই তত্ত্বের ঠিকানা বদল করে দিই।' ঘটক মহাশয় সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—'সত্যি বলছেন, তাহলে আমায় আধ ঘণ্টাটাক সময় দিন, আমি একটিবার জিজ্ঞাসা করে আসি।' আত্মীয়ের এই বদ-রসিকতায় মেসোমশায় বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঘটককে এই বলিয়া বিদায় দিলেন যে তাঁর ছেলে-বেচার ব্যবসায় নেই, ও ভদ্রলোকের কথার নড়চড় হয় না। তত্ত্ব যথাস্থানে পেঁছিল, ও যথানির্দিষ্ট দিনে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গেল।

ছাত্রজীবন শেষ হইলেই প্রশ্ন ওঠে জীবিকার। পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথের অসাধারণ সাফল্যের পর সরকারি চাকুরির কোনোরকম সম্ভ্রান্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হবার পথ ছিল উন্মুক্ত। কিন্তু শৈশবকালের স্বদেশী আন্দোলনের জ্বলন্ত অনুপ্রেরণা দাদাকে কখনও পরিত্যাগ করে নাই। ইংরেজ সরকারের প্রত্যক্ষ সেবাকে তিনি ঘৃণা করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে ঠিক এই সময়ে কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠন শুরু হইয়াছিল আশুতোষের নেতৃত্বে। কেবলমাত্র পরীক্ষা-পরিচালক প্রতিষ্ঠান হইতে ইউনিভারসিটির রূপান্তর হইতেছিল উচ্চতম জ্ঞানানুশীলনের ও গবেষণার প্রাণকেন্দ্রে। প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিবান তরুণ যুবকদের এই বিরাট প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত করা আশুতোষের দূরদৃষ্টির অন্যতম প্রধান নিদর্শন। এম-এস-সি পাশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সত্যেন্দ্রনাথ নবপ্রতিষ্ঠিত স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থায় গণিত ও পদার্থবিদ্যার শিক্ষণের কাজে নিযুক্ত হইলেন। তাঁর জীবনের একটি প্রধান সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। এজন্য আশুতোষের নিকট সত্যেন্দ্রনাথের কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ জীবনের পথ কোনো দিনই মসৃণ হইতে পারে না। কর্মক্ষেত্রের দৈনন্দিন জীবনে আশুতোষের পরিচালনার কোনো কোনো ত্রুটি সত্যেন্দ্রনাথের চোখে পড়িলে তিনি সমালোচনা চাপিয়া পারিতেন না। আর অপরের দৃষ্টি হইতে সত্যেন্দ্রনাথের ত্রুটি ছিল এই যে, তাঁর সমবয়সী অন্যেরা যখন গবেষণার ফলে নানা বিষয়ে 'ডক্টরেট' উপাধি অর্জন করিতেছেন সত্যেন্দ্রনাথ থাকিয়া যাইতেছেন শুধুমাত্র এম-এস-সি। অনেকের ধারণা হইত তিনি পরিশ্রমী নন, তাঁর শক্তি আছে কিন্তু তিনি আড্ডাবাজ। তাঁকে দেখা যাইত হয়তো কোনো বন্ধুর কাঁধে হাত দিয়া কলিকাতার পথে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া যাইতেছেন গল্প করিতে করিতে। তিনি তাস ও দাবা খেলেন। ধূমপানে অভ্যস্ত, এসরাজ বাজান। আর সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের নানা গ্রন্থ ফরাসী, ইতালীয়ান ও জার্মান ভাষায় পড়িয়া বিজ্ঞানের অবহেলা করেন। সত্য কথা বলিতে কি এ অভিযোগ আমার মনেও কোনো দিন ওঠে নাই বলিতে পারি না। কিন্তু দাদার খুঁত-ধরা ছিল আমার স্বভাব ও শিক্ষার বিরুদ্ধে। তবু একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমার মনের ভাব তিনি ধরিয়া ফেলেন। আমার আজও স্পষ্ট মনে আছে, তিনি সেদিন আমায় বলিয়াছিলেন—'দেখ, জ্ঞানের রাজ্যে এখন একটা প্রকাণ্ড আলোড়ন চলছে। কোনো বিষয়ের জ্ঞানকেই একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান থেকে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। গণিত, চট্ করে করা পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন—এদের শিকড়গুলো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে। কাজেই, ভালো কিছু করতে গেলে অনেক জানতে হয়, গভীরভাবে ভাবতে হয়। তার জন্যে সময় লাগে।" কথাগুলি তিনি আমায় বলিয়াছিলেন একেবারে সাধারণ সুরে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসির সহযোগে। কিন্তু আমার মন তখনই পরিতৃপ্ত হইয়াছিল।

কলিকাতা ইউনিভারসিটিতে অল্প কয়েক বছর কাজের পর সত্যেন্দ্রনাথ চলিয়া গেলেন ঢাকায়—পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের রীডার-এর পদে যোগ দিতে। প্রোফেসার পদে রহিলেন মিঃ জেন্‌কিন্‌স্‌ যিনি পরে বাংলাদেশের ডি-পি-আই হইয়া যান। এখানে গিয়া সত্যেন্দ্রনাথ গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন তিনটি বিষয় লইয়াই যথাসাধ্য মনোনিবেশের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনীষার ফল প্রকাশ্যে দেখা দিতে বিলম্ব হইল না। টাইপ-করা পাঁচ-ছয় পাতার একটি প্রবন্ধ তিনি পাঠাইয়া ছিলেন ইংরেজিতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুবিখ্যাত মুখপত্র ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে, যাহাকে সংক্ষেপে বলা হয় ফিল-ম্যাগ। ঢাকা নামক অখ্যাত ইউনিভারসিটির এক অখ্যাত শিক্ষকের এই প্রবন্ধ ফিল-ম্যাগের কৌলীন্য-দৃপ্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিল না। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ আপন প্রবন্ধের কপি সরাসরি পাঠাইয়া দেন আইনস্টাইনকে। জগৎ-বরেণ্য বিজ্ঞানী তৎক্ষণাৎ ইহাকে জার্মান ভাষায় স্বয়ং অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলেন 'টসাইটশ্রিফ্‌ট্‌ ফ্যুর ফিজিক্‌'-এ, এই মন্তব্যসহ যে প্রবন্ধটিকে তিনি মনে করেন আধুনিক পদার্থবিদ্যার একটি জটিল সমস্যার এক দ্যোতনাময় সমাধান। ইংরেজিতে প্রকাশিত না হওয়ায় এ দেশের বিজ্ঞানীমহলে তাহা প্রায় অখ্যাতই রহিয়া গেল।

ঢাকা ইউনিভারসিটির সংবিধানে ছিল যে উন্নততর জ্ঞানানুশীলনের জন্য কোনো প্রোফেসর বা রীডারকে বৃত্তি দিয়া বিদেশে পাঠানো যাইবে দু বছরের জন্য। কাহাকে পাঠানো হইবে এই প্রশ্নের বিচারে সত্যেন্দ্রনাথই নির্বাচিত হন। ভাইস চান্সেলর মিঃ হার্টগ এই সিদ্ধান্ত সত্যেন্দ্রনাথকে জানাইবার সময় আভাস দেন যে যদিও বৃত্তি বিষয়ে এমন কোনো শর্ত নাই, তবুও সত্যেন্দ্রনাথের উচিত কোনো ইওরোপীয় ইউনিভারসিটির ডক্‌টর হইয়া ফেরা, কারণ তিনি এ পর্যন্ত গবেষণা জাতীয় কোনো কৃতিত্ব দেখান নাই। সত্যেন্দ্রনাথ তখন তাঁহাকে দেখান আইনস্টাইনের মন্তব্য। মিঃ হার্টগ জার্মান জানিতেন, তাই আমতা আমতা করিয়া বলেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করুন।" সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বখ্যাতির সূত্রপাত ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই ঢাকার সহিতই জড়িত রহিয়াছে তাঁর জীবনের এক শোচনীয় দুর্ঘটনার স্মৃতি। তাঁর দ্বিতীয় সন্তান ও প্রথম পুত্র সবে হাঁটিতে শিখিতেছে এমন সময় ফুটন্ত গরম দুধের কড়ার ভিতর পড়িয়া যায় ও নাভিকুণ্ড পুড়িয়া যাওয়ায় অচিরে প্রাণত্যাগ করে। মাসিমা তাহাতে বৌদিদি সম্বন্ধে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন, কারণ

তাহার ধারণা হয় বৌদিদির অনবধানতাই এই শোকাবহ ঘটনার মূল কারণ। বৌদিদি মানুষ হিসাবে খুবই ভালো, কিন্তু সাংসারিক গৃহিণীপনায় তার কুশলতার অভাব ছিল। আর মাসিমা ছিলেন অতিমাত্রায় সুগৃহিণী। আপন হৃদয়ের বিশালতা দিয়া দাদা দুই বিরুদ্ধপক্ষের শোকের গভীরতা আত্মস্থ করিতে পারায় সংসারে শোকের মধ্যেও শান্তি অব্যাহত থাকে।

ইতিমধ্যে সত্যেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও গভীরতর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-প্রবন্ধ ইওরোপীয় বৈজ্ঞানিক মহলে প্রচারিত হইয়া গেল। ইহার সিদ্ধান্তগুলির সহিত আইনস্টাইন এবারে একমত হইতে না পারায় বিজ্ঞানজগতে দেখা দিল তীব্র বিতর্ক। ঢাকা হইতে তোড়জোড় করিয়া সত্যেন্দ্রনাথ প্যারিসে পৌঁছাইয়া দেখিলেন তাঁহার খ্যাতি আগেই প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। মাদাম কুরি-র লেবরেটরিতে তিনি সহযোগিতার জন্য আমন্ত্রণ পাইয়া গেলেন বিনা চেষ্টায়। ফরাসী ভাষা তিনি পড়িতে পারিতেন প্রায় ইংরেজির মতো স্বচ্ছন্দে, কিন্তু এ দেশে কথা বলার সুযোগ ছিল না। সেখানে তাঁহার মুখ ফুটিল এক নূতন ভাষায়। দু বছরের ছুটির এক বছর কটিল প্যারিসের বিজ্ঞানী মহলে। তাঁহার হৃদয়বত্তার গুণে তিনি অনেকের পারিবারিক বন্ধু হইয়া উঠিলেন, যাঁহারা এখনও তাঁহাকে ভোলেন নাই। প্যারিস হইতে গেলেন বার্লিনে। ইংলণ্ডে যাইবার কোনো আগ্রহ তাঁর ছিল না। বার্লিনের হোটেল হইতে টেলিফোনে আইনস্টাইনকে জানাইলেন যে, তিনি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন ও বিশ্ববিজ্ঞানের সর্বাগ্রগণ্য পুরোহিতের তিনি দর্শনার্থী। আইনস্টাইন টেলিফোনেই তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দেখা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হইল বিতর্ক-বিচার। আবার ভাষা বিভ্রাটের পালা। জার্মান বলার অভ্যাস তো সত্যেন্দ্রনাথের ছিল না। এখানেও আইনস্টাইন তাঁহাকে সাময়িকভাবে তাঁহাদের সর্বোচ্চ আলোচনা সভার—কলোকিয়াম্-এর—সম্মানিত সভ্য করিয়া লইলেন। এখানেও কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের তিনি হইয়া উঠিলেন পারিবারিক বন্ধু।

বার্লিনে থাকিতেই সত্যেন্দ্রনাথ খবর পাইলেন যে মিঃ জেনকিনস্ ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছেন কলিকাতায়। তাঁহার শূন্যপদের জন্য প্রার্থী ডাকা হইবে কেবল ভারতে নয়, বাহিরেও। সত্যেন্দ্রনাথের অনেক শুভার্থী লিখিয়া পাঠাইলেন, সত্যেন্দ্রনাথ যেন আবেদনপত্র পাঠান ও সেই সঙ্গে অতি অবশ্য একখানি সার্টিফিকেট—আইনস্টাইনের। আবেদন পাঠাইবার সময় সত্যেন্দ্রনাথ

বাধ্য হইলেন আইনস্টাইনকে ব্যাপারটা বোঝাইয়া বলিতে। আইনস্টাইন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তুমি বিজ্ঞানের যে কাজ করেছ তাই কি যথেষ্ট সার্টিফিকেট নয়? পরে শুনিয়াছি, দাদার মুখে নয়, আইনস্টাইন নাকি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার এ দেশে আসায় আমরা উপকৃত হইয়াছি। সত্যেন্দ্রনাথ এ দেশে ফেরার পর রবীন্দ্রনাথ যান জার্মানিতে ও আইনস্টাইনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিকট ভারতীয় গণিতবিদ্ বোসের খবর জিজ্ঞাসা করেন। এ বোস যে কে, তাহা রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন নাই। আইনস্টাইন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এই বোস এমন একজন গণিতবিদ যাঁহার প্রতিভায় যে-কোনা দেশ গর্বিত হইতে পারে। দেশে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথ এই বোসকে খুঁজিয়া বাহির করেন ও আমন্ত্রণ করেন শান্তিনিকেতনে। এই আলাপ পরিচয়ের ফলেই 'বিশ্ব-পরিচয়'-এর ভূমিকা।

দাদা রবীন্দ্রনাথের কবিতার ও গদ্য রচনার আজন্ম ভক্ত। 'কথা ও কাহিনী' ও 'চয়নিকা'-র বহু কবিতা তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। মনে আছে তাঁর কাছে আমি 'গোরা' পড়িয়াছিলাম এক অভিনব প্রথায়। যেখানে যেখানে আছে গোরা ও বিনয়ের তর্ক, সেখানে একপক্ষের যুক্তি পড়ার পর বই মুড়িয়া ভাবিয়া বাহির করিতে হইবে অন্যপক্ষের খণ্ডন কি হইতে পারে। তা ছাড়া, 'সবুজপত্র' প্রকাশের সময় প্রমথ চৌধুরীর ব্রাইট স্ট্রীটের বাড়িতে যে আসর বসিত দাদার সেখানে নিমন্ত্রণ ছিল নিয়মিত। মাঝে মাঝে আমিও সেখানে গিয়াছি আমার ছাত্রাবস্থায় দাদার অনুচর হইয়া। রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রা'-র আসরেও গিয়াছি তাঁহার সঙ্গে। কিন্তু তাঁহাকে কখনও আগাইয়া গিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত আলাপ করিতে দেখি নাই। দেশে থাকিতে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁহাকে না চেনার ইহাই ছিল প্রধান কারণ।

অথচ একদিক দিয়া দেখিলে দাদাকে বলা যায় কবিগুরুর ভক্ত—একলব্যের মতো। দাদা তো কেবল বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী নন, তিনি মনে-প্রাণে দেশসেবী, বাংলাভাষী সমগ্র জনসাধারণের আপনজন। এই বাঙালী জাতির সুখদুঃখ তাঁর ব্যক্তিগত সুখদুঃখের চেয়ে গভীরতর। বাঙালী জাতিকে যে ভালবাসে সে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও সর্বশেষে রবীন্দ্রনাথকে ভক্তি না করিয়া পারে না। তাই দাদার মনন ও চিন্তা কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণার জটিল অঙ্কের মধ্যে আটকাইয়া থাকিতে পারে নাই, তাহা ছড়াইয়া পড়িয়াছে বিশাল সামাজিক বিবর্তনের কর্মপ্রবাহে। আজ বাঙালী

জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা—শিক্ষার দূরবস্থা। ইহার পদ্ধতিতে আবশ্যক আমূল পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের প্রধান রূপ হওয়া উচিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল বৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রমের প্রবর্তন নয়, আমাদের সামগ্রিক চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগ ও প্রসার। 'বিশ্ব-পরিচয়' গ্রন্থরচনায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রচেষ্টার সূচনা করিয়া গিয়াছেন, সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ' তাহারই প্রতিষ্ঠানগত রূপ। ইহা কোনো ন্যাশনাল লেবরেটরির বা ইনস্টিটিউটের বাঙালাদেশীয় সংস্করণ নয়। বাংলাভাষী শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি ইহাকে তাহার নিজস্ব কীর্তি বলিয়া গ্রহণ করে ও লালন করে তাহাতেই হইবে বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথের জীবন-সাধনার উপযুক্ত সার্থকতা।

আটই মে

১৯৪৫-এর ৮ই মে পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিবস বলিয়া পরিগণিত হইবে। ঐ দিনে হিটলার-শাসিত জার্মানী বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ স্বীকার করে। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের এক বিরাট পর্ব্ব ঐ দিনে শেষ হয়। ঐ দিনেই নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে বিশ্বযুদ্ধ শেষ না হইলেও তাহার শেষ পরিণাম কি হইতে পারে। রোম-বার্লিন-টোকিও ছিল অক্ষ শক্তির তিন কেন্দ্র; কমিণ্টার্ন-বিরোধী মূল ত্রিশক্তি। উহার প্রবল পরাক্রান্ত দুই ইউরোপীয় অংশীদারের অভাবিত পরাজয়ে এশিয়াস্থিত তৃতীয় শক্তিটির জয়ের আশা নির্ব্বাপিতপ্রায়, মিত্রশক্তির চরম বিজয় আজ সুনিশ্চিত।

কিন্তু মিত্রশক্তির বিজয় লাভের মধ্যে এমন কি আছে যাহাতে বিশ্বের জনসাধারণ পুলকিত হইয়া উঠিতে পারে। যুদ্ধ মাত্রেরই অবসানে একদল জয়ী ও অন্যদল পরাজিত হয়। দিনকতকের জন্য উভয় পক্ষই চুপচাপ থাকে, আবার বিরোধ ঘনাইয়া উঠে কুচকাওয়াজ শুরু হয়, প্রচণ্ডতর যুদ্ধে দুই পক্ষের শক্তি পরীক্ষায় শান্তি ভাঙিয়া যায়। ইতিহাস ত এমনই ভাবে চলিয়াছে ও চলিবে।

ইতিহাসের এই ব্যাখ্যা মনে হয়, একদেশদুষ্ট। ইহা অতীতের ঘটনাকে যতখানি মানে বর্ত্তমানের বাস্তবতা ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্যতাকে সেই পরিমাণে

অস্বীকার করে। ৮ই মে-র মূল্য হিসাব করিতে বসিয়া ইহা ভুলিয়া যায় যে নাৎসী রাষ্ট্রের একান্ত নিধন সাধিত হইয়াছে সাম্রাজ্যবাদের বিজয়ে নহে—জনশক্তির, বিশেষত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রশক্তির অপ্রতিহত অগ্রগতিতে।

মিত্রশক্তির ভিতর অন্তর্বিরোধ আছে, এ কথা রাজনৈতিক শিশুতেও জানে। সাম্রাজ্যবাদের সহিত সাম্যবাদের মৈত্রী মূলগত হইতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদের নাড়ীর টান নাৎসীবাদের দিকে. কারণ নাৎসীবাদ সাম্রাজ্যবাদের নিকট আত্মীয়, তাহারই সুস্পষ্টতর রূপ। সাম্যবাদ তাহাদের দুয়েরই জন্মগত প্রতিদ্বন্দ্বী। তবু ইতিহাসের পরিহাস এই যে নাৎসীবাদের সহিত সাম্রাজ্যবাদের সংঘর্ষে সাম্রাজ্যবাদকে সাম্যবাদের সহায়তা স্বীকার করিতে হইল, আত্মীয়-কলহে সাধারণ শত্রুর বন্ধুত্ব ভিক্ষা করিতে হইল আত্মরক্ষার অনিবার্য্য তাগিদে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় দেখি ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সহিত জার্মান নাৎসী রাষ্ট্রের বিরোধ, ধনতান্ত্রিক জগতের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপনের দুর্জয় বাসনায়। অনাক্রমণ চুক্তির ফলে সোভিয়েট রুশিয়া তখন সতর্ক দর্শক মাত্র। এই অস্বাভাবিক গৃহযুদ্ধ চেম্বারলেন, দালাদিয়ে ও হিটলার সকলেরই অনভিপ্রেত, অথচ ইহাকে প্রতিরোধ করার উপায়ও কাহারো সাধ্যায়ত্ত ছিল না। ইহা ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে নাই, ইহা ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ক্ষয়রোগের বাহ্য প্রকাশ। সমর-পিপাসু নাৎসীতন্ত্রের সামগ্রিক প্রস্তুতির আঘাতে সমর-বিমুখ সাম্রাজ্যতন্ত্রের শ্লথগতি নিশ্চল হইয়া উঠিল। পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের প্রায় সমগ্র ভূভাগ হিটলারের নেতৃত্ব মানিয়া লইল। এমন কি সমাজবিপ্লবের ঐতিহ্যবাহী গর্ব্বিত ফরাসী দেশেও হিটলারের প্রভুত্ব স্থাপিত হইল। কেবল ব্রিটিশ জনসাধারণ হিটলার-বিদ্বেষী চার্চ্চিলের নেতৃত্বে রুদ্ধশ্বাস পরাক্রমে পরাধীনতার শৃঙ্খলকে দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিয়াছিল। হিটলারের চৈতন্য হইল, ব্রিটিশ জাতির সহিত এই অনিশ্চিত সংগ্রামে দুই ধনতন্ত্রী শক্তির বৃথা শক্তিক্ষয় হইতেছে; আর তাহারই সুযোগে উভয়েই একান্ত শত্রু সোভিয়েট রাষ্ট্র তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অতি দ্রুত সম্পাদনের অজেয় শক্তি অর্জ্জন করিতেছে। এই চেতনাই শান্তির দূত হেস্-এর ইংলণ্ডে আকস্মিক আবির্ভাবের রহস্যাবৃত কারণ। কিন্তু হায় ততদিনে মিলনের শুভলগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, ধনতন্ত্রীদের আত্মবিরোধ ঘনীভূত হইয়াছে, হিটলারের প্রস্তাব গ্রহণ করা চার্চ্চিল-চালিত ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর সাধ্যাতীত। এই প্রত্যাখানের ফলে অচিরেই ঘটিল হিটলারের সোভিয়েট অভিযান, যে অকারণ

বিশ্বাসঘাতী, তীক্ষ্ন-বিচারিত ও বিজ্ঞান-পরিচালিত অভিযানের তুলনা ইতিহাসে নাই। বিনা অপরাধে সমাজতন্ত্রী সোভিয়েট রুশিয়াকে জীবন-মরণ সংকটের সম্মুখীন হইতে হইল। কিন্তু তাহাতেও ধনতন্ত্রীদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হইল না; সোভিয়েটের আজন্ম শত্রু চার্চ্চিলকে যে আপনা হইতে হিটলারের বিপক্ষে সোভিয়েটের সহিত সখ্যস্থাপনা করিতে হইল, ইহাতেই বোঝা যায় ধনতন্ত্রের অন্তরস্থ ক্ষয়রোগ কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল।

২

তবু এতদিনে যেন চেম্বারলেনের আত্মা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কারণ এইবার যে যুদ্ধ শুরু হইল ত প্রকৃত যুদ্ধ। এ যুদ্ধ সেই দুই মতবাদে, যাহাদের মধ্যে কোন আপোষ-রফার অবকাশ নাই, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের স্থান নাই। এই মহাভারতীয় দ্বৈরথ-সংগ্রামে, সোভিয়েটের সহিত মিতালির জন্যই, ইঙ্গ-মার্কিন শাসকশ্রেণী হইয়া পড়িল অনেকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দর্শকের মতো। সোভিয়েটের আকুল আহ্বানেও দ্বিতীয় রণাঙ্গন উদ্‌ঘাটন করার কোনো আগ্রহ তাহাদের অন্তরে নাই, আছে কেবল শ্রমিককৃষক সৈনিককে ভুলাইবার মতো আয়োজনের অভিনয়! শাসকশ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের বিরোধী এই অভিনয়ের আবশ্যকতা, ও শেষ পর্য্যন্ত জনমতের চাপে এই অভিনয়কে সত্যে রূপান্তরিত করিয়া জার্মানীকে দুই পাশ হইতে আক্রমণ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় স্তরে ইহাই সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার। হিটলার কর্ত্তৃক সোভিয়েট আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বের স্বাধীনতাকামী জনগণের দিক হইতে যুদ্ধের তাৎপর্য্যের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। এখন আর যুদ্ধ নিবদ্ধ রহিল না দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থাভিসন্ধী মল্লক্রীড়ায়। যে সংঘর্ষ পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ ব্যতীত সকল দেশে অহরহ চলিতেছে—শাসকের সহিত শোষিতের সংঘর্ষ—তাহাই এখন অভিব্যক্ত হইয়া উঠিল প্রচণ্ডতম তীব্রতায়। নাৎসীবাদ হইতেছে শাসকশ্রেণীর শোষণ-প্রণালীর নিষ্করুণ আয়োজন। আর সোভিয়েট রুশিয়া হইতেছে পৃথিবীর সেই একটিমাত্র দেশ যেখানে শোষণের অবসানে শ্রেণীহীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রথম সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশের শোষিত জনগণ, কৃষকশ্রমিক ও বুদ্ধিজীবী দেখিল সোভিয়েটের পরাজয়ে তাহাদের চরম সর্ব্বনাশ। তাই সোভিয়েটের সমর্থনকল্পে তাহারা মিত্রপক্ষের বিজয়ের জন্য

সমরোদ্যমে যথাসাধ্য সহায়তায় প্রবৃত্ত হইল, ও এই সহায়তার ভিতর দিয়া আপন আপন দেশের শাসকশ্রেণীর সোভিয়েটবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলতাকে পরাজিত করিয়া সোভিয়েটের অনুগামী হইতে বাধ্য করিল। হিটলারের অধিকৃত দেশসমূহে অমানুষিক অত্যাচার সত্ত্বেও যে সকল স্বদেশপ্রেমিক প্রতিরোধী দল বিশ্বাসঘাতক শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষ চালাইতেছিল, তাহারাও যথাসময়ে বিজয়ী সোভিয়েট বাহিনীর সহিত হাত মিলাইয়া জনমতের প্রতিভূস্বরূপ শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিল। তাই হিটলার জার্মানীর পতনে ৮ই মে হইয়া উঠিল বিশ্বব্যাপী বিজয়োৎসবের দিবস, সমগ্র শাসকশ্রেণীর উপর সমগ্র শোষিত-শ্রেণীর অভিযান-সাফল্যের গৌরবরঞ্জিত পুণ্য-দিবস।

৩

তবে কি ৮ই মে-র পর হইতে বিশ্বব্যাপী শোষণের অবসান ঘটিয়াছে শাসক-শ্রেণী আসনচ্যুত হইয়া লোপ পাইয়াছে। বিজিত নির্জ্জিত পরাধীন জাতিগুলি স্বাধীন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী হইয়াছে? তাহা যে হয় নাই তাহা ত প্রত্যক্ষ। কিন্তু তাহাতেও ৮ই মে-র মহিমা খর্ব হয় না কারণ যে-পথে চলিলে বিশ্বব্যাপী শোষণের অবসান ঘটে, শাসকশ্রেণীর উচ্ছেদ হয়, বিজিত জাতিরা স্বাধীন কর্তৃত্ব লাভ করে সে পথ ৮ই মে-র আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। ৮ই মে-কে বলা যাইতে পারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহারই প্রকাশ্য পরিণতি যাহার সূচনা হয় ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বরে। রুশবিপ্লবের ফলে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রবর্ত্তিত হইল নূতন যুগ, সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহে শ্রমিক বিপ্লবের যুগ; তাহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিবে সমস্ত নির্য্যাতিত দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক বিপ্লব, শ্রমিকশ্রেণীর সহিত বন্ধুত্ব বন্ধনে ও তাহার নির্দ্দিষ্ট পরিচালনায়। যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শোষণের অবসান ঘটিয়াছে, শ্রেণীহীন সমাজ সম্ভব হইয়াছে, জারের আমলের অধীন নির্য্যাতিত জাতিগুলি স্বাধীন ও সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, তাহা ছিল এতদিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর নিকট অপাংক্তেয়। বর্ত্তমান যুদ্ধের ফলে তাহার মর্যাদা আজ এমনই বাড়িয়াছে যে শান্তি বৈঠকে বিশ্বের জনশক্তির নেতৃত্ব তাহার হাতে আপনা হইতে আসিয়া পড়িতেছে। আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের সহিত সামরিক শক্তি পরীক্ষা করার সাহস বা শক্তি কোন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের নাই। অথচ মিত্রশক্তির একাংশ এখনো

সাম্রাজ্য টিকাইয়া রাখিতে চায়, তাই মিত্রশক্তির অভ্যন্তরীন সংঘর্ষের সমাধান হয় নাই। তাই আজ তাহাদের মধ্যে যে যুদ্ধ চলিতেছে সে যুদ্ধ চলিতেছে অস্ত্র লইয়া নয়, অন্য উপায়ে। হিটলার-বিরোধী সংগ্রামের মতো এখানেও সোভিয়েটের জয় অবশ্যম্ভাবী। কারণ, ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মতো সোভিয়েট রণক্লান্ত নয়, তাহার ভিতরে শ্রেণীগত অন্তর্বিরোধ নাই, তাহার উৎপাদন শক্তি বিস্ময়কর বেগে বাড়িয়া চলিয়াছে। আর একমাত্র তাহারই প্রতিনিধির কণ্ঠে দ্বিধাহীন স্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, শোষিত জনগনের কামনা ও বিজিত জাতিগুলির অভীপ্সা। তাহার কৃতিত্বের উজ্জ্বল উদাহরণ সংক্রামক হইয়া দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে, শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবীকে অনুরূপ আদর্শে উদ্দীপিত করিতেছে।

৪

ভারতবাসীর পক্ষে সোভিয়েটের আদর্শ ও কর্ম্মনীতির সম্যক অনুধাবনের পথে প্রধান অন্তরায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ। এই সাম্রাজ্যবাদকে আমরা চিনি অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে। ইহার রাজনৈতিক মিথ্যাচার ও অর্থনৈতিক স্বৈরাচারে বিক্ষুব্ধ নয় এমন ভারতবাসী খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। তবুও ইহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধারও অন্ত নাই। আমরা ইহাকে নিজের অজ্ঞাতসারে প্রায় সর্ব্বশক্তিমানের আসনে বসাইয়া রাখিয়াছি। ইহার শাসন আমাদের উপর অটুট আছে বলিয়া আমরা ধরিয়া লইয়াছি, ইহাকে শাসন করার মতো শক্তি কোথাও নাই! ইহার আয়ু যে ফুরাইয়া আসিয়াছে, যে ইহাকে বধিবে সে যে জনশক্তির ক্রমজাগরণে ইতিপূর্ব্বেই বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি না। তাহার যথেষ্ট কারণও আছে। জগৎব্যাপী ফিউডালতন্ত্রের প্রথম পরাজয় ঘটে ইংলণ্ডের ধনতন্ত্রের অভ্যুদয়ে। তাহারই প্রভাবে পৃথিবীর দেশে দেশে একদিন জাতীয় স্বাধীনতার মন্ত্র ছড়াইয়া পড়ে। ইংলণ্ডের ধনতন্ত্রের সেদিন ছিল বিপ্লবী ভূমিকা। ইংলণ্ডের রাজ্যলাভেই ভারতবর্ষে ফিউডালতন্ত্রের অবসান হয় ও জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত হয়। ভারতের ইতিহাসে ইংলণ্ডের এই দান, সাহিত্যে ও শিল্পে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে অবিস্মরণীয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক ঘটনার সমস্ত জ্ঞান আমরা আহরণ করি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরকলার মারফতে। সে পরকলা দূরবীক্ষণের উল্টা দিকের মতো,

নিকটকে দেখায় দূরে, বৃহৎকে দেখায় ক্ষুদ্র, সরলকে দেখায় বিকৃত। তাহা দেখিতে দেয় না যে ধনতন্ত্রের গর্ভ হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে তাহার মারণাস্ত্র সাম্যবাদ। এই সাম্যবাদের শক্তি দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে, এই সাম্যবাদের পথেই পৃথিবীর জনগণের মুক্তি, ও পৃথিবীর এক বৃহৎ দেশে এই জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া নূতন মানবসমাজের পত্তন করিয়াছে। আমাদের কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও রুশিয়ায় বৈজ্ঞানিক সমাজবাদের প্রবর্ত্তন প্রায় সমসাময়িক। ১৯০৫ সালে আমরা রুশজাপান যুদ্ধ লইয়া মাতামাতি করিয়াছি, অথচ, সে বৎসর জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রকাণ্ড প্রচেষ্টা রুশিয়ায় ব্যর্থ হইয়া গেল তাহার কোন খবর রাখি নাই; মার্কস্-এর সমকালীন মাটসিনি ও বাকুনিন-এর রচনাবলী আমাদের স্বদেশী নেতারা জানিতেন, কিন্তু মার্কস্ ও এঙ্গেলস্-এর চিন্তাধারা ও কর্ম্মোদ্যম তাঁহাদের অজ্ঞাত ছিল; ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লব সম্বন্ধে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী নিন্দা কুৎসা ও গ্লানি আমরা অতিসহজে গলাধঃকরণ করিয়াছি, তাহার প্রকৃত স্বরূপ বোঝার যথেষ্ট চেষ্টা করি নাই। বিগত দশকে পণ্ডিত নেহরু সোভিয়েট সম্বন্ধে যে সহৃদয় উপলব্ধির চেষ্টা করেন তাহা কংগ্রেসের ভিতর বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন একটি প্রবল প্রগতিশীল বিশ্বশক্তির সহযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বহু জাতির ও বহু শ্রেণীর বাসভূমি ভারতের রাজনীতি সোভিয়েটের নিকট হইতে অনেক কিছু শিখিতে পারিত, যে শিক্ষার অভাবে তাহা অঙ্গহীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এক অস্পষ্ট ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা ভাবিতেছি যে মিত্রশক্তির জয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে আরো মজবুত হইয়া বসিল। দেখিতে পাইতেছি না যে সোভিয়েটের দৃষ্টান্তে ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক চেতনা প্রখরতর হইয়া ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর আধিপত্যের ভিত্তি ধ্বসাইয়া দিতেছে। ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর মূল নীতি আন্তর্জাতিক সমাজবাদ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মর্ম্মান্তিক অভিজ্ঞতায় ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণী বুঝিতে পারিয়াছে যে তাহাদের স্বদেশে সোভিয়েটে অনুরূপ সমাজবাদী রাষ্ট্র গড়িতে না পারিলে তাহাদের পারিবারিক সুখ, সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য ও জাতিগত শান্তি বজায় থাকিতে পারে না। ব্রিটেনে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় তাহারাই একমাত্র বাধা যাহারা ভারতেও সাম্রাজ্যবাদ চাপাইয়া রাখিয়াছে। তাই আজ ভারতের জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রিটিশ জনগণের সমাজবাদের আকাঙ্ক্ষা একই লক্ষ্যে মিলিত হইয়াছে, সে লক্ষ্য হইতেছে

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর আশু উচ্ছেদ। ভারত ও ব্রিটেনের সম্মিলিত উদ্যমে, সোভিয়েট সৃষ্ট অনুকূল পরিবেশে এ উচ্ছেদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে! এ বোধ আমাদের দেশে যতই স্পষ্টতর হইবে, ইউরোপীয় জনশক্তির বিজয়কে ততই ভারতীয় জনশক্তির বিজয়ের সূত্রপাতরূপে মুক্তির প্রেরণারূপে দেখিতে পাইব। ৮ই মে'র মিত্রশক্তির বিজয়ে আমাদের বিরাগ ততই ক্ষীণতর হইয়া আসিবে।

স্পেনে গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি

বিগত ১৮ই জুলাই তারিখে স্পেনের গৃহযুদ্ধারম্ভের দশম-বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইল। স্মরণ করিতে বেদনা লাগে, আজিও তাহার সুচারু সমাধান হয় নাই। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইয়া শেষ হইয়া গেল। হিটলার-মুসোলিনি রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে সাময়িক দাপাদাপির পর ধরাবক্ষ হইতে চিরতরে নির্ব্বাসিত হইল। তবু তাহাদের ক্রীড়াপুত্তলি জেনারেল ফ্রাংকো এখনও স্পেনীয় জনগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা থাকিয়া ফ্যাশিজম্ ও নাৎসীজম্-এর কলঙ্কিত ঐতিহ্য বহন করিয়া চলিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ, ১৯৩৬ সালে ১৮ই জুলাই-এ স্পেনে যে দুইটি শক্তির সংঘর্ষ আরম্ভ হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহাদের প্রকৃতি দেশবিশেষে সীমাবদ্ধ নয়, সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক। সমগ্র মানবসমাজের প্রগতির ও প্রতিক্রিয়ার এই দ্বন্দ্ব তাই প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশে দুইটি যুধ্যমান শিবির সৃষ্টি করিয়াছিল। সকল সভ্যদেশের প্রগতিশীলের চাহিয়াছিলেন বর্ব্বর অত্যাচারী ফ্রাংকোর উচ্ছেদ ও স্পেনীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় প্রগতিকামীদের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও জওহরলাল। আন্তর্জাতিক জগতে ভারতবর্ষের মর্য্যাদা উপযুক্ত হাতেই ন্যস্ত ছিল।

কিন্তু প্রগতিশীলতার জয়রথ সর্ব্বদা সরলরেখায় চলে না। হিটলার-

মুসোলিনির নিধনে বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়া গুরুতরভাবে আহত হইলেও একেবারে পঞ্চত্ব পায় নাই। কে না জানে, ইংলন্ড ফ্রান্স ও আমেরিকার প্রতিক্রিয়া-প্রবণ প্রভুশক্তি সযত্নে ফ্রাঙ্কোকে পালন করিতেছে সমস্ত আদর্শ ও প্রতিজ্ঞাকে নির্লজ্জের মতো বিসর্জন দিয়া। তাই আজ এই তিনটি দেশের প্রগতিপন্থী জনশক্তির বিশেষ দায়িত্ব আপন দেশের প্রভুশক্তির প্রতিক্রিয়া-প্রবণ অংশকে নিষ্ক্রিয় ও লুপ্ত করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করা। নইলে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়লাভে তাহাদের নবার্জিত নতুন জীবনের সম্ভাবনা এই ছিদ্র পথে বিনষ্ট হইতে পারে। স্পেনের সমস্যা দশবৎসর পরেও রহিয়া গিয়াছে। —আন্তর্জাতিক সমস্যা। ইণ্টার-ন্যাশনাল ব্রিগেড-এর কাজ এখও শেষ হয় নাই।

ইণ্টার-ন্যাশনাল ব্রিগেড স্পেন-বিপ্লবে সব চেয়ে লক্ষ্য করিবার বিষয়। বিশ্ব-সংস্কৃতির ইতিহাসে ইহার অনুরূপ কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। বায়রণ গ্রীসের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ দিয়া প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন; শেলী ও সুইনবার্ণ বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা-প্রয়াসী জননেতাদের আবেগবান সমর্থক ছিলেন, ইহা ইতিহাস কোনোদিন ভুলিবে না। কিন্তু স্পেনের অভ্যন্তরীন সংঘর্ষ যেভাবে বিভিন্ন দেশের যুবকবৃন্দকে গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্দীপিত করিয়া সংঘবদ্ধ সশস্ত্র অভিযানে বিদেশীয় জনগণের স্বার্থে প্রাণত্যাগে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহার তুলনা পূর্বতম ইতিহাসে মেলে না। ফ্রান্সে আন্দ্রে মালরো, ইংলণ্ডে ডবলিউ. এইচ্. অডেন ও যুক্তরাষ্ট্রে আর্নেস্ট হেমিংওয়ে এই অনুপ্রেরণাকেই বিশিষ্ট কাব্যরূপে প্রকাশ করিয়া প্রগতিকামী সংস্কৃতিবানের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে ইংরাজীশিক্ষিত বুদ্ধিজীবী স্মরণ না করিয়া পারে না—ইণ্টার-ন্যাশনাল ব্রিগেডের সেই সব তরুণ প্রতিভার কথা, স্পেনের রণক্ষেত্রে অকালে প্রাণ না দিলেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অমরত্ব অর্জন করা যাঁহাদের পক্ষে অবধারিত ছিল। কেম্ব্রিজে বিজ্ঞানের ছাত্র ডেভিড গেস্ট-এর সম্পর্কে অধ্যাপকমহলে দৃঢ় প্রত্যয় ছিল নোবেল প্রাইজের জয়মাল্য একদিন তাঁহার কণ্ঠে শোভা পাইবে। অক্সফোর্ডের ইতিহাসের ছাত্র জন কর্নফোর্ডের বয়স মৃত্যুকালে ছিল মাত্র একুশ বৎসর। তাহারই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহার অধ্যাপকগণ সশ্রদ্ধায় তাহা স্মরণ করেন। চিন্তাশীল প্রবন্ধ ও সাবেগ কবিতা রচনায় তাঁহার মধ্যে তারুণ্য ও পরিপক্কতার যে অপূর্ব সমাবেশ ঘটিয়াছিল, বিচক্ষণমহলে তাহার স্বীকৃতি ক্রমশঃ প্রশস্ত

হইতেছে। সদ্য-নিহত কিরভ সম্বন্ধে কবিতায় কর্ণফোর্ড যে একটি লাইন লিখিয়া গিয়াছেন তাহা বিনা দ্বিধায় তাঁহার পক্ষেও প্রয়োগ করা যায়—'He will throw a longer shadow as time recedes'

ডেভিড গেস্ট বা জন কর্ণফোর্ডের তুলনায় র‍্যাল্‌ফ ফক্‌স্‌ ছিলেন প্রবীণতর; মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ। স্পেনের যুদ্ধে যোগদানের পূর্বেই তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন রাজনৈতিক ও দার্শনিক প্রবন্ধে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে ও সাহিত্যিক সমালোচনায়। তাঁহার 'দি নভেল এণ্ড দি পিপল্‌' না পড়িলে আধুনিক সাহিত্য-আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। স্পেনীয় জনগণের সপক্ষে রাজধানী মাদ্রিদ রক্ষার বীর্যবান চেষ্টায় ফ্রাঙ্কো-নিয়োজিত মুর সৈন্যের বেয়নেটের আঘাতে এই প্রতিভাবান লেখকের অপমৃত্যু ঘটে, তাঁহার শক্তিশালী লেখনীর গতি চিরকালের মত রুদ্ধ হইয়া যায়।

এই তিন জন বীর সৈনিক ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তান, তাহাদের সুবিখ্যাত উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত। কিন্তু ক্রিস্‌টোফার কড্‌ওয়েল এই ছদ্মনামে পরিচিত যে ত্রিশ বৎসরের যুবক স্পেনের রণক্ষেত্রের প্রথম দিনের সংঘর্ষেই প্রাণ দিলেন, তিনি আসিয়াছিলেন একেবারে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে—কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ করিবার সুযোগ তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। অথচ ইহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই—তাঁহার স্বোপার্জ্জিত পাণ্ডিত্য ছিল প্রথম শ্রেণীর। আপন মৃত্যু দিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছেন, অন্যান্য অনেকের মতো, মার্ক্সীয় দর্শনের মৌলিক প্রয়োগে তাঁহার আচার্য্যোপম অধিকার প্রকাশ পাইল তাঁহার জীবনাবসানের পর। তিনি ছিলেন গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য; কিন্তু তাঁহার স্বভাব ছিল এমনই লাজুক যে ছদ্মনামে লিখিত তাঁহার তিনখানি গ্রন্থের কথা তিনি পার্টি নায়কদের কাহাকেও জানিতে দেন নাই। স্পেনে চলিয়া যাইবার পর একখানি গ্রন্থের খানকয়েক পাতা প্রুফের অবস্থায় তাঁহাদের হাতে আসে। চমৎকৃত বিস্ময়ে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ স্পেনে কেব্‌ল করেন কড্‌ওয়েলকে ফিরিয়া আসিবার অনুজ্ঞা দিয়া। কেব্‌ল্‌ পৌঁছিবার পূর্বেই তাঁহার সৈনিকজীবন সমাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। অকালমৃত্যু সত্ত্বেও লেখক হিসাবে যে তিন খানি গ্রন্থ কড্‌ওয়েল-এর নামের সহিত অম্লান অমরত্ব বিজড়িত করিয়া দিবে। তাহাদের নাম ক্রমেই দেশে-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে: "স্টাডিজ্‌ ইন এ ডাইয়িং কালচার," 'ক্রাইসিস ইন ফিজিক্‌স্‌' ও বিশেষ করিয়া "দি ইলিউসন এণ্ড রিয়ালিটি"। কড্‌ওয়েল কবিতাও লিখিতেন,

যদিও তাহাতে সাফল্য অর্জনের চেয়ে প্রতিশ্রুতির আভাসই পরিমাণে বেশী বলিয়া মনে হয়। বাঁচিয়া থাকিলে কি হইত বলা যায় না; কবিতার ক্ষেত্রে অন্ততঃ এখন তিনি হইয়া রহিলেন তাদের মধ্যে একজন যাদের বিষয়ে বলা হইয়াছিল, 'দি ইনহেরিটার্স অব আনফুলফিল্‌ড্‌ রিনাউন'। কড্‌ওয়েলের কবিতাবলীতে পাওয়া একটি ছোট ল্যাটিন কবিতার অনুবাদ; তিনি কি প্রবক্তার মতো তাহাতে তাঁহার ভবিষ্যৎ নিয়তির পূর্বচ্ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলেন?

Unhappy men, who roam, on hope deferred
Relying, thinking not a painful death!
Here was Seleucos, great in mind and word,
Who his young prime enjoyed but for a breath,
In world-edge Spain, so far from Lesbian lands
He lies, a stranger on uucharted strands.

দশবৎসর পূর্বে সূচিত স্পেনের গৃহযুদ্ধে বিদেশীয় রণাঙ্গনে ইংলণ্ডের এতগুলি তরুণ প্রতিভার সানন্দ আত্মদান বর্তমান ইংলণ্ডের সমাজতন্ত্রী সরকারের আমলে কি ব্যর্থ হইবে? "রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন; স্বর্গ কি হবে না কেনা?" বৈদেশিক মন্ত্রী বেভিন আর কতকাল আপন পক্ষপুটে ক্ষুদে হিটলারকে আগলাইয়া রাখিবেন? ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী জনসাধারণ আর কতকাল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির এই ব্যভিচার সহ্য করিবেন?

সমালোচনা প্রবন্ধ

শেষ প্রশ্ন

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(গুরুদাস চ্যাটার্জি এণ্ড সন্‌স্‌)

'শেষ প্রশ্ন' শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই একটি প্রশ্নের কথা মনে পড়িয়া গেল। প্রশ্নটি করিয়াছিলেন শরৎচন্দ্র দিলীপকুমারকে। কোন এক ওস্তাদের গান শুনিতে অনুরুদ্ধ হইয়া, গুড়গুড়ির নল ছাড়িয়া উঠিতে একান্ত নারাজ শরৎচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"গায় ত ভালো, কিন্তু থামে ত?" শরৎচন্দ্র যে কত বড় শিল্পী, তা' এই একটা ছোট টিপ্পনী হইতে বোঝা যায়। প্রকৃত শিল্পসৃষ্টি করিতে হইলে—শিল্পকলার যে কোন প্রকারেই হোক্ না কেন—শুধু ভাল গাহিলেই চলে না, থামিতে জানা চাই। শিল্পী মাত্রেই জানেন, বলার চেয়ে, এমন-কি ভাল বলার চেয়েও, না-বলা কত বেশী কঠিন। বলার একটা নিজস্ব ঝোঁক আছে, একবার বলিতে আরম্ভ করিলে থামিতে ইচ্ছা করে না। ক্রমাগতই বলিয়া যাইতে লোভ হয়, যে-সূক্ষ্ম সীমা রেখায় আসিয়া কলমকে নির্ম্মমভাবে চাপিয়া ধরিতে হয়, তাহা কখন পার হইয়া যায়, খেয়াল থাকে না, ফলে এত সাধের রূপসৃষ্টি শ্রীহীন বিকারে পরিণত হয়। একমাত্র শিল্পীই জানেন, কত প্রলোভন জয়, কত অবান্তর আকর্ষণকে জোর করিয়া

প্রত্যাখ্যান তাঁহাকে করিতে হয়—এ বিষয়ে তাঁহার সংযম সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর সংযমের চেয়ে কম নয়। শরৎচন্দ্রের লেখায় এই সাধন-সুকঠিন সংযমের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। পদের সুমিতপ্রয়োগে, বাক্যের সুবিন্যস্ত গতিতে, বক্তব্যের সুসীম নিশ্চয়তায়, চিত্রিত চরিত্রের সুনির্দ্দিষ্ট স্পষ্টতায় তাঁর রচনা বাংলা কথাসাহিত্যের একদিক আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু চারিশত পৃষ্ঠার এই সুবৃহৎ গল্পটি পড়িতে পড়িতে সন্দেহ হইল—শরৎবাবু কি থামিতে ভুলিলেন? তিনি কি ভুলিয়া গেলেন শিল্পসৃষ্টি হয় শুধু সৃজনেরই তাড়নায়, অন্য যে-কোন উদ্দেশ্য সৃজনের পক্ষে শুধু অবান্তর নয়, অন্তরায়? কারণ, 'শেষ প্রশ্নে' তাঁহার সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় নাই বলিলে মোটেই অত্যুক্তি করা হয় না। পড়িলে স্পষ্টই বোঝা যায়, ইহার মধ্যে এমন একটি চরিত্র বা ঘটনা নাই, যাহা তাঁহার শিল্পী-মনকে উদ্বোধিত করিয়াছে। ঘটনা ত সংক্ষেপে এই যে, আশুবাবুর কন্যা মনোরমাকে কমলের তথাকথিত স্বামী শিবনাথ ভুলাইয়া লইলেন, আর মনোরমার দয়িত অজিতকে শিবনাথের "শিবানী" ছিনাইয়া লইলেন—একান্ত বিশেষত্ব-বর্জ্জিত সুপরিচিত অদল-বদলের কাহিনী। আশুবাবু, অবিনাশ, অক্ষয়, হরেন, অজিত, সতীশ, রাজেন, মনোরমা, নীলিমা, বেলা ইত্যাদি আর যে-সকল চরিত্র এই গল্পে স্থান পাইয়াছে, তাহাদের অনুরূপ চরিত্র আমরা শরৎচন্দ্রের অন্যান্য গ্রন্থে বহুবার পাইয়াছি। কমলকে 'চরিত্র' বলা কোনক্রমেই চলে না—সে কতকগুলা কথার সমষ্টি মাত্র, যে কথাগুলির মধ্যে পূর্ব্বাপর চরিত্রগত সুসঙ্গতি খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। এই কমলই হইতেছে 'শেষ-প্রশ্নের' মুকুটিত কীর্ত্তি অথবা অপকীর্ত্তি। সমস্ত আখ্যায়িকাটী তাহারই চারিপাশে ঘুরিতেছে,—আগ্রার প্রবাসী-বাঙ্গালী-পতঙ্গের দল তাহার বিজাতীয় রূপবহ্নির চারিপাশে যেমন ঘুরিয়া বেড়াইত। ঘটনাগুলি ঘটান হইতেছে এমনভাবে যাহাতে কমলের সুযোগ হয়, হয় কড়াকড়া কথা কহিবার, না-হয় অভাবিত চমকপ্রদ কোনকিছু করিবার। অধিকাংশ ঘটনাই আকস্মিক, অসুস্থ আকস্মিকতার অপ্রতিহত প্রভাব সমস্ত গল্পটীকে কলুষিত করিয়া দিয়াছে। গল্পটী প্রথমতঃ মাসিকপত্রে ক্রমশঃ প্রকাশ্যভাবে বাহির হইয়াছিল। মনে হয় যেন লোকপ্রিয়তা বজায় রাখিবার জন্য গ্রন্থকার প্রতি সংখ্যায় কিছু কিছু 'শক' দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন নাই। একই দেহে বিভিন্ন অবয়বের মত, একই গল্পে বিভিন্ন ঘটনা, প্রত্যেকে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া পরস্পরকে পূর্ণ করিয়া তুলিবে

—ইহাই হইল কথাশিল্পীর আদর্শ। সে-আদর্শকে তুচ্ছ করিয়া শরৎচন্দ্রের প্রতিভা এক কদাকার monstrosity-র জননী হইয়া বসিয়াছে।

কথা উঠিবে, গল্প-রচনার এই কি একমাত্র আদর্শ? অন্য আদর্শ কি নাই? রোলাঁ কি বলেন নাই, মানুষের জীবন নদীর মত, নিজের পথ কাটিয়া চলে, আর গল্প-সাহিত্য জীবনের প্রতিরূপ, তাহাও কোন সুনির্দ্দিষ্ট পন্থায় আবদ্ধ নয়, তাহাও পথ কাটিয়া চলে? জয়স্, প্রুস্ত্, এঁরা কি কোন প্লট্ মানিয়া চলেন? আকস্মিকতার ছড়াছড়ি কি তাঁহাদের রচনায় পাওয়া যায় না?

কথাগুলি নিছক সত্য—কিন্তু বর্ত্তমানক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। চেতনার ধারা বাহিয়া যে-নূতন ধরনের উপন্যাস ইউরোপে লিখিত হইতেছে, শরৎচন্দ্র সে-পথের পথিক নন্। 'শ্রীকান্ত'কে অবশ্য রোলাঁবর্ণিত নদীর সহিত তুলনা করা যায়—এবং কোন রসিক পাঠকই তাহাতে প্লটের বাঁধুনি খোঁজে না। কিন্তু 'শেষ প্রশ্ন' ত সে-শ্রেণীর উপন্যাস নয়। সনাতন আরিস্টোট্‌ল্-এর সূত্র-অনুযায়ী এ-গল্পের আরম্ভ, মধ্য ও শেষ আছে। কাজেই ইহাতে ঘটনা-গ্রন্থন সুসংবদ্ধ ও চরিত্র-চিত্রণ সুসংহত হওয়া দরকার। বাঁদর গড়িতে বসিয়া বাঁদর গড়িলে দোষ হয় না কিন্তু শিব গড়িতে বসিয়া বাঁদর গড়িলে দোষ না দিয়া চলে কি?

শোনা যায়, শরৎচন্দ্র নাকি রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ষাট বার—অথবা একশ ষাটবার?—পড়িয়াছেন। শুনিবার প্রয়োজন হয় না, 'শেষ প্রশ্নের' প্রতি পৃষ্ঠায়—শুধু কমলের জন্মবৃত্তান্তে নয়—'গোরা'র প্রভাব ধরা যায়। দুটি বইতেই দেশের ও জাতির—তথা মানবজাতির—নানা সমস্যাকে নানা দিক হইতে বিচার করিয়া দেখা হইয়াছে। দু'জনেই শক্তিমান লেখক—অথচ কী বিরাট পার্থক্য। 'গোরা'র বিতর্কগুলি কাঁটার মত উঁচাইয়া নাই, লতা-পাতা-ফুলের সহিত মিশিয়া একটী অখণ্ড সম্পূর্ণতার সৃষ্টি করিয়াছে। তর্কের জন্য গল্পের স্রোত কোথাও ব্যাহত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না—তাহার প্রধান কারণ তাহার তর্কের পাত্রগুলির প্রত্যেকের স্বতন্ত্র নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী আছে। কাজেই তাহাদের বক্তব্য শুধু তর্ককেই জটিল করিয়া তোলে না, তাহাদের চরিত্রকেও স্ফুট করিয়া দেয়। আমাদের মস্তিষ্কও যেমন তুষ্ট হয়, রসবোধও তেমনই তৃপ্ত হয়। কিন্তু 'শেষ প্রশ্নে' কমলের সহিত যাহারা তর্ক করে তাহাদের যেন কোন আন্তরিক স্বকীয় বিশ্বাস নাই, তাহারা কথা কয় শুধু কমলকে কথা কহাইবার জন্য—কমলের বিদ্যাবুদ্ধি, চিন্তাশীলতার প্রাখর্য্যকে

জাহির করিবার জন্য। সাহিত্যেই হোক্ বা জীবনেই হোক্, জাহির করিবার প্রয়াস সর্ব্বদাই অশোভন—আর এই আশোভনতাই 'শেষ প্রশ্নের' প্রধান কলঙ্ক।

অনেকের মতে, আধুনিক উপন্যাসে এ-দোষ দোষই নয়। আধুনিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য লঘু নয়, গুরু; চিত্তরঞ্জন নয়, সত্যানুসন্ধান। কাজেই কোন গভীর তথ্য বা জটিল সমস্যার অনুধাবনে গল্পের গতি নিরুদ্ধ হইলেও আপত্তি করা ছেলেমানুষি গল্প-প্রিয়তার পরিচায়ক। হয়ত কথাটা সত্য, হয়ত আমাদের মর্মের নিভৃত কন্দরে যে-শিশুমনে নিরন্তর গল্প শুনিবার জন্য বায়না করে, তাহাকে তর্কের চড় মারিয়া শিক্ষা দেওয়াই কর্ত্তব্য। তবু মনে হয় ইহাকে কি বলা চলে না—রুটির বদলে পাথর দেওয়া? একথা নিশ্চিত যে, গভীর সত্যের মধ্যে যে-রস আছে, গল্পপ্রিয় শিশুমন সে-রস উপভোগের উপযুক্ত অধিকারী নয়। কিন্তু 'শেষ প্রশ্নে' যে-সকল তথ্যকে বড় গলায় প্রচার করা হইয়াছে তাহা ত ইউরোপীয় সাহিত্যের হাটে বাসি মাল, প্রায় বস্তাপচা হইতে চলিল। এই ভাবের হাটের দলালিই কি তবে শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব? পাঠকের মনে চিন্তার উদ্রেক, উপন্যাসকারের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও জিজ্ঞাসা করা যায় দীর্ঘায়িত তর্কালোচনাই কি তাহার শ্রেষ্ঠ পন্থা? সংযত মিতভাষী 'অভয়া'র পাঁচটী কথায় যে-তেজ, যে-দীপ্তি, যে-শক্তি আছে বক্তৃতাময় কমলের বাগাড়ম্বরে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় কি? 'চতুরঙ্গে'র মধ্যে তর্কের অংশ কতটুকু, অথচ বিশ্বসাহিত্যে কটা বই আছে যা' তার চেয়ে বেশী করিয়া মানুষকে ভাবিতে শেখায়?

আসল কথা, আমাদের দেশের বর্ত্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থা শরৎচন্দ্রের ভাবপ্রবণ অন্তরকে পীড়িত করিয়াছে—'শেষ প্রশ্ন' এই পীড়নের তীব্র প্রতিঘাত; শিল্প সৃষ্টির প্রেরণায় ইহা রচিত নহে। তাই শরৎচন্দ্রের দেশপ্রীতিকে শ্রদ্ধা করিয়াও বলা যায়, যে-সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী স্রষ্টা না হইয়া সংস্কারক হইয়া ওঠেন, সৃজনের অপেক্ষা লোকশিক্ষাকে বড় করিয়া দেখেন, রূপকারের বৃত্তিকে উপেক্ষা করিয়া উপকারে প্রবৃত্ত হন, হে ভগবান, সে-সাহিত্যের ভবিষ্যতের প্রতি তুমি দৃষ্টি রাখিয়ো।

অপরাজিত (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রঞ্জন প্রকাশালয়

বিভূতিবাবুর মতো সৌভাগ্যশালী লেখক বাংলাদেশে কখনও জন্মিয়াছেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হইতে না হইতে তিনি যে খ্যাতি ও স্তুতি লাভ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের প্রথম রচনার ভাগ্যে জোটে নাই। একথা আর বলা চলে না যে বাঙালী পাঠক গুণের মর্যাদা করিতে জানে না।

সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় সমসাময়িক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি অনেক স্থলেই কতকগুলি সাময়িক কারণের সমাবেশ। 'পথের পাঁচালী'র ক্ষেত্রে তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কলিকাতার নিয়ত-প্রবর্ধমান প্রভাব সত্ত্বেও একথা এখনও নির্বিবাদে বলা যায়, বাংলার সামাজিক জীবন প্রধানতঃ পল্লীকেন্দ্রিত। এমন শিক্ষিত পরিবার খুবই কম, দুই তিন পুরুষের মধ্যে যাহারা বাংলার জমির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুক্ত ছিল না। এমন বাঙালী কজন পাওয়া যায়, যাহারা ছাত্রবয়সে সহরে বাস করিয়াও সহুরে জীবনকে তীব্র ভাষায় নিন্দার পর পল্লীজীবনের সহজ সরল অনাড়ম্বরতার গুণগানে স্কুল বা কলেজগৃহ মুখরিত করিয়া তোলে নাই? চলন্ত রেলগাড়ির জানালা দিয়া কোন্ বাঙালী ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলির দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে তাকায় না? প্রাচীন সাহিত্যের কথা ধরিবার প্রয়োজন নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের

সমস্ত সামাজিক উপন্যাস ও রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ছোট গল্প পল্লীজীবনকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। ফলে এইসব ওস্তাদ শিল্পীর কবি-প্রতিভার জ্যোতিতে বাংলার পল্লীশ্রী আমাদের কল্পনানেত্রে ধরাধামে সুখস্বর্গের শোভায় বিরাজিত ছিল।

কিন্তু চমক ভাঙিল, স্বপ্ন-জড়িমা পলকে ভাগিল যেদিন শরৎচন্দ্রের সত্য-সন্ধানী দৃষ্টি রূঢ় দীপের আলোক লইয়া বাংলার পল্লীজীবনের বাস্তব চিত্রটি উদ্ঘাটিত করিয়া দিল, তাঁহার 'পল্লী-সমাজে'। সে চিত্র এমনই নিষ্করুণ অথচ এতই অবিতর্কিত যে পল্লী সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাইয়া গেল ; যাহা ছিল সুখের খনি, সৌন্দর্যের আকর, তাহাই হইয়া উঠিল দলাদলির আড্ডা, ম্যালেরিয়ার ডিপো, সংকীর্ণতার দৃঢ় দুর্গ ও পুঞ্জীভূত কলংকের বিস্তীর্ণ পসরা। সাহিত্যেও নদীর মতো একদিকে ভাঙন ধরিলে অন্যদিক গড়িয়া ওঠে। বাংলা সাহিত্যের টান অতিমাত্রায় সহরমুখী হইয়া পড়িল। এমন কি যে লেখকের নিকট পল্লীগ্রাম শ্রুতিমাত্রে পর্যবসিত, হয়তো যাঁহার নিজের বাড়ী শ্যামবাজার ও মামার বাড়ি বাগবাজারে হওয়ায় পল্লীগ্রামের সহিত চাক্ষুষ পরিচয়ও ঘটে নাই, তিনি ও সুযোগ পাইয়া পুরামাত্রায় ওয়াকিবহাল হইবার জন্য পল্লীজীবনকে দুটো খোঁটা না দিয়া ছাড়িলেন না। তদুপরি আবার একদল পশ্চিমানুরক্ত লেখক বাংলা সাহিত্যকে য়ুরোপীয় সাহিত্যের আধুনিকতার কোঠায় তুলিবার প্রাণপণ চেষ্টায় অনেকস্থলে মূলহীন ভাব ও অবাস্তব চরিত্রের প্রবর্তনে সাহিত্যক্ষেত্রে সমুদ্র-মন্থনের কোলাহল সৃষ্টি করিলেন, যাহা হইতে কেহ বলিলেন অমৃত উঠিতেছে, কেহ বলিলেন গরল। এই বিপর্যয়ে আত্মহারা হইয়া পল্লীগ্রামে নাড়ী-বাঁধা বাঙালী পাঠকের সাহিত্যিক শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম ঘটিল।

এহেন সংকটে ত্রাণের বার্তা আনিলেন বিভূতিভূষণ নিশ্চিন্দিপুরের বৃদ্ধা বালবিধবা ইন্দির ঠাকরুণ ও তাঁহার স্নেহের ধন দুর্গা ও অপুর বাল্যজীবনের কাহিনীর ভিতর দিয়া। পল্লীমাতা আবার যেন কথা কহিয়া উঠিলেন। স্বদেশপ্রাণ বাঙালী পাঠক তাহার একান্ত প্রিয় স্বদেশী বস্তু পাইয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। বিভূতিভূষণের বর্তমান সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা এই সুযোগের সদ্ব্যবহারের ফল, সুনিপুণ বিষয়নির্বাচনের পুরস্কার।

কিন্তু 'পথের পাঁচালী'-তে বিভূতিবাবু বাংলা সাহিত্যকে স্থায়ী এমন কিছু দিয়াছেন যাহার মূল্য সমসাময়িক রুচি-অরুচির মানদণ্ড দিয়া নিরূপিত হইবার নহে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে কিরূপ সতর্কতার সহিত তিনি শরৎচন্দ্রের

এলেকার পাশ কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পল্লীচিত্র শরৎচন্দ্রের পল্লীচিত্রকে সমর্থনও করে না, প্রতিবাদও করে না, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া থাকে। যেখানে শরৎচন্দ্র আঁকিয়াছেন পল্লী-সমাজ, বিভূতিভূষণ আঁকিয়াছেন একটি পল্লীগৃহ, তাহাও সম্পূর্ণ নহে, কারণ সর্বজয়া-ইন্দির ঠাকরুণের সংসারে হরিহর রায়ের অস্তিত্ব নাই বলিলেই চলে। আর ইন্দির-ঠাকরুণের শোচনীয় মৃত্যুর যে করুণ চিত্র গ্রন্থকার আঁকিয়াছেন তাহা কেবল প্রকৃত পল্লীগ্রামে ঘটা সম্ভব বলিয়া আমাদের ধারণা নাই। বাংলার পল্লীসমাজ যতই পাপদুষ্ট কলঙ্ক-জর্জরিত হউক, এটুকু হিতবুদ্ধি ও ক্ষমতা তাহার এখনও আছে যে, ওরূপ অবস্থায় গৃহস্থকে বাধ্য করে অসহায় মুমূর্ষুর সেবা-যত্ন করিতে। লোকালয় হইতে সামান্য দূরে গ্রামের একপাশে ফেলিলেই কোন পল্লীপরিবার যে সমাজ-নিরপেক্ষ হইয়া ওঠে তাহা আমাদের সহজে বিশ্বাস হয় না।

তবে একথা মনে রাখিতে হইবে, কোন প্রকৃত পল্লীর অবিকৃত চিত্রাংকন বিভূতিবাবুর মূল উদ্দেশ্য নহে; তিনি চাহিয়াছেন, বাংলার বাঁশবনে-ঘেরা ঘন-শ্যামল পল্লীগ্রাম দুটি সদ্য জাগ্রত, গ্রহণশীল উপভোগ-সমর্থ শিশুচিত্তের উপর কি ছাপ ফেলে, কোন্ প্রতিক্রিয়া উৎপাদন করে, তাহাই আঁকিয়া দেখাইতে। তাঁহার নিশ্চিন্দিপুরকে সাধারণ পরিণতমন মানুষের চোখ দিয়া দেখিলে চলিবে না, তাহাকে দেখিতে হইবে দুর্গা-অপু-র বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখ দিয়া। বিস্ময়-বোধ কাব্যানুভূতির উৎস ও বিভূতিভূষণ বিস্ময়বোধের কবি। শিশুচিত্ত বিস্ময়-বোধের প্রথম ও প্রধান আধার; তাই 'পথের পাঁচালী'র সুবৃহৎ আয়তন তিনি শিশুচিত্তের বিকাশের ইতিহাসে ভরাইয়া তুলিয়াছেন। এই দিকে তাঁহার শক্তি অনন্যসাধারণ, ও তাঁহার কীর্তি বঙ্গ সাহিত্যে অতুলনীয়। বিস্ময়বোধের ফলে, বস্তু-বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁহার চোখ-নাক-কান আশ্চর্য রকমে খোলা ও সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। পল্লীগ্রামের তুচ্ছতম গাছ-গাছালির পাখ-পাখালির খুঁটিনাটিও তাঁহার লক্ষ্য এড়াইয়া যায় নাই। ইংরেজি সাহিত্যে দেখা যায়, গাছ লতা ফুল ফল পশু পাখীদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের সহিত সাহিত্যসেবীগণের কি অন্তরঙ্গ সহমর্মিতা ও নিগূঢ় পরিচয়। তুলনায় বঙ্গ-সাহিত্যে এই অভাব অতি সহজেই চোখে পড়ে। কোন দৃশ্য বর্ণনা করিতে গিয়া বাঙালী কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুস্পষ্ট জ্ঞানের অভাবে কয়েকটি অতিপরিচিত নামের পরই 'কত-কি ফুল' 'নাম না জানা পাখী' ইত্যাদি অস্পষ্ট কথার আড়ালে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কিন্তু 'পথের পাঁচালী'-তে এরূপ ফাঁকি কোথাও নাই বলিলে চলে। বর্ণে গন্ধে

স্বাদে শব্দে পল্লীলক্ষ্মীর ভাণ্ডারও যেরূপ প্রচুর, বিভূতিবাবুর বর্ণনাও সেইরূপ সমৃদ্ধ। বহিঃপ্রকৃতির সানুরাগ পর্যবেক্ষণ শক্তিতে তাঁহার আসন সুবিখ্যাত ডব্লিউ এইচ্‌ হাড্‌সন-এর শ্রেণীতে অকুণ্ঠ-অধিকার বলে বসানো যাইতে পারে। ইহার অতিরিক্ত প্রশংসা ভাবোচ্ছ্বাস বলিয়া বোধ হয়।

বাল্যকালে পল্লীগ্রাম যত বিভিন্ন উপায়ে আনন্দ দিতে পারে, 'পথের পাঁচালী'তে গ্রন্থকার তাহাদের সবিস্তার ও সর্বাঙ্গসুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। আমকুড়ানো, নোনাপাড়া, পানফলতোলা হইতে কড়িখেলা, নৌকাবাওয়া, বারোয়ারি দেখা ইত্যাদি কিছুই বাদ পড়ে নাই। কিন্তু পল্লীশিশুর প্রধানতম সুখের একটি উপলক্ষ সাঁতার দেওয়া। কি মনে করিয়া যে বিভূতিবাবু দুর্গা ও অপুকে ইহা হইতে বঞ্চিত করিলেন তাহা তিনিই জানেন। ইছামতীতে না হয় কুমীরের ভয়, কিন্তু নিশ্চিন্দিপুরে কি কোন পুকুর ছিল না?

'অপরাজিত'-র পরিচয়-প্রসঙ্গে পথের পাঁচালীর এই পর্যালোচনা অপরিহার্য, কেননা অপরাজিত স্বতন্ত্র উপন্যাস নহে, শেষোক্ত গ্রন্থেরই সম্প্রসারণ। 'পথের পাঁচালী'র শেষভাগে দেখিতে পাওয়া যায় দশ-এগারো বৎসরের পিতৃহীন শিশু অপু মফঃস্বলের কোন সহরে পাচিকা মায়ের মনিব জমিদার বাড়িতে থাকিয়া স্কুলে যাইতেছে ও বিনাদোষে মার খাইয়া নিশ্চিন্দিপুরে ফেরার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার সেই একান্ত বাসনা পূর্ণ হইল বছর চব্বিশ পরে। এই চব্বিশ বৎসরের বঙ্কিম ইতিহাস 'অপরাজিত'-র দুইখণ্ডে প্রায় ছয়শত পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ। সে ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার অসম্ভব, কারণ অপু-র ঘটনা-বহুল জীবনকাহিনীটি ঠিক দশগজী মসলিন-এর মত নয়, যাহাকে নাকি একটি আংটির আয়তনে আঁটা যাইত। মোটামুটি এটুকু জানিলেই যথেষ্ট যে, অপু মাইনর পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া হাইস্কুলে পড়িল, প্রবেশিকা পাশ করিয়া কলিকাতার রিপন কলেজে ভর্তি হইল। দারিদ্র্যের সহিত লড়াই করিয়া আই এ পরীক্ষা দিবার সঙ্গে সঙ্গে মা সর্বজয়াকে হারাইল। খবরের কাগজে কাজ করিতে করিতে বন্ধুর মামার বাড়ি বেড়াইতে গিয়া তাহার প্রায় দোপড়া মামাতো বোন অপর্ণাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইল। পরে একদিকে ক্লান্তিকর কেরাণী-গিরি, অন্যদিকে শান্তিময় পারিবারিক জীবন। পুত্রের জন্ম দিয়াই স্ত্রীর মৃত্যু ও অপুর কলিকাতা ত্যাগ করিয়া কিছু দেশভ্রমণের পর সুদূর মধ্যপ্রদেশে অরণ্যবাস। পাঁচ-ছয় বৎসর পরে বাংলাদেশে ফিরিয়া পুত্র কাজলকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিল ও ক্রমে গল্প ও উপন্যাস লেখক হিসাবে তাহার প্রতিপত্তি

ও অর্থাগম হইতে লাগিল। এক বিদেশী বন্ধুর প্রস্তাবে সে ভারতবর্ষের বাহিরে পর্যটনের সুবিধা পাইল ও নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া তাহার বাল্যসঙ্গী বর্তমানে নিঃসন্তান বিধবা রাণুদির অভিভাবকতায় পুত্রকে রাখিয়া সুদূরের পিয়াসা মিটাইবার জন্য ভাসিয়া পড়িল। অপুর জীবন-কাহিনীর বর্তমান পরিসমাপ্তি এই চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরেরই। বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার পুনরুদয় দেখার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিবে কিনা তাহা বিভূতিবাবুই বলিতে পারেন।

দেখা যাইতেছে সেই একই অপুর জীবন-কাহিনী হইলেও 'অপরাজিত' ঠিক 'পথের পাঁচালী'র সমধর্মী রচনা নহে। যে ক্ষুদ্র পল্লী-বিশ্বের গণ্ডীর ভিতর অপুর বাল্যজীবন কাটিয়াছে, বয়স বাড়ার সঙ্গে তাহাকে চিরদিন সেখানে আবদ্ধ রাখা সম্ভব হইল না। বলা যাইতে পারে, 'পথের পাঁচালী'-র প্রধান চরিত্রই হইয়াছে নিশ্চিন্দিপুর। 'অপরাজিত'-য় নিশ্চিন্দিপুর দূরে মিলাইয়া গিয়াছে, চোখের উপর হইতে মনের আড়ালে স্থান পাইয়াছে। যাহা প্রত্যক্ষ ছিল, তাহা হইয়া উঠিয়াছে স্মৃতি। গ্রীক পুরাণে বলে মিউজ-রা নিমোজিনী-র কন্যা, অর্থাৎ স্মৃতিই কবিতার জননী। বিভূতিভূষণ যে কবি, ও তাঁহার কবিত্ব যে স্মৃতিমূলক, তাহার প্রভূত নিদর্শন 'অপরাজিত'-য় পাওয়া যায়। যখন-তখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে নিশ্চিন্দিপুরের কথা অপুর মনে পড়িয়া যায়, ও কোন্ অদৃশ্য অঙ্গুলির পরিচালনায় স্মৃতির জলতরঙ্গে টুং-টাং করিয়া বাজিয়া ওঠে। সামান্য কয়টি কথার ভাবগর্ভ প্রয়োগে বাংলার পল্লী-শোভা রূপ পরিগ্রহ করে। শুধু বাংলাদেশ কেন, প্রকৃতির অন্য দৃশ্যও যে বিভূতিভূষণের কবিত্বশক্তিকে উদ্বোধিত করিতে পারে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মধ্যপ্রদেশে বিন্ধ্যারণ্যের সুবিস্তৃত বর্ণনা। ভাষার লালিত্যে, ভাবের ঘনত্বে, পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতায় তাহার তুলনা বাংলা ভাষায় দুর্লভ।

স্মৃতির আর এক কাজ সময়ের গতিকে স্তম্ভিত করিয়া, কালপ্রবাহকে বিপরীত মুখে চালানো। প্রখর স্মৃতির সাহায্যে বর্তমানের কঠিন নিগড় হইতে মুক্তি পাওয়া যায়, অতীত বর্তমান অপেক্ষাও সজীব হইয়া উঠে। এই স্মৃতিলীলার ফলে বিভূতিবাবুর উপন্যাসে বর্তমান হইতে অতীতে ও অতীত হইতে বর্তমানে নিয়ত যাতায়াত চলে। হঠাৎ প্রুস্ত-এর 'হারানো কালের অনুধাবনের' কথা মনে পড়িয়া যায়। পরক্ষণেই ধরা পড়ে এ তুলনা কপট তুলনা। কথাশিল্পে কালবোধের প্রয়োগে বিভূতিবাবু সনাতনপন্থী ; অপু-র জীবনকাহিনীতে সময়ের ক্রম সহজেই অনুসরণ করা যায়, ঘটনার পারম্পর্যে ঁর

শৃঙ্খল অটুট থাকে বলিয়া। প্রুস্ত্ একেবারে বিপ্লবপন্থী। তাঁহার কালক্রম বৈজ্ঞানিকের ক্রনোমিটারে ধরা পড়িবার নয়। তাহা একেবারে স্বসিদ্ধ, স্বেতর কোন শাসনের বশীভূত নয়।

Le temps proustien a une e´lasticite´, une relativite´ qui e´chappe a´ toute mensuration du dehors. Chacun aura pu constater que Proust ne donne jamais de dates ni indications pre´cises d'e´poques. Nons ne comptons pas dans son roman parmois et anne´es mais d'apres le changement des saisons de l'a´me. Elles ne permettent ancune analyse chronologique. Le temps s'e´coule suivant une courbe si irre´guliere qui'elle e´chappe au calcul. Un changement de I'atmosphere suffit a recre´er le monde et nous-me´mes. Le temps et I'espace sont de simples modes du souvenir et re´action mutuelle.

[প্রুস্ত্-বর্ণিত কাল স্থিতিস্থাপকশীল, তাহার আপেক্ষিকতা বহির্বর্তী মানদণ্ডের অতীত। এ-কথায় সকলেই সায় দিবেন যে, প্রুস্তের মধ্যে তারিখ বা যুগ-সম্বন্ধে কখনো কোন সুনিশ্চিত নির্দেশ থাকেনা। তাঁহার উপন্যাসে কাল-গণনা মাস বা বৎসরের অনুপাতে হয় না, হয় কেবল আত্মার ঋতুপরিবর্তন অনুসারে। কালের সেই বঙ্কিম প্রবাহ এতই অনিয়ন্ত্রিত যে তাহাকে অঙ্কে বাঁধা অসাধ্য। সেখানে পরিবেষ্টনের সামান্য বিকারই বিশ্বসৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট, এবং সেই বিবর্তনেই পাঠক সঞ্জীবিত হইয়া উঠে; সেখানে দেশ ও কাল স্মরণের উপকরণ মাত্র, আসলে উহাদের পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাতই অভীষ্ট বস্তু।]

কিন্তু মানবমনের কারবার তো শুধু বস্তু-বিশ্বকে লইয়া নহে, বুদ্ধির জন্য, তৃপ্তির জন্য, আনন্দের জন্য, তাহাকে মানবজগতেও চলাফেরা করিতে হয়। মানবজগতের বৈচিত্র্যের অবধি নাই, মানুষের সংস্পর্শে আমাদের অন্তরলোক যে বিকাশলাভ করে তাহার রহস্যের আদি অন্ত নাই। বিভূতিবাবু তাঁহার রচনায় এই মানবজগতকেও প্রতিবিম্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গতির পথে অগ্রসর হইতে গিয়া অপু যে কত বিভিন্ন ধরনের নরনারীর জীবনবৃত্তকে ছেদ করিয়া গেল, বিভূতিবাবু সযত্নে তাহাদের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। এ-বিষয়ে তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়। তিনি জীবনকে ব্যাপকভাবে

ভাবে দেখিতে চাহিয়াছেন—মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন মতামতের পরকলার ভিতর দিয়া নহে। অনেক তুচ্ছ ঘটনা ও অবহেলিত প্রাণী তাই তাঁহার অনুকম্পা-লাভে বঞ্চিত হয় নাই। তাঁহার চিত্রপট বিস্তৃতপরিসর ও চিত্রশালিকা সংখ্যা-ভূয়িষ্ঠ। তবুও মনে হয়, মানবচরিত্র অংকনে তাঁহার দৃষ্টি অগভীর, অভিজ্ঞতা স্বল্প, শক্তি ক্ষীণ ও সাফল্য সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ। ইহার কারণ, প্রাকৃতিক জগতে সামান্য তৃণগুচ্ছ হইতে বিরাট নীহারিকাপুঞ্জ ও নাক্ষত্রিক আকাশের নিকট তিনি নিজেকে যেমন ছাড়িয়া দিতে পারিয়াছেন, মানবজগতে তাহা পারেন নাই।

Le sujet du romancier, la vision du poete se pre´setent a‘ leurs esprits tyranniquement, et comme dudehors. L' artiste ne choisit pas sa maite‘re, il est choise par elle. Il est contraint de I'exprimer, et de I'exprimer dans toute sa purete´ et son inte‘grite‘. Pour I' artiste, comme pour le penseur et pour le savant, le plus haut devoir est de se soumettre a‘ la realite‘ qu'il a contemple‘e. Comme toute connaissance, I' activite‘ de I' artiste consist a‘ reproduire une re‘alite‘ objective. L' artiste n' invente pas, il de‘couvre. L' art n'est pas une invention, mais une exploration. [ঔপন্যাসিকের বিষয়বস্তু, কবির স্বপ্ন বহির্জগৎ হইতে অন্তরে প্রবেশ করে যেন অত্যাচারীর মত। প্রসঙ্গ নির্বাচনে শিল্পীর কোন হাত নাই, প্রসঙ্গই তাহাকে মনোনীত করিয়া লয়। তখন প্রকাশ করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর তো থাকেই না, উপরন্তু ব্যঞ্জনাকে অকৃত্রিম ও অবিকল করিতেও সে বাধ্য হয়। ভাবুক ও বিদ্বজ্জনের মতো ধ্যেয় সত্যের নিকটে আত্মসমর্পণ করাই শিল্পীর পরম কর্তব্য। যেমন বহিরঙ্গ বস্তুর প্রত্যুৎপাদনই জ্ঞানার্জনের একমাত্র লক্ষ্য, রূপকারের সাধনাও তদনুরূপ। সে উদ্ভাবক নহে, আবিষ্কারক, কপোলকল্পনা তাহার ব্রত নহে, তাহার ব্রত কেবল জিজ্ঞাসা।]

মানবজীবন সম্বন্ধে এই exploration-এর, অনুসন্ধানের আভাস বিভূতিবাবুর রচনায় পাওয়া যায় না। আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহা অত্যন্ত ভাসা-ভাসা, সাদামাটা মামুলি স্তরের। তাঁহার চিত্রিত চরিত্রগুলি হয় মামুলি ধরনে ভাল, না হয় মামুলি ধরনে মন্দ, না হয় মামুলি ধরনেই প্রাণহীন জড়

পদার্থ—এতই মামুলি যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের সম্বন্ধে আরো জানিতে কোন কৌতূহল হয় না। তিনি নিজে লিখিয়াছেন বটে সকল বড় সাহিত্যের মূলে আছে মানব বেদনা, কিন্তু বোধহয় উপলব্ধি করেন নাই যে বেদনার অনন্তরূপ, শুধু দারিদ্র্যের সহিত সংঘর্ষই তো তাহার একমাত্র প্রকাশ নয়। দারিদ্র্যের সহিত অপুর বিরোধও অত্যন্ত মামুলি ধরনের—কখনও খাইয়া কখনও না খাইয়া, কখনও চাকরি করিয়া কখনও না করিয়া অপু দারিদ্র্যকে বহিয়া চলিয়াছে মাত্র। একটা সহজ জীবনানন্দ ও রোমান্সপ্রিয়তার দোহাই দিয়া গ্রন্থকার অপুকে সর্ববিধ অন্তর্দ্বন্দ্ব—প্রলোভন, প্রেমাবেগ, ভাববিপ্লব, আদর্শবিভ্রাট ইত্যাদি হইতে সযত্নে দূরে রাখিয়াছেন। অথচ এই সব অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারাই বালক মানুষ হইয়া ওঠে, মানুষ অতি-মানুষ হইবার আশা রাখে। জীবনের জটিলতাকে জানিলে তবেই জীবনকে জয় করা সার্থক—যে তাহা জানিল না সে কিসে অপরাজিত? তাহার সারা জীবনই তো অপরিণত। এই অতিকায় উপন্যাসখানির কোথায়ও কোন জীবনের জটিলতার সম্মুখীন হইবার প্রয়াস দেখা যায় না। ইহারই মধ্যে সবচেয়ে জটিল চরিত্র 'লীলা'; সেও অত্যন্ত মামুলিভাবে জটিল। বড় ঘরের রূপসী বিদুষী তরুণী এক বিলাতফেরৎ বদ-মেজাজ চরিত্রহীন বড়লোক স্বামীর অত্যাচারে কুলত্যাগ করিয়া অন্য এক তরুণ ব্যারিস্টারের হাতে গিয়া পড়িল, যে তাহার সঞ্চিত অর্থ নির্বিকারে ফাঁকি দিয়া ফুঁকিয়া দিল। পরে সে থাইসিস্-এ আক্রান্ত হইয়া একদিন হঠাৎ আত্মহত্যা করিয়া বসিল—এ কাহিনী কি সর্বজন পরিচিত নহে? অপুর সহিত লীলার স্বল্পব্যক্ত প্রণয়-সম্বন্ধের প্রকৃতি এমনই অবাস্তব, ভিত্তি এতই শিথিল যে তাহার গভীরত্বে বিশ্বাস করা রমণীমন-অনভিজ্ঞ অপরিণত বয়সের বাহিরে সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। গভীরতার ও জটিলতার অভাবে কেন্দ্রীয় চরিত্রের পরম দুর্বলতাই উপন্যাসখানির প্রধান ব্যর্থতা। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরিয়া এই বিমুখীনতার তথ্যবহুল বিবরণ পড়া ক্লান্তিদায়ক হইয়া উঠে। ছদ্মবেশী আত্মচরিতের বিপদই বোধ হয় এই যে, যে-ছোট ঘটনা গ্রন্থকারের নিকট দ্যোতনাপূর্ণ, তাহা পাঠক সাধারণের নিকট ব্যর্থ হইতে পারে, এ চেতনা সহজেই লোপ পায়। খুঁটিনাটির বিবরণেও মাঝে মাঝে ত্রুটি ঘটিয়াছে। ইতুপূজা কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে না হইয়া পৌষ মাসের পিছনে চলিয়া গিয়াছে; সরস্বতী পূজা কোনকালেই মাঘমাসের কয়েক মাস পরে হইতে পারে না; পূজার ছুটির ঠিক পূর্বেই কলিকাতায় হকি খেলিবার সীজন্ নয়; ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ্ সায়েন্স এণ্ড টেক্নলজির

ঠিকানা বোধহয় কেম্‌ব্রিজে নয়, লণ্ডনে। কিন্তু ক্লান্তি না আসার আসল কারণ বিভূতিবাবুর ভাষা। মাঝে মাঝে শব্দবিন্যাস-বিপর্যয় আছে। তথাপি তাহা স্বচ্ছ ও অনায়াস। মনে পড়ে মিড্‌ল্‌টন মারির উক্তি—Try to be precise and you are bound to be metaphorical। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভ্রমণ কাহিনীতে বিভূতিবাবু যে সুপঠিত তাহার অনেক ইঙ্গিত যেখানে সেখানে ছড়ানো আছে। কিন্তু কোথাও অবান্তর কোটেশন বা এলিউশান-এর সাহায্যে বিদ্যা জাহির করিবার সহজ পন্থায় পাঠকের চমক উৎপাদন করিবার চেষ্টা নাই। তাঁহার পরিশীলন মেঘান্তরিত সূর্যরশ্মির মতো সহনক্ষম দীপ্তিতে তাঁহার রচনাকে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছে। রচনায় এই দুর্লভ প্রসাদগুণ ও কবিত্বশক্তি সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয় উপন্যাসকার হিসাবে, মানব-চরিত্রের বিবৃতিকার হিসাবে বিভূতিভূষণ বড় বই লিখিলেও বড় লেখক নহেন। কারণ Le grand e´crivain est celui qui a la vision de nouveaxu aspects de la re´latite´, vision si impe´rieuse et exigeante qu'elle les remplit pour lui de quelque chose d'eternel. Son oeuvere est une fene´tre qui nous donne vue sur une nouvelle perspective; c'est une e´chappe´e sur une paysage jusqu'alors inconnue. [বড় লেখক তিনিই যাঁহার চোখে বস্তুবিশ্বের নবতর বিভাস প্রতিভাত হয়। তাঁহার দিব্যদৃষ্টির এমনি অনিবার্য মহিমা যে তিনি এই বিভাসেই চিরন্তনের পরিপূর্ণতার সন্ধান পান। বাতায়নের মতো তাঁহার সৃষ্টি আমাদের সামনে নূতন পরিপ্রেক্ষিত আনিয়া দেয়, অদ্যাবধি-অজানা জগতে নিষ্ক্রমণের পথ প্রশস্ত করে।]

জাগরী

সতীনাথ ভাদুড়ী

সমবায় পাবলিশার্স।

গান্ধী-পূর্ব যুগে শিক্ষিত বাঙালী-মহলে একটা কথা প্রচলিত ছিল যে পরাধীন জাতির নাকি কোন রাজনীতি থাকিতে পারে না। কথাটা নেহাৎ মিথ্যা ছিল না। কারণ তখন যাহাকে রাজনৈতিক আন্দোলন বলা হইত তাহা প্রধানতঃ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনেই সীমাবদ্ধ থাকিত। এই পদ্ধতিতে কখনই শক্তি অর্জন করা যায় না। অথচ রাজনীতির প্রকৃত অর্থ হইতেছে দেশের শাসনতন্ত্রের উপর অধিকার স্থাপনের জন্য লড়াই। গান্ধী-আন্দোলনে এই লড়াই দেশব্যাপী বিস্তৃতি লাভ করিল। তাহারই ফলে বোঝা গেল, পরাধীন জাতির প্রধান কর্তব্য রাজনীতি, তাহাকে বাদ দিলে অন্য সমস্ত কর্ম-পন্থা শিথিল-ভিত্তি হইয়া পড়ে। তখন হইতে রাজনীতি জনকয়েক উচ্চশিক্ষিত লোকের অবসর-বিনোদনের উপায় হইতে একেবারে জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের কেন্দ্র অধিকার করিয়া বসিল। সংগ্রামশীল রাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবে সাধারণ বাঙালী গৃহস্থালীর স্নিগ্ধ পরিবেশ হইয়া উঠিল বৈপ্লবিক চাঞ্চল্যে উদ্বেল।

'জাগরী' এমনই একটি রাষ্ট্রীয় পরিবারের কাহিনী। পূর্ণিয়ার একটি বাঙালী পরিবার। গৃহকর্তা ছিলেন সরকারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

গান্ধীজির ডাকে সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন অসহযোগের বন্যাস্রোতে। তাঁহার গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইল গান্ধী আশ্রম। শবরমতীর সমস্ত নিয়ম-কানুন সেখানে নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হইত। সুতরাং তাঁহার স্ত্রীকেও হইয়া উঠিতে হইল স্বামীর সহধর্মিণী। ছেলেদু'টির বড়টিকে ইংরাজী না পড়াইয়া পাঠান হইল কাশীর বিদ্যাপীঠে। বিলু সেখান হইতে শাস্ত্রী উপাধী পাইয়া পূর্ণিয়ায় ফিরিল। ছোটভাই নীলুকে সে-ই আগ্রহ করিয়া 'আর্থকোয়েক এলাউয়েন্স' হইতে খরচ পাঠাইয়া কলেজে পড়াইয়া বি.এ. পাশ করাইল। এইভাবে আসিয়া পড়িল ১৯৪২ সালের অগস্ট বিক্ষোভ। ইতিমধ্যে অবশ্য সমস্ত পরিবারটি বারবার জেল খাটিয়া আসিয়াছে কংগ্রেসের নির্দেশে। বিহারের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে এই রাষ্ট্রীয় পরিবারটির আসন ছিল সকলের সম্মানার্হ। স্বয়ং গান্ধীজির সহিত ইহার সোজাসুজি যোগাযোগ ছিল।

এই গান্ধী উপাসক পরিবারেও ১৯৩৪ সাল হইতে ফাটল ধরিয়াছে। গান্ধীময় পরিবেশে লালিত ও বর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও বিলু ও নিলু দুজনেই গান্ধীবাদে অবিশ্বাসী হইয়া কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত হইল। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিতেছেন ঃ রাজনৈতিক জাগৃতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই আলোড়নের তরঙ্গ বিক্ষোভ কোন না কোন স্থলে পারিবারিক জীবনের ভিত্তিতেও আঘাত করিতেছে। অগস্ট বিক্ষোভ এই পরিবারকে কিভাবে আঘাত করিল তাহারই বিস্তৃত চিত্র আঁকা হইয়াছে এই তিনশত পৃষ্ঠাব্যাপী উপন্যাসে।

গ্রন্থকারের সাহিত্যিক সৎসাহসের তারিফ না করিলে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। বাংলার মন্বন্তরের কথা বাদ দিলে এই অগস্ট বিক্ষোভের চেয়ে উল্লেখ্য ঘটনা আমাদের সামাজিক জীবনে সম্প্রতি ঘটে নাই। অথচ বাংলা কথা-সাহিত্যে তাহার উপযুক্ত প্রকাশ হয় নাই বলিলে অন্যায় হয় না। ইহার একটি কারণ বোধ হয় এই যে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে এ বিক্ষোভ তেমন গভীর স্তরে পেঁছিায় নাই। পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশে ইহার বিস্তার ছিল অনেক বেশী। বিহার-প্রবাসী বাঙালী লেখক তাই উপন্যাস রচনার এমন একটি বিষয় পাইয়াছেন সাধারণ বাঙালী উপন্যাসকার যাহা হইতে বঞ্চিত ছিলেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে। কিন্তু সুযোগ পাইলেই তাহার সাহিত্যিক সদ্ব্যবহার করার ক্ষমতা সকলের থাকে না। সানন্দে স্বীকার করা উচিত গ্রন্থকার এই সুযোগের সম্যক সদ্ব্যবহার করিয়া এমন একটি দ্যোতনাপূর্ণ

উপন্যাস রচনা করিয়াছেন যাহা না পড়িলে বর্তমান বাংলা কথা-সাহিত্যের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

অতি-সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বিক্ষোভকে উপন্যাসের উপজীব্য হিসাবে ব্যবহার করিতে পারা শিল্পকুশলতার দিক হইতে একটি অতি কঠিন পরীক্ষা। বলিতে বাধা নাই এ পরীক্ষায় গ্রন্থকার সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। উপন্যাসটিতে মাত্র চারটি অধ্যায়, প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়বস্তু একই, একটি বিশেষ রাত্রির বর্ণনা। একই গল্প চারবার বলিবার দুঃসাহস যে লেখকের আছে তাঁহাকে অভিনন্দন না জানাইয়া থাকা যায় না। চারবার পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও যে গল্প পাঠকের নিকট নীরস লাগে না তাহার নির্বাচন শিল্পদৃষ্টির সামান্য পরিচয় নহে। নীরস যে লাগেনা, তাহার কারণ, গ্রন্থকার একই ঘটনাকে চারিটি চোখ দিয়া দেখাইয়া, চারিটি চরিত্রের মুখ দিয়া বলাইয়া চারিটি ব্যক্তিকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বিশেষ রাত্রির ঘটনাটিতেও এমন একটি কারুণ্যের নিবিড়তা আছে যাহা পাঠকের মনকে বহুক্ষণ আর্দ্র ও রসসিক্ত করিয়া রাখে। ভাঙ্গনশীলতা সত্ত্বেও বাঙালী গৃহস্থের পারিবারিক সংগঠন এখনও বেশ স্থিতিশীল। পারিবারিক দ্বন্দ্বে তাই আমাদের মন সমবেদনায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে, দ্বন্দ্বের মূলে যদি থাকে দেশের জন্য স্বার্থত্যাগ তাহা হইলে তাহার আবেগ আমাদের মর্মের গভীরে গিয়া আঘাত করে ; আর স্বার্থত্যাগের পরিণাম যদি হয় ফাঁসীর মঞ্চে রজ্জুর কণ্ঠাশ্লেষে, তাহা হইলে আমরা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি। আমাদের জাতীয় চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি গ্রন্থকারের সজাগ দৃষ্টি আছে বলিয়াই উপন্যাসখানি সংক্ষিপ্ত সাংবাদিকতা হইয়া পড়িবার সম্ভাব্য বিপদ হইতে কৃতিত্বের সহিত রক্ষা পাইয়াছে।

অগস্ট বিক্ষোভের ফলে গ্রন্থের নায়ক বিলু এবং তাহার বাবা ও মা তিনজনেই পূর্ণিয়া সেণ্ট্রাল জেলের অধিবাসী। বিলুর বাবা—মাস্‌টার সাব —আছেন রাজনৈতিক বন্দীদের বিশেষ বিভাগে ; মা আছেন আওরৎ কিতা ; আর বিলু আছে কন্‌ডেম্‌ড্‌ সেল্‌স-এর এক নম্বর কামরায়। রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার জীবনাবসান—এ সংবাদ জেলের মধ্যে ছড়াইয়া গিয়াছে। সে রাত্রে তিনজনেরই বিনিদ্র-চিন্তার স্রোত আবেগের তীব্রতায় বর্তমান হইতে অতীতে ও অতীত হইতে বর্তমানে নানা খাতে আনাগোনা করিতেছে। এই আঙ্গিকের অবলম্বনে গ্রন্থকার অত্যন্ত নিপুণতার সহিত জেল-জীবনের নানা-দিকের বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে ফ্লাড্‌ লাইটের আলোকপাতের মতো জাজ্বল্যমান

করিয়া তুলিয়াছেন। ইংরেজের জেল, অসহযোগ আন্দোলনের পর হইতেই আমাদের কাছে তাহার প্রকৃত রূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। যে শয়তানী রাজ-শক্তির হৃদয়হীন নিষ্পেষণে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি নির্জীব, তাহারই ঘনীভূত রূপ এই কারাগার। এই কারাগারের কুক্ষিতে প্রাণ দিয়াছে, আটক থাকিয়াছে, যুগের পর যুগ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা, বীর শহীদেরা। এই কারাগারের একদিকে আছে নীচতা ও অধঃপতনের কাহিনী, অন্যদিকে আছে বৈপ্লবিক শিক্ষালোচনার গৌরবময় অধ্যায়। রাজনৈতিক কারাজীবনের যথাযথ চিত্রের এমন পরিণত অথচ পর্যাপ্ত প্রকাশের জন্য গ্রন্থকার স্বাধীনতাকামী পাঠক-সাধারণের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইবেন।

সেইরাত্রে জেলের ঠিক বাইরে, জেলগেটের সামনে, আছে আর একটি লোকও বিনিদ্র। সে নিলু। সে আসিয়াছে দাদার মৃতদেহের সংকারের আয়োজনে। সেও ছিল জেলের অভ্যন্তরে অগস্ট বিক্ষোভের ফলে। কিন্তু সেখানে তাহার রাজনৈতিক মত-পরিবর্তন হয়; সে কংগ্রেস সোশালিস্ট পার্টি ছাড়িয়া ফ্যাসী-বিরোধী পার্টিতে যোগ দিয়া মুক্তি পায়। মত ও কর্মের ঐক্য বজায় রাখিতে সে দাদার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়; সেই সাক্ষ্যের ফলেই হইবে রাত্রি প্রভাতে বিলুর ফাঁসী। গ্রন্থকারের হয় ত হঠাৎ মনে পড়িয়াছিল অগস্ট-বিপ্লবের জন্য কোন নামজানা কংগ্রেস সোসালিস্টের ফাঁসী বস্তুতঃ হয় নাই, শেষ পর্যন্ত অবশ্য বিলুর ফাঁসী হইল না, সরকারের আদেশে ফাঁসীর হুকুম মুলতুবি রহিল। সেই প্রভাতে অন্য একজন সাধারণ কয়েদীর ফাঁসীর আয়োজন হওয়ায় সকলের মনে এই ভুল বোঝার সৃষ্টি হইয়াছিল। ফাঁসী হওয়া বা না হওয়া এই উপন্যাসের মূল প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন এই, রাজনৈতিক মতবাদের বিরোধ ঘটিলে ভাই যদি ভাইয়ের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়, ও তাহাতে ভাইয়ের প্রাণদণ্ড ঘটে, তাহা হইলে এইরূপ কার্যকে কোন্ চক্ষে দেখিতে হইবে, তাহাকে সমর্থন করা চলে কি না।

বলা নিষ্প্রয়োজন, এ প্রশ্ন রাজনৈতিক নীতিজ্ঞানের মূলগত প্রশ্ন। গ্রন্থকার এ প্রশ্নকে প্রয়োগ করিয়াছেন একটি বিশিষ্ট পরিবেশে, অগস্ট-বিক্ষুব্ধ বিহারে। তিনি নিজেই বলিতেছেন—গল্পটি ১৯৪২ সালের অগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় পড়িতে হইবে। তাই বিলু ও নিলুর দ্বন্দ্ব দুটি ব্যক্তির বিরোধ নয়, হওয়া উচিত দুটি মতবাদের সংঘর্ষ। এ সংঘর্ষকে দেখিতে হইবে কংগ্রেস সোশালিস্ট মতবাদের সহিত ফ্যাসী-বিরোধী মতবাদের সংঘর্ষ হিসাবে, যেখানে

আনুষ্ঠানিক গান্ধীবাদী বাবা ও মা নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে প্রচার করা বইখানির উদ্দেশ্য নয়। এ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি যে সচেতন ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। গান্ধী-বাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইলেও তাহার দুর্বলতা ও বিহারে কংগ্রেস মিনিস্ট্রির ত্রুটি-বিচ্যুতি তিনি বিলুর ও নিলুর মুখ দিয়া বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীতে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। কিন্তু বিলুর সহিত নিলুর বিরোধে তাঁহার পক্ষপাত, চেষ্টা সত্ত্বেও গোপন রাখিতে পারেন নাই। ব্যক্তি হিসেবে বিলুর সহিত নিলুর কোনো তুলনাই হয় না। "নিলু চিরকাল স্পষ্টবক্তা" কিন্তু "তাহার মন ও দৃষ্টিভঙ্গী স্থূল।" তাহার কবিতা ভালো লাগেনা, অথচ বিলু যখন ধনিক-শ্রমিক প্রভৃতি দেওয়া একটা লাঠিমারাগোছের সনেট লিখিয়া দিয়াছিল তখন নিলুর সেটা খুব ভালো লাগিয়াছিল। নিলু সেটা ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল। গুরুজনের প্রতি নিলুর কোনো শ্রদ্ধা নাই, মা বাবাকে অকারণে আঘাত করিতে তাহার একটুও বাধে না। এইরূপ অজস্র উক্তি গ্রন্থময় ছড়ানো আছে। নিলুকে শ্রদ্ধা করিতে পারা যায়, এমন একটি ঘটনাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যেখানে সে ভালো, দাদার ছায়া হিসাবেই ভালো। জেলে থাকিয়া যখন সে রাজনৈতিক সাবালকত্ব অর্জন করিল, দাদার পক্ষপুট হইতে বাহিরে আসিয়া সি, এস, পি ছাড়িয়া দিল, তখন এই আবাল্য-স্পষ্টবক্তার সাহস হইল না দাদার সহিত আলোচনা করিবার। সে দাদার নিকট হইতে চোরের মতো পলাইয়া বেড়াইতে লাগিল। বিলু ও নিলু পরস্পর বোঝাপাড়া করিতে পারিত, গোরা ও বিনয়ের মতো। ইহার অভাবে যে দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসের ভিত্তি তাহার প্রকৃতি হইয়া উঠিয়াছে রাজনৈতিক অপেক্ষাও পারিবারিক। দুটি বিরোধী মতবাদকে সমদৃষ্টিতে দেখাইবার উদারতা গ্রন্থকারের না থাকায় উপন্যাসটির উৎকর্ষ শেষ পর্যন্ত বহুল পরিমাণে ম্লান হইয়াছে। ট্রাজেডীর ঘন করুণ রস ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়োজন হয় সত্যের সহিত সত্যের সংঘাত, সত্যের সহিত মিথ্যার নহে। গ্রন্থকারের চিত্রণে বিলুর চরিত্র যে পরিমাণ সত্য, নিলুর তাহা নহে। সি, এস, পি ছাড়িয়া সে যে-দলে প্রবেশ করিল তাহার কোন সংজ্ঞা গ্রন্থকার দেন নাই। আভাসে ইঙ্গিতে মনে হয় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি, কারণ একথা আজ সকলেই জানে যে এদেশে ফ্যাসী-বিরোধী পার্টিগুলির মধ্যে ইহাই সবচেয়ে সক্রিয় ও প্রভাবশীল। নিজের নিরপেক্ষতার দাবী বজায় রাখার জন্য গ্রন্থকার সুচতুরভাবে গ্রন্থের মধ্যে অন্যত্র কমিউনিস্টদের উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নিলুর

বেলায় চাপিয়া গিয়াছেন। দাদার বিরুদ্ধে নিলু যে সাক্ষ্য দিয়াছিল, গ্রন্থকার ইহাও বলিয়াছেন, তাহা স্থানীয় পার্টি-নেতাদের মনঃপুত ছিল না। কিন্তু এইরূপ একটি গুরুতর বিষয়ে নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য করা কোনো কমিউনিস্ট সভ্যের পক্ষে সম্ভব কিনা, কমিউনিস্ট পার্টিতে কি ভাবে সমবেত আলোচনায় ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হয়, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকার নীরব থাকিয়া নিলুর প্রতি ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি গুরুতর অবিচার করিয়াছেন।

অকপট সহানুভূতি সত্ত্বেও বিলুর প্রতিও গ্রন্থকার সর্বত্র সুবিচার করিতে পারেন নাই। বিলু ছেলেবেলা হইতেই গান্ধীবাদের আবহাওয়ায় মানুষ। নিজের পিতার জীবনে সে গান্ধীজির আদর্শের ও কর্মপন্থার ত্রুটিহীন আচরণ দেখিয়াছে। তবুও কেন সে কংগ্রেস সোশালিস্ট হইয়া উঠিল তাহা গ্রন্থ পড়িয়া ঠিক বোঝা যায় না। কারণ তাহার পিতার সহিত এ লইয়া কোনো আলোচনার কথা আমরা পাই না। তাঁহারা যেন অসহায় ভাবেই পরস্পরের মতভেদ মানিয়া লইলেন। গ্রন্থকারের মতে বিলু মার্কসবাদ এত ভালো করিয়া আয়ত্ত করিয়াছিল যে সে ক্লাশ করিয়া অন্যদের পড়াইত। গ্রন্থকারের কি জানা নাই যে মার্কসবাদ ও আত্মকেন্দ্রিকতা পরস্পর-বিরোধী, তাহাদের একত্র অবস্থান অসম্ভব। বিলুর মতো স্থিতধী ব্যক্তি মার্কসবাদ পরিপূর্ণ আয়ত্ত করার পরও এমন আত্মকেন্দ্রিক রহিল কি করিয়া? নিলুর আচরণের প্রতি তাহার যে অনুকম্পা, সে ত আনুষ্ঠানিক গান্ধীবাদের খানিকটা সচেতন খানিকটা অচেতন বাহ্য বিনয়ের নামান্তর। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দার্শনিক ও ঐতিহাসিক শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট হওয়ায়, এই ধরনের ত্রুটি সম্ভব হইয়াছে।

ত্রুটিগুলি গুরুতর সন্দেহ নাই। কিন্তু যতদূর জানা গিয়াছে এই উপন্যাসই গ্রন্থকারের প্রথম প্রকাশিত রচনা। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস এই গ্রন্থ নিজ গুণে জনপ্রিয়তা অর্জন করিবে। গ্রন্থকারের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ জনপ্রিয়তার স্রোতে গা ভাসাইয়া তিনি যেন অতি শীঘ্র দ্বিতীয় রাজনৈতিক উপন্যাস শুরু না করেন। সেই অবসরে রাজনৈতিক জগতে বিভিন্ন কর্ম-প্রণালী ও তাহাদের দার্শনিক ভিত্তি অন্তরঙ্গভাবে পর্যালোচনা করিলে তিনি অধিকতর লাভবান হইবেন ও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধতর করিতে সমর্থ হইবেন। গুণীলেখক সর্ব্বদাই নিজের অতীত কীর্ত্তিকে অতিক্রম করিতে সচেষ্ট থাকেন।

কামধেনু

তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়। বেঙ্গল পাবলিশার্স।

গণনায়ক

সতীনাথ ভাদুড়ী। বেঙ্গল পাবলিশার্স।

ছোটবড়

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। পূরবী পাবলিশার্স লিঃ।

'কামধেনু' তারাশংকরের নূতন উপন্যাস নহে, সম্প্রতি-লিখিত পাঁচটি গল্পের সংকলন। অথচ মলাট হইতে মলাট পর্যন্ত চোখ বুলাইয়া গেলে ইহা সহজে বুঝিবার উপায় নাই। বইটিতে না আছে সূচীপত্র, না আছে পত্রশীর্ষে গল্পগুলির নাম। ইহার উদ্দেশ্য কি এই যে ক্রেতা-পাঠক এক পলকেই বুঝিতে না পারে যে গ্রন্থটি উপন্যাস না ছোটগল্প? অর্থাৎ তারাশংকরের উপন্যাসের যে কদর আছে ছোটগল্পের তা নাই—এই ধারণাই বোধহয় এই কৌশলের মূলে।

অথচ এই ধারণার বাস্তবতা কতটুকু? বাংলা কথাসাহিত্যের আসরে তারাশংকরবাবুর প্রবেশ খুব বেশী দিনের কথা নয়, এবং সে-প্রবেশ ছোট গল্পের মাধ্যমে। 'জলসা-ঘর' তাঁহার খ্যাতির প্রথম পাদপীঠ। বীরভুম অঞ্চলে গ্রামীণ-জীবনের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সামাজিক নানাস্তরের নাটকীয় কাহিনী প্রমাণ করে তিনি শরৎচন্দ্র-প্রদর্শিত পথের উপযুক্ত পথিক। আভিজাত্য-দর্পিত ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ জমিদার-পরিবার, কুঠিয়াল ও লাঠিয়াল, সাধারণ চাষী ও সাঁওতাল-বাউরী: ক্ষেতমজুর-মজুরনী, বন্যার উৎপাত ও সাপের উপদ্রব,

গ্রামের শিক্ষক ও ডাকঘরের পিওন, যাত্রাদলের কবি ও সহজিয়া বাউল, সামাজিক প্রথার প্রাচীন বন্ধন ও সমাজবিরোধী প্রবৃত্তির অদম্য প্রকাশ ইত্যাদি যে সমস্ত উপাদান লইয়া তিনি পরে বৃহদাকার উপন্যাস লিখিয়াছেন তাহার প্রায় সবই অঙ্কুরাকারে পাওয়া যায় 'জলসা-ঘরে'। উপন্যাসগুলিতে পটভূমিকা বৃহত্তর হইয়াছে, অনেক খুঁটিনাটি প্রদর্শন করার সুযোগ মিলিয়াছে কিন্তু মূল কাঠামো রহিয়া গিয়াছে অনেকাংশে অপরিবর্তিত। সাহিত্যিক মূল্যবিচারে আকার-গত পরিমাণের প্রাধান্য গৌণ। মেদবৃদ্ধি হইলেই শক্তি বৃদ্ধি হয় না। তাই তারাশঙ্করবাবুর অসংখ্য অনুরক্ত পাঠকের মধ্যে এমন পাঠক নিশ্চয়ই বিরল নয় যাহারা মনে করে তিনি 'জলসা ঘরে' যে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিলেন ভবিষ্যতে তাহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।

উপন্যাসের ক্ষেত্রে ছোটগল্প অপেক্ষা সমাজ-জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে তিনি বিস্তারিত করিয়া বিশ্লেষণের অবকাশ পাইয়াছিলেন। তাহা হইতেছে সমাজ-জীবনের উপর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব। উপন্যাস মাত্রকেই রাজনীতি-বিবর্জিত হইতে হইবে, এ বিশ্বাস বা অভ্যাস তাঁহার নয়। 'আনন্দমঠ' 'রাজসিংহ' 'গোরা' 'ঘরে বাইরে' 'পথের দাবী'—ইহাদের শিক্ষাকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার নানা উপন্যাসে প্রকাশ, তিনি গান্ধীবাদী আন্দোলনের সবল সমর্থক। যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা বর্তমান বাংলার গোষ্ঠী-জীবনকে প্রভুতরূপে প্রভাবিত করিয়াছে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিন্দু-মুসলিম সম্বন্ধ, মন্বন্তর, মহামারী প্রভৃতি—নানা চিত্রে-চরিত্রে তিনি তাঁহাদের অঙ্কিত করিয়াছেন ঐ দৃষ্টিভঙ্গীর নির্দেশ-মতো। তাঁহার এই সামাজিক চেতনা, ঐতিহাসিকতা-বোধ, তাঁহার উপন্যাসগুলিকে সাধারণ পাঠকমহলে আনিয়া দিয়াছে ঈপ্সিত লোকপ্রিয়তা।

কিন্তু যে সামাজিক চেতনা, ঐতিহাসিকতা-বোধ মাত্র ব্যক্তিগত অনুভূতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, যাহা বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে শাণিত নহে, তাহার অসম্পূর্ণতা সহজেই প্রকট হইয়া পড়ে। তাহা বর্তমান সমাজ-জীবনের জটিলতা অনুভব করে, সত্যনিষ্ঠ হইলে তাহাকে অস্বীকার করে না। কিন্তু পুরাতনের মধ্য হইতে নূতনের উদ্ভবের সন্ধান না পাইয়া ধরিয়া লয় পুরাতনই সনাতন, তাহার ক্ষয় নাই; নূতন কেবল স্বপ্নজগতেই সত্য, বাস্তবজগতে তাহার আসন চিরদিনই শূন্য। ক্ষয়িষ্ণু ধনবাদী সমাজ-ব্যবস্থার পুঞ্জীভূত ক্লেদ তারাশঙ্করবাবুর মনকে করিয়াছে ভারাক্রান্ত, হতাশাপীড়িত। বিশ্বব্যাপী

ধনবাদের বিরুদ্ধে নবোদ্ভূত সমাজবাদের অনিবার্য জয়যাত্রা তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিতে না পারায় তিনি বিশ্বাস হারাইয়াছেন শ্রমিক-কৃষকের সংঘবদ্ধ সংগ্রামে, বুদ্ধিজীবীদের কুসংস্কার-বিরোধী বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তিতে। বর্তমান বাঙালী সমাজ তাঁহার দৃষ্টিতে ভবিষ্যতের গর্ভাধার নয়, অতীতের শবাধার। 'কামধেনু'-র প্রত্যেকটি কাহিনীতে ইহার সমর্থক নিদর্শন পাওয়া যায়।

'কামধেনু'-র গল্পগুলির রচনাকাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষাবস্থা হইতে বর্তমান পর্যন্ত। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের ইতিহাসে এ পর্ব একটি অতিদ্রুত পরিবর্তনের কাল। এই পর্বের প্রধান লক্ষণ, যুদ্ধকালীন অব্যবস্থার সুযোগ লইয়া দুর্ভিক্ষ ও মহামারী সৃষ্টি করিয়া শাসক ও শোষক শ্রেণীর সীমাহীন লোভ ও ব্যাপক সামাজিক দুর্নীতি, যাহার ফলে জনসাধারণের সমষ্টিগত অভূতপূর্ব দুর্দশা। তাহারই রাজনৈতিক প্রতিফলন প্রদেশব্যাপী দাঙ্গায় ও সাম্প্রদায়িক দেশ-বিভাগে, যাহা দুর্দশার প্রতিকারের পরিবর্তে তাহাকে আরো ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু এই অন্ধকারময় চিত্রই বাস্তবতার পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য নয়। দাঙ্গার বিযাক্ত আবহাওয়া সত্ত্বেও চলিয়াছে হিন্দু-মুসলমান শ্রমিকের ঐক্য ধর্মঘটের আহ্বানে, হিন্দু-মুসলমান কৃষকের ঐক্য তেভাগার সংঘর্ষে। একথা সত্য যে শ্রমিক-কৃষকের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির বর্তমানে জয় হইয়াছে। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতেছেন এ জয় অত্যন্ত সাময়িক, প্রবঞ্চনাশীল; শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম থামিয়া যায় নাই, যাহার পরিণামে আকাঙ্ক্ষিত সমাজবাদী সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করা আমাদের দেশে সম্ভব হইবে। সংঘবদ্ধ শ্রমিক-কৃষকের সহিত সম্বন্ধ-রিক্ত মধ্যবিত্তেরা যে এ-অবস্থায় মানসিক ক্লৈব্যে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেন, তাহাও অবশ্য স্বাভাবিক। তারাশঙ্করবাবু আজ ইহাদেরই মুখপাত্র হইয়া পড়িয়াছেন।

উভয়ের ছাড়াছাড়ি। গ্রন্থকার সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার বহু ঊর্ধ্বে, তাই মুসলমানের গো-শকটে চড়িতে ভয় পান না। পথে এক কীর্তনিয়ার আবির্ভাব হইল, যিনি মুসলমান শেখ গাড়োয়ানকে শোনাইয়া দিলেন—

শেখ-সৈয়দ আমীর-নবাব ফকির-ঠাকুর পীর—
বৈরাগীকে পায়ের ধুলা দাও—চরণ ধুলা।

শেখও 'সাবাস সাবাস' করিয়া উঠিল। কিন্তু গ্রন্থকার ভাবিতেছেন—"সত্যপীর সত্যনারায়ণ সব মিথ্যে। কলকাতার রক্তাক্ত রাজপথের দৃশ্য যে দেখেছে তার চেয়ে এ কথা কেউ ভালো জানে না।"

তারাশঙ্করবাবু ঠিকই ধরিয়াছেন। কলিকাতার রাজপথে হিন্দু মুসলমানের যে পাশবিক প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল তাহার নিরাকরণ পুরাতন বৈষ্ণবীপন্থায় হইবে না। তাহার কারণ যে মূলত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। কিন্তু তারাশঙ্করবাবুর মননশীলতা তাঁহার বিচারবুদ্ধিকে এই পথে পরিচালিত করিল না। তিনি সমষ্টিগত সমস্যাকে ব্যক্তিগত সদিচ্ছার সমস্যায় রূপান্তরিত করিলেন। তাই প্রয়োজন হইল সুন্দীপুরের বটতলার—সিদ্ধপুরুষের অতি-প্রাকৃত প্রভাবের প্রতীক—যার তলায় নিরাপদে বসিতে পারে কেবল সেই মানুষ যে নিজের সবচেয়ে বড়ো পাপের কথা বলিতে পারে অকপটে। এই অবস্থায় তারাশঙ্করবাবু লিখিতেছেন :

"তা কি পারি আমি? আমি মিথ্যাচারী—দারিদ্র্যের কাহিনী রচনা করে অর্থ উপার্জন করি, সে দারিদ্র্যকে মিথ্যা ভালোবাসার ভান করি, মিথ্যা আমি ঘোষণা করি—হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সকলকেই আমি সমান চোখে দেখি। ...কলকাতার এত বড় হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কাপুরুষের মতো ঘরে ব'সে শুধু অনুশোচনা করেছি, কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছি, আর্তকে রক্ষার জন্য, উন্মত্তকে প্রকৃতিস্থ করবার জন্য কিছু করতে পারি নাই,—প্রতিষ্ঠা-হানির ভয়ে, নিজের প্রাণের মমতায়। আরো অনেক—অনেক পাপ। সে সব কথা কি এদের সামনে প্রকাশ করতে পারি?

পারি না।

নতুন সিগারেট ধরিয়ে নীরবে বসেই রইলুম গাড়ীর মধ্যে।

বিচ্ছিন্ন চিন্তা আসতে লাগল। যামিনী রায়, নির্মল বোস, পশুপতি ভটচাজ, সুবল বাঁড়ুজ্জে, সজনী দাস—নিজের পাপকে কি কেউ অকপটে প্রকাশ করতে পারত এদের সম্মুখে?

কলকাতার মধ্যে কোথাও কি আছে এমন সুন্দীপুরের বটতলা ?”

মূলোৎপাটিত মধ্যবিত্তের নিষ্ফল আত্মমর্ষণের চমৎকার উদাহরণ। তারাশংকরবাবুর মতে, সাম্প্রদায়িক সমস্যার কোন সমাধান নাই যত দিন না হিন্দু মুসলমান সকলে, সাধারণ হইতে নেতারা পর্যন্ত প্রতিটি জন অকপটে আপন পাপ ব্যক্ত করিতে পারে! বলা নিষ্প্রয়োজন এ ব্যবস্থা যেন বামনের চাঁদে হাত দিতে চাওয়ার মতো অলীক ও হাস্যকর। যে রাধা কোন দিনই নাচিবে না তাহার জন্য ন' মণ তেল পোড়ানোর ব্যবস্থা।

তারাশঙ্করবাবুর নজরে পড়ে নাই—কলিকাতায় যখন এই মর্মভেদী দাঙ্গা চলিতেছিল সেই সময়েই কলিকাতার আট হাজার ট্রাম-মজুর মালিকের বিরুদ্ধে দীর্ঘ ধর্মঘট চালাইতেছিল, তাহাদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ঘটে নাই। কলিকাতার আশে পাশে চটকল অঞ্চলে যে আটলক্ষ শ্রমিক কাজ করে, যাহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করে,—কলিকাতার উত্তেজনা তাহাদের মধ্যে সংক্রামিত হইলে কি দানবীয় কাণ্ড ঘটিতে পারিত তাহা কল্পনা করিতেও মন শিহরিয়া ওঠে। কিন্তু শ্রমিক-শ্রেণীর সুস্থ শ্রেণীচেতনা তাহা উস্কানি সত্ত্বেও ঘটিতে দেয় নাই। কলিকাতার মিশ্রিত ও সীমান্ত পল্লীতে অনেক হিন্দু পরিবার মুসলমানকে ও মুসলমান পরিবার হিন্দুকে সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের বিভীষিকা অগ্রাহ্য করিয়াও আশ্রয় দিয়াছিল, এমন দৃষ্টান্তের সংখ্যাও তুচ্ছ নয়। সদ্য আন্দামান-প্রত্যাগত তরুণ কমিউনিস্ট কর্মী বীর লালমোহন তাঁহার স্বদেশ নোয়াখালিতে দাঙ্গা থামাইতে গিয়া এমনভাবে আত্মাহুতি দিলেন যে তাঁহার দেহের একটি ছিন্ন অংশও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাংলা দেশের কমিউনিস্ট পার্টির হিন্দু-মুসলমান সভ্যদের মধ্যে কোন আত্মবিরোধের চিহ্নও দেখা যায় নাই। সুন্দীপুরের বটতলার চেয়ে এই উদাহরণগুলি কি বেশী কার্যকরী নয়? এই বনিয়াদের উপরেই কি গড়িয়া উঠিবে না ভবিষ্যতেব মিলিত সমাজ—যে সমাজ তারাশংকরবাবুর একান্ত কাম্য? যে রোগের প্রতিকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সম্ভব, তাহার জন্য অতি-প্রাকৃতের শরণ লওয়া কি পিছনদিকে মুখ ফিরাইয়া আগাইয়া চলা নয়, লেনিন যাহাদিগকে আখ্যা দিয়াছিলেন "মুকুর বিপ্লবী" তাহাদের মতো ?

'কামধেনু'র অন্যান্য গল্পও প্রমাণ করে তারাশংকরবাবুর মুখ পিছন দিকে ফিরানো। 'যাদুকরের মৃত্যু' গল্পে তাঁহার দরদ চিকিৎসাবিজ্ঞান অপেক্ষা সাপুড়ে ও বেদেনীর ঝাড়ফুঁক ও মন্ত্রতন্ত্রের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছে। যাদুকর

নাদেরের নিষ্ঠা ও সাধুতা, বেদেনীর কর্মতৎপরতা ও ত্বরিত বুদ্ধি, একজন সাধারণ আধুনিক ডাক্তারের চেয়ে মনের উপর অনেক বেশী ছাপ ফেলে। একথা ঠিক যে চিকিৎসাবিজ্ঞান এখনও অনেক রোগের নিয়ামক খুঁজিয়া পায় নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য আজ অজ্ঞাত বলিয়া চিরদিনের মতো অজ্ঞেয় তো নয়। অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও দৃষ্টিভঙ্গীকে অস্বীকার করিলে ভবিষ্যৎ প্রগতির পথ যে রুদ্ধ হইয়া যায়।

শ্রমিকের ধর্মঘট ও কৃষকের তেভাগা যে বর্তমান পর্বে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তারাশংকরবাবুর সজাগ মন তাহা স্বীকার না করিয়া পারে নাই, অথচ দেখা যায় তাহাদের সুস্থভাবে গ্রহণ করিতেও পারেন নাই। তাই, স্ট্রাইকের মাত্র ক্ষণিক উল্লেখ পাওয়া যায় 'পাটনী' গল্পে চণ্ডাল শ্মশানচারীদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনের দীর্ঘায়িত বর্ণনার আনুষঙ্গিক উপলক্ষ্য হিসাবে, আর তেভাগার উল্লেখ পাওয়া যায় 'বরমলাগের মাঠ' অর্থাৎ ব্রহ্মনাগের মাঠ গল্পে চাষীদের নাগপূজায় বিশ্বাসের অনুপান হিসাবে। উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যায় মালিক শ্রমিকের প্রতি সহানুভূতিশীল ও জমিদার কৃষকের প্রতি ক্ষমাপ্রবণ। অনেকের মতে ইহাতে আপত্তি করিবার কি আছে? সাহিত্যিকের কি স্বাধীনতা নাই মালিক জমিদারকে সহৃদয়তার সহিত আঁকিবার? মালিক বা জমিদারমাত্রই কি নিষ্ঠুর বা অত্যাচারী? শুনিতে চমকপ্রদ হইলেও প্রশ্নটি আসলে কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক।

আসল প্রশ্ন এই, আজিকার দিনে মালিকিয়ানা বা জমিদারী-প্রথা জনসাধারণের জীবনযাত্রার উন্নতির পথে বাধা কিনা, জনসাধারণের স্বার্থে তাহাদের উচ্ছেদ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে কিনা। যদি দেখা যায়, কোন লেখক মালিক বা জমিদারের চিত্র আঁকিতে গিয়া তাহাদের সমাজ-বিরোধী ভূমিকা না দেখাইয়া বা সামান্য ইঙ্গিত দিয়া কোন ব্যক্তি বা মালিক জমিদারের আন্তরিক মহত্ত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তখন কি স্পষ্ট হইয়া উঠে না তাঁহার লেখনী কাহাদের স্বার্থে পরিচালিত হইতেছে? এখানে লেখকের নিজস্ব মতামতের প্রশ্ন উঠে না। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র বা কাহিনীর তাৎপর্যই এখানে একমাত্র বিচার্য। এই বিচার দিয়া কি বলা যায় না, তারাশংকরবাবুর লেখনী আজ সেই সব সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষকের স্বপক্ষে তাহার শক্তিপ্রকাশ করিতেছে না যাহারা মালিকিয়ানা বা জমিদারীর অভিশাপের অবসান ঘটাইবার জন্য অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছে, অকাতরে দলে দলে প্রাণ দিতেছে? তিনি আঁকিতেছেন

কেবল তাহাদের দুর্বলতার দিক, মোহান্ধ কুসংস্কারপ্রিয়তার দিক, তাহাদের সমাজ-বিরোধী উচ্ছৃংখলতার দিক। যেন এই সব ত্রুটির জন্য তাহারা নিজেরাই দায়ী, যেন এই সব প্রবৃত্তি তাহাদের জন্মগত উত্তরাধিকার, যেন এই দুর্গতি হইতে তাহাদের উদ্ধার কোনদিন সম্ভব নয়। এই ভ্রান্ত দরদ দিয়া তারাশংকরবাবু শরৎচন্দ্রের ঐতিহ্যের সম্প্রসারক না হইয়া হন্তারক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রমাণ, তাঁহার প্রধান গল্প—'কামধেনু'। নাথুর ফাঁসি হইবে, কারণ সে একজন গোহত্যাকারীকে গলা টিপিয়া খুন করিয়াছিল। "ফাঁসিতে তার দুঃখ নাই। গোহত্যাকারীকে মেরে ফাঁসি যেতে কোনও আক্ষেপ নাই তার। তবে ফাঁসির দড়িটা গরুর আঁতে হলেই তার আর কোন খেদ থাকত না।" নাথু চিত্রকর, জাতিতে পটুয়া, ধর্মে ইসলাম। তাহার ঘরে আসিল গোবৎস, যাহা পরে দেখা গেল প্রকৃতই কামধেনু, অর্থাৎ সন্তানবতী না হইয়াও দুধ দেয়। ইহা কাল্পনিক ব্যাপার নয়, প্রকৃতির খেয়ালে এরূপ যে মাঝেমাঝে ঘটে তাহাও এ গল্পে স্মরণ করাইয়া দেওয়া আছে। সুরভি-র দুধ বিক্রয় করিয়া ও তাহাকে প্রদর্শক-প্রাণী হিসাবে ব্যবহার করিয়া নাথুর সংসারে দুঃখ ঘুচিয়া গেল। তাহার এই সৌভাগ্যের কারণ কেবল মা-সুরভির মাহাত্ম্য নয়, জমিদার গৃহিণীর সু-ব্যবহার ও সদুপদেশ। "রাজার ঘরের মেয়ে—রাজার ঘরের রাণী রাজার মা—রাজবুদ্ধি"—নাথু ভাবিল। "ফিরে বছরে শীতকালে মাঘমাসের পয়লা পৃথিবী উঠল কেঁপে—ভূমিকম্প।" নাথু তার কারণ জানে। "জানবে না কেন? পাপ। পাপে ভরে গেল দুনিয়া। পাপের ভারা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।" নাথুর ঘরবাড়ী, স্ত্রী, ছেলেরা সব বিলুপ্ত হইল ভূমিকম্পে—সুরভি ছাড়া। তার পর-বছর আরো ভয়ংকর বছর। "মাটি জল বাতাস দূরের কথা, নাথুর কামধেনুর দুধ গেল শুকিয়ে। তিনটে গ্রাম ঘুরেও নাথুর ঝুলি অর্ধেকের উপর খালি থাকতে আরম্ভ করল।" সেই বছর নাথুর জীবনে আসিল ফুলমণি—বিশ বছরের যুবতী। তাহার চোখের নেশায় নাথু বিক্রয় করিল তাহার কামধেনু সুরভিকে জমিদার-গৃহিণী মা-ঠাকুরাণীর কাছে, *আড়াই-শো টাকায়। নহিলে ফুলমণিকে উদ্ধার করার টাকা পাওয়া যায় না।* মাঝে মাঝে গিয়া সুরভিকে দেখিয়া আসে। মা-ঠাকুরাণী আপত্তি করেন না। পরে ফুলমনির সহিত ঝগড়ার ফলে সে সুরভিকে বিষ দিয়া মারিল ও তাহার চামড়া মুচিদের নিকট হইতে কিনিয়া রাখিল। "কিনেছিল, তার ইচ্ছা ওই চামড়াখানি নিয়ে ঘর থেকে সে চলে যাবে। ফকির-সন্ন্যাসী হয়ে যাবে।"

তারপর "এলো হেফাজদি পাইকার। চামড়ার কারবার করে। মুচিদের কাছে খবর পেয়ে এলো।" স্থির হইল শুধু মরা চামড়া নয়, জ্যান্ত চামড়া ফুলমণিকেও বিক্রয় করিতে হইবে। "ফুলমণিকে বেচে সেই টাকায় তার চামড়ার ব্যবসা। ফুলমণির জন্য সে মহাপাপ করেছে। সকল পাপের মূল ফুলমণি। কিন্তু তবু ফুলমণির জন্য সে কাঁদে। কতদিন কেঁদেছে। ...টাকা পয়সা অনেক হয়েছিল তার। ধীরে ধীরে সব সে ভুলেও আসছিল।" হঠাৎ ঘটনাটা ঘটিয়া গেল। এক গোহত্যাকারীকে দেখিয়া, তাহার "গরুর ডাক" শুনিয়া সব গোলমাল হইয়া গেল নাথুর। মুহূর্তে পাগল হইয়া গেল সে। ফলে, নাথুর ফাঁসী।

বাংলাদেশের চাষী তাহার গরুকে কি চোখে দেখে, কি ভাবে তাহাকে আত্মীয় করিয়া লয়, তাহার চিত্র আঁকিতে গিয়া তারাশঙ্করবাবুকে কত কাণ্ডই না করিতে হইয়াছে! ইহার সহিত শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'-এর কত না তফাৎ। সাধারণ চাষী গফুর, ও সাধারণ গরু মহেশ। পরিবেশের মধ্যে কোন চমৎকারিত্ব আমদানী করার প্রয়োজন হয় নাই—হিন্দু জমিদার ও মুসলমান চাষী—গরুর প্রতি কাহার কি রকমের টান তাহা স্বল্প কথায় আশ্চর্য স্পষ্টতার সহিত ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর ফুটিয়া উঠিয়াছে জমিদারের সহিত চাষীর সত্য সম্পর্ক। ঝোঁকের মাথায় গফুর বলে, জমিদারের ডাকে কাছারী-বাড়ীতে যাইতে অস্বীকার করিয়া—"মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।"—তাহার এদম্ভ অবশ্য টেকে নাই। মহেশকে সম্বোধন করিয়া তাহার উক্তি—"জমিদার তোর মুখের খাবার কেড়ে নিলে, শ্মশানধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা-বিলি করে দিলে"—জমিদার-প্রথা অবসানের চরম যুক্তি নহে কি? নাথুর মতো গফুরও একদিন মহেশকে হত্যা করিয়াছিল। কিন্তু একই কার্যের পিছনে যে দুইটি বিভিন্ন মনোবৃত্তি, তাহাদের মধ্যে কোন তুলনাই সম্ভব নয়। দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পূর্বে গফুর বলিতেছে—"আল্লা, আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে' খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ ক'রো না।" শরৎচন্দ্রের লেখনীতে বাংলার সমস্ত দরিদ্র, নিপীড়িত চাষী-সমাজ সমস্বরে ফুকারিয়া উঠিয়াছে। সেইজন্যই 'মহেশ' বাংলা কথা-সাহিত্যের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন।

'জাগরী'-প্রণেতা শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী একটি মাত্র উপন্যাসের সামর্থ্যে বাংলার কথা-সাহিত্যে যে সম্মানের আসন অধিকার করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কৃতিত্বের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। 'গণনায়ক' খুব সম্ভব তাঁহার দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। এটি উপন্যাস নহে, পাঁচটি ছোটগল্পের সমষ্টি, কিন্তু এটিকেও উপন্যাস বলিয়া চালানোর চেষ্টা আছে, বোধহয় প্রকাশক একই বলিয়া। বাংলা সাহিত্যিক হইলেও সতীনাথবাবু ঠিক বাঙালী সাহিত্যিক নহেন, তাহা আমরা 'জাগরী' হইতে জানি। তিনি প্রবাসী বাঙালী, বিহারের পুর্ণিয়া অঞ্চল প্রধানত তাঁহার কর্মভূমি। আনন্দের বিষয়, বিহার-প্রবাসী সাধারণ বাঙালীদের মতো তিনি নিজেকে চারিপাশের বিহারী-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন নাই। বিহারবাসীর বিভিন্ন স্তরের সহিত বিশেষ করিয়া তাহার নিম্নমধ্যবিত্ত ও সম্পন্ন চাষী শ্রেণীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কংগ্রেস-আন্দোলনই এই যোগের মূলসূত্র। বিহারে কংগ্রেস ও তাহার গান্ধীবাদী ধারার প্রভাব সকলেরই জানা আছে। সেই ধারার একজন শক্তিশালী বাহক সতীনাথবাবু। কিন্তু সেই ধারাকে তিনি নির্বিচারে গ্রহণ করেন বলিয়া মনে হয় না। কংগ্রেসের ভিতরে থাকিয়াও সমাজতন্ত্রীরা গান্ধীবাদের যে সমালোচনা করিতেন, সতীনাথবাবু তাহার সম্বন্ধে সর্বদাই অবহিত। তাই গান্ধীবাদের আদর্শকে বচনে স্বীকার করিয়া কংগ্রেসী নেতারা যে সকল অনাচারের আচরণ করিতেছে ও প্রশয় দিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে সাভিমান অভিযোগ তাঁহার আছে। এই বিচারশীলতার ফলে তাঁহার দৃষ্টিতে এমন একটি স্বচ্ছতা আসিয়াছে যাহাতে উচ্চতম কংগ্রেস নেতাগণের বক্তৃতার ইন্দ্রজাল আর তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না। 'স্বাধীনতা'র মূল্য হিসাবে দেশবিভাগের ব্যবস্থাকে একটি অনিবার্য দুর্ঘটনা বলিয়া তিনি মানিয়া লইতে পারেন নাই—বিমূঢ় কংগ্রেস-ভক্তের মতো। ইহার পিছনে তিনি দেখিতে পাইয়াছেন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কূট ভেদনীতি, কংগ্রেস ও লীগনেতাদের অসহায় আত্মসমর্পণ, জমিদার ও ব্যবসাদারদের হঠাৎ 'গণনায়ক' সাজিয়া হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর সযত্নে আতঙ্ক ও বিদ্বেষ পরিবেশন ও তাহার সুযোগ লইয়া হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে উভয় সম্প্রদায়ের নিরপরাধ গৃহস্থগণের সর্বস্ব লুণ্ঠন ও উভয় সম্প্রদায়ের জনসাধারণের চরম দুর্দশা। "হেঁজিপেঁজি লাট নয়, খানদানী, রাজার বাড়ীর ছেলে" লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নেতৃত্বে কংগ্রেস ও লীগনেতারা যখন দেশবিভাগের নীতি মানিয়া লইয়া কমিশনের রোয়েদাদের

প্রতীক্ষায় দেশবাসীকে উৎকট উৎকণ্ঠার পাকে সিদ্ধ করিতেছিলেন, তাঁহারই একটি অনবদ্য চিত্র আঁকিয়াছেন সতীনাথবাবু তাঁহার 'গণনায়ক' নামক গল্পে। এরূপ সুলিখিত শিল্পকুশলী গল্প বাংলা সাহিত্যে খুব কম আছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। পূর্ণিয়া জেলার গোপালপুর থানা আর দিনাজপুর জেলার শ্রীপুর থানার মধ্যের সীমারেখা 'নাগর' নদী। তার উপর আছে একটি কাঠের নড়বড়ে পুল। পুলের পশ্চিমেই আরুয়াখোয়ার হাট। বাইরের জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ ষোল মাইল দূরের সুধানী স্টেশন থেকে। চোরাকারবারের কেন্দ্র আরুয়াখোয়ার বাজার হইতে পুল পার হইয়া যায় গোরু মোষ চিনি ঘি; আর বাংলা দেশ হইতে আসে চাল আর ধান। জনসংখ্যা হিন্দু মুসলমানে মিশ্রিত। এই আরুয়াখোয়ার হাটে সুধানী হইতে চিনির চোরাই মাল লইয়া আসিয়া জহুরমল ডোকানিয়ার মুনীম ঘোষণা করিলেন—"আর কি, দিনাজপুর জেলা ত পাকিস্তান হয়ে গেল।"

খবরটা তিনি পাইয়াছেন তাঁর মালিকের বাড়ীতে যে 'বিজলী'তে খবর আনাইবার কল আছে তাহা হইতে। "সেই কলে লাটসাহেব পর্যন্ত ডোকানিয়াজীর সঙ্গে কথা বলেন, কত লোক কত খবর সেখানে দেয়, কত আওরৎ তাঁকে খুশী করার জন্য গানবাজনা শোনায়। কাজেই মুনীমজির কথার গুরুত্ব স্থানীয় লোকদের কাছে অনেকখানি।" মুনীমজির বলিবার ভঙ্গীতে "আত্মপ্রত্যয় ফুটে বেরুচ্ছে; কোন বিশ্ববিশ্রুত দেশনায়ক সাংবাদিকদের বৈঠকে ডেকেছেন যেন। তারপর সাগ্রহ প্রশ্ন আসে,—আর আমাদের আরুয়াখোয়া ?"

"আরুয়াখোয়া ত পূর্ণিয়া জেলা। হিন্দুস্থানে। এ তো আর বাংলামুলুক নয়। এখানে আর কারো টু ফ্যাঁ চলবে না।"

স্থানীয় ইজরাদার মুসলমান। তিনি সকলকে বুঝাইতেছেন—"আরে মিয়া লাটসাহেবের কথাও বদলায়—ঠেলায় ফেলতে পারলে। আমি আজ রাতেই যাচ্ছি সদরে। পাঁচ-শো টাকা চাঁদা নিয়ে গেল জেলা পাকিস্তান কনফারেন্সে—সদর-সাহেব কত রকমের কথা বললেন। আর চলে গেলেই হ'ল এ জেলা হিন্দুস্থানে। কেবল কতকগুলো অনর্থক টাকা খরচ হবে এই যা।"

খানিক পরেই মুনীমজী ও ইজারাদারে সাক্ষাৎকার। চোরাকারবারী চিনির উপর দর কষাকষি। স্বীয় সম্প্রদায়ের গৃহস্থের অভিভাবক হিসাবে দুজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিল কে কত ধানচাল কম দামে কিনিয়া লইতে পারে। রিলিফের টাকা তাঁহাদের হেফাজতেই থাকে ও তাঁহাদের হাত দিয়াই খরচ হয়।

"পনরই আগষ্ট, হিন্দুস্থান আজাদ হবে—মুনীমজী সব দোকানদারদের খবর দেন।

আর পাকিস্তান ?

হ্যাঁ, পাকিস্তানকেও আজাদী দিতে হবে ঐ দিন। সমবেত শত শত লোক প্রশ্ন করতে চায়—ওটা কি আর কিছুতেই আটকানো যায় না ? যেন এই নীরব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে বাধ্য হয়ে মুনীমজী বলেন 'এই নিয়েই খুশী হ'স তো নে।' মুসলমানদের প্রতি একটা দমকা উদারতার ঝাপটায় —'দিন কয়েক পরেই ঠেলা বুঝবি'—কথা কয়টা জিভে আটকে যায়।…এপারে হিন্দুস্থান ওপারে পাকিস্তান। পুলের ওপারে রেলিংয়ের ওপর লাগানো হয়েছে সবুজের ওপর চাঁদ তারা দেওয়া লীগের ঝাণ্ডা, পুলের এদিকে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসী তিন রঙা পতাকা। ওদিকে একদল চীৎকার করে, লে লিয়া হ্যায় পাকিস্তান, বাঁট গেয়া হ্যায় হিন্দুস্থান; এদিকের দল চেঁচায়, বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ্।

ভয় হয় পুল পুড়বে। এপারের লোকেদের মুনীমজী ঠান্ডা করে ওপারের লোকেদের করে ইজারাদার সাহেব—পুল গেলে হাট থাকবে কোথায়।

মুনীমজীর মধ্যস্থতায় দুদিককার লোকেদের মধ্যে প্যাক্ট হয় কোন পক্ষই কারও সম্বন্ধে 'মুর্দাবাদ' বলতে পারবে না।—আর পাকিস্তানের নতুন ঝাণ্ডা নতুন ফ্ল্যাগের খবর রাখো না বুঝি ? দরকার থাকে তো আমাকে বলো যত লাগে। সব রকম দামের আছে।

এপারের লোকেদেরও মুনীমজী হিন্দুস্থানের নতুন ঝাণ্ডার কথা বলেন।

সে এখন কোথায় পাওয়া যাবে ?

সে কি আর আমি ব্যবস্থা করিনি ? সব রকমের পাবে।

সাধে আর লোকে 'মুনীমজী' 'মুনীমজী' করে অস্থির হয়। যখন যেখানে যে জিনিষটার দরকার, মুনীমজীর তা নখদর্পণে।…দুদিনের মধ্যে সব ঝাণ্ডা চড়া দামে বিক্রি হয়ে গেছে। স্বজাতীয় লোকের ভয়ে ইজারাদার কোথায় যেন গিয়েছে—তার সেপাই বলে পাটনায়।

শরণার্থীর দল ছাড়া আর সকলে বোধহয় যখন কমিশনের কথা ভুলেছে তখন হঠাৎ মুনীমজী খবর দেন, কমিশনের রায় বেরিয়েছে। শ্রীপুর এসেছে হিন্দুস্থানে।

হরিপুর থানা পড়েছে পাকিস্তানে।

জলপাইগুড়ি জেলার তিতলিয়া থানা চলে গিয়েছে পাকিস্তানে।

বললেই হোল ? চলে গেলেই হোল আর কি ?

শরণার্থীদের ক্যাম্প ভেঙে যায়।

মুনীমজী ওপারের সকল লোককে বলেন যে 'সকলে পাকিস্তান ফ্ল্যাগ আর রেখো না। আমার কাছে দিয়ে দিও। আমি গভর্ণমেণ্টের কাছে জমা করে দেবো। হিন্দুস্থানে পাকিস্তান ফ্ল্যাগ রাখা বারণ।'

তাঁরই দেওয়া পাকিস্তান-নিশানগুলি আবার তাঁর কাছেই ফিরে আসে।

তিনি মনে মনে ভাবেন—এগুলি নিয়ে কাল যেতে হবে তিতলিয়ার দিকে। তাঁর জমিটমি গুলো একবার দেখে আসবেন, সেখানে বেচতে হবে এই ঝাণ্ডা-গুলো। আর সেখানে যোগাড় করতে হবে সেখানকার অপ্রয়োজনীয় হিন্দুস্থান পতাকাগুলি। একই জিনিস দু দুবার করে বেচবেন। তিনি হিসেব করেন সব মিলিয়ে তাঁর কত হলো। 'কমিশন' অনেককে অনেক কিছু দিয়েছে, আবার অনেক কিছু নিয়েছে। কিন্তু এই কমিশনের রায়ের কমিশন বাবদ তাঁর প্রাপ্য তিনি পেয়ে গেছেন। হিসাবে কোথাও ভুল হয় নি।

ক্যাম্পের বাইরে থেকে ভেসে আসছে 'মুনীম সাহেব কি জয়।'

মুনীমজী কুঠিয়ালী ভাষায় পকেট-বুকে হিসাব লিখতে বসেন।"

এই সংক্ষিপ্তসারে গল্পটির সকল দিক দেখানো সম্ভব হয় নাই। তবু সতীনাথবাবুর দৃষ্টিভঙ্গী যে সত্যনিষ্ঠ, তাহাতে বোধহয় আর সন্দেহ থাকে না। একটি মাত্র আফশোষের কথা এই-যে, সতীনাথবাবু তাঁহার গল্পের প্রধান চরিত্র করিয়াছেন একজন মুনীম অর্থাৎ গোমস্তাকে। তাহার কর্মক্ষেত্রের পরিসর অত্যন্ত স্বল্প। এইরূপ শত সহস্র মুনীম-ইজারাদারকে সম্মুখে রাখিয়া কয়েকজন মুষ্টিমেয় হিন্দু মুসলমান রাঘব-বোয়াল স্বজাতির সর্বনাশের মূল্যে আপনাদের অনির্বাণ লোভাগ্নির সমিধ সংগ্রহ করিতেছে ; তাহার ইতিহাস এই দেশ-বিভাগের কাহিনীতে সুগুপ্ত রহিয়া গেল। আশা করা যায়, সতীনাথবাবুর শক্তিমান সত্যনিষ্ঠ লেখনী একদিন ইহাকে লইয়া এমন উপন্যাস রচনা করিবে যাহার উজ্জ্বলতা 'জাগরী'-কেও ম্লান করিয়া দিবে।

কিন্তু এ আশার পথে আশংকাও আছে অনেক। গণনায়কের অন্য গল্প-গুলিতে দেখা যায় বিহারী মধ্যবিত্ত সমাজের পশ্চাৎবর্তী অংশের সামাজিক সমস্যাই তাঁহাকে ব্যাপৃত রাখিয়াছে বেশী। যেমন 'বন্যা' বা 'ভূত'। এমন কি 'পংক্তিলকে' ইংকা-রাজ্যের রোমাণ্টিক কাহিনী যাহা মেক্সিকোর প্রাচীন ইতিহাসে গৃহীত, তাহারও মূল উৎস—ফিউডালতন্ত্র-শাসিত প্রাচীনপন্থী

সমাজে নরনারীর পরস্পরের প্রতি ব্যক্তিগত প্রেমের আবির্ভাবের সংঘর্ষ, উন্নততর ধনবাদ সমাজে যে আবির্ভাব স্বতঃসিদ্ধের মতোই সমাজে গৃহীত। কিন্তু শঙ্কিত হইতে হয় 'আণ্টা-বাংলা' পড়িয়া। আণ্টাবাংলা—অর্থাৎ প্ল্যাণ্টারদের ক্লাব। তরাই-অঞ্চলে নীলকর সাহেবদের প্রতিষ্ঠিত একটি ইয়োরোপিয়ান ক্লাব-এর ইতিবৃত্ত। আর ইতিবৃত্ত সেই সব ওরাওঁ আধিয়ার-দারদের যাহারা পুরুষানুক্রমে এই নীলকর সাহেবদের সেবা করিয়া অহেতুক অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছে। কত নীরব আর্তির বিচ্ছিন্ন কাহিনী, কত জলুসের নাগরদোলার আবর্ত মিলাইয়া আণ্টাবাংলার ইতিহাস। তরাইয়ের ভিজা মাটির কালা আদমীরা সবই সহ্য করিয়াছিল। কিন্তু প্রতিবাদ জানাইল কালো কয়লা—তাও এখানে নয়, জার্মানীর। নকল নীলের উদ্ভাবনে নীলকর-রাজত্বে যবনিকা পড়িয়া গেল। তা সত্ত্বেও আণ্টাবাংলার দীপ্তি তখনই ম্লান হইল না। নীলের চাষ গিয়াছে, জমি তো যায় নাই। নীলকরেরা রাতা-রাতি পাইতে চাহে বনেদী জমিদারের আভিজাত্য। চির নবীন আণ্টাবাংলার ক্লাবে জমিয়া উঠিয়াছে অহোরাত্র উৎসব।

এই অন্তহীন আনন্দ-উচ্ছ্বলতার দিনেই বোটরা ফূর্তি করিয়াছে প্রচুর। ক্লাবের উর্দিপরা লোকের আবার ফূর্তির অভাব। রংবেরং-এর বিলাতী মদ যত পার খাও। বোটরার মনে পড়িয়া যায় যে প্রতিবারের মতো এবারেও ফাদার টুডু ঠাকুর্দার মৃত্যু-তারিখে একরাশ বোগনভিলির ফুল কবরের উপর রাখিয়াছিলেন। পাথরের উপর লেখাটা পড়িয়া বলিয়াছিলেন অন্য বারের মতো, "একজন সত্যিকারের ক্রীশ্চয়ান ছিল বিরসা। তার নাতি তুমি। আজ থেকে প্রতিজ্ঞা করো মদ ছেড়ে দেবে।" সে প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু আণ্টাবাংলায় নিজেকে ঠিক রাখিতে পারে না।

এই পাদ্রী-সাহেব ফাদার টুডুর নিকট 'রবিবারে কাজ করিতে নাই' শিখিয়া কাজে হাজির না থাকায় বিরসা ওরাওঁকে প্রাণ দিতে হয় আণ্টাবাংলার সেক্রেটারি বেঞ্জামিন সাহেবের অত্যাচারে। বোটরা তাহার বাবাকে দেখে নাই। বোটরা যেবার হয় সেইবারই তাহার বাবা সেই যে বেলী সাহেবের আসামের চা-বাগানে চলিয়া যায় আর ফেরে নাই। মা'র সহিত তাহার আর দেখা হয় না বলিলেই হয়। দুই একদিন দেখা হইলে তাহার মাথায় তেল এবং পরনে রঙীন শাড়ী দেখিয়াই বুঝিতে পারে যে সে বেশ সুখেই আছে।

বেশ চলিয়া আসিতেছিল। হঠাৎ বোটরা আবিষ্কার করে যে আণ্টাবাংলার

নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ-দীপালী ম্লান হইয়া আসিতেছে। বেঞ্জামিন ছাড়িবার পর ক্লাবের সেক্রেটারীর পদের জন্য লোক পাওয়া যায় না, প্রত্যহ টেনিস খেলিবার লোক হয় না। আণ্টাবাংলার বার-রুম উঠিয়া গেল, খরচে পোষায় না। বোটরার থাকিবার স্থান হইল সেই ঘরে। সে একাই হইল দারোয়ান, মার্কার, আরদালী, চাঁদা সংগ্রাহক। শতচ্ছিন্ন উর্দির উপর ইংরাজীতে 'প্ল্যাটার্স ক্লাব' পিতলের তকমাটি সে সর্বদা ঝকঝকে পরিষ্কার করিয়া রাখে, বাঙালী-বাবুদের কসমোপোলিটান ক্লাবের রামলালের কাছে ছোট না হইবার উদ্দেশ্যে। ঐ ক্লাবের কেরানীবাবু ফুসলানি দেন, তাহাকে আণ্টাবাংলা ছাড়িয়া সেখানে কাজ লইবার জন্য। কিন্তু এক দুর্নিবার আকর্ষণ তাহাকে টানিয়া রাখে এই ক্লাবে। পুরাতন বার-রুম যেন স্বর্গরাজ্য হইতেও মনোরম।

স্বাভাবিক মৃত্যুর হাত হইতে 'ক্লাব'-কে বাঁচাইয়া দিল ১৯৩৪-এর ভূমিকম্প। নীলকুঠির যুগের কঙ্কালের মতো আণ্টাবাংলার দেওয়ালের অবশেষ দাঁড়াইয়া থাকে। তবুও বোটরা কসমোপোলিটান ক্লাবে চাকরি করিবে না। সে হইল জসলীন সাহেবের মোটরের ক্লীনার। কাঁদিয়া কাটিয়া আণ্টাবাংলার কমপাউণ্ডে থাকিবার অনুমতি করাইয়া লয়।

দুইবছরের মধ্যে বোটরা সাহেবের মোটর চালাইতে আরম্ভ করে। সুবিধা পাইলেই পঞ্চাশ ষাট সত্তর—মোটরের গতি বাড়াইয়া দেয়।

মোটর চালাইবার সময় যেরূপ নিকটের জিনিষগুলি পিছনে ছুটিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, অথচ দূরে দিগন্তের স্থির দৃশ্য চোখের সম্মুখে অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়, বোটরার মনও সেইরূপ সুদূর স্মৃতির অপরিবর্তিত রসের মধ্যে ডুবিয়া থাকে; আজকালকার কথা তাহার মনে সাড়া জাগায় না। বর্তমান পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কেবলমাত্র আণ্টাবাংলার ভাঙা দেওয়ালগুলি দেখিলে তাহার মনের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠে।

যুদ্ধ লাগিবার পরের কথা। জসলীন সাহেবই তাকে সেণ্ট্রাল পি-ডবলু-ডি-তে ট্রাক-চালানোর কাজ জোটাইয়া দিল। তবুও বোটরা আণ্টাবাংলা ছাড়িতে রাজী নয়। জসলীন বলিল—আমি বলে দেব যত বেশী দিন সম্ভব এখানেই রাখবে।

ক্রমে সময় আসিল, আণ্টাবাংলার হাতা ছাড়িয়া তাহাকে যাইতেই হইবে। নহিলে চাকরি ছাড়িতে হয়। কিন্তু তাহার পর? আণ্টাবাংলা গিয়াছে, জসলীন সাহেব গিয়াছে, বয়স হইয়াছে, হাত পা কাঁপে। এখন রোজগার

না করিলে দাঁড়াইবে কোথায়। কস্‌মপলিটন ক্লাবে? মরিয়া গেলেও নয়।

মরিল সে আণ্টাবাংলাতেই আট-টনি মোটর রোলার চালাইতে চালাইতে তাহার ঠাকুর্দা বিরসা ওঁরাওএর মৃত্যুদিনে। সেদিন সে একটুও নেশা করে নাই, তবুও স্বপ্ন দেখিতেছিল—ঘোড়ায় চড়া বেলী সাহেব, চশমাপরা ফাদার টুডু, ঠাকুর্দা বিরসা, ছোট বেঞ্জামিন, মার্কার সাহেব, কেরানীবাবু, আণ্টাবাংলার ভাঙা দেওয়াল, বোগনভিলির গুচ্ছ, অজস্র স্মৃতির প্রেতাত্মা তাহার স্টিয়ারিং হুইলের ভিতর দিয়া ঘূর্ণিবাত্যার মতো চলিয়া যাইতেছে। আট-টনি রোলার মড়মড় করিয়া ইঁটের বর্ডার চূর্ণ করিয়া সজোরে পথের ধারে পাকুড় গাছটিতে ধাক্কা দেয়। বোটরার স্পন্দহীন দেহ ছিটাইয়া পথের পরে পড়ে।

নূতন উষার সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া সতীনাথবাবু অতীতের দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন আণ্টাবাংলার যুগের স্মৃতির অবশেষ। কিন্তু ইহাতে তিনি নীলকরদের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত জনগণের কোন প্রতিবাদের বা প্রতিরোধের আভাস দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, বিরসা হইতে বোটরা পর্যন্ত তিন পুরুষের প্রভুভক্তি, কুকুরের মতো, যে কুকুর অকারণে প্রভু কর্তৃক বেত্রাহত হইয়াও বেতটি মুখে করিয়া প্রভুর হাতে পেঁছাইয়া দেয়। আর দেখিলেন শুধু নৈসর্গিক ও সাময়িক কারণে আণ্টাবাংলার অবসান। প্রশ্ন জাগে, আণ্টাবাংলা যাহার প্রতীক সেই শক্তিমান ধনিকবর্গের দ্বারা নিঃস্বশ্রেণীর অর্থনৈতিক শোষণ, তাহা কি এইরূপ স্বাভাবিক ভাবেই মৃত্যুর পথে চলিবে? তাহার জন্য কি অপরিহার্য নয় দুর্বার শ্রেণীসংগ্রাম, নিষ্করুণ আততায়িত্ব, শোষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিরাট গণ-অভ্যুত্থান, কেবল যাহারই পরিণামে রচিত হইতে পারে শ্রেণীহীন সমাজ ও শান্তিময় পৃথিবী?

চৌদ্দটি গল্পের সমষ্টি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **"ছোট বড়"**-তে বড় গল্প নাই বলিলেই হয়; প্রত্যেকটি গল্প আকারে ছোট, এমন একটি গল্পও নাই যাহা চৌদ্দ-পনের পৃষ্ঠার বেশী। সুতরাং গল্পগুলিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ কাহিনী গড়িয়া ওঠার চেয়ে নক্সা আঁকার ভাবই থাকিয়া গিয়াছে। তাই ইহার অনেক গল্প মনের উপর কোন গভীর ছাপ রাখিয়া যায় না। ইহা সত্ত্বেও মানিকবাবুর কল্পনার বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিবার মতো। শহর ও পল্লীগ্রামের নিম্ন মধ্যবিত্ত ও চাষী-জীবনের অনেক অবহেলিত দিক তাঁহার সন্ধানী দৃষ্টিপাতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার পক্ষে ইহাতে নূতনত্ব

কিছু নাই। এ ক্ষমতা তিনি অনেক দিন হইতেই দেখাইতেছেন। যাহাতে বিস্মিত হইতে হয় তাহা হইতেছে তাঁহার বিবর্তন-বোধ ও শ্রেণী-চেতনা। যুদ্ধান্তপর্বের প্রখর শ্রেণী-সংঘর্ষের প্রভাবে বাংলার মধ্যবিত্ত ও কৃষক-সমাজে যে প্রবল আলোড়ন চলিয়াছে, তিনি সুনিপুণভাবে তাহার ধারা অনুধাবন করিতেছেন, ইহার প্রচুর নিদর্শন মেলে তাঁহার গল্পগুলিতে। দুঃখের বিষয় তাঁহার দৃষ্টির পরিধি মধ্যবিত্ত ও কৃষক সমাজেই নিবদ্ধ; এই পর্বে যে সামাজিক শক্তি সবচেয়ে সক্রিয়, শ্রমিক-শ্রেণীর সংঘবদ্ধতা, তাহার সম্বন্ধে কোন উল্লেখ তাঁহার এই গল্প-সমষ্টিতে নাই। কিন্তু দাঙ্গা, দেশবিভাগ, সামাজিক দুর্নীতি ও আর্থিক দুরবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার বোধশক্তি প্রচলিত নেতৃপূজার কুয়াশায় আচ্ছন্ন নয়। কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা নেতাদের মতে ছিল অনিবার্য; ইহার মধ্যেও মানিকবাবুর চোখে পড়ে হিন্দু-মুসলমান পরিবারে মৈত্রীর সম্ভাবনা ('ছেলেমানুষি')। নেতারা বলেন, দেশবিভাগ দেশের লোকেরই কল্যাণার্থে; তিনি দেখেন, ইহার ফলে ঘরে-ঘরে আত্মীয়-বিরোধ ও স্বজন-বিচ্ছেদ ('স্থানে ও স্তানে')। নেতারা ভরসা দিতেছেন, নূতন ব্যবস্থার ফলে দেশের লোকের জীবনযাত্রা শীঘ্রই উন্নত হইবে; তিনি দেখিতেছেন, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ মাথার কাজের মোহ ছাড়িয়া হাতের কাজের পথে নামিয়া শ্রমিক শ্রেণীর গোষ্ঠীভুক্ত হইতেছে—('চালক')। নেতারা বলিয়া বেড়াইতেছেন, দেশের সকল লোকেই দুর্নীতিপূর্ণ হওয়ায় তাঁহারা কিছু করিতে পারিতেছেন না; মানিকবাবু দেখাইতেছেন, চাষীদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য এখনও বর্তমান; তাহারই ক্ষুধার অন্ন লইয়া বেসাতির বিরুদ্ধে লড়াই করিতেছে ('ধান'); ক্ষেতের লড়াইয়ের মধ্য দিয়া নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্র উন্নত করিতেছে ('সাথী'); অনাচার ও নীচতার বিরুদ্ধে তাহাদের প্রতিবাদ ঘনীভূত করিতেছে ('দীঘি' ও 'পেরানডা')। বিরাট তেভাগা সংগ্রাম মানিকবাবুর শিল্পীচিত্তকে উদ্বোধিত করিয়াছে, তাহার প্রমাণ—'হারাণের নাতজামাই।' জমিদার ও পুলিশের সংযুক্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে এক কৃষকরমণী তাহাদের রাজনৈতিক নেতাকে বাঁচাইবার জন্য আপন কন্যাকে দিয়া জামাই বলিয়া স্বীকার করাইয়া লইল; ইহা লইয়া আসল জামাইয়ের অভিযোগ ও তাহার উত্তরে কৃষক রমণীর বিচক্ষণতা; শেষে পুলিশ তাহার স্ত্রীকে অপমান করিতেছে দেখিয়া জামাইও পুলিশের বিরুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িল—এই খণ্ডচিত্রকে অবলম্বন করিয়া মানিকবাবু তেভাগা-সংগ্রামের মর্মকথা উদ্ঘাটিত করার চেষ্টা

করিয়াছেন। বাংলাদেশের চাষী ও ক্ষেতমজুর-সমাজের বর্তমান মনোবৃত্তি যাঁহারা বুঝিতে চাহেন, তাঁদের পক্ষে এ গল্পটি পড়া অবশ্য কর্তব্য। এমন সুগঠিত গল্প কদাচিৎ পড়িতে পাওয়া যায়। অবশ্য ইহাতেও কিছু কিছু দুর্বলতা আছে। এরূপ গল্পে বৃদ্ধ হারাণের চরিত্রের অবতারণা মনে হয় অনাবশ্যক। মনে হয় তেভাগা সম্বন্ধে মানিকবাবুর দরদ যতটা আছে অভিজ্ঞতা ততটা নাই। তাই অনাবশ্যক কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয় মাঝে মাঝে।

কিন্তু দরদ ও অভিজ্ঞতার অপূর্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে তাঁহার 'গায়েন' নামক গল্পটিতে নিজের ব্যক্তিগত বিশেষত্বকে খর্ব না করিয়াও মানিকবাবু জনপ্রিয় সাহিত্যিক। তাই কবির সহিত শ্রোতার সম্বন্ধ, কবির কাজ কি কেবল আত্মপ্রকাশ না অপরের চিত্তবিনোদন, আত্মপ্রকাশের মূলেই বা থাকে কোন সামাজিক নিরূপণ, রুচিগত বিবর্তন হয় কোন সামাজিক বিধানে, কবির উপর শ্রোতার দাবী কি ধরনের, কেমন করিয়া সে দাবীর বদল হয় সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, পুরাতন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যের সহিত নূতন চেতনার নবোদ্‌গত সাহিত্যের সম্বন্ধ কি বিরোধের না সমন্বয়ের,—এই ধরনের অনেক জটিল প্রশ্ন নিহিত আছে তাঁহার এই গ্রাম্য জীবনের বাহ্যতঃ সরল কাহিনীটিতে—

"রাজেন দাস গ্রাম্য গায়েন। গান গেয়ে ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষকে এতকাল কাঁদিয়ে আসছে যে লোকটা তাকে দেখলে মনে হয় পাকা টুলটুলে খুশির ফলটি ফেটে গেছে হঠাৎ, এখন থেকে পৃথিবীতে আর আনন্দের অভাব হবে না। ···তবুও দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছে। তার তিনকুড়ি বয়েস হয়ে এলো, সে এখন শ্রোতার হৃদয়ের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলেছে। রাজেন দাসের গানে সাড়া দিচ্ছে না মানুষ, কি ভয়ানক কথা এটা! জগৎ যেন স্তব্ধ হয়ে ভাবে এটা কি ব্যাপার, অরণ্য নাকি খুঁজে পাচ্ছে না বাতাস, সাড়া তুলতে পারছে না মর্মরধ্বনির?"···

"রাজেন টের পায়। জনতা তার চিরদিনের প্রেয়সী, কাঁধে ঘুরিয়ে উড়ুনি কোমরে বেঁধে কোঁচা ঝুলিয়ে বরবেশে সবার মধ্যে দাঁড়ালেই সে বক্ষলগ্না প্রিয়ার মতো অনুভব করে সমাবেশের হৃৎস্পন্দ, শুনতে পায় মনোরঞ্জনের ফরমাস, জানতে পারে হাসি কান্নার আবেগ, আবেশ, বিহ্বলতার গভীরতা। কবে গায়নে শুধু একঘেয়ে পচা নোংরামির রস পরিবেশন বন্ধ করেছিল গুরুর

সঙ্গে বিদ্রোহ করে, গাইতে সুরু করেছিল পুরাণ-কথা নিজের মতো লিখে নিয়ে, মাঝে মাঝে তারই মধ্যে স্বদেশিয়ানার বুকনি ঢুকিয়ে দিতে দিতে, কবে পুরাণকথা ছেড়ে চলে এসেছিল দেশের কথায়, সব তার স্মৃতিতে জড়িয়ে গেছে। পুলিশ ধরে জেলে দিয়েছে, জরিমানা করেছে।···

"কবি-জীবন তার সার্থক হয়েছে এই বুড়ো বয়সে, ধন্য হয়েছে চরমরূপে, বন্যা আর দুর্ভিক্ষের গায়ন করে। সাড়া পড়ে গিয়েছিল চারিদিকে। বড় সে ছিল, সেরা সে ছিল কবির মধ্যে—একমাত্র অদ্বিতীয় কবি বলে তারপর লোকে মেনে নিল তাকে।···

"এমনি রাজেন দাসের প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হয়েছে একজন। হরিখালির নরহরি। শিষ্য সে হলেও হতে পারত রাজেন দাসের। সবে সে প্রৌঢ় বয়সে পা দিয়েছে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক ভাবে শিষ্য সে নয়। রাজেনের শিষ্যেরা বলে, সে গায় বেশ, তা রসকস নেই, শুধু ওই এক কথা, যে মরে সে মরে, তার পাত্তা মেলে না, চুপচুপ মরা পাপ! ম'রো না মারো, যে মারতে চায় তোমায় তুমি তাকে মারো।···

"অসন্তুষ্ট রাজেন বলে—গোঁয়ার গোবিন্দ, গায়নের বোঝে ছাই। এতো বাবু বক্তিমে নয়। হৈ হৈ রৈ রৈ করে গাল গলা ফুলিয়ে চেঁচিয়ে গেলেই হল। এ রসের ব্যাপার।···

"তবু ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে বুকটা। মনে মনে সে ভালো করেই জানে, দশজনে যা চায় তাই আসল, আর সব মিছে।···

"কদমপুরের আসরে রাজেন গায় দুর্ভিক্ষের গান। প্রথমে জমজমাট হয়ে উঠেছিল অসহায় মানুষের নিরুপায় মরণের সকরুণ ভূমিকা আর মানুষরূপী দানবের খেলার ছলে সেই মারণযজ্ঞ আরম্ভের বর্ণনা। সুরে ও কথার বাঁধুনিতে আরও মুগ্ধ করেছিল সমবেত হৃদয়মন, সভা গমগম করেছিল ঔৎসুক্যে, নড়ে চড়ে ভালো করে জেঁকে বসেছিল সবাই।—

"কিন্তু কেমন যেন ওলোট পালোট হয়ে যায় হিসাব নিকাশ, ধীরে ধীরে বিগড়ে যেতে থাকে সভার মতিগতি। আধবুড়ো একজন উঠে দাঁড়ায় হঠাৎ, মুখে তার খোঁচা খোঁচা গোঁফ দাড়ি, বিস্ফারিত চোখ, সর্বাঙ্গ থর থর করে কাঁপছে। তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তকণ্ঠে সে বলে, রাজেন দাস! বলি ও রাজেনদাস! তাতো বুঝলাম, সর্বনাশ তো হচ্ছে, কি করি তার উপায় বলো, বাঁচি কিসে তা বাৎলে দাও।···

"আসর আর তেমন জমে না। যে জমাবে আসর প্রাণের ছোঁয়াচ দিয়ে তার প্রাণেই উদ্বেগের আলোড়ন।···

"মেয়ে আমোদ সান্ত্বনা দিয়ে বলে—নতুন গান বাঁধো!

"দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওঠে রাজেন, নতুন গান বাঁধো! নতুন গান বাঁধো! এ তোর ভাত বেগুন রাঁধা কি না, রাঁধলেই হল। ভেতর থেকে গান না এলে বাঁধব কি?

"হঠাৎ একদিন নরহরির আসরে আচমকা রাজেনের আবির্ভাব সত্যই অঘটন, চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। কর্তাব্যক্তি একজন এগিয়ে এসে আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে সম্মানের স্থানে বসিয়ে দেয়।··'

নরহরি রাজেনেরই শিষ্য—একলব্য যেমন দ্রোণের, সুকান্ত যেমন রবীন্দ্রনাথের। গানের সুরুতে নরহরি প্রণাম জানায় ছড়ায়—

হাতে ধরে গান শেখালে
গুরু তুমি বাপ,
গুরু-মারা বিদ্যে দেখে
দিও না অভিশাপ,
দুটি পায়ে প্রণাম জানাই,
যে গুরু সে বাপ।

"নরহরি প্রথমে আরম্ভ করে দুর্দিন ঘনিয়ে আসার গান—মনে মনে রাজেন বলে, চোর, গুরুমারা বিদ্যেই শিখেছ বটে তুমি। কিন্তু দুঃখের দিনের ছবি ভয়াবহ হয়ে উঠতে না উঠতে পাশ কাটিয়ে নরহরি গায়—'কোমর বাঁধো ভাই!'

একটু থতমত খেয়ে ভুরু কুঁচকে চেয়ে থাকে রাজেন। তারপর নরহরির ঝাঁঝালো পদগুলি চোখে জল আনে না, তপ্ত হয়ে ওঠে নিশ্বাস। হাতগুলি যেন এগিয়ে যেতে চায় নরহরির ডাকেই সায় দিয়ে শিশু-খেকো মেয়ে-খেকো মানুষ-খেকো রাক্ষসগুলির টুঁটি ধরে টেনে এনে ফাঁসিতে লটকে দিতে। বারংবার উম্মাদনা ফেটে পড়ে সভায়।···

রাজেন তাকে জড়িয়ে ধরে বুকে। বলে, নরহরি তুই মোর গুরু! তোকে প্রণাম করি। নরহরি বলে—ওরে বাপরে, অপরাধ হবে, পা ছুঁয়োনা বাপ; মরে যাব!

—তবে বল মোর মেয়াকে লিবি? তোকে ছাড়া আর কারো হাতে মেয়া দেব না।

দু আঙুল কানে ঢুকিয়ে নরহরি বলে, বোলো না বাপ, শুনতে নাই, তোমার মেয়া আমার বুন !"

'গায়েন' গল্পটিতে মানিকবাবু সাহিত্যিক উপলব্ধির যে স্তরে পৌঁছিয়াছেন, আশা করা যায় তাঁহার শিল্পরচনা তাহার অনুবর্তী হইয়া তাঁহাকে অবিরত নূতন নূতন পথের অগ্রগামী করিয়া রাখিবে।

তারাশঙ্কর, সতীনাথ, মানিক—বাঙালী পাঠককে বলিয়া দিতে হয় না যে গল্প বলিতে বসিয়া ঘটনার সংস্থানে, চরিত্রের সংঘাতে, সংলাপের বৈশিষ্ট্যে, স্থান-কাল-পাত্রের যথাযথ সংযোজনায়, হাস্য-পরিহাসের যথোচিত পরিবেশনে ইঁহারা গল্পকে গল্প করিয়া তুলিতে পারেন। প্রায় একই পর্বে একই আবহে রচিত এই গল্প-গ্রন্থ তিনটিতে তাঁহাদের স্বকীয়তা লিপিবন্ধ হইয়া রহিল। বাংলা সাহিত্যের ও সমাজের ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক ইহাতে দেখিতে পাইবেন কেমন করিয়া এই পর্বে বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজ ত্রিধাবিভক্ত হইয়া, এক অংশ বর্তমানের পাশ কাটাইয়া পশ্চাৎমুখী, অপর অংশ বর্তমানকে সহ্য করিয়াও বিচারশীল ও তৃতীয় অংশ বর্তমানের প্রতিবাদে ভবিষ্যতের আবাহনে কর্ম-প্রবণ। এই তিনজন লেখককে তিনটি বিভিন্ন ধারার রূপকার বলিয়া চিনিয়া লইতে সহায়তা করিবে—ইহাই এইটি তিনটি গল্প-সংকলনের বিশেষ সার্থকতা।

JUST LOVE

Wanda Wassilewska. (Hutchinson)

রাজনৈতিক কর্ম্মী শ্রীমতী ভাসিলিয়েভস্কা-র লেখিকারূপে আবির্ভাব সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদের মাধ্যমে এদেশে আমরা তাঁহার রচিত মাত্র কয়েকটি ছোট গল্প ও একটি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের সহিত পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বিতীয় পর্বে হিটলারের অপ্রত্যাশিত সোভিয়েট আক্রমণে তথাকার জনমণ্ডলীতে, আবালবৃদ্ধ-বনিতার মানসে যে বীরত্বপূর্ণ দেশপ্রেমের উৎসারণ হয় তাহারই অপূর্ব শৈল্পিক প্রকাশ তাঁহার রচনায়। অসাবধানে পড়িলে মনে হইতে পারে তাঁহার রচনার উদ্দেশ্য সাময়িকভাবে জার্মান শত্রুর বিপক্ষে রুশ জনগণকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করা। এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভিত্তিহীন। পঁচিশ বৎসর ধরিয়া রুশ বিপ্লবের সফল প্রগতির ফলে পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশে যে নূতন মানব-সমাজের পত্তন হইয়াছে ও তাহার প্রভাবে মানব-চরিত্রের যে নবতর বিকাশ ঘটিয়াছে, তাহাই রূপ-পরিগ্রহ করিয়াছে এই লেখিকার গল্পে ও উপন্যাসে। বীরত্বের কাহিনীর অভাব বুর্জোয়া সাহিত্যে নাই। বহু বীর্য্যবান্ চরিত্রের সৃষ্টিতে বুর্জোয়া সাহিত্য সমৃদ্ধ। তাহাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে সমাজের প্রতিক্রিয়াশীল

ভাবধারা ও পরিস্থিতির বিরুদ্ধে আদর্শনিষ্ঠ মুক্তিকামী বীরের সংঘর্ষ, সংগ্রাম ও পরিশেষে ব্যর্থ পর্যবসান। ব্যর্থতার ভিতর দিয়াই মহৎ ব্যক্তিস্বরূপের প্রকৃষ্ট প্রকাশ। মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের মূল মাপকাঠিতেই মাপিতে পারা যায় মানুষের মর্মগত অপরিমেয় শৌর্যসম্পদ।

কিন্তু "মানুষের স্বভাব বদলায় না"—এ উক্তি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে একান্ত অশ্রদ্ধেয়। সামাজিক মূল্যজ্ঞান যুগে যুগে পরিবর্তনশীল, ও শেষ বিশ্লেষণে দেখা যায় তাহা নির্ভর করে সমাজগঠনের আর্থিক বনিয়াদে। ফিউডাল সমাজের মনোবৃত্তি বুর্জোয়া সমাজের মনোবৃত্তি হইতে মূলতঃ পৃথক। যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও জাতিগত দেশপ্রেম বুর্জোয়া সমাজের ও রোমান্টিক সাহিত্যের মূলমন্ত্র ফিউডাল সমাজে ও সাহিত্যে তাহা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

কিন্তু বুর্জোয়া সমাজেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ও দেশপ্রেমের সর্বাঙ্গীন উৎঘাটন সম্ভব নয়। কারণ সেথায় আছে অল্পসংখ্যক বিত্তবানের মুষ্টিতে সমগ্র রাষ্ট্রকর্তৃত্ব—যাহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিত্তহীনের আত্মপ্রকাশের পথ অবরুদ্ধ। এই সংঘাতের সমাধান সম্ভব একমাত্র সোশালিস্ট সমাজেই, যেখানে রাষ্ট্র কর্তৃত্ব পরিচালিত হয় দেশব্যাপী জনসাধারণের শোষণহীন স্বার্থে, পূর্ণতম গণতন্ত্রের আদর্শে। এই আদর্শ বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে ১৯৩৬ সালের পর হইতে সোভিয়েট রাষ্ট্রগুলিতে স্টালিন কনস্টিটিউশন্-এর প্রতিষ্ঠানে। তাই সেথাকার সাহিত্যেও ধ্বনিত হইতেছে নবতম রাগিণী; রাষ্ট্রের বিরোধে নয়, তাহার সহযোগে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সম্ভাবনীয় সমগ্র বিবর্তনের সিম্ফনি। ব্যক্তিত্ব প্রকাশের যে মনোবৃত্তি এই বিরাট বিশ্বব্যাপী সিম্ফনিতে নূতন স্থর যোজনা না করিয়া তাহাকে ব্যাহত করার দিকে ঝোঁকে; তাহার আকর্ষণ আপাত প্রতীয়মানতায় যতই প্রবল হউক না কেন পরিণামে তাহা সমগ্র জনসমাজের পক্ষে বিষময় হইতে বাধ্য—এই বোধ, এই দৃঢ় চেতনা, সোভিয়েট সাহিত্যে অবারিত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। এই করণে সোভিয়েট সাহিত্য আজ সকল দেশের আদর্শনিষ্ঠ প্রগতিশীল মানবমনের স্বপ্নসুষমার প্রতিচ্ছবি বলিয়া গৃহীত হইতেছে। যাহাদের রচনার প্রসাদে এই সোভিয়েট সাহিত্য সমুজ্জ্বল, শ্রীমতী ভাসিলিয়েভস্কা তাঁহাদের অন্যতম।

তাঁহার রচিত নূতন উপন্যাসখানি কিন্তু মোটেই রাজনৈতিক ধারার নয়। ইহাই তাহার বিশেষত্ব। ইহার ঘটনাসংস্থান সেইকালে যখন লাল ফৌজের অমিত বিক্রমে পরাস্ত হইয়া দুর্জেয় জার্মান বাহিনী প্রতিদিন পশ্চিম মুখে

পশ্চাদ্‌গমন করিতেছে; প্রতিদিনকার সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বহু পল্লী নগর প্রদেশের পুনরুদ্ধার সানন্দে ঘোষিত হইতেছে, আর ঘোষিত হইতেছে যাহারা এই স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরের মতো প্রাণ দিতেছে তাহাদের প্রতি সসম্মান কৃতজ্ঞতা। সম্মুখসমরে যোগ না দিয়াও যাহারা শ্রমশিল্পের উৎপাদনশক্তি বাড়াইয়াছে, রোগশয্যায় আহতগণের পুনর্জীবনের সুব্যবস্থা করিয়াছে, তাহাদের বীরত্বের কাহিনীও সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ কখনও বিস্মৃত হয় নাই। অন্ধকার আতঙ্কের অবসানে এই গৌরবময় অধ্যায়ের আভাসমাত্র পাওয়া যায় লেখিকার এই নূতন উপন্যাসে, ইহা তাঁহার রচনার মুখ্য বিষয় না হওয়ায়। ইহাতে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য একটি প্রেমের কাহিনী বর্ণনা। যাহা গ্রন্থটির নামেই প্রকাশ, একটি নিছক প্রেমের কাহিনী।

বলা বাহুল্য, নিছক মুক্ত প্রেমের কাহিনী ফিউডাল সাহিত্যে পাওয়া দুর্লভ, যদিও ইহা বুর্জোয়া যুগের উপন্যাসের একমাত্র উপজীব্য বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এমন কি, ডিটেকটিভ উপন্যাসেও একটি প্রেমের সূত্র জড়ানো না থাকিলে তাহা প্রায়ই পাঠক-পাঠিকাকে হতাশ করে। নরনারী যতদিন সমাজবদ্ধভাবে বাস করিবে, ততদিন তাহারা পরস্পরের প্রেমে পড়িবে, ও তাহা লইয়া সাহিত্য রচিত হইবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। তাই বলিয়া সব দেশের সব প্রেমের কাহিনী একই খাতে বহিয়া যাইবে, এ ধারণা অসংগত। বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে এই বিশিষ্ট মনোবৃত্তিরও রূপান্তর ঘটে, নবতর দৃষ্টিভঙ্গীর আবির্ভাব হয়, ও তাহা লইয়া অভূতপূর্ব সাহিত্যের উদ্ভব হয়। ইহাই সাহিত্যের প্রগতি।

বুর্জোয়া সমাজের যেখানে শেষ, সোশ্যালিস্ট সমাজের সূচনা সেখানে। তাই দেখিতে পাই শ্রীমতী ভাসিলিয়েভস্কা রচিত কাহিনীর আরম্ভ সেখানে যেখানে বুর্জোয়া উপন্যাসের সমাপ্তি প্রায়শঃ ঘটে। মারিআ ও গ্রিগরী-র প্রেমের সূত্রপাত প্রথম দর্শনেই, প্রায় ফার্ডিনান্ড ও মিরান্ডা-র মতো। তাহাদের দুই বৎসরের বিবাহিত জীবন তেমনই নিবিড় আনন্দে কাটিয়াছিল যেমন কল্পনা করা যায় যে কোনো মিলনান্ত উপন্যাসের নায়ক নায়িকার কাটে। অকস্মাৎ শোনা গেল হিটলারী আক্রমণের বজ্র ঝনঝনা। গ্রিগরী এন্‌জিনিয়ার, সে গেল যুদ্ধক্ষেত্রে; মারিআ শিক্ষিতা নার্স, সে গেল মস্কোর হাসপাতালে। আবার দু'বছর তাহাদের দেখা নাই, শেষ দিকে সংবাদও দুর্লভ। মারিআ-র হাসপাতালের একজন স্পেশালিস্ট সার্জন, ভরণ্টসভ ছিলেন ছাত্রী-অবস্থার

তাহার শিক্ষক। তিনি তখনই মারিআ-র প্রেমে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু সংকোচের বাধা কাটাইয়া প্রস্তাব করিবার পূর্বেই তাঁহারই বন্ধু গ্রিগরীর সহিত মারিআ-র হইয়া গেল বিবাহ। গ্রিগরীর অনুপস্থিতিতে যুদ্ধের অনিশ্চিত আবেষ্টনে ভরণ্টসভই মারিআ-র প্রধান আশ্রয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু, যে বন্ধুত্বকে মারিআ-র মা পর্যন্ত স্বচ্ছন্দচিত্তে গ্রহণ করিতে অক্ষম। অথচ সে বন্ধুত্বে নৈতিক কলঙ্কের লেশমাত্রও ছিল না। এই পর্যন্ত বলার পর সমস্ত গল্পটি বলিয়া যাইবার প্রলোভন জোর করিয়া দমন করিতে হইবে। এই সনাতন ত্রয়ীত্ব বুর্জোয়া উপন্যাসে একান্ত সুপরিচিত মেরুদণ্ডস্বরূপ হইলেও নূতন সমাজের পরিস্থিতিতে তাহাতে যে রক্তমাংসের আরোপ করা হইয়াছে তাহা বুর্জোয়া লেখকের কল্পনাতীত। হেগেল-এর একটি গভীরতম উক্তি—ট্রাজেডি হইতেছে সংঘাত সত্যের সহিত মিথ্যার নহে, সত্যের সহিত সত্যের—তাহার প্রচুর সমর্থন মিলিবে এই গল্পটির দৃশ্যে দৃশ্যে। প্রধান চরিত্র তিনটির প্রত্যেকেই প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে জীবনে আপন সত্যকে অবিকৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে। স্বার্থের তাগিদে কেহই আপোশ পন্থার অনুসারক নয়। প্রতি পদক্ষেপে আপন কর্তব্যকে নির্মমায়িকভাবে প্রত্যক্ষ করিতে ভীত নয়, ও তাহার প্রণোদনায় বৃহৎ আত্মোৎসর্গেও পরাঙ্মুখ নয়। তিনজনেই যেন রোমাণ্টিক প্রেমের চরম আদর্শে অনুপ্রাণিত। এইরূপ একটি গ্রন্থি সৃষ্টি হইলে বুর্জোয়া সমাজে তাহার নির্গমপথ থাকে না। ব্যর্থতার মহত্ত্বের মধ্যে হয় তাহার পরিসমাপ্তি। বুর্জোয়া সাহিত্য-দর্শনে তাই বলা হয়, ট্রাজেডির মহাকর্তব্যই এই, ভীতি ও করুণা সঞ্চার করিয়া পাঠকের চিত্তকে পবিত্র করা। ট্রাজেডি তাই বুর্জোয়া সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

কিন্তু যে সমাজ-ব্যবস্থার অন্তরে নিহিত আছে ভবিষ্যৎ মানব সমাজের অসীম বিস্তারের সম্ভবনা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অপরূপ বিকাশের সম্ভাবনা, সে সমাজে এই জীবনদর্শন পরিবর্তিত না হইয়া পারে না। তাই এই গ্রন্থে একটি দৃশ্যে বলা হইয়াছে ঃ—

"না, ইহা সত্য নয় যাহারা দুঃখভোগ করে দুর্ভাগ্য তাহাদিগকে উন্নত করে। দুঃখভোগ মানুষকে করে শূন্য ও দরিদ্র। দুঃখভোগ মানুষের অন্তরে সঞ্জাত করে রাগ ও দ্বেষ। মারিআ যখন সুখী ছিল—হ্যাঁ, ইহা সত্য, রচা-কথা নয়, পরীর গল্প নয়—একসময়ে সে ছিল গভীরভাবে সগৌরবে সুখী। তখন তাহার সুখ উপচাইয়া পড়িত। সকলের তরে ছিল তাহার হাসি মুখ,

সকলের জন্য সদুপদেশ এবং অন্তরে ছিল সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে সকলেই সুখী হোক তাহার মতো।

তাহার পর খবর আসিল গ্রিগরীর মৃত্যু হইয়াছে। দুঃখ উন্নীত করে। মিথ্যা কথা, স্বচ্ছন্দে-লালিত শিশুদের জন্য তৈরী এই অসার কাহিনী—মিথ্যা, ভুল, ও ভণ্ডামীপূর্ণ অসার কাহিনী। তাহার দিকেই চাহিয়া দেখ, রাগ দ্বেষে ভরা, অন্তর তাহার শূন্য, শুধু তিক্ত কথার বীজ তাহাতে বিষময় ফল পাকাইতেছে।

এই ত আরো প্রমাণ, সে বদলাইয়াছে। সে কেবল ভাবিতেছে নিজের কথা, নিজেরই কথা। যথেষ্ট প্রমাণ হইল দুঃখভোগ মানুষকে উন্নত করে না; নষ্ট করে, শুষ্ক করে, ভস্ম করে।"

যে কোন রূপ আত্মরতি সোশালিস্ট সমাজের প্রগতির পরিপন্থী। রোমান্টিক প্রেমের পরস্পরের তন্ময়তা অথবা বৃহৎ আত্মোৎসর্গের মধ্যেও গোপন থাকে এই আত্মরতির মূল। আত্ম-পরায়ণ সমাজে তাহা সহজে চোখে পড়ে না। পড়িলেও তাহার মূল্য বিচার হয় অন্যরূপ। তাহাকে দেখানো হয় মহৎ হৃদয়ের আত্মবিকাশের চরম ও কাম্য ফলরূপে। কিন্তু সোশালিস্ট সমাজ নির্মমভাবে বিচার করে এই প্রবৃত্তিকে। ব্যক্তির নিকট যাহা কঠিন আত্মবিসর্জন তাহাও নিন্দার্হ, ক্ষমার অযোগ্য, যদি না তাহা সমগ্র সমাজের শ্রেষ্ঠ কল্যাণের সহায়ক হয়। অকপট নিঃস্বার্থ হইবার প্রচেষ্টার মধ্যে সুগোপন আত্মরতির সংঘর্ষ—ইহাই হইতেছে এই গ্রন্থের নাটকীয় প্রাণবস্তু। যে চরিত্র যে পরিমাণে আত্মরতির মোহে অভিভূত, তাহার দুঃখভোগও তত বেশি। মুক্তির পথ হইতেছে সামাজিক অগ্রগতিকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া, আত্মরতিকে তাহাতে নিমজ্জিত করিয়া, অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাইয়া, পূর্ণ জীবনানন্দের পথে চলিবার শক্তি সঞ্চয় করা।

এই জীবনদর্শন শ্রীমতী ভার্সিলিয়েভস্কা এই গ্রন্থের কোথাও প্রচার করার চেষ্টা করেন নাই। পান্থ পাদপের গাত্র হইতে রস নিঃসরণের মতো ইহা আপনা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। গল্প-লেখক হিসাবে এই লেখিকার মর্যাদা অতি উচ্চে। বক্তব্যে ও আঙ্গিকে, প্রসঙ্গে ও প্রকরণে, অঙ্গাঙ্গী সঙ্গম এবং ঘটনাগ্রন্থনের সংশ্লিষ্টি ও বচনপ্রয়োগের পরিমিতি তাঁহার সহজ আয়ত্তে। আকারে ক্ষুদ্রকায় এই উপন্যাসটি গভীরতায় ও ব্যঞ্জনায় সফোক্লেস বা শেক্সপিয়ারের নাটকের সমতুল্য। নাটকীয় শ্লেষ, যাহা সফোক্লেসের বিশেষত্ব,

এবং চমক ও উদ্বেগ যাহা শেক্সপিয়ারের বিশেষত্ব, দুইই তাঁহার শিল্পকলায় প্রতিফলিত। চরিত্র সৃষ্টিতে আনুরূপ্য ও বৈপরীত্য নীতির যে সুদক্ষপ্রয়োগ তাঁহার রচনায় আছে তাহাতে শিল্পকার হিসাবে তিনি সেই শ্রেণীতে আসন পাইবার অধিকারী যেখানে শেক্সপিয়ার আর সফোক্লেস বিরাজমান। তাঁহার সম্বন্ধে একথা অকুণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, সোশালিস্ট সাহিত্যকে তিনি পূর্বযুগের সমস্ত ঐশ্বর্যে ভূষিত করিয়া নূতন যুগের ভবিষ্যৎ গরিমার উপযুক্ত করিয়া তুলিতেছেন।

তমসার শেষে

আলেকসাই টলস্টয় ; পূরবী পাবলিশার্স, কলিকাতা

রামধনু

ভান্দা ভাসিলিয়েভ্স্কা ; ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড

সোভিয়েটের গল্প-সংগ্রহ

সম্পাদক, সুধী প্রধান, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড

সোভিয়েটের একটি যুদ্ধ-গল্প

প্রতিরোধ পাবলিশার্স, ঢাকা

সমালোচ্য গ্রন্থগুলির সব কখানি-ই মৌলিক রচনা নহে, অনুবাদ। তবুও ইহাদের গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না। অনুবাদ প্রগতিশীল সাহিত্য মাত্রের অপরিহার্য অঙ্গ, কারণ কোনো দেশেরই সাহিত্য আজ স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দাবী করিতে পারে না। অনুবাদের সহায়তাতে এক ভাষায় রচিত সাহিত্য অন্যভাষার সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। ইহাও অবশ্য সত্য যে, বর্তমান যুগে সাহিত্য-রচয়িতার পক্ষে শুধু স্বভাষানিষ্ঠ হইলে চলে না, তাহাকে নানা বিদেশী ভাষায় কুশলী হইতে হয়। বলিতে গেলে, ব্রিটিশ যুগের সমগ্র বাংলা সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় রঞ্জিত। অথচ, সেই অনুপাতে, ইংরাজী শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গ্রন্থের প্রকৃত সাহিত্যিক অনুবাদ হয় নাই ; হইলেও তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে। কোনো বাংলা সাহিত্যিক কি 'ম্যাকবেথ' বা 'কৌনলওয়ার্থ" বাংলা অনুবাদে পড়িয়া অনুপ্রাণিত হইয়াছেন ? আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার গুণে বাঙালী সাহিত্যিক লেখেন বাংলা কিন্তু পড়েন ইংরাজী। ফলে তাঁহাদের বাংলা রচনা ভাবে ও ভাষায় ইংরাজী রচনার গন্ধে আমোদিত হইয়া থাকে। ইহাতে এতদিন ধরিয়া আমাদের দেশের পক্ষে ক্ষতির চেয়ে লাভই হইয়াছে

বেশী। ইংরাজী সাহিত্যের ঋদ্ধিমান সংস্পর্শে আসিয়া বাংলা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা কি অভাবিত বেগে বাড়িয়া গিয়াছে তাহা আজ কাহারো অজানা নাই। যে ইংরাজী সাহিত্য, ফরাসী ও জারমান সাহিত্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও ষোল হইতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত, সমস্ত বিশ্বের উপর বিরাট আধিপত্য করিয়াছে, তাহার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচয়, পুরুষানুক্রমে তাহার একনিষ্ঠ সাধনা বাঙলার সামাজিক জীবনের রূপান্তরের সহায়ক হইয়াছে— আমাদের কল্পনাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, দৃষ্টিশক্তিকে প্রসারিত করিয়া, চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া, কর্মশক্তিকে বেগবান করিয়া।

কিন্তু যাহা এককালে আনিয়াছিল মুক্তির উন্মাদনা, তাহাই এখন হইয়া উঠিয়াছে অবসাদের গুরুভার। ইউরোপে ফিউডালতন্ত্রের সর্বপ্রথম সংঘঠিত প্রতিবাদ হিসাবে, বিবর্ধমান ধনতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বাহক হিসাবে, ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব দেশে দেশে নবতর সাহিত্য-সৃজনের ঐতিহাসিক কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এখন ইংলন্ডের ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদের শেষ পর্যায়ে আসিয়া ক্ষয়িষ্ণু, মুমূর্ষু; তাহার সাহিত্যেও তাই মানবমুক্তির উদাত্ত স্তোত্র আজ স্তম্ভিত। শোষণমুক্ত মানবসমাজের ভিত্তি পত্তন করিয়া যে দেশ সভ্যতার অভিযানে অন্য সকল দেশকে একটি সমগ্র যুগ পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে তাহারই সাহিত্যে আজ মন্দ্রিত হইতেছে সেই মহাগীতি। সোভিয়েট সাহিত্যের সহিত পরিচয় তাই এখন প্রত্যেক মুক্তিকামী বাঙালী সাহিত্যানুরাগীর অবশ্য কর্তব্য।

'তমসার শেষে' আলেক্সাই টল্স্টয় প্রণীত বিশাল ত্রি-পর্ব উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ। তিন পর্বের নাম, যথাক্রমে "দুই বোন", "১৯১৮" ও "বিষণ্ন প্রভাত"। ইহা সম্পূর্ণ করিতে টল্স্টয়ের তেইশ বছর লাগিয়াছে। রুশ বিপ্লবের ফলে রুশিয়াতে যে অভুতপূর্ব সামাজিক আলোড়ন ও আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহারই যথাযথ চিত্র মহাকাব্যের আকারে অঙ্কিত করাই এই উপন্যাসাবলীর উদ্দেশ্য। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সোভিয়েট সমালোচকের মতে এই ত্রি-পর্বে বিশেষতঃ ইহার শেষ ভাগে দেশব্যাপী জীবন-সংগ্রামের অংশ প্রতিফলিত হইয়াছে—সুদূর কোন গ্রামের একটি শিশুর জীবন হইতে লেনিন ও স্টালিন পর্যন্ত। মনে হয় যেন আখ্যায়িকা-কার সর্বদা আশঙ্কিত হইয়া আছেন, পাছে কোনো খুঁটিনাটি বাদ পড়ে, পাছে কোনো তথ্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা না হয়। ইহার সমস্ত উপাদান বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে গৃহীত; অথচ গল্পের

স্রোত কোথাও ব্যাহত হয় নাই, খণ্ডের গুরুত্ব পূর্ণতার সুষমাকে বিকৃত করে নাই। আলেক্সাই টল্স্টয়ের রচনা শুরু হয় বিপ্লবের পূর্ব হইতেই। পাঠকেরা তখন তাঁহার নাম লইয়া কেবল পরিহাসই করিত; টল্স্টয় নামধারী লেখক কেবল একজনই হইতে পারে, ইহাই ছিল ব্যঙ্গের হুল। আলেক্সাই টল্স্টয় বিপ্লবকে সহজে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাহার সমগ্র তাৎপর্যকে উপলব্ধি করিতে তাঁহার কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল। সেই আলেক্সাই টল্স্টয় আজ রুশ-বিপ্লবের সামাজিক বিবর্তনের সবচেয়ে শক্তিমান কথক। তাই তিনি অর্জন করিতে পারিয়াছেন ১৯৪৩ সালের স্টালিন পুরস্কার।

'তমশার শেষে' প্রধানত দুটি বোনের কাহিনী। মূল গ্রন্থকার এই পর্বের নামই রাখিয়াছেন, "দুই বোন"। ইংরাজী অনুবাদকের অনুসরণে বাংলা অনুবাদক এই পরিবর্তনটি ঘটাইয়াছেন, যাহার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। "দুই বোন"-এর বিষয়বস্তু একটি ছোট শিক্ষিত পরিবারের নিয়তি; ইহার পশ্চাৎ-পটে আছে সেন্ট পিটারসবুর্গ ও ক্রাইমিয়ার বাক-সর্বস্ব বুদ্ধিজীবিদের সামাজিক জীবন। তাহার উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিঘাত, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জারের পতন ও বিপ্লবের প্রথম সূচনা, ও পরে অক্টোবর মাসে (পুরাতন পঞ্জিকা অনুযায়ী) সাম্যবাদী বিপ্লবের সফল আবির্ভাব। এইখানে প্রথম পর্বের সমাপ্তি।

ভান্দা ভাসিলিয়েভ্স্কা-র "রামধনু" পড়িতে গিয়া আমরা উপনীত হই সোভিয়েট জীবনের প্রায় আধুনিকতম স্তরে, যাহাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নির্মম পেষণে নাৎসিবাদের বিশ্বাসঘাতক ও বর্বর আচরণে সুবিস্তীর্ণ সোভিয়েট রাষ্ট্রের নরনারী ও শিশু একান্ত হইয়া স্বদেশ স্বজাতি ও স্বকীয় সংস্কৃতি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশের নিপীড়িত জনগণের শৃঙ্খল মোচনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। লেখিকা জাতিতে পোলীশ, জার্মান-অধিকৃত য়ুক্রেনের ছোট একটি গ্রামের প্রতিরোধকে কেন্দ্র করিয়া রচিত এই কাহিনী ১৯৪৩-এর স্টালিন পুরস্কার লাভ করে। উপন্যাসখানির পরিসর স্বল্প, যাহাকে বলা যায় রচনা-চাতুর্য, তাহার কোনো চেষ্টা ইহাতে নাই, কোনো জটিল সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের প্রয়াস-চিত্র ইহাতে নাই। তবুও ইহার গভীরতা ও অর্থ-বহতা অপ্রমেয়। অধুনা-রচিত কোনো দেশের কোনো উপন্যাসের সহিত ইহার একদিক দিয়া তুলনা চলে বলিয়া মনে হয় না। ইহা অনায়াসে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শ্রেণীতে আপন আসন অধিকার করিয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে অর্থ-

নৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ-গোষ্ঠী গঠনের অবশ্যম্ভাবী পরিণামে যে নূতন চেতনা ও নবতর মানস বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাহারই প্রকৃষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। আমাদের পরিচিত ধনতান্ত্রিক সাহিত্যের প্রধান সুর হইল রোমান্টিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিত্ব অর্জনের আগ্রহে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সকল প্রকার আবেগ ও অনুভূতি, হউক তাহারা যতই প্রবল বা সূক্ষ্ম, ইহাদিগকে লইয়াই ধনতান্ত্রিক সমাজের ও রোমান্টিক সাহিত্যের কারবার। ভয় ছিল, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটিবে, তাহার সাহিত্য হইবে যন্ত্রচালিত সাহিত্য। এ ভয় যে কত মিথ্যা, বর্তমান সোভিয়েট সাহিত্য তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, প্রতিহিংসা, ক্রোধ, জিঘাংসা, আত্মত্যাগ ইত্যাদি যে সব মনোবৃত্তিগুলিকে আমরা ব্যক্তিত্ব-বিধানের বিভিন্ন প্রবাহ বলিয়া মনে করি; "রামধন্" পড়িলে দেখিতে পাই, নূতন সমাজে তাহাদের পরিধি সংকুচিত না হইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাদের সাহিত্যিক প্রকাশ ও যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি না হইয়া অভাবনীয় বাস্তবিকতার বিস্ময়ে শ্বাসরোধী হইয়া উঠিয়াছে। নূতনত্ব হইতেছে এইখানে যে, এই সব একান্ত ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক প্রবাহের উৎস সেখানে আর ব্যক্তিত্ব বোধ নহে, উন্নততর গোষ্ঠীচেতনা; গোষ্ঠীর সহিত ব্যক্তির বিরোধ, ধনতান্ত্রিক সাহিত্য ও সমাজের যাহা মূল উপজীব্য, এ-রাষ্ট্রে তাহা আজ হইয়া উঠিয়াছে অতীতের কথা। এখানে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পৃক্ত, তাই গোষ্ঠীর বিপদে প্রত্যেকটি ব্যক্তি নিজেকে গোষ্ঠীর সমগ্রতার প্রতিনিধি ভাবিয়া সানন্দে আপন নিয়তি নির্ধারণ করে। এই সুর, এই বিরাট মহান্ মিলনবাণী, সোভিয়েট সাহিত্যের বাহিরে অন্য কোথাও ধ্বনিত হইতেছে বলিয়া আমার জানা নাই।

মানব-সাহিত্যের ইতিহাসে এই যে নূতন বসন্ত, "রামধন্"-র লেখিকা তাহার একমাত্র কোকিল নহেন। সোভিয়েটের সাহিত্য-কুঞ্জ বহু বিহঙ্গের বিচিত্র কাকলীতে মুখর। উল্লিখিত দুটি গল্পচয়ন গ্রন্থে, অন্ততঃ দশজন লেখকের রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথমটিতে আছে বারোটি গল্প ও একটি প্রবন্ধ; দ্বিতীয়টিতে আছে পাঁচটি। আলেক্সাই টলস্টয় ও ভান্দা ভাসিলিয়েভ্স্কা তো আছেনই। তা ছাড়া আছেন শোলোখব, টিখোনভ, সোবোলেভ, ডচেনকো—যাঁহাদের নাম আর বাঙালী পাঠকের নিকট একেবারে অপরিচিত নহে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সিমনভ বা গর্বটভ-এর একটি গল্পও অনুবাদকবর্গের চোখে পড়ে নাই। নির্বাচিত গল্পগুলির মধ্যে তারতম্য

নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কোনটিকেই বলা চলে না, বিশেষত্ব বর্জিত। "দশ ফোটা তাজা রক্ত", "মা", "প্রিয়া", "কুটীরের ভিতরে", "নীল ওড়না" প্রভৃতি গল্পের সহিত পরিচয় না থাকিলে সাহিত্যচর্চা অঙ্গহীন হইয়া পড়ে।

অনুবাদগুলি প্রায়শঃই সুখপাঠ্য। সোভিয়েট সাহিত্যের অনুবাদ শুরু করায় অনুবাদকেরা প্রত্যেকেই বাঙালী পাঠকদের ধন্যবাদার্হ। সেই জন্যই মনে হয় তাঁহাদের উচিত, তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সম্যক সচেতন হওয়া। সোজাসুজি রুশভাষা হইতে অনুবাদ করার সামর্থ্য আমাদের দেশে কতদিনে হইবে বলা যায় না! ইংলণ্ডের সাহিত্যিক মহলে ও বিদ্যায়তনে রুশভাষার অনুশীলন প্রবলবেগে আরম্ভ হইয়াছে। বহু দিন ধরিয়া ইংরাজী অনুবাদের সহায়তা নেওয়া ছাড়া আমাদের অন্যগতি নাই। কোন অনুবাদ মূলের সমকক্ষ হইতে পারে না; অনুবাদের অনুবাদ তাহা হইলে কোথায় গিয়া দাঁড়ায়! অথচ দেখিতেছি, ইংরাজী অনুবাদে মূলের সাহিত্যরস পরিবেশন করার যতটা সযত্ন প্রয়াস আছে, বাংলা অনুবাদে তাহা অনেকাংশে স্বল্পতর। স্থানে স্থানে ইংরাজী ইডিয়ামের অনুবাদে ভ্রান্তি ঘটিয়াছে; ভাষান্তরের পথে যেখানে প্রতিবন্ধক দেখা দিয়াছে, তাহাকে এড়াইয়া সহজ করার প্রবৃত্তি প্রকট। এ-প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নহে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "রামধনু" অনুবাদ এইরূপ ত্রুটি হইতে মুক্ত। কিন্তু যে-দুইটি সাহিত্যিক গুণের জন্য লেখিকার প্রসিদ্ধি—শব্দ প্রয়োগে কঠিন মিতব্যয়িতা ও ভাবপ্রকাশে বহুল ইঙ্গিতময়তা—তাহা ইংরাজী অনুবাদে যতটা ফুটিয়াছে, বাংলা অনুবাদে পবিত্রবাবুও তাহা বজায় রাখিতে পারেন নাই। ইহার জন্য দুই ভাষার অনুবাদশক্তি দায়ী কিনা বিবেচ্য। কারণ অনুবাদ ক্ষেত্রে বাঙলায় পবিত্রবাবুর মত সক্ষম অনুবাদক আর বড় কেহ নাই।

"তমসার শেষে"-তে অনুবাদক অশোক গুহ কিরূপ দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বুঝাইতে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইংরাজী অনুবাদে যেখানে লাগিয়াছে তিন শত পৃষ্ঠার উপর, বাংলা অনুবাদে তাহা দেড়শত পৃষ্ঠাতেই কুলাইয়া গিয়াছে। এ পার্থক্য টাইপ ও কাগজের সাইজের দোহাই পাড়িয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে কি? কি করিয়া এই অসম্ভব সম্ভব হইল ইংরেজি অনুবাদের ও বাংলা অনুবাদের শেষ অংশ দুইটি মিলাইয়া পড়িলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

মানময়ী গার্লস্ স্কুল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স)

শুভযাত্রা

শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদার (রঞ্জন প্রকাশালয়)

রবীন্দ্র মৈত্রের বেনামীতে লেখা ব্যঙ্গ গল্প, দুঃখী পলকের কাহিনী, প্রথম পড়ার পর তাঁহার সাহিত্যিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যতটা আশা ততটা ভয় হইয়াছিল। শক্তিশালী নবীন লেখকের পক্ষে দলাদলির বিষাক্ত পরিমণ্ডলের চেয়ে বেশী ক্ষতিকর আর কিছু হইতে পারে কিনা সন্দেহ। এ-অবস্থায় স্বদলের হাততালি ও পিঠ চাপড়ানোর মোহের সহিত আসিয়া যুক্ত হয় প্রতিপক্ষকে খর্ব করিবার অধীর আগ্রহ, অধিকাংশস্থলে লোপ পায় ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান, হিতাহিত বিচার। ফলে লেখককে পাইয়া বসে একচোখোমি,—সত্যসাহিত্যসৃষ্টির পথে যে ত্রুটিকে বলা যাইতে পারে বৃহত্তম অন্তরায়। রবীন্দ্র মৈত্রের শক্তির পরিচয় এইখানেই যে ব্যঙ্গরচনাতেও তাঁহার দুই চোখ খোলা থাকিত—অন্ততঃ যে-সব বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান-সংঘর্ষের প্রশ্ন না উঠে। তাঁহার এক চোখে ফুটিত দরদ, অন্য চোখে শাসন। কাজেই তাঁহার ব্যঙ্গ হইয়া উঠিত রঙ্গের অনুরূপ—অর্থাৎ যাঁহাকে তিনি ব্যঙ্গ করিতেছেন তিনি যেন তাঁহারই দলের, শুধু মজা করিবার জন্য কয়েকটি বিশেষত্বকে একটু অতিরঞ্জিত করিতেছেন মাত্র। এই অতিরঞ্জনের যোগে একদিকে প্রকাশ পাইত তাঁহার শ্যেনদৃষ্টি সমালোচনা, অন্যদিকে বহিয়া

চলিত হাস্যরসের স্রোত। কারণ—অতিরঞ্জন, হাস্যরসের প্রাণ। যাহা নিত্য দেখা যায়, চোখ তাহার মধ্যে হাসিবার মতো কিছু খুঁজিয়া পায় না, তাই শিশু পড়িয়া গেলে হাসি আসে না, প্রাপ্তবয়স্কের বেলায় আসে। তাই একদেশের আচারব্যবহার ভিন্নদেশীর নিকট হাস্যকর ; মঙ্গলগ্রহে 'মানুষ' থাকিলে তাহার নিকট পৃথিবীর সমস্ত মানবজাতিটাই অদ্ভুত। কোনোখানে একটু বাড়াবাড়ি, নিয়মের একটু ব্যভিচার না ঘটিলে হাসা যায় না। কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে, অতিরঞ্জনের হাস্যোদ্রেক করিবার ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ। সাধারণকে যেকোন রকমে যেকোনদিকে বাড়াইয়া দিলেই হাস্যকর হয় না, ভীতিপ্রদও হইতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে পা পিছলাইয়া আছাড় খাইতে দেখিলে হাসি আসে ঘটে, কিন্তু যদি দেখা যায় ফলে ঘটিতেছে অঙ্গহীনতা বা অপঘাত, তখন হাসির বদলে কান্না আসার সম্ভাবনাই অধিক। হাস্যরসিককে তাই সর্বদা সাবধানে থাকিতে হয় কখন অতিরঞ্জন নিজের যথার্থ সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়া বিরক্তিকর কুরূপে পরিণত হয়—কাঁচা লেখকের হাতে পড়িয়া যে দুর্দশা অতিরঞ্জনের প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। আর এই সুষ্ঠু সীমাজ্ঞান প্রচুর পরিমাণে ছিল বলিয়া রবীন্দ্র মৈত্র বাংলা হাস্য সাহিত্যে চিরস্থায়ী পূজা পাইবার অধিকারী।

"মানময়ী গার্লস স্কুল" রবীন্দ্র মৈত্রের একটিমাত্র প্রকাশিত নাটক, আর এইটিতে তাঁহার সৃজনী-প্রতিভা নিষ্কলঙ্ক পূর্ণতায় পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে। হাস্যরসপ্রধান নাটক লিখিতে যে মালমশলার প্রয়োজন, সে বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ছিল পাকা রন্ধনীর মতো। তিনি জানিতেন, ফলস্টাফ বা তারত্যুফ-এর মতো বিশাল চরিত্র সৃষ্টি করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নয়। তাই তাঁহার আদর্শ ছিল ইংলন্ডের রেস্টোরেশন্ যুগের পরিহাস-রসিক নাট্যকারগণ, বিশেষ করিয়া কন্‌গ্রীভ। হাস্যোদ্রেকী প্রয়োগশিল্প তিনি তাহাদের নিকট শেখেন, অবশ্য তাহাদের নৈতিক উন্মার্গগামিতা সযত্নে পরিহার করিয়া ; রবীন্দ্র মৈত্রের পরিহাস প্রাচুর্যে পঙ্কিলতার আভাস মাত্র নাই। এই নাট্যকলার কেন্দ্রীয় সূত্র—ঘটনাসংস্থান। এমন একটি যোগাযোগ নির্বাচন করিতে হইবে যাহা সচরাচর না ঘটিলেও অতি-বিরল নয় ; আর হাস্যোৎপাদন করিতে হইবে তাহাদের অভাবিত অথচ অন্-অস্বাভাবিক পরিণতিগুলির ক্রমিক উদ্‌ঘাটনে। সু-অভিনয়ের কল্যাণে আজ "মানময়ী"র যশ বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাই তাহার সংক্ষিপ্তসার দিয়া প্রমাণ করা নিষ্প্রয়োজন কিরূপ

স্বচ্ছন্দ দক্ষতার সহিত রবীন্দ্র মৈত্র এই কেন্দ্রীয় সূত্রকে প্রয়োগ করিয়া সার্থকতার দিব্য প্রসাদ লাভ করিয়াছেন।

নাটকে হাস্যসৃষ্টির আর এক উপায়, রসাল কথোপকথন। অনেক নাটকে এই বাক্যালাপের ছটা ঘটনাসংস্থানকে গৌণ করিয়া তোলে। তখন ইহাকে নির্দোষ গুণ বলা চলে কিনা সন্দেহ। 'মানময়ী'র চরিত্রগুলি কাঠের পুতুল নয়, তাহারা কথা কয় জীবন্ত নরনারীর মতো, প্রত্যেকের স্বতন্ত্র চলনভঙ্গী আছে। তাহারা কথা কয়, যে অবস্থায় যতটুকু না কহিলে নয় ততটুকু; নাট্যকারের মুখোস হইয়া তাঁহার পরিহাস-চাতুর্যের প্রকাশের সুযোগ দিবার জন্য নয়। এই দুর্লভ ক্ষমতা সর্বদাই অভিবাদনযোগ্য; এবং ইহা সম্ভব হয়, নাট্যকারের সর্বব্যাপী অনুকম্পার ফলে। নাটকটি পাঠে বোঝা যায় গ্রন্থকারের মন অত্যন্ত আধুনিক। তাঁহার নায়ক মানসমোহনের চরিত্রে বাংলার যুবক-মনের একটি উজ্জ্বল দিক প্রকাশ পাইয়াছে। লেখাপড়ায় সে মহাপণ্ডিত নহে, কিন্তু তাহার উপস্থিত বুদ্ধি প্রশংসনীয়। বিপদে পড়িলে ভড়কাইয়া না গিয়া উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনে তৎপর। আর নারী সম্বন্ধে তাহার মনোভাব সবল পুরুষোচিত ভদ্র। সে ভালোবাসিতে জানে, ভালবাসা পাইতেও চাহে, প্রেমের ক্ষেত্রে সে ধর্মজাতিগোত্রের গুরুত্ব মানে না। অথচ অবস্থাচক্রে একটি অপরিচিতা তরুণীকে মাসাবধি স্ত্রী পরিচয়ে চালাইতে হইলেও তাহার মন ভাব-বিলাসিতায় উচ্ছল হইয়া আত্মমর্যাদা ও নারীমর্যাদার সীমা লঙ্ঘন করে না। তাঁহার সৃষ্ট সকল চরিত্রগুলিকেই যে তিনি জীবনে এইরূপ পছন্দ করিতেন তাহা নহে, তাহাদের দোষগুণ তাঁহার নিকট প্রত্যক্ষ; অথচ শিল্পসৃষ্টির জন্য যে পক্ষপাতহীন সমবেদনা আবশ্যক, তাহা তিনি সকলকেই সমভাবে পরিবেশন করিয়া দিয়াছেন—বোধ হয় এক মিঃ ফার্ণাণ্ডেজ ছাড়া। নাটকে দুষ্ট চরিত্রের অবতারণা দূষণীয় নয়। কিন্তু এইরূপ চরিত্রের প্রতি লেখকের মানুষ হিসাবে যতই বিরাগ থাকুক নাট্যকার হিসাবে বিরূপ হইলে চলিবে না। তাই, শাইলক্‌-এর প্রতি শেষ পর্যন্ত পাঠকের করুণার উদ্রেক হয়, ইয়াগোর অমানুষিক শক্তির প্রভাবে বিস্ময়ে মাথা নত হইয়া আসে। ফার্ণাণ্ডেজ আমাদের মনে নিছক ছোটোলোকোমির ছাপ রাখিয়া যায়। এই ত্রুটি ক্ষমা করা যায় এই ভাবিয়া যে চরিত্র-চিত্রণ রবীন্দ্র মৈত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। আর নাটিকাখানির অজস্র গুণরাশির ভিতর হইতে এই ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করার আর কোনই অজুহাত নাই—সমালোচকের অপ্রত্যাখ্যানীয় অপ্রিয় কর্তব্যসাধন ছাড়া।

'শুভযাত্রা', শ্রীপ্রবোধকুমার মজুমদারের প্রথম প্রকাশিত রচনা, অথচ, আধ ঘণ্টায় পড়িয়া ফেলা যায়। এই নাটকখানিতে প্রবোধ বাবু বাংলাদেশের সমগ্র পাঠকচিত্ত জয় করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু এই লোকপ্রিয়তার পিছনে কোনো কারসাজী, ব্যবসাদারী বুদ্ধি বা সাময়িক উত্তেজনার সংস্রব নাই, ইহা তাঁহার সার্থক রূপসৃষ্টির প্রকাশ্য পুরস্কার। গ্রন্থকার আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যকলাপদ্ধতির সহিত সুপরিচিত, ও সেই শিল্পকৌশলের উপর তিনি যে কিরূপ অনায়াস-প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এই সুগঠিত দৃশ্যবিভাগহীন একাঙ্ক নাটিকাটি। সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে কলিকাতার এক মধ্যবিত্তগৃহস্থের দোতলার বেশ প্রকাণ্ড একটি কক্ষে; আর সময়, বিকাল পাঁচটা হইতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। এইটুকু পরিসরের মধ্যে নাট্যকার আঁটাইয়াছেন বাঙালী পরিবারের একটি অতি করুণ মর্মস্পর্শী কাহিনী, ঠিক যেমন করিয়া প্রকৃতিদেবী ফুলফলবীজের ভিতর আপন আয়োজনসম্ভার অব্যর্থ নিপুণতায় ঠাসিয়া দেন। বাহুল্যের এই নির্মম বর্জনে কাহিনীর রস হইয়া উঠিয়াছে ভাবঘন, রূপণার অবিরত তাপে যাহা কিছু তরল সমস্ত উবিয়া গিয়াছে। "শুভযাত্রা"য় এই রূপণার, মূর্তিগড়নের ক্ষমতার পরিচয় দিয়া প্রবোধকুমার পাঠকবর্গকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছেন। একাঙ্ক নাটকে চরিত্রের ক্রমিক বিকাশ সম্ভব নয়, প্রবোধকুমারেরও তাহা অভীপ্সিত নয়। তিনি দেখাইয়াছেন, একটি বিশেষ ঘটনা বিভিন্নধর্মীর মনে কিরূপ স্ব-প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, আর এই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে জীবনে কেমন অলঙ্ঘ্যভাবে মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডির আবির্ভাব হয়। কারণ, ট্র্যাজেডির মূলসূত্র, হেগেল বলিয়াছেন, সত্যের সহিত সত্যের, ন্যায়ের সহিত ন্যায়ের সংঘাত, অসত্য বা অন্যায়ের সহিত নহে; Tragedy is the conflict of right with right, not right with wrong. সুদূর মধ্যযুগের সুবিখ্যাত লেখক বইথিয়ুস জীবনে দার্শনিক সান্ত্বনার প্রয়োজনীয়তা কোথায় আলোচনা করিতে গিয়া বলিতেছেন, এই প্রয়োজন আছে; কেননা সম্যক পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় চরম ট্র্যাজেডির জন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যবহারকে দোষ দেওয়া চলে না, যেহেতু জীবনে আছে

> This discord in the pact of things,
> This endless war 'twixt truth and truth.

'শুভযাত্রা'য় দেখা যায় ট্র্যাজেডি সম্বন্ধে এই ব্যক্তি-নিরপেক্ষ উদার দার্শনিক

দৃষ্টি নাট্যকারের আছে। কলেজের অধ্যাপক সুধাংশুর বয়স বছর ত্রিশ। তাহার ছিল সুখের জীবন; উন্নত-চরিত্রা মাতা, প্রেমময়ী পত্নী, স্নেহশীলা ভগিনী ও স্বচ্ছল সংসার। হঠাৎ একটী পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে গিয়া মৃণালিনীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিল, দুই মাসের শিশুর মৃত্যুর সহিত তাহা পরিণত হইল ঘোর উন্মত্ততায়। দুই বৎসর ধরিয়া যথাসাধ্য চিকিৎসার পর ডাক্তারেরা একবাক্যে রায় দিলেন, এ-ব্যাধি জীবনে সারিবার নয়। যদি বা মাঝে মাঝে অল্প কালের জন্য জ্ঞান ফিরিয়া আসে, তাহার উপর নির্ভর করা চলিবে না। অবশেষে সুধাংশু পুনর্বার বিবাহে রাজী হইল, কতকটা তাহার মাতার মুখ চাহিয়া, আর কতকটা নমিতাকে তাহার ভালো লাগে বলিয়া। সুধাংশু শুভযাত্রায় বাহির হইতে যাইবে এমন সময় মৃণালিনী চৈতন্য ফিরিয়া পাইল ও বন্ধঘরের শিকলটি ভিতর হইতে খুলিয়া আসিয়া ঢুকিল তাহার নিজের ঘরে যেখানে সুধাংশু সজ্জিত হইতেছিল। মৃণালিনী সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ, কোনদিন যে সে পাগল হইয়াছিল, এ বোধ পর্যন্ত তখন তাহার নাই। এখন কি করা কর্তব্য, এই সমস্যার গুরুভার সকলকে পীড়িত করিয়া তুলিল। সুধাংশুর সহিত মৃণালিনীর ব্যবহার সন্দেহলেশহীন, পূর্ববৎ সাদর। এই সাদর ব্যবহারে, নিয়তির এই অকরুণ পরিহাসে হাসি আসে, শক্তিমান নাট্যকার অত্যন্ত কৌশলের সহিত এ হাস্য ফুটাইয়াছেন, কারণ এ হাসি বাহ্যতঃ স্নিগ্ধ হইলেও কার্যতঃ প্রলয়ের অব্যবহিত পূর্বের বিদ্যুৎ দীপ্তির মতো জ্বালাকর। এমন সময় বহুদিনের পরিচর্যাপরায়ণা বামা ঝির অতি স্বাভাবিকভাবে উচ্ছ্বসিত কাংস্যকণ্ঠ মৃণালিনীকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল, যাহার ফলে মৃণালিনীর ভাই উপেন্দ্র, যে তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছিল, তাহার নিকট সমস্ত রহস্য প্রকাশ করিয়া দিতে বাধ্য হইল। সমস্যা হইয়া উঠিল আরো গুরুতর। পারিবারিক বন্ধু প্রবীণ চিকিৎসক কিন্তু পূর্বমতই বাহাল রাখিলেন, উপরন্তু জানাইলেন, মৃণালিনী সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিলেও তাহার সুধাংশুর নিকট থাকা উচিত নহে, যেহেতু তাহার সন্তানের ঐ ভীষণ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইবার ষোল-আনা সম্ভাবনা। উপেন্দ্রের পরামর্শে মৃণালিনী চলিয়া যাইতে রাজী হইল। লগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায়, মৃণালিনীর ট্রেনের সময়ের পূর্বেই সুধাংশুকে চন্দন-চর্চিত হইয়া বর সাজিয়া বিবাহ-বাসরাভিমুখে যাইতে হইবে। মৃণালিনীও যাইবার পূর্বে তাহাকে প্রণাম করিতে আসিল, আর যবনিকা পতন হয়

মৃণালিনীর শেষ প্রশ্নের স্বর নীরব হইবার পূর্বেই—“ওগো সত্যিই কি আমার আর কোন আশা নেই?”

সংক্ষিপ্তসার দিয়া প্রবোধকুমারের নাট্যরচনার কৃতিত্ব পূর্ণ প্রকটিত করা অসম্ভব। একটু একটু করিয়া টিপিয়া টিপিয়া অথচ অনাবশ্যক ঘোরাঘুরি না করিয়া পাঠকের মনকে গল্পের দিকে টানিয়া লইবার অসাধারণ ক্ষমতা প্রবোধকুমার দেখাইয়াছেন। আর দেখাইয়াছেন নাটকে করুণ দৃশ্য ফুটাইতে হইলে নাট্যকারকে কিরূপ নিষ্করুণ হইতে হয়। তাঁহার প্রত্যেকটি চরিত্র স্বধর্মের অখণ্ড প্রকাশে ভাস্বর। ঘটনা-গ্রন্থনেও মালতী ও উপেন্দ্রের ব্যবহারে যে দুএকটি ত্রুটি আমাদের চোখে পড়িয়াছে তাহা লইয়া মতভেদ সম্ভব ও তাহারা এত সামান্য যে ধর্তব্যই নহে। এ সত্ত্বেও প্রবোধকুমারের নাট্যকার-বৃত্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ দেখার পূর্বে। ‘শুভযাত্রা’র প্রধান আকর্ষণ তাহার চরিত্র চিত্রণে ততটা নয়, যতটা সুনিপুণ বিষয় নির্বাচন। প্রবোধকুমারের আখ্যানবস্তুটি অস্বাভাবিক নহিলেও অতি বিরল। তাহাতে বোঝা যায়, ট্র্যাজেডির রহস্যকে তিনি এখনও পাশ হইতে আক্রমণ করিতেছেন, মুখোমুখি নহে। তাঁহার দৃষ্টি-ক্ষেত্রের পরিধি সংকীর্ণ। জগতের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিগুলিতে অতি বিরল ঘটনার অবতারণা হয় নাই, এমন নহে; কিন্তু তাহারা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে ঘটনা-সংস্থানের উপর নির্ভর করিয়া নয়, বিরাট চরিত্রসৃষ্টির বিপুল কবিত্বশক্তির প্রসাদে।

বাংলাসাহিত্যে গীতকবিতার উৎকর্ষ যেরূপ প্রখর, নাটকের অপকর্ষ তেমনই নিষ্প্রভ। মনে হয় নাকি একের উৎকর্ষই অপরের অপকর্ষের অন্যতম কারণ? কারণ, গীতিকবিতায় যে গুণ অবশ্য প্রয়োজনীয়, অনেক সময়ে তাহা নাটকীয় সৌন্দর্যের পরিপন্থী। বাঙালী চরিত্রে গীতিকবিতাসুলভ দ্রবশীল আবেগের প্রাচুর্য সকলেরই চোখে পড়ে; নাই আমাদের সেই স্বানুরাগহীন নির্মায়িকতা যাহা শ্রেষ্ঠ নাটকের ঐশ্বর্য। রবীন্দ্র মৈত্র ও প্রবোধকুমারের রচনায় এই নির্মায়িকতার দর্শন মেলে। রবীন্দ্র মৈত্রের লেখনী অকালে থামিয়া গেল। প্রবোধকুমারের উপর এখন নাট্যসাহিত্যের দাবী অনেক। শুধু এইটুকু প্রার্থনা, ‘জার্ণিজ্ এণ্ড’-এর পর “বাজার্স গ্রীণ” পড়িবার দুর্ভাগ্য হইতে বাঙালী পাঠক যেন অব্যাহতি পায়।

সপ্তপর্ণ

শ্রীরাখালচন্দ্র সেন ; (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়)

কথাসাহিত্যে ছোট গল্পের উদ্ভব খুব বেশী দিনের কথা নয়, ইহার কৌলিন্য-মর্য্যাদা তবুও আজ সভ্যজগতে সর্বত্র স্বীকৃত। এমন পাঠক বিরল ছোট গল্পে যার অরুচি। এমন কাহিনীকার বিরল ছোট গল্পে কৃতিত্ব-অর্জ্জনে যিনি পরাঙ্মুখ। এই অভূতপূর্ব লোকপ্রিয়তার কারণ বহুবিধ, তার মধ্যে দুইটি প্রধান বলিয়া মনে হয়;—লোকশিক্ষার বহুল প্রচার ও যান্ত্রিকতার চাপে জীবনছন্দের দ্রুতগতি। গণতন্ত্রের প্রয়োজনে ও কল্যাণে সকল দেশেই পাঠকসংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে যাহারা মুদ্রিত অক্ষরমালায় মনের আনন্দের সন্ধান পাইয়াছে। ইহাদের দাবীপূরণ সাময়িক পত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ; আর সাময়িকপত্রের সহায়তা না পাইলে ছোট গল্পের প্রসার এত বাড়িতে পাইত কি না সন্দেহ। লোকরঞ্জনে সাময়িকপত্রের অনন্যগতি উপজীব্য ছোট গল্প। শুধু গল্প হইলেই চলিবে না তাহা ছোট হওয়া চাই ; একটি বৃহৎ কাহিনীকে বহুদিন ধরিয়া অনুসরণ করিবার সময় বর্তমানে অতিশয় দুর্লভ। যে-আকারের গল্প কর্মস্থানে যাতায়াতের পথে ট্রামে ট্রেনে টিউবে বাসে অনায়াসে পড়িয়া ফেলা যায় তাহারই চাহিদা বেশী।

প্রশ্ন উঠিবে, যাহার জন্ম এরূপ ক্ষণিক সাময়িকতায় তাহাতে স্থায়ী

সাহিত্যের কৌলিন্য কি ভাবে সম্ভব। এ প্রশ্ন যে শূন্য-জাত নয় তাহা সহজ-বোধ্য। লক্ষ লক্ষ মুদ্রিত ছোট গল্পের অধিকাংশই যে দুইবার, এমন কি একবারও, পড়ার অযোগ্য তাহা স্বীকার করিতে বাধা নাই। আমরা তাহাদিগকে চলিতে চলিতে পড়ি, ও চলিতে চলিতে ভুলি। কিন্তু আকাশের অসংখ্য তারার মাঝে, বনের অজস্র ফুলের ভীড়ে, এমন তারা, এমন ফুল কি আমাদের চোখে পড়ে না যাহার দিকে আমরা বিমুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকি? ছোট গল্পের ইতিহাস শুধু প্রাচুর্যের নয়, ঐশ্বর্যেরও; এবং 'সপ্তপর্ণ'-প্রণেতা পরলোকগত রাখালচন্দ্র সেনের কৃতিত্ব এই যে তিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সাতটি গল্পের সমষ্টি এই গ্রন্থ; পাঁচটি পূর্বে অপ্রকাশিত, দুইটি প্রকাশিত হইয়াছিল 'পরিচয়ে', মাত্র প্রথমটি লেখকের জীবিতকালে ও সম্পূর্ণ অনুমোদনে। লেখক কোনো পরিষ্কার খসড়া রাখিয়া যান নাই, টুকরা-টাকরা কাগজের বিশৃঙ্খলতা হইতে তাঁহার অপ্রকাশিত গল্পগুলিকে উদ্ধার করিতে হইয়াছে। লেখকের শেষ মার্জন-স্পর্শ পাইলে তাহারা কিরূপ দাঁড়াইত কে জানে।

ভূমিকায় লেখা আছে;—স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র সেনের জন্ম ১৮৯৭ সালের চৈত্র মাসে, মৃত্যু ১৯৩৪ সালের পৌষে।···খুলনা জেলার সামান্য একটি গ্রামে অতি সাধারণ গৃহস্থের গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বৈচিত্র্যহীন বাল্যকালের পর গ্রামের পাঠশালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। তীক্ষ্ন মেধাবী বালক অসীম অধ্যবসায়ে সাধারণের গণ্ডী ছাড়াইয়া নিজের ভবিষ্যৎ নিজের হাতে গড়িয়া তুলিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ১৯১৯ সালে ইতিহাসে এম্. এ, পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন ও সেই বৎসর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত হন। দুই বৎসর অক্সফোর্ডে কাটাইয়া ১৯২১ সালে সরকারী কাজে নিযুক্ত হন। তারপর তের বৎসর নানা জেলায় সসম্মানে বিচারকের পদ অলঙ্কৃত করেন। ১৯৩৪ সালে আলিপুরের এ্যাডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট জজ থাকার সময় মৃত্যু হয়।"

'সপ্তপর্ণে'র সাতটি গল্পে আপেক্ষিক তারতম্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার একটি গল্পও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। প্রত্যেকটি আপন উদ্দেশ্য-সিদ্ধ। বিষয়-নির্বাচনে লেখকের বৈচিত্র্য লক্ষ্য-যোগ্য। বাংলার পল্লীগ্রামে সামান্য গৃহস্থ ঘরের বালিকাবধূ, চঞ্চল কৌতুহলী বৌদি-প্রিয় বালক দেবর,

কুলটা নারী, স্বদেশপ্রাণ সন্ত্রাসবাদী কর্মী, আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত সমাজের নরনারী, মাঝির ঘরের অভীপ্সা-প্রবণ মাতৃভক্ত যুবক, ফরাসী নারী ও তাহার স্প্যানিশ প্রণয়ী, বাঙালী ভ্রমণকারী ও তাহার য়ুরোপীয় সহযাত্রী—একই গ্রন্থে ইহাদের সমাবেশ নিশ্চয় সাধারণ ঘটনা নয়। অথচ, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, কষ্টকল্পনার আভাস অতিমাত্রায় কম। ইহার কারণ, ছোট গল্প রচনায় রাখালচন্দ্রের হাত ওস্তাদ শিল্পীর মতো পাকা। তিনি ঘটনা গাঁথিতে জানেন, চরিত্র আঁকিতে জানেন, আর জানেন কি ভাবে একটি ভাবমন্ডল সৃষ্টি করিতে হয় যাহাতে ঘটনা ও চরিত্র আপনা হইতে খাপ খাইয়া যায়। মনে পড়ে, ষ্টীভনসন্ একবার তাঁহার এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন—তিনি যতদূর জানেন তাহাতে মাত্র তিনটি প্রকারে গল্প রচনা সম্ভব। আগে ঘটনা গাঁথিয়া তাহাতে চরিত্র যোজনা করা ; অথবা, চরিত্র নির্বাচন করিয়া তদনুযায়ী ঘটনা সাজানো ; অথবা, একটি ভাবমন্ডলকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া ঘটনা ও চরিত্রের সাহায্যে তাহাকে ফোটাইয়া তোলা। ষ্টীভনসন্ কথিত তিনটি পন্থার অনুকূল নিদর্শন রাখালচন্দ্রের রচনাবলীতে প্রচুর পাওয়া যায়।

'সপ্তপর্ণ' আরো সাক্ষ্য দিবে, রাখালচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের নানামুখী বিকাশ ছিল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পর্যবেক্ষণ ও উপভোগ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল কবির মতো, মানবজীবনের ঘাত-প্রতিঘাত তাঁহার চিত্তকে আন্দোলিত করিত।

নাট্যকারের মতো, সামাজিক সমস্যার জটিলতা তাঁহার মস্তিষ্কে স্থান পাইত দার্শনিকের মতো , পদার্থ-বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য তাঁহাকে টানিত অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মতো। নরনারীর সম্বন্ধ লইয়া তিনি অনেক মাথা ঘামাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তাহার মাধুর্যে কখন তিনি মুগ্ধ, তাহার মিথ্যায় কখন তিনি তীব্র ; তাঁহার সজাগ মন প্রেমের কোনো একটি বিশেষ দিককেই অদ্বিতীয় বলিয়া ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে রাখালচন্দ্রের গল্প-গুলি গল্পই, নিছক রসোত্তীর্ণ গল্প; মনীষার বিচিত্র ইঙ্গিত সত্ত্বেও তাহারা কখনও আত্মপ্রকাশ হইতে আত্মপ্রচারের নিম্নস্তরে অধঃপতিত হয় নাই তাঁহার অটুট সীমাজ্ঞানের প্রভাবে। রাখলচন্দ্রের অকালমৃত্যু বঙ্গ সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি। সান্ত্বনা এই, 'সপ্তপর্ণ' তাঁহার অকালমৃত্যুকেও জয় করিয়াছে। এখন হইতে বাংলা সাহিত্যে এমন শ্রেষ্ঠ গল্প-সঞ্চয়ন কল্পনা করা অসম্ভব রাখালচন্দ্রের 'সহযাত্রী' যাহাতে আপন গৌরবের আসনটি পাইবে না স্বকীয়তার মহিমায়।

THREE MEN IN NEW SUITS

J. B. Priestley (Hienemann)

BRIGHT DAY

J. B. Priestley

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে যে সব লেখক ইংরেজী কথা-সাহিত্যে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হন জে. বি. প্রিস্টলি তাঁহাদের অন্যতম। প্রিস্টলির সাহিত্যিক প্রচেষ্টা বহুরেখ। ভ্রমণ-কাহিনী, সাহিত্য-সমালোচনা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধে তাঁহার রচনা উল্লেখযোগ্য হইলেও তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব সফল-অভিনীত নাটকে ও বহুলপ্রচারিত উপন্যাসে। হলিউড-এর সিনেমা-শিল্পের সহিতও তাঁহার যোগাযোগ আছে। হিটলারী আক্রমণে ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক জীবন যখন নির্বাপিতপ্রায় তখনও প্রিস্টলি বহু প্রখ্যাত সুধী সাহিত্যিকের মত দেশত্যাগ করিয়া নিরাপদ অঞ্চলে আশ্রয় না খুঁজিয়া স্বদেশের জনসাধারণের দুঃখসুখের সাথী হইয়া সংস্কৃতির দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। বি-বি-সি হইতে তাঁহার ব্রডকাস্ট বক্তব্যের উৎকর্ষে ও বাচনভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যে শুধু তাঁহার নিজের দেশে নয়, এদেশেও অনেক শ্রোতাকে তৃপ্তি ও আনন্দ দিয়েছে। যুদ্ধ-আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে লণ্ডনের রঙ্গমঞ্চগুলি বন্ধ করিয়া দিতে হয়। পরে ব্ল্যাক-আউটের কড়াকড়ির মধ্যেও ওয়েস্টমিনস্টার থিয়েটার খোলার অনুমতি পাওয়া গেলে প্রিস্টলির নাটক দিয়াই উৎসবের উদ্বোধন হয়। তাঁহার 'মিউজিক অ্যাট নাইট' খুব সম্ভব এ-যুদ্ধের মধ্যে প্রথম প্রদর্শিত নাটক। যুদ্ধকালীন

দুর্বিসহ ভয়াবহতার পরিবেশের ভিতর এই লঘু হাস্যে কিছুক্ষণ অন্য জগতের আস্বাদ পাইয়া দর্শকবৃন্দ নাট্যকারের নিকট কৃতজ্ঞতা বোধ করিত। কিন্তু ইংলণ্ডের জনসাধারণকে কেবল মানসিক পলায়নপরতায় সহায়তা করিয়া প্রিস্টলি তৃপ্ত ছিলেন না। ব্রিটিশ জাতির বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিরা সমরোত্তর জগৎ সম্বন্ধে যে তীব্র বিভেদাত্মক আশা আকাংখা পোষণ করিতেছিল তাহার নাটকীয় রূপ প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'দে কেম টু এ সিটি'-তে। বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ সালে বইটির বিষয়বস্তু সমসাময়িক হইলেও ইহাকে ঠিক সমর-সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যায় না। ইহার অন্তর্নিহিত রূপকের তাৎপর্য যুদ্ধের অব্যবহিত ফলাফলের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া দূরপ্রসারী হইয়া আছে।

'নূতন পোশাকে তিনটি মানুষ' প্রকাশিত হয় ১৯৪৫-এ এবং এটি নাটক নহে, উপন্যাস। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে ইহাকে বলা চলে পূর্বোক্ত নাটকটির পরবর্তী ধাপ। যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, আর তিনটি বন্ধু যাহারা এতদিন একই রেজিমেণ্টে একই অনুপ্রেরণায় পৃথিবীর বহু বিক্ষিপ্ত রণাঙ্গনে ফাশিজম-এর বিরুদ্ধে মৃত্যুপণ করিয়া লড়াই করিয়াছে তাহারা অবশেষে ফিরিয়া আসিল স্বদেশের একই কাউণ্টিতে। ইহাদের মধ্যে পূর্বে পরস্পর জানাশোনা ছিল না, যুদ্ধের গতিই তাহাদের একত্র টানিয়া আনিয়াছিল। যুদ্ধারম্ভের আগে তাহাদের সামাজিক স্তরভেদ ছিল দুস্তর। অ্যালান স্ট্রেট স্থানীয় বড়লোক জমিদার বংশের সন্তান; হারবার্ট কেনফোর্ড সম্ভ্রান্ত না হইলেও সম্পন্ন কৃষক পরিবারের পুত্র, যাঁহাদের বিস্তৃত জোতজমি আছে; আর এডি মোলড হইতেছে নিকটবর্তী খনির মজুর। ঘটনার আবর্তনে এই তিন জনের মধ্যে বন্ধুত্বের আবেগ এমন ঘন হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহারা সাধ্যপক্ষে পরস্পরের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে নাই। তাই সুযোগ সত্ত্বেও স্ট্রেট উচ্চতর অফিসার হইবার বাসনা ত্যাগ করিয়া নেহাৎ সার্জেন্টই থাকিয়া গেল, কেনফোর্ডও কর্‌পোরাল-এর উপরে উঠিল না। আর মোলড-এর পক্ষে বোধ হয় প্রাইভেট-এর উপরে উঠা একপ্রকার নিষিদ্ধই ছিল বলা চলে। দেশে ফিরিয়া তিনবন্ধু পাইল তিন রঙের তিনটি পোশাক—দায়মুক্ত সৈনিকের জন্য সাধারণ সভ্যজীবনে ফিরিবার পথে সরকারী ব্যবস্থার দায়সারা আচ্ছাদন, যাকে ইংরেজিতে বলা হয় 'ইউটিলিটি' পোশাক। তিন বন্ধুর হৃদয় মন তখন ভবিষ্যতের স্বপ্নগরিমায় ভরপুর। অজানা বিদেশে যুদ্ধের কদর্য ভীষণতার বৈপরীত্যে গড়িয়া উঠিয়াছে সে স্বপ্ন—স্বাধীনতার, সুখ-সমৃদ্ধির, সাম্যের, শোষণহীন শান্তিময় ভবিষ্যৎ

সমাজ-ব্যবস্থার স্বপ্ন। তিনটি বন্ধুর একজনও বিপ্লবী নয়, এমন কি রাজনীতি-পরায়ণও নয়। তাহারা সাধারণ ভদ্র স্বস্থমন মানুষ, সদুপায়ে ও বিনা সংঘাতে নিজে বাঁচিতে চায় ও অপরকে বাঁচিতে দিতে চায়। যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় তাহারা শিখিয়াছে, যে ফাশিজম সকল দেশের জনগণের প্রধান শত্রু তাহা তাহাদেরই স্বদেশের সমাজ গঠনের অনিবার্য ফল। বৎসরের পর বৎসর এই বিকট দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করার সমস্ত কষ্টযন্ত্রণা সহিবার সময় তাহারা ভাবিয়াছে, যদি বাঁচিয়া থাকে, ফিরিয়া গিয়া দেখিবে দেশেও সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে, সাধারণ মানুষের সুখ শান্তি ও প্রাণ লইয়া এই বীভৎস জুয়া-খেলায় নামিয়া আসিয়াছে শেষ যবনিকা, আর তাহারই অন্তরালে অপেক্ষা করিতেছে নূতন সমাজ, নূতন পৃথিবী; নূতন জীবন। নিজেদের শহরের 'পাবলিক বার'-এ একত্র পানোৎসবের পর যে যার গৃহাভিমুখে চলিল; এই সংকল্প ভুলিল না যে অল্প দিনের মধ্যেই পুনর্মিলিত হইয়া পরস্পরের অভিজ্ঞতা মিলাইয়া দেখিবে।

এই তিনটি অভিজ্ঞতার ধারা বাহিয়া আমরা পরিচিত হই বর্তমান ইংলণ্ডের বিভিন্ন সামাজিক স্তরের প্রতিভূস্থানীয় বহু নরনারীর সহিত ও শুনি তাহাদের অন্তরের কথা। চরিত্রাংকনে ও সংলাপ-সংযোজনায় গ্রন্থকারের নৈপুণ্যে ও নির্বাচনের বিচক্ষণতায় বিস্মিত হইতে হয়। মাত্র ১৭০ পৃষ্ঠার একটি কাহিনীতে আজিকার ইংলণ্ডের সামাজিক গতি-প্রকৃতির এমন সর্বাবয়ব আলেখ্য এমন দৃঢ় ও স্পষ্ট রেখায় ফোটাইতে পারা যায় তাহা বইখানি না পড়িলে বিশ্বাস করা শক্ত। আরো বিস্ময় এই যে, আলেখ্যটি প্রাণহীন প্রতিকৃতি নহে। বর্তমান সমাজব্যবস্থার প্রচ্ছন্ন দুর্বলতাগুলি সুদক্ষ অংগুলি চালনে অল্প ইংগিতেই আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, তাদের আর উপেক্ষা করা চলে না। 'নূতন পোশাকে তিনটি মানুষ' আবার মিলিত হইল ও আলোচনা করিয়া দেখিল, যে আশা লইয়া যুদ্ধসমাপ্তির পর তাহারা দেশে ফিরিয়াছিল তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা অতি সুদূর। তাহারা যেন আর তাহাদের জন্মভূমির অধিবাসী নয়, কোনো ভিন্ন গ্রহ হইতে প্রবাসী। টোরী-শাসনের অবসানে শ্রমিক নেতাদের হাতে রাষ্ট্রশক্তি আসিয়াছে, ইহা কম আশার কথা নহে, কিন্তু দুঃখ এই নেতা-দের কথায় ও কাজে মিল না থাকায় সাধারণ শ্রমিক কৃষক ও বেতনভোগীর ভাগ্যের বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই; সমাজের উচ্চস্তরে পরিবর্তনের কোনো আগ্রহেরই আভাস পাওয়া যায় না; যাহারা শোষিত ও বঞ্চিত তাহারা

ছাড়া অন্য সকলেই পুনরায় পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামোয় ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত। এই তিনটি বন্ধু যাহাদের প্রতিনিধি, তাহারাই শুধু সভয়ে লক্ষ্য করিতেছে এই প্রবৃত্তির শেষ কোথায়; ইহার অর্থ, স্বদেশে দারিদ্র্য ও বেকারীর পুনরাবির্ভাব ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রবল জাতিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও অবশেষে আর এক বিশ্বযুদ্ধ। এই সংকট হইতে পরিত্রাণ কোথায়, কোন পথে তাহার সঠিক সমাধান, এই তিনটি বন্ধু, ইংলন্ডের লক্ষ লক্ষ প্রগতিকামী জনসাধারণের মতো, স্পষ্ট করিয়া জানে না। প্রিস্টলিও তাহাদের কোনো পথের নিশানা দেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, ইহারা কি করিতে হইবে তাহা ভালো করিয়া না জানিলেও কি যে করিতে হইবে না তাহা অত্যন্ত জোরের সহিত বুঝিয়াছে। ইহারা চায় পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার সুনিশ্চিত অবসান। সমরোত্তর ব্রিটেনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে যে গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, শিল্পীর উপযুক্ত অন্তর্দৃষ্টির সহিত প্রিস্টলি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। চার্চিলের পথে যে ব্রিটেনের সমূহ সর্বনাশ ও সোভিয়েট-প্রদর্শিত পথেই যে মুক্তির সম্ভাবনা, প্রিস্টলি মানেন যে এই অনুভূতি আজ ইংরেজদের নীচের কোঠার লোকেদের মনে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং সম্পন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাও তাহার ছোঁয়াচে স্পর্শ একেবারে কাটাইতে পারিতেছে না।

প্রিস্টলির এই সমাজ-সমালোচনায় দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয় দৃষ্টি-ভঙ্গী হইতেই নানা বিতণ্ডার উদ্ভব হইতে পারে। উপন্যাসটিতে গল্পাংশের চেয়ে আলোচনাই বড় হইয়া উঠিয়াছে—বস্তুত ইহাকে গল্পাকারে সাংবাদিকতা বলা যাইতে পারে। তবে ইহার সাহিত্যিক বিশেষত্ব এই যে, সাংবাদিকতা এক্ষেত্রে বাহিরের জগতের খুঁটিনাটির যথার্থ বর্ণনার অপচয়প্রবণ প্রয়াসে আবদ্ধ না থাকিয়া মনোজগতের বাস্তবতার সন্ধান করিয়াছে ও তাহাকে প্রকাশ করিয়াছে কথা-শিল্পীর কলা কৌশলের সম্যক প্রয়োগে। তাই এই উপন্যাসখানিতে চিন্তার খোরাক আছে যতটা, আনন্দের যোগানও তার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

এক বৎসর পরে রচিত ও ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত 'ঝলমলে দিন' প্রিস্টলির নবতম উপন্যাস, এবং রীতিপ্রকৃতিতে প্রথমোক্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রিস্টলির মতো অবিরাম দ্রুত লেখনশীল কথকের পক্ষে ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে। ইহার নায়ক গ্রেগরী ডসন উত্তম পুরুষেই নিজের কথা বিবৃত করিয়াছে। মুখবন্ধে প্রিস্টলি পাঠককে, গতানুগতিক ভাবে নয়, সনির্বন্ধ অনুরোধ

জানাইয়াছেন যে, এই চরিত্রটিকে যেন আমরা গ্রন্থকারের বেনামদার না ভাবিয়া বসি, ও উপন্যাসোক্ত কোনো ঘটনাকে যেন আমরা কোনো ব্যক্তিগত বাস্তব ঘটনার হুবহু চিত্র বলিয়া না ভাবি। এই সাবধান বাণীর প্রয়োজন ছিল নিশ্চিত। কেন না, প্রিস্টলির জীবনের কতকগুলি সুবিদিত বাহ্য তথ্যের সহিত গ্রেগরী ডসন এর জীবনযাত্রার নিকট সাদৃশ্য আছে।

ডসন এর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় সিনেমা-জগতের অধিপতিগণের সহিত অবারিত অন্তরঙ্গতা। একটি নূতন চিত্র, যাহাতে এক বিখ্যাত তারকা অভিনয় করিতে চুক্তিবদ্ধ, তাহার বাক্যাংশ রচনার জন্য সে প্রযোজক ও পরিচালকের নির্দেশে আটলান্টিকের তীরে এক নিদ্রালু অঞ্চলের জনবিরল হোটেলে আসিয়া উঠিয়াছে। সেই হোটেলে অতিথি ছিলেন আর একটি দম্পতি, বয়স ষাটের কাছাকাছি। ডসন এর কেবলই মনে হয় তাহারা যেন চেনা লোক অথচ কিছুতেই ঠিক করিতে পারে না। কয়েক দিন অস্বস্তিতে কাটার পর এক সন্ধ্যায় শুবার্ট-এর 'বিয়্যাট মেজর ট্রিয়ো'-র অপরূপ সুন্দর মৃদুগতির সুরস্পন্দন শুনিতে শুনিতে স্মরণের রুদ্ধদ্বার যেন ব্যাকুল করাঘাতে অকস্মাৎ খুলিয়া গেল, মনে পড়িয়া গেল ১৯১৩-১৪ সালের কথা। ডসন তখন ষোল সতের বছরের সংসার-অনভিজ্ঞ যুবক, মামার বাড়িতে থাকিয়া ইংলণ্ডের উত্তরাংশে পশমের কারবারে শিক্ষানবীশ। ছোটখাটো পাবলিক স্কুলের ছাত্র ছিল সে, তার বাপ ছিল ভারতবর্ষের আই-সি-এস। হঠাৎ ভারতবর্ষের অসুখে বাপ মা দুইই মারা যাওয়ায় কেম্‌ব্রিজে পড়ার আর্থিক সঙ্গতির অভাবে কাজে ঢুকিতে বাধ্য হইল। কিন্তু সাহিত্যচর্চা একেবারে ছাড়িতে পারিল না। এই ব্যবসায় সূত্রে তাহার সহিত পরিচয় ও খানিকটা ঘনিষ্ঠতা হয় মিঃ ম্যালকম নিক্‌সী ও তাহার স্ত্রী এলিনর-এর সহিত। তাঁহারাই এখন লর্ড ও লেডী হার্নডীন নামে পরিচিত থাকায় তাহার স্মৃতিশক্তিকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। এই আকস্মিক প্রতিঘাতে তাহার মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। একদিকে বর্তমানের হাতের কাজ যাহা ব্যবসায়ের নিয়মানুসারে নির্দিষ্ট তারিখের ভিতর সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিয়া দিতে হইবে; তাহার জন্য প্রায় প্রত্যহ আসিতেছে ট্রাঙ্ক কল, তারকা- অভিনেত্রীসহ সহযোগী কর্মীদের অনাকাঙ্ক্ষিত আবির্ভাব ইত্যাদি। আর অন্যদিকে আছে সেই বিস্মৃত প্রায় কাল-পর্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ পুনর্চিত্রনের সাভিনিবেশ প্রচেষ্টা। বর্তমান হইতে অতীতে ও অতীত হইতে বর্তমানে মানসিক গতায়াতের যে আঙ্গিক

প্রিস্টলি এই উপন্যাসে ব্যবহার করিয়াছেন তাহা তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি নহে। কিন্তু তাহার প্রয়োগে তিনি যে কুশলতার সাক্ষ্য দিয়াছেন তাহা একেবারে আচার্যোপম। ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রিস্টলি যশস্বী হন 'দি গুড কম্পানিয়নস' ও 'এঞ্জেল পেভমেন্ট' রচনার পর। তখন তিনি ছিলেন ডিকেন্স-পন্থী, গল্প বলার ভঙ্গী ছিল ঢিলে-ঢালা। পরে নাটক রচনায় আধুনিক রঙ্গমঞ্চের দাবী মানিতে অভ্যাস করিতে হয় বাহুল্য বর্জন ও ঘটনা সংকোচন। এই পদ্ধতির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হয় ফিল্‌ম্‌-গল্পের সিনারিও রচনায় 'কাটিং', 'ক্লোজ-আপ' 'ফ্ল্যাশ-ব্যাক' প্রভৃতির প্রবর্তনে। এই দুটি বিভিন্ন অথচ সগোত্র শিল্পের শিক্ষা প্রিস্টলির নিকট ব্যর্থ হয় নাই। তাই তিনি ৩৬৮ পৃষ্ঠার একটি (ছোট্ট) উপন্যাসে এক ব্যক্তির ত্রিশ বৎসরব্যাপী সাংসারিক ও সামাজিক অভিজ্ঞতার চিত্র পর্যাপ্ত ভাবে আঁকিতে পারিয়াছেন। সমসাময়িক সামাজিক বিবর্তনের আলেখ্য আঁকিতে গিয়া যাঁহারা তিন চারি খণ্ডের কম থামিতে পারেন না প্রিস্টলির এই উপন্যাসখানি তাঁহাদের নিকট নূতন পথের সন্ধান দিতে পারে।

উপন্যাসটির নাম কেন রাখা হইল 'ঝলমলে দিন' তাহা সহজে বোঝা যায় না বলিয়া গ্রন্থকার 'জুলিয়াস সীজার' হইতে একটি উদ্ধৃতি দিয়া পাঠকের সহায়তা করিয়াছেন : ঝলমলে দিনেই সাপ গর্তের বাহিরে আসে। প্রিস্টলির মতে ব্রিটেনে শেষ ঝলমলে দিন গিয়াছে ১৯১৪ সালের ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কামানগর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটিল 'ওল্ড মেরি' ইংলন্ডের অকাল মৃত্যু। তখন হইতে শুরু হইয়াছে শান্তির বদলে ভীতি, সন্তোষের বদলে অতৃপ্তি, মানবিকতার বদলে নৈর্ব্যক্তিকতা। যাহার অনিবার্য পরিণতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফাশিজম। কিন্তু সেই '১৪-পূর্ব ঝলমলে দিনেই ইহার সূত্রপাত দেখা গিয়াছিল, বিষধর তাহার বিবর ছাড়িয়া সমাজ-দেহে ছোবল মারিতে প্রস্তুত হইতেছিল। যে-বিষ সে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিল তাহা হইতেছে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে মহাবিত্তের, হাই ফাইন্যান্স-এর, অপ্রতিহত প্রসার। আগেও ছিল উচ্চ-নীচ শ্রেণীভেদ, আয়-ব্যয়ের তারতম্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ব্রিটেনের মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে তখন ধনী-দরিদ্রের বা প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ স্নেহ মৈত্রী প্রেম প্রভৃতি মানবিক অনুভূতির সম্পর্কচ্যুত ছিল না। নিজের অভিজ্ঞতা হইতে ডসন তাহা ভালো করিয়াই জানে; তাহার নিয়োগকর্তার পরিবারে সে পাইয়াছিল স্বচ্ছন্দ ব্যবহারের অধিকার ও তাঁহার তিনটি সুন্দরী কন্যার সহিত তাহার ছিল বন্ধুত্বের বন্ধন। সে যুগের স্মৃতির সৌরভ ত্রিশ বৎসর পরে

তাহাকে আবিষ্ট করিয়া তোলে। এখন সে বুঝিতে পারে নূতন বিষের বাহক ছিল এই মিঃ নিক্‌সী, যে এখন যুদ্ধের প্রসাদে সামাজিক গৌরবের চূড়ায় পৌঁছিয়া লর্ড হার্নডীন রূপে বিরাজমান। এখন সে বুঝিতে পারিতেছে ধনতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় মায়া-দয়ার স্থান নাই, ন্যায়-অন্যায়ের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নাই। আছে কেবল অন্তহীন মুনাফা অর্জনের উগ্র ও একাগ্র প্রয়াস। এই যক্ষের হাতে পড়িলে আর নিস্তার নাই; শিক্ষা-সংস্কৃতি, স্বাদেশিকতা, আত্মবিকাশ সব কিছুই ইহার পায়ে বলি দিতে হইবে। ডসন ইহা মর্মে মর্মে বুঝিতে পারে। তাহার সৌকুমার্যপ্রিয় স্পর্শালু শিল্পীচিত্ত এই আসুরিক ইতরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে চায় কিন্তু পথ খুঁজিয়া পায় না। সিনেমা-শিল্পের সহিত সে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, ইহার ভিতর বাহির তাহার নখদর্পণে। লোকশিক্ষায়, সৃজনী আনন্দে, সমাজ-উন্নয়নে যে শিল্পের সম্ভাবনীয়তা অসীম, মুষ্টিমেয় কোটিপতির অর্থাগমের অস্ত্র হইয়া তাহা যে কিভাবে পৃথিবীব্যাপী প্রবঞ্চনার ও অধোগমনের পঙ্কাকীর্ণ পথ হইয়া উঠিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া সে শিহরিয়া উঠে। ব্রিটেনের মতো স্বাধীন দেশও সিনেমা ব্যাপারে মার্কিনী মিলিয়ন-ডলার নীতির অনুগামী, ইহা তাহার স্বাজাত্যবোধকে পীড়িত করে; অভিমান করিয়া সে হলিউডের লাভজনক আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে। কিন্তু বুঝিতে পারে এই একক চেষ্টায় ব্যাধির কোনো প্রতিকার হইবে না, বিশেষ উপশম হইবে না। তাহার মানসিক দ্বন্দ্ব তাহাকে পরিশ্রান্ত বিষণ্ণ করিয়া তোলে।

শেষ পর্যন্ত মুক্তির একটা পথ সে আবিষ্কার করে। একটি মেয়ে যে ছিল তাহার পূর্বযুগে অনুচর এবং যাহাকে সে নিতান্ত খুকী বলিয়া গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নাই সে এখন একটি সংঘবদ্ধ দলের নেত্রী হইয়াছে। এই দলের উদ্দেশ্য সমরোত্তর ব্রিটেনের সামাজিক জীবনকে তাহার ঢালু অধোগমন হইতে ঠেকাইয়া রাখা, সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করা সমস্ত পুঞ্জীভূত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সকল বিভাগে। ইহারা সংখ্যায় এখনও কম কিন্তু ইহাদের কর্মোন্মাদনার যেন অন্ত নাই। অসম্ভবকে সম্ভব করার দৃঢ়পণে ইহারা আবদ্ধ। সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার সহিত, তাহাদের সুখ-দুঃখের সহিত ইহারা একাত্ম। ইহাদের আবেগ আছে, অভিজ্ঞতা নাই। নিজের জ্ঞানের অভিজ্ঞতা আছে, আবেগ শুকাইয়া আসিতেছিল, এখন যেন ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার মরা গাঙে বান ডাকিল। ডসন বুঝিতে পারিল সে মনেপ্রাণে শিল্পী

বলিয়াই আজ তাহার কর্তব্য এই সংঘের অন্যতম হইয়া উঠা। সাহিত্যিক এককতার যুগ কাটিয়া গিয়াছে। শিল্পীর আত্মিক শ্রীবৃদ্ধির জন্যই এখন তাহাকে সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত হইতে হইবে। নইলে তাহার সাধনা হয় উপযুক্ত প্রকাশপন্থার অভাবে অফলা থাকিয়া ব্যর্থ হইবে, না হয় শক্তিমান অশুভ গোষ্ঠীর বৃত্তিভোগী অনুচর হইয়া বিষময় ফল প্রসব করিতে থাকিবে। প্রিস্টলির এই অভিজ্ঞতা ও তাহার সিদ্ধান্ত ধনতান্ত্রিক সকল দেশের শিল্পীর অনুধাবনযোগ্য।

সে নহি, সে নহি।

শ্রীচাণক্য সেন : ক্লাসিক প্রেস।

শ্রীচাণক্য সেনের দ্বিতীয় উপন্যাস 'সে নহি সে নহি' যখন 'প্রবাসী'—পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় তখন মাসের পর মাস সাগ্রহে আমি তাহার অনুসরণ করি। কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত তাঁহার প্রথম উপন্যাস "রাজপথ জনপথ" পড়িয়া মনে হইয়াছিল বাংলা কথা-সাহিত্যের আসরে এই নূতন আগন্তুকের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করিবার মতো। দ্বিতীয় উপন্যাসখানি এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল, "বহুলাংশে" পরিমার্জনার পর। আমার আন্তরিক ধারণা বাঙালী পাঠকসমাজের চিন্তাশীল বিভাগ ইহাকে অবহেলা করিবেন না।

চাণক্য সেনের বর্তমান কর্মস্থল দিল্লী, যদিও তাঁহার শিক্ষাজীবন কাটিয়াছে পূর্ববঙ্গের গ্রামে ও কলিকাতায়। কর্মজীবনে সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতা অর্জন করেন কলিকাতার 'স্টেটস্‌ম্যান' ও মধ্যপ্রদেশের 'নাগপুর টাইমস্‌'-এ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিস্তৃততর ক্ষেত্রে তাঁহার মনোযোগের প্রকৃষ্ট পরিচয় 'ধীরে বহে নীল'—যাহা ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হইয়া মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সমীক্ষা হিসাবে পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করে। সাংবাদিকতার এই স্তর হইতে উদ্ভুত হয় সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস। ১৯৬০ সালে রচিত "রাজপথ জনপথ" উপন্যাসে দেখা যায় যে তাঁহার সাংবাদিকতা ও সাহিত্যিকতা কিছুটা কাছাকাছি ভাবে জড়াইয়া আছে।

বর্তমান যুগে সকল সভ্যদেশেই কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যের সহিত সাংবাদিকতার সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড় হইয়া গিয়াছে। সাংবাদিকের তথ্যনিষ্ঠা ও সাহিত্যিকের রূপায়ণ-শক্তি নিশ্চয় একই শ্রেণীর রচনা-কুশলতার নিদর্শন নয়। কিন্তু উপন্যাসকার যদি তাঁহার বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করেন একেবারে সমসাময়িক জীবনযাত্রা, তাহা হইলে তাঁহার সাহিত্যিক শক্তি খঞ্জ হইয়া পড়ে সাংবাদিকতার সম্পূরক শক্তির অভাবে। নিছক কল্পনা দিয়া উপন্যাস রচিতে গেলে তাহার সম্পূর্ণ কাল্পনিক হইয়া পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। 'সে নহি সে নহি' উপন্যাসে চাণক্য সেন তাঁহার সাংবাদিক দৃষ্টি-নৈপুণ্যের সহিত সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণার সংযোগ সাধনের উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছেন।

"সে নহি সে নহি"-র রচনাকাল জানুয়ারি ১৯৬১ হইতে এপ্রিল ১৯৬২। আর এ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় ঘটনা—সাবিত্রী আম্মার সহিত দেবযানীর নিউ দিল্লীতে সাক্ষাৎ—ঘটে ১৯৫৮-৫৯ সালে, যখন ইরাকে কাশেম-বিপ্লবের চমকপ্রদ অগ্রগতি ভারতের পার্লামেন্টারি মহলে ভোজন-টেবিলেও আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। এই কেন্দ্রীয় ঘটনা হইতে গল্পের পরিসমাপ্তির কালব্যাপী ব্যবধান মাস-খানেকের বেশি হইবে না। কেবল এইটুকু বিস্তারের উপর নির্ভর করিলে উপন্যাসকার হয়তো ঘটনা পরম্পরাকে শরীরস্থ অস্থিগুলির মতো সুবিন্যস্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে না থাকিত দৈহিক লাবণ্য, না থাকিত প্রাণের প্রকাশ। গ্রন্থকার তাই তাঁহার বক্তব্যের তাগিদে বিস্তৃত করিয়াছেন তাঁহার উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতকে। তিনি বলিতেছেন: "বিগত পঞ্চাশ বছরের ভারতবর্ষ এ উপন্যাসের পরিবেশ। তার সঙ্গে এসে মিশেছে বর্তমান কালের পৃথিবী। বহু মানুষের বিচিত্র ছায়া পড়েছে উপন্যাসের বিস্তীর্ণ পরিবেশে তবু তাদের ছাপিয়ে উঠেছে কয়েকটি প্রধান চরিত্র।" বলা বাহুল্য, সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে উপন্যাসকারের প্রধান দায়িত্ব এই প্রধান চরিত্রগুলির চিত্রণে। পশ্চাৎপট যতই বিস্তীর্ণ ও পরিবেশ যতই বিচিত্র হোক না কেন, উপন্যাস সাহিত্য-হিসাবে সফল হইতে পারে না যদি না তাহারা সম্পৃক্ত হয় প্রধান চরিত্রগুলির রূপায়ণের সহিত। শ্রীচাণক্য সেন সজাগভাবেই এ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

এই উপন্যাসে প্রবাহিত দুটি নারীর জীবন ধারা—তামিলনাদের সাবিত্রী আম্মা ও বাংলার দেবযানী। দুজনের পরিচয় স্বাধীন ভারতের রাজধানী দিল্লীতে। সাবিত্রী আম্মা, গল্পের সূচনায়, জীবন-সায়াহ্নে কংগ্রেসী এম পি.,

স্বাধীনতা-সংগ্রামের গান্ধী-আন্দোলনে দীর্ঘকাল যোগদানের ফলে। দেবযানীর বিজ্ঞান-শিক্ষা কলিকাতায়, তবে বর্তমানে নিজের কৃতিত্বে আমেরিকার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না তরুণী অধ্যাপিকা। সে স্বল্পকালের জন্য ভারতে ফিরিয়া আসিয়াছে, দিল্লীতে উচ্চমানের বেসরকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে। উপন্যাসে এই দুটি জীবনধারা অনুসৃত হইয়াছে তাহাদের উৎসমুখ হইতে। সাবিত্রী আম্মার পিতামাতার কাহিনী, ও দেবযানীর মাতা ও মাতামহের কাহিনী উপন্যাসের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। অধুনা প্রচলিত সিনেমাশিল্পের আঙ্গিক অনুসারে লেখক প্রয়োগ করিয়াছেন অতীত সম্বন্ধে 'ফ্ল্যাস-ব্যাক' ও বর্তমান সম্বন্ধে 'ক্লোজ-আপ'। আধুনিক সাহিত্যশিল্পের বহুল-প্রচলিত প্রণালীর—ভাবের অনুষঙ্গ ও স্বগতোক্তি—ব্যবহারেও তিনি কার্পণ্য করেন নাই। দৃশ্যের পর দৃশ্যের পরিবর্তন ঘটিয়াছে, দিল্লী হইতে মাদুরাই, সবরমতী ও মাদ্রাজে, কলিকাতা হইতে বাংলার পল্লীতে এবং লণ্ডনে ও নিউ ইয়র্কে। আধুনিক অর্থাৎ ইংরেজ আমলের ভারত হইতে আজ পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান নারী-প্রগতির সুদীর্ঘ ইতিহাসকে উপন্যাসাকারে রূপায়িত করাই ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। কিন্তু জাতীয় ও সামাজিক গতিশীলতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নারীর প্রগতি ঘটিতেও পারে না, এবং তাহার বিশেষত্বকেও উপলব্ধি করা যায় না। তাই এই উপন্যাস রচনার প্রাথমিক দাবীতেই লেখক বর্ণনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন বাঙলার স্বদেশী আন্দোলন ও অগ্নিযুগকে। দক্ষিণ ভারতের পশ্চাৎপদ সমাজ, থিয়োসফি আন্দোলন ও মিসেস বেসান্তকে একদিকে, ও অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণামকালে কলিকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা ও গান্ধীজির শান্তি-প্রচেষ্টা, দেশ-বিভাগ ও বিভাগ-জর্জর ভারতে দেশবাসীর পক্ষে ইংরেজের হাত হইতে কংগ্রেসের রাজনৈতিক শাসনভার গ্রহণ—এ সমস্তই উপন্যাসের চলিষ্ণু প্রবাহে যথোচিত স্থান পাইয়াছে। নারীর জীবনে, ব্যক্তিগত ভাবেই হোক বা সমষ্টিগত ভাবেই হোক, পুরুষের সমর্থন ও বিরোধিতা অনিবার্য। তাই, সাবিত্রী আম্মা ও দেবযানী উভয়কেই কেন্দ্র করিয়া দেখা যায় নানাবিধ পুরুষ চরিত্রের আবর্তন। আর নারী প্রগতি সম্বন্ধে মনে রাখিতে হইবে নারী মাত্রেই অন্য নারীর সহায়িকা নয়, এমনকি মা ও মেয়ে সবসময়েই পরস্পরের সহানুভূতিশীল সহযোগী নয়। নর-নারীর সম্বন্ধের নানা জটিলতার রহস্য নিহিত থাকে তাহাদের সামাজিক ব্যবহারের অন্তরালে অপ্রকাশ্য মানসিক সংগঠনের স্বকীয়ত্বে। এই সব জটিলতা প্রকটতর

হইয়া ওঠে কোনো দেশের ইতিহাসে যখন ঘটে কোনো অভূতপূর্ব দ্রুত পরিবর্তন। ভারতের স্বাধীনতা-লাভ ও সমাজতন্ত্রীয় রাষ্ট্র ঘোষণা এমনই একটি ঘটনা যাহার গুরুত্ব ও তাৎপর্য কেবল ভারতীয় সমাজের মরা গাঙে জোয়ার আনে নাই, সমগ্র বিশ্বের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে করিয়াছে নূতন সংযোগের ও সংঘাতের নাটকীয় যবনিকা-উত্তোলন।

এই নাটকীয় যবনিকা-উত্তোলনের দশ-বারো বছরের মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্র-ব্যবস্থার যে বিশেষত্ব ভারতীয় বুদ্ধিজীবি মহলে প্রায় অপ্রতিবাদ্যভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, বুদ্ধিজীবি উপন্যাসকার হিসাবে চাণক্য সেন তাঁহার গ্রন্থে তাহা চিত্রিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

"স্বদেশের রাজধানীতে সেক্রেটারিয়েট ব্যাপারটা দেবযানীকে খানিকটা অভিভূত করেছে। ছাত্রীজীবন কেটেছিল কলকাতায়। রাইটার্স বিল্ডিং-এর নাম শুনেছিল অনেক, কিন্তু একবার ছাড়া কোনদিন তার সংস্পর্শে আসতে হয় নি। কোম্পানী আমলের ওই লাল ইঁটের বাড়ীটাকে ভালো করে দেখে নি পর্যন্ত কোনও দিন।...কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং না জেনে থাকা গেছে, কিন্তু দিল্লীতে সেক্রেটারিয়েট না জেনে, না মেনে, বাঁচবার উপায় নেই। এ শহরের প্রাণ-কেন্দ্র হলো 'বড়া দপ্তর'। সে এত বড়, এত তার দাপট, তার কাছে মানুষের মূল্য তুচ্ছ। সে চলে নিজের অমোঘ নিয়মের দীর্ঘসূত্র বেতালে; আপন মাহাত্ম্যে সে মাতাল। দেবযানী ভেবেছিল, সেক্রেটারিয়েটের বড় সাহেবরা বুদ্ধিমান, কর্মকুশল, দেশের জনকল্যাণ তাঁদের একমাত্র না হোক প্রধান কাম্য। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে প্রয়োজনের তাগিদে যাঁদের সংস্পর্শে তাকে আসতে হয়েছে তাঁরা অন্য জাতের মানুষ। তাঁরা নিজেদের দাম বড় বেশি বোঝেন, অন্যের দাম বড় কম। তাঁরা বাস্তব থেকে দূরে বাস করেন, পৃথিবীটাকে দেখেন নিজস্ব এক কৃত্রিম দৃষ্টিতে বিকৃত করে। তাঁরা দায়িত্ব এড়াতে চান, সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পান; বলেন বেশি, শোনেন খুব কম। সর্বদা বুঝিয়ে দেন, তাঁরা যা করেন তাই ঠিক, যা করেন তা নির্ভুল। দেবযানীর রাগ হয়, মজাও লাগে। পশ্চিমে তার দশবছর কেটেছে, কিন্তু ব্যুরোক্রাট্দের মাহাত্ম্য বোঝবার সুযোগ হয় নি। য়ুরোপ আমেরিকায় সিভিল সার্ভেন্টদের চেয়ার ছেড়ে দিতে সমাজ অভ্যস্ত নয়। ভারতবর্ষেই উপন্যাসের আদর্শ নায়ক আই. সি. এস.। ভারতবর্ষে রাজপুরুষের মর্যাদা আকাশ-উঁচু। পাশ্চাত্যে সরকারী চাকুরেদের প্রতি বেসরকারী মানুষের বরং

একটু প্রচ্ছন্ন অবহেলা। ওদেশের সিভিল সার্ভেন্ট সেবক। এদেশে তারা শাসক।"

দেবযানী ছিল রাজনীতি-নিস্পৃহ বিজ্ঞান-সাধিকা। কিন্তু অল্পদিনের অভিজ্ঞতাতেই সে বিস্মিত-ক্ষোভে অনুভব করিল, সরকারের কর্তৃত্ব-মুক্ত কোনো প্রচেষ্টারই—হোক না যতই কেন উচ্চতম মানবিক আদর্শের অনুগামী ও সর্বভারতীয় জাতীয় অগ্রগতির সহায়ক—সহজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। সে বিদেশ হইতে ডাকিয়া পাঠাইল হিমাদ্রিকে, যে তাহার জীবনে বিজ্ঞান-সাধনার উদ্‌বোধক, গবেষণা-সাফল্যের প্রধান হোতা, তাহার অন্তর-আনুগত্যের প্রধান দাবিদার। কিন্তু গান্ধীবাদী হিমাদ্রিও বর্তমানে রাজনীতিতে বিগতস্পৃহ। দেবযানীর স্বামী-বিচ্ছিন্ন জীবনের দ্বিতীয় অবলম্বন তাহার একমাত্র সন্তান খোকন। এই খোকনের মুখ চাহিয়াই দেবযানী হিমাদ্রিকে সর্বাঙ্গীণভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। হিমাদ্রী তাহার মানবিকতার সমস্ত মহত্ত্ব দিয়া খোকনের চিত্ত জয় করিয়া জননী দেবযানীকে পুনরায় জায়াত্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল। দেখা গেল, সন্তানবতী স্নেহশীলা মাতার পক্ষে পুনরায় পতিগ্রহণে যে সব সামাজিক প্রতিবন্ধ দেবযানীর মর্মের গভীরতম প্রদেশে আত্মসংঘাতের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহারা সর্বজনীন নয় সর্বকালের নয়। সমাজের একটি বিশেষ স্তরে তাহাদের গুরুত্ব; সে স্তর কাটাইয়া গেলে তাহারা নির্বিষ হইয়া পড়ে। ইহা নিঃসন্দেহ যে স্বাধীন ভারতে উন্নততর সামাজিক ভাবাদর্শের প্রভাব বাদ দিয়া হিমাদ্রি-দেবযানী-খোকনের সম্মিলিত জীবন কল্পনা করা যায় না। কিন্তু এই যে একটি সুখের সংসারের উপস্থাপনা হইল, স্বাধীন ভারতের ব্যুরোক্রাট-পর্যুদস্ত পরিবেশে ইহার ভবিষ্যত কতখানি সুখের থাকিতে পারিবে, উপন্যাসকার চাণক্য সেন তাহার কোনো ইঙ্গিত তাঁহার গ্রন্থে দেন নাই। দেবযানী-হিমাদ্রির সযত্ন-লালিত দেশসেবার কর্মপদ্ধতি—দিল্লীতে বেসরকারী উচ্চ-মানের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগার প্ল্যানটি ভবিষ্যতের অন্ধকারেই নিমজ্জিত থাকিয়া গেল।

গবেষণাগার সম্বন্ধে উপন্যাসে এই অনিশ্চয়তা, আমার মনে হয়, চাণক্য সেন মহাশয়ের শিল্পচর্চায় বিবেকবত্তার পরিচায়ক। তিনি জানেন, বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রের মূলগত প্রকৃতি সম্বন্ধে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের বিচারবুদ্ধি দ্বিধামুক্ত নয়। তাহারা ইহাকে দেখিতে চান সনাতন ভারতীয় সভ্যতার মানবিক ঐতিহ্যবাহী আধুনিক পরি-প্রসার হিসাবে। সাবিত্রী আম্মার মুখ দিয়া তাই

তিনি বলেন, ভারতবর্ষে হিন্দু হয়ে জন্মাবার একটা দুরপনেয় দায়িত্ব আছে, যা দেবযানীও মানিয়া লইয়া ভাবেন, ভারতবর্ষ দেশ নয়, সংস্কৃতি ও সংস্কার, আমাদের রক্তের স্রোতে ধমনীতে ধমনীতে ভারতবর্ষ প্রবাহিত। কিন্তু দেখাইয়া দিবার প্রয়োজন আছে কি এই সনাতন ভারতবর্ষের কোনো ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নাই, থাকিতে পারে না বলিয়াই নাই। হিন্দু-সমাজ কি ভারতের সব প্রদেশে সর্বব্যাপী ঐক্যবদ্ধ সমাজ, তাহার অভ্যন্তরে কি ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্য-শূদ্রের সংঘাত কখনো ছিল না, ধনীর দ্বারা দরিদ্রের শোষণ অজ্ঞাত ছিল? তাছাড়া ভারতবর্ষের ইতিহাস কি কেবল হিন্দুদেরই ইতিহাস? ভারতীয় মুসলমান কি কখনই ভারতীয় হয় নাই। ইহা মানিলে তো মানিতে হয় ভারত-বিভাগই ভারত-ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি? চাণক্য সেন নিজেই দেখাইয়াছেন কি ভাবে বর্তমানের কংগ্রেসী নেতারা সযত্নে পরিহার করেন এই প্রসঙ্গকে। অন্যদিকে তিনি চাহেন যে ভারতীয় রাষ্ট্র সর্বপ্রকারে আধুনিক ও বিজ্ঞানপন্থী হইয়া উঠুক। তাই তিনি হিমাদ্রি-দেবযানীর প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া ভারতে 'সায়েন্টিফিক ম্যান' গড়িবার প্রয়াসী। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র দেবযানী বলিতেছে বিজ্ঞানের কোনও দেশকাল পাত্র নাই; বিজ্ঞান সমস্ত মানুষের। কিন্তু ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন কি নাই যে দেবযানীর এই বিজ্ঞান-আনুগত্য এক বিমূর্ত বিজ্ঞান-সাধনার প্রতিভাস কি না। অর্থাৎ যে সমাজে বিজ্ঞানের সাধনা চলিতেছে সেখানে বিজ্ঞানের উদ্ভাবনের ও আবিষ্কারের চরম মূল্য নির্ধারিত সেই সমাজের চালিকা-শক্তির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের ওপর। সেই কারণেই বর্তমান বিশ্বে সকল দেশের সকল সমস্যার মূলে হইতেছে এক অবিরাম সংঘাত—সাম্রাজ্যবাদের সহিত সমাজবাদের, সংঘবদ্ধ ধনশক্তির সহিত বিবর্ধমান শ্রম-শক্তির। সনাতন ভারতবর্ষের বর্তমান খণ্ডিত উত্তরাধিকারেও এ সংঘর্ষের বিরাম নাই। তাই বিজ্ঞান-প্রসারের প্রসঙ্গেও রাষ্ট্রকর্মীরা বিব্রতভাবে প্রশ্ন তোলেন—এ কোন বিজ্ঞান? মার্কিন বিজ্ঞান, না রুশ বিজ্ঞান? তাই সাবিত্রী আম্মার স্বল্পদৃষ্টি কিন্তু রূঢ়ভাষী কন্যা সরোজা দিল্লীর রাজনীতি-বিশারদদের মধ্যে যাহারা সবচেয়ে আদর্শবাদী তাহাদের সম্বন্ধে বলিতেছে যে ইংরেজ চলিয়া যাওয়াতে তাহাদের মহাবিপদ হইয়াছে, লড়িবার আর কিছুই নাই।

লড়িবার আর কিছুই নাই এই মনোভাব সর্বতোভাবে প্রযোজ্য ভারতের বুদ্ধিজীবীর বেলায়। চাণক্য সেনের এই বৃহদাকার উপন্যাসের সমস্ত পটভূমি

জুড়িয়া আছে এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। বৃহৎ ধনশক্তির প্রতিনিধি বা সংঘবদ্ধ শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধির কেহই এই উপন্যাসে স্থান পায় নাই। এই সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে অনবহিত তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার প্রধান চরিত্রগুলির সকলকেই বর্তমান বিশ্বের মূলগত সমস্যা সম্বন্ধে অনীহাপ্রবণতার ভিত্তিতে গড়িয়া তোলায় এ সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য উপস্থাপিত করিতে হইয়াছে কয়েকটি পার্শ্ব-চরিত্রের উক্তির মাধ্যমে। কনট প্লেসের এক মাঝারি অভিজাত রেস্তোরাঁয় এক মধ্যাহ্ন আহারের নিমন্ত্রণে আগত কয়েকজন বিভিন্ন প্রদেশীয় ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর সহিত দেবযানীর আলাপ-আলোচনা হয়। বলা বাহুল্য, এরূপ আলোচনায় রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন কোনো প্রসঙ্গই বাদ পড়ে না। এবং দেখা যায়, বক্তাদের কাহারো মতের সঙ্গে অন্য কাহারও মতের কোনো ঘনিষ্ঠ ঐক্য থাকে না। এই আলোচনা-পর্বের প্রায় সমাপনকালে, আমন্ত্রণকারী অধ্যাপক সমীর ঘোষ দেবযানীকে বলিতেছে :

"আমাদের সবাকার কথা শুনে আপনার নিশ্চয় অবাক লাগছে। ভারতবর্ষের বর্তমান জীবনে সবচেয়ে লক্ষণীয় জিনিস হচ্ছে, আমাদের বিরাট মতভেদ। কোনো দুজন ভারতবাসী সব বিষয়ে একমত নয়। আসলে আমরা সবে মাত্র চলতে শুরু করেছি। এখনও নির্দিষ্ট পথে আমরা চলছি না। দেখুন না আমাদের রাষ্ট্রীয় চেহারা : আমরা গণতান্ত্রিক দেশ, কিন্তু এ দেশে নেতারা যত অন্ধপূজা পান পশ্চিমে তার একাংশও সম্ভব নয়। গণতন্ত্র হয়েও আমরা এক এবং অদ্বিতীয় রাজনৈতিক দল দ্বারা দীর্ঘকাল শাসিত। আমরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি, কিন্তু আসলে আমাদের দেশে ধনতন্ত্রের জয়জয়কার। ধনী-দরিদ্র এমন প্রভেদ আজ পৃথিবীর অন্য কোনও দেশে নেই। আমাদের কংগ্রেস দল সমাজতন্ত্রের নামে ধনতন্ত্রকে বলিষ্ঠ করছে, আমাদের সমাজতন্ত্রীরা মার্কিন মুখাপেক্ষী। কম্যুনিস্টরা সংগ্রাম-পলাতক ভদ্রলোক। অর্থাৎ আমাদের কোনো কিছুই নির্ভেজাল নয়। আমরা এখন এক বিরাট লেবরেটরী; এখানে কেবল নানা পরীক্ষা চলছে—আমরা ফুটছি—মানে সেদ্ধ হচ্ছি, ফুটে উঠছি না।"

সকলে হেসে ওঠাতে সমীর ঘোষ আবার বলল, "প্রকৃত সংগ্রাম আমাদের এখনও শুরু হয় নি। দেরী আছে। প্রকৃত সংগ্রাম হলো সাধারণ মানুষের অধিকারের সংগ্রাম। একদিন আমাদের বর্তমান প্রচেষ্টার ফাঁকি ধরা পড়ে যাবে। আমরা হঠাৎ দেখব শিব গড়তে গড়েছি বাঁদর। সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয়

দেখব ধনতন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সমাসীন। গণতন্ত্রের পোশাক পরে দেখব সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ধনীদের রাজত্ব। তখন আমাদের নজর খুলবে। তখন ভারতবর্ষে হবে প্রকৃত সংগ্রাম। আজ আমাদের কারুর দল বেছে নেবার দরকার নেই, তখন দরকার হবে। তখন জীবন নিজেই প্রশ্ন করবে, তুমি কোন দলে? অনেকের দলে, না কয়েকজনের দলে? তখন সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বৈজ্ঞানিক, সবাইকে দল বেছে নিতে হবে। এখন আমরা ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ সবকিছুকে গালাগালি দিই। আমেরিকা ও রাশিয়াকে এক মানদণ্ডে বিচার করে নিজেদের অদলীয় নিরপেক্ষতার বাহাদুরী দেখাই। দম্ভ করে বলি আমরা কোনও দলে নই, সকলের কাছ থেকে তাই আমরা ননীর জন্যে হাত পাতি। আজ সবাই আমাদের মিত্র। আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে পশ্চিমের ধনতন্ত্র; প্রাচ্যের সাম্যবাদ। এমন দিন চিরকাল থাকবে না। ইতিহাসের নিয়মে আমাদের দল বেছে নিতে হবে। তখন আমরা নতুন সাহিত্য লিখব, আমাদের অর্থনীতি, জীবনদর্শন অন্যরকম হবে, আমাদের বিজ্ঞান অন্য পথে, অন্য লক্ষ্যে চলবে।"

সমীর ঘোষের এই সোচ্ছ্বাস উক্তি সেদিন কনট প্রেসের ভোজন সভায় লঘু-হাস্যে উপহসিত হইয়া সভায় সমাপ্তি টানিয়াছিল। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর উত্তেজিত উচ্ছ্বাসেরও দৌড় এই পর্যন্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতি দুর্নিরীক্ষ্য হইলেও কখনই একেবারে থামিয়া থাকে না। যাহাকে মনে হয় হঠাৎ পরিবর্তন, তাহাও হঠাৎ ঘটে না। নানা বিসর্পিত পথে, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা দিয়া তাহা ইতিহাসের উদ্দেশ্য-সাধনের অভিমুখে পদক্ষেপ করিতে থাকে। মহৎ শিল্পীর দিব্য দৃষ্টিতে এই অজানা পথের পথিকদের পাদচারণ প্রতিফলিত হয়। ইহার জন্য মহৎ শিল্পীদেরও প্রয়োজন হয় জীবনের অভিজ্ঞতার পরিধির বিস্তার। বর্তমান ভারতে বুদ্ধিজীবীদের জীবনের পরিধি যতটা বিস্তৃত তাহারই চৌহদ্দীকে মানিয়া লইয়া চাণক্য সেন "সে নহি, সে নহি" উপন্যাসে যে সত্যনিষ্ঠ বুদ্ধিদীপ্ত সংবেদনশীল সমাজ-চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা তাঁহার ভাষাপ্রয়োগের নৈপুণ্যে, ও গল্পগঠনের উৎকর্ষে বর্তমান যুগের অবসানেও ইহাকে পৌঁছাইয়া দিবে ভবিষ্যৎ যুগের মানসলোকে।

LUCRETIUS, De RERUM NATURA

Translated into English

R. C. Trevelyan (Cambridge).

অনুবাদ-গ্রন্থ বিচার করিতে বসিলে একটি প্রশ্ন স্বতঃই মনে জাগে, বিচার করিতে হইবে কাহার তরফ হইতে, যে পাঠক মূলের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, না যে-পাঠকের নিকট মূল একেবারে অপরিচিত। এ প্রশ্নের কোনো সদুত্তর আমার জানা নাই। বর্তমান ক্ষেত্রে বিচারের অধিকারও আমার নাই। আমি শুধু পাঠকবর্গকে এইটুকু জানাইতে পারি যে অনুবাদক প্রস্তুত ছিলেন তাঁহার অনুবাদের পাশাপাশি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লুক্রিশিয়াস-এর মূল ল্যাটিন মুদ্রিত করিতে, প্রকাশকের অসুবিধাতেই তাহা হইয়া ওঠে নাই। তাঁহার বিশ্বাস মূল গ্রন্থের প্রত্যেকটি কথা তিনি যথাযথভাবে অনুবাদ করিয়াছেন, ও এবিষয়ে তিনি পণ্ডিতবর্গের তীক্ষ্ণ পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে ভীত নন।

কিন্তু এমন কোনো কথাই নাই যে প্রতিটি শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ যোগাইতে পারিলেই অনুবাদ সিদ্ধ হইবে। বিশেষ করিয়া মহৎ কবিতায়, যাহার প্রাণশক্তি বাক্যের অর্থ অপেক্ষা ছন্দের স্পন্দনেই গূঢ়ভাবে নিহিত। এই ছন্দস্পন্দনেই হয় একই কালে অনুবাদকের লোভ ও হতাশা। কোনরূপে ইহাকে ফুটাইয়া তুলিতে না পারিলে সমস্ত অনুবাদই হয় প্রাণহীন পণ্ডশ্রম, অথচ সকল শিক্ষিত অনুবাদকই জানে যে ছন্দস্পন্দনের ভাষান্তর মানববুদ্ধির

সীমারেখার প্রকট প্রমাণ। লুক্রিশিয়াস-এর ধ্যানগম্ভীর ষট্‌পর্বিকা যাহার কানে একবার বাজিয়াছে, কোনো অনুবাদই তাহাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। আর সে উদাত্তধ্বনি যে শোনে নাই, কোনো অনুবাদেই যে তাহার রস পরিবেশন করা অসম্ভব, এ কঠিন সত্য ট্রেভেলিয়ানের অবিদিত নয়। ভার্জিলের ল্যাটিন ষট্‌-পর্বিকাকে ইংরাজ কবি টেনিসন যে অর্ঘ্য দিয়াছেন, তাহার দাবী লুক্রিশীয় ষট্‌-পর্বিকার অধিকার বহির্ভূত নহে, পণ্ডিতেরা এইরূপ বলেন। তবু ইংরাজ কবি হইয়া ট্রেভেলিয়ান একটি সুবিধা পাইয়াছেন। তাঁহার মাতৃভাষায় এমন একটি সুপ্রচলিত ছন্দ আছে, বহু যুগের বহু মহাকবির অনুশীলনের ফলে তাহার প্রকাশশক্তি এমনই অকুণ্ঠিত ও অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে, যে এমন ভাবাবেগ কল্পনা করা কঠিন যাহা তাহাতে পূর্ণ কাব্যরূপ পরিগ্রহ করিতে না পারে। আয়াম্বিক পঞ্চপর্বিকার মাহাত্ম্যেই ট্রেভেলিয়ান-এর অনুবাদ এমন স্বচ্ছন্দ সাবলীল ও রসোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। অন্ততঃ একটি পাঠক সানন্দ কৃতজ্ঞতায় স্বীকার করিতেছে যে প্রথম হইতে শেষ লাইন পর্যন্ত আদ্যন্ত পড়িয়া যাইতে তাহার কোথায়ও কোনো বাধা লাগে নাই, অতৃপ্তি বা বিরক্তি জন্মে নাই। যদিও কিছুকাল পূর্বে ভিন্ন অনুবাদে প্রথম লুক্রিশিয়াস পড়িতে গিয়া তাহার অভিজ্ঞতা হইয়াছিল অন্যরূপ।

তবুও মনে হয় ল্যাটিন শিখিবার বিপুল শ্রম সার্থক হয় এক লুক্রিশিয়াসকে আয়ত্ত করিয়া আনন্দ পাইতে শিখিলেই। শ্রেষ্ঠ ল্যাটিন কবিগণের তিনি অন্যতম, ইহা বলিলে লুক্রিশিয়াস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা হয় না। গ্রীক কবিতার মহিমার প্রাখর্যে ল্যাটিন কবিতার গৌরব আজ অনেকাংশ ম্লান। লুক্রিশিয়াস নিজেও গ্রীক প্রভাবে আপাদমস্তক সিক্ত ছিলেন। বিদেশী ভাষার প্রাত্যহিক চর্চা শুধু যে আমাদের প্রকাশভঙ্গীকে প্রভাবিত করে তাহা নহে, আমাদের চিন্তার গঠন ও ভাবের উদ্‌গমকেও ছাড়ে না। ব্যক্তিগত অনুভূতি অভিজ্ঞতা ও দৃঢ়প্রত্যয়ের প্রকাশও তাহার আলোকে বর্ণাঢ্য হইয়া উঠে। এদিক দিয়া ভাবিয়া দেখিলে প্রত্যেক বাঙালী কবিরই লুক্রিশিয়াস অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। এ-হেন গ্রীক প্রভাব সত্ত্বেও—এমন কি তাঁহার একমাত্র গ্রন্থের নামটি পর্যন্ত গ্রীক হইতে গৃহীত—তাঁহার কবিপ্রতিভার স্বকীয়তা অবিসংবাদিত, বিস্ময়কর, স্তম্ভনপ্রদ।

অথচ লুক্রিশিয়াস-এর অভিপ্রায় ছিল না কবি হওয়া ; তিনি কবি, নিজের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও। কাব্য বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, সাজাইয়া গোছাইয়া

ইনাইয়া বিনাইয়া কথার মালা গাঁথা, তাহাকে তিনি মনেপ্রাণে ঘৃণা করিতেন। তিনি ছিলেন জ্ঞানবাদী, গুরুবাদী, অথচ নিরীশ্বরবাদী। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল জ্ঞানপ্রচারের সহায়তায় মানুষের দৈববিশ্বাস ও ভয় দূর করিয়া এই পার্থিব জীবনকে সুন্দরতর ও মহত্তর করিয়া তোলা। বিশ্বের সমস্ত দুঃখ দারিদ্র্য দুর্নীতির মূলে মানুষের অজ্ঞান কুসংস্কার। কার্যকারণ শৃংখলা মানিলে কোনো সমস্যাই অমীমাংসিত থাকে না, দেবতার খেয়াল বা ঈশ্বরের লীলা মানিবার প্রয়োজন হয় না, মানুষ নিজের পায়ে ভর করিয়া নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদির ব্যবহার দ্বারাই দেবত্বে উপনীত হইতে পারে। জাগতিক হেতুবাদে এই প্রগাঢ় প্রত্যয় তিনি অর্জন করেন এপিকিউরীয় দর্শন হইতে। তাই তাঁহার একমাত্র উপাস্য দেবতা এপিকিউরাস। তাঁহার কাব্যগ্রন্থের যেখানে সেখানে তাঁহার সাধারণতঃ কঠিন সংযত ভাষা গুরুভক্তির উচ্ছ্বাসে মুখর হইয়া উঠিয়াছে। প্লেটো জেনোফোনও এ বিষয়ে তাঁহার পিছনে পড়িয়া গিয়াছেন, ভয় হয়। দার্শনিক আত্মবিলোপের এরূপ উদাহরণ আর আছে কি না জানি না। ছয় সর্গে বিভক্ত লুক্রিশিয়াস-এর বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ ছন্দে বাঁধা একটি বিরাট তর্কজাল। একমাত্র উদ্দেশ্য এপিকিউরীয় দর্শনের পুংখানুপুংখ ব্যাখ্যা যাহাতে শিষ্য গুরুকে এক কেশাগ্রও অতিক্রম করেন নাই, অন্ততঃ তাহাই তাঁহার ধারণা। ছন্দের প্রয়োজনও একই উদ্দেশ্যে, যাহাতে দর্শনের তিক্তস্বাদ মিষ্টতায় আবৃত হয়। একান্ত ব্যবহারিক প্রয়োজনই তাঁহার কাব্যের মূল প্রেরণা ; গুরুর মতবাদ প্রচারার্থে অন্য দার্শনিক মতামতকে তিনি নির্দয় ব্যঙ্গ করিতেও পশ্চাৎপদ নন। তাঁর কাব্যে গল্প নাই ঘটনা নাই চরিত্র নাই, আছে শুধু দৃঢ়বন্ধ যুক্তি-প্রয়োগ স্বমতের সমর্থনে ও বিপক্ষের বিনাশনে। কাব্যের বিষয়বস্তু—ইংরাজী সমালোচনার ভাষায় যাহাকে বলা চলে অ্যাক্‌শন্—হইতেছে যুক্তির সংঘাত, সুপ্রাচীন ভ্রান্তির সুপ্রতিষ্ঠিত প্রভুত্বের ক্রমিক পরাজয় ও তিরোভাব, প্রাকৃতিক রহস্যের ও জাগতিক সত্যের অভিনব উপলব্ধির অমোঘ দীপ্তির আবির্ভাবে। কাব্যের চিরাচরিত পথ পরিহার করিয়া দর্শন ও বিজ্ঞান-বোধের ভিত্তিতে কবিতা রচনার প্রচেষ্টা আজ বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আপনাদিগকে ভবিষ্যতের অগ্রদূত ভাবিবার পূর্বে তাঁহারা যেন একবার লুক্রিশিয়াস-এর কথা ভাবিয়া দেখেন।

এই বহুল-বিজ্ঞাপিত দার্শনিকতা সত্ত্বেও লুক্রিশিয়াস-এর কাব্যগ্রন্থ নিছক কাব্য, দর্শন নহে, এবং দান্তে বা মিল্টন-এর কীর্তিকলাপের সহিত তুলনীয়।

বুদ্ধিপ্রণোদিত ঘনবিন্যস্ত যুক্তিজালের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির বিশ্ববীক্ষা ও জীবনবেদ ; সৃষ্টির শৃঙ্খলা বৃহত্ত্ব ও বৈচিত্র্য, এবং প্রকৃতির নিত্য-চঞ্চলতার প্রতি চিরসজাগ দৃষ্টি ; মানবজীবনের সফলতায় উল্লাস ও বিফলতায় করুণা। মানবের সামাজিক ও নৈতিক সমস্যা, ইতর প্রাণীজগতের সহিত মানুষের নিবিড় সহানুভূতির সম্পর্ক, কর্মের উন্মত্ততা ও নির্জন চিন্তা-শীলতার প্রশান্তি—এ সবকিছুই তাঁহার কাব্যে আপনা হইতে স্থান পাইয়াছে, কাহাকেও কষ্ট করিয়া টানিয়া আনিয়া বসানো হয় নাই। দার্শনিক মরুভূমিতে তাহারা নহে মরূদ্যান, বিশ্বের বহুলাঙ্গত্বের তাহারা অনুপ্রেরিত প্রতিরূপ।

প্রশ্ন উঠিবে, লুক্রিশিয়াস-এর কাব্যাংশের উৎকর্ষকে কি তবে গ্রহণ করিতে হইবে তাঁহার অসার দার্শনিক তত্ত্বকে বর্জন করিয়া—মেকলে যেমন করিয়া-ছিলেন ? কারণ ইহা ত সকলেরই জানা কথা যে দর্শন বা বিজ্ঞানের বিচারে এপিকিউরীয় মতবাদ বর্তমানকালে একেবারে অচল। সমস্ত সৃষ্টি যে অসংখ্য অবিভাজ্য কণিকার আকস্মিক যোগাযোগের ফল, কে তাহা আজ সুস্থ অবস্থায় বিশ্বাস করিবে ? তাহা ছাড়া, কণিকার যে অনির্দেশ্য স্বেচ্ছাচালিত তির্যক্-গতি—ক্লিনামেন—এপিকিউরাস ও তৎশিষ্য লুক্রিশিয়াস কল্পনা করিয়াছেন, ন্যায়তঃ তাহা তাঁহাদের মূল প্রত্যয়ের বিরোধী। নিয়তির শাসনাতিরিক্ত মানুষের স্বাধীন পুরুষকারের সমর্থনেই তাঁহারা এ পরিকল্পনা করিতে বাধ্য হইয়া-ছিলেন ; কিন্তু এ যুক্তি ত ন্যায়ের বিচারে টিঁকিতে পারে না। গুরু ও শিষ্য উভয়েই হেতুবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু হেতুবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের প্রয়োজন, তাঁহাদের যুগে তাহা পণ্ডিতসমাজেও অজ্ঞাত ছিল। তাঁহাদের যুক্তির ধারা বহিত নিরীক্ষণ ও উপমানের খাত বাহিয়া ; তাঁহাদের ভুল ধারণায় আজ আমাদের হাসি আসে ; প্রত্যেক দিন হয়ত নূতন সূর্য আমাদের দেখা দেয়, সূর্যকে যত বড় চোখে দেখা যায় তাহার প্রকৃত আয়তনও তাহাই, এসব কি আমাদের নিকট পাগলের প্রলাপ নহে ? তবে কি করিয়া আমরা লুক্রিশিয়াস-এর "প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণন"-কে পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারি ?

কিন্তু এ তর্ক বুদ্ধিজীবী নৈয়ায়িকের, কাব্যরসিকের নহে। অভিজ্ঞ কাব্য-পাঠকমাত্রই জানেন মহৎকাব্য উপভোগের সময় বুদ্ধিপ্রসূত মতামতকে জীর্ণবস্ত্রের মতো দূরে প্রক্ষেপ করিতে হয়। কোনো অখ্রীষ্টিয়ানই তাহা হইলে মিলটন বা দান্তে পড়িবার অধিকারী নহে ; কোনো আধুনিক ব্যক্তিই হোমার

বা ছিদ্র কবিতার রসাস্বাদ করিতে পারে না। এরূপ মন লইয়া অধিকাংশ কবিতাপাঠের চেষ্টা বৃথা হইবে। কবিতায় মজিতে হইলে চাই সেই শক্তি যাহাকে কোলরিজ বলিয়াছেন, স্বেচ্ছায় সন্দিহার অবদমন। এ শক্তি যাহার নাই তাহার পক্ষে লুক্রিশিয়াস পড়িবার আয়োজন না করাই ভালো। এপিকিউরীয় মতবাদ আজ যতই তুচ্ছ মনে হউক, যুগক্রমবোধ থাকিলে দেখা যাইবে সভ্যতার ইতিবৃত্তে তাহার স্থান তুচ্ছ নয়। জগৎ শৃংখলাবদ্ধ, তাহাতে খামখেয়ালীর খেলা চলিতে পারে না, এপিকিউরাস যদি এ তত্ত্ব উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা না করিতেন, আধুনিক বিজ্ঞানের কি গতি হইত ভাবা দুষ্কর। আর হউক সে-মতবাদ পংকস্বরূপ, তাহাতে ফুটিয়াছে পংকজ; লুক্রিশিয়াস-এর কাব্যগ্রন্থ। কামনা করি অধ্যাত্মবাদ বা সাম্যবাদের মূলনীতি (সত্য মিথ্যা যাহাই হউক) অবলম্বন করিয়া রচিত হউক এমন কাব্য যাহাকে লুক্রিশিয়াস-এর সমপর্যায়ে স্থাপন করিতে সাহিত্যরসিক সমালোচক বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করিবে না।

KARL MARX IN HIS EARLIER WRITINGS

H. P. Adams

(George Allen and Unwin)

কার্ল মার্কস্-এর যুগপৎ যুগান্তকারী ও যুগপ্রবর্ত্তক প্রতিভা আজ পৃথিবীর সর্বত্র, অন্ততঃ মৌখিকভাবে, স্বীকৃত। একমাত্র উটপাখী-জাতীয় জীবেরাই ইহাকে নির্বিচারে অবজ্ঞা করার আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতে পারে। প্রগতিবাদের ঐতিহাসিক পাদভূমি হইতে দেখিলে বোঝা যায় ইঁহাদের অস্তিত্বে বর্তমানের সক্রিয় প্রাণসত্তা নাই, ইঁহারা অতীতের প্রেতযোনিসম কালাতিক্রম মাত্র। মার্কস্-বাদকে অবজ্ঞা করার ফলে ইঁহাদের পক্ষে ঘোষণা করিতে বাধে না যে তাঁহারা সোভিয়েটের শত্রু, অথচ, সকল স্বাধীনতাকামী দেশে ইহা বোধ হয় আজ জ্যামিতিক স্বীকার্যের মতো গৃহীত যে সোভিয়েট রাষ্ট্রেই মানব-প্রগতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায়। মানসলোকে উদারনৈতিক মানবপ্রীতির সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও ইঁহারা বস্তুতঃ প্রগতি-বিরোধী, প্রতিক্রিয়া-প্রবণ, প্রতিবিপ্লবী।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের ইতিহাসের বিস্তৃতি মাত্র পঁচিশটি বৎসরের। ইহারই মধ্যে তাহার কীর্তিকলাপ বিশ্বে যে আন্দোলন তুলিয়াছে তাহার তুলনা নাই। সে কীর্ত্তি কেবল সুদীর্ঘ সমরাঙ্গনে অলৌকিক বীরত্বে নিবদ্ধ নহে,—ফাশিস্ট

জারমানি সে ক্ষেত্রে তাহার গৌরবের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী,—অনাবিল শান্তির উজ্জ্বলতর বিজয়ের পথে তাহা সমাস্তীর্ণ, যে ক্ষেত্রে ফাশিস্ট জারমানি তাহার সহিত তুলনারও অযোগ্য। তাই, চক্রশক্তির বাহিরে সকল সভ্য দেশে সোভিয়েট সুহৃৎ সংঘ গড়িয়া উঠিতেছে, ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই। কবি শিল্পী দার্শনিক বৈজ্ঞানিক মনীষীরা একবাক্যে সোভিয়েট রুশিয়ার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছেন, কারণ মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ এই একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের উপর অনেকাংশে নির্ভর করিতেছে। অনেকে সোভিয়েটের সুহৃৎ অথচ মার্কসবাদে অর্থাৎ দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে নিঃস্পৃহ। সকলেরই জানা কথা, মার্কসবাদ সোভিয়েট রাষ্ট্রের মূলভিত্তি, সোভিয়েট রাষ্ট্র মার্কসবাদের সাবয়ব প্রতিফলন। আলোচনার প্রসার ও প্রভাব যে পরিমাণে বাড়িতে থাকিবে, সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সেই সঙ্গে মানবজাতির ভবিষ্যৎ হইবে সেই নিরাপদ।

এই দিক দিয়া দেখিলে বর্তমান গ্রন্থের নামটি সহজে মার্কসবাদী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কার্ল মার্কস মার্কসবাদী হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন নাই, হইয়া উঠিতে তাঁহার কিছু সময় লাগিয়াছিল। যে শিক্ষা, চিন্তা ও কর্মধারার ফলে তিনি ক্রমশঃ, যদিও অতিদ্রুত, কান্ট ফিটে হেগেল ও ফয়েরবাখ্-এর শিষ্যত্ব-পর্ব কাটাইয়া স্বকীয় বৈপ্লবিক জীবনবেদে উপনীত হইলেন তাহার চিত্তাকর্ষক ইতিহাস মার্কসবাদী আলোচনার অবিভাজ্য অঙ্গ হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় মার্কসের এই যুগের রচনাগুলির সুসম্পাদিত সংস্করণ জারমান ও রুশ ভাষাতেও সুলভ নহে, ইংরাজীতে ত' আরো দুর্লভ। মেহ্রিং রচিত মার্কস্-এর জীবনচরিতে ও সিড্নে হুক রচিত "ফ্রম হেগেল টু মার্কস" গ্রন্থে ইহাদের কিঞ্চিৎ আভাস পূর্বে পাওয়া গিয়াছিল। এই দুষ্প্রাপ্য রচনাগুলিকে অবলম্বন করিয়াই আলোচ্য গ্রন্থের পরিকল্পনা।

লেখক মার্কসবাদী নহেন, কিন্তু তিনি বিবেকবান্। মার্কস্-রচনার পরিচয় দিতে গিয়া তাই তিনি একেবারে সূচনা হইতে সুরু করিয়াছেন। ১৮১৮ সালে মার্কস্-এর জন্ম হয় জারমানির ট্রিয়র নগরে, ও ১৮৩৪ পর্যন্ত স্থানীয় স্কুলে মার্কস্ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার ছাত্রাবস্থায় লিখিত কয়েকটি রচনা অবলোপের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে। তাহাদের একটিতে এমন একটি বাক্য আছে যাহাকে জীবনচরিতকার মেহ্রিং ভবিষ্যৎ মার্কসীয় সাম্যবাদের প্রথম ক্ষীণ অরুণলেখা বলিয়া আবাহন করিয়াছেন ;—"আমাদের সামাজিক

সম্বন্ধগুলিকে আমরা নির্ধারিত করিতে পারার পূর্বেই তাহারা কিয়দংশে সক্রিয় হইয়া থাকে।" মনে পড়ে কেহ এক সময়ে লেনিনকে প্রশ্ন করে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ সম্বন্ধে মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌ কি কোন বই লিখিয়াছেন? উত্তরে লেনিন বলেন, মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌ এমন কোন্‌ বই লিখিয়াছেন যাহা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ নহে? ১৮৩৫ সালে মার্কস্‌ স্কুল ছাড়িয়া বন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন আইনবিজ্ঞান অধ্যয়নের উদ্দেশ্য। শুনিতে অবাক লাগে, এই সময়ে বৈপ্লবিক সাম্যবাদের আদিগুরু কবিতা লিখিতেন ও জেনি ফন ভেষ্টাফালেন নাম্নী সম্ভ্রান্ত বংশীয় অপরূপ সুন্দরী তরুণীর সহিত বিবাহের জন্য বাগ্‌দত্ত হন। '৩৬ হইতে '৪১ সাল কাটে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইতিহাস ও দর্শনের চর্চা, বিশেষতঃ হেগেলীয় দর্শনের অন্তর্ভেদী আলোচনা, এইখানেই আরম্ভ হয়। কর্মক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ ঘটে কলোন নগরে '৪২-৪৩ সালে, 'রাইনিশে ৎসাইটুং' নামক সংবাদপত্রের লেখক ও পরে সম্পাদক হিসাবে; মার্কসের নির্ভীক সম্পাদনার ফলে কাগজের প্রভাব ও গ্রাহক-সংখ্যা দ্রুত বাড়িতে থাকে। ফলে সরকার কাগজটি বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন ও মার্কসকে দেশ ছাড়িয়া ফ্রান্সে আসিতে হয়। ইতিমধ্যে জেনি-র সহিত বিবাহ ঘটিয়া গেল। ১৮৪৪ সালে বাহির হইল "ফরাসী জারমান বার্ষিকী" যাহাতে প্রথম মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌-এর লেখা একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এই উপলক্ষে প্যারিস নগরীতে ইঁহাদের ভবিষ্যৎ বন্ধুত্বের প্রথম সূত্রপাত। এই বন্ধুত্বের তুলনা আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাসে বিরল। সমাজবিপ্লবী কার্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মার্কস্‌ জার্মান সরকারের প্ররোচনায় ফ্রান্স হইতে বিতাড়িত হইয়া ব্রুসেলস্‌-এ আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেখান হইতে এঙ্গেলস্‌-এর সহযোগিতার দুটি পুস্তক লেখা হইল। এক, "পবিত্র পরিবার"—ইহার উদ্দেশ্য মার্কস্‌-এর পূর্বতন সহচর "তরুণ হেগেলীয়"দের ব্যঙ্গ করিয়া তাহাদের ভুল দেখাইয়া দেওয়া; দুই, "জারমান আইডিয়োলজি", ইহার উদ্দেশ্য পূর্বতন গুরু হেগেলের সহিত বোঝাপড়া করা। মার্কস্‌ ও এঙ্গেলস্‌ কোনোদিন হেগেলের নিকট তাঁহাদের ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে বিরত হন নাই। তাঁহাদের দাবি শুধু এই যে তাঁহারা হেগেলের ভাববাদী সিদ্ধান্তগুলিকে পরিহার করিয়া তাঁহার দার্শনিক পদ্ধতিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে গ্রহণ ও প্রয়োগ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ দুটিতে দেখা যায় যে দুই বন্ধুর পরস্পর আলোচনার ফলে তাঁহাদের মতামত ক্রমশঃ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। তাঁহারা কেবল

অপরের মত খণ্ডন করিয়াই তৃপ্ত নন, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজবিপ্লবের ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে সুচিন্তিত নির্দেশ দিতেছেন। যাহা কিছু অস্পষ্ট, যাহা কিছু বিপ্লব-বিরোধী, তাহার বিরুদ্ধে ইঁহাদের ব্যঙ্গ যেরূপ ক্ষুরধার, পাণ্ডিত্য সেইরূপ অগাধ ও যুক্তি সেইরূপ অমোঘ। চল্লিশ বৎসর পরে বেবেল-কে লিখিত এক পত্রে এঙ্গেলস্ সানন্দে স্বীকার করেন এই সহযোগিতায় মার্কস্ তাঁহাকে শিখাইয়াছিলেন "কি ভাবে খাটিতে হয়।" ১৮৪৭ সালে বিখ্যাত ফরাসী লেখক প্রুধোঁর সহিত তর্কযুদ্ধ বাধিল। সমাজতন্ত্রের চিন্তানায়ক হিসাবে তিনি লিখিলেন "দারিদ্র্যের দর্শন", ফরাসী ভাষাতেই মার্কস্ যাহার উত্তর দিলেন "দর্শনের দারিদ্র্য" নামক গ্রন্থে। ব্যঙ্গ ও যুক্তিতে মার্কস্ প্রুধোঁর রচনাকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিলেও তাঁহার প্রভাবকে একেবারে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। আজ পর্যন্ত অনেক প্রতি-বিপ্লবী আন্দোলনের মূল অনুসন্ধান করিলে প্রুধোঁ-প্রবর্তিত ধারণার অস্তিত্ব ধরা যায়।

এইখানেই মার্কস্-রচনার আদি পর্বের শেষ। এই যুগের দুরধিগম্য গ্রন্থগুলির বিস্তৃত সারসংকলন ও তাহাদের ঐতিহাসিক পটভূমিকা সংযোজন করিয়া লেখক সাম্যবাদী পাঠকমাত্রের কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। ১৮৪৮ সালে প্রকাশিত হইল "সাম্যবাদী ঘোষণা," বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ বিষয়ে সর্ব-প্রথম ও সম্ভবতঃ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ। রিয়াজানোভ-কৃত মুখবন্ধ ও ভাষ্যসহ এ গ্রন্থ যাঁহারা অধ্যয়ন করিয়াছেন, এবিষয়ে তাঁহাদের দ্বিমত হইবার সম্ভাবনা নাই। আন্তর্জাতিক গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে ইহার প্রকাশ স্মরণীয়তম ঘটনা বলিয়া স্বীকৃত। এখন হইতে মার্কস্ আর শিক্ষানবিশ সমালোচক নহেন, ত্রিশ বৎসর বয়স হইতেই বিধৃত-সত্য প্রয়োগ কৌশলী নেতা। তাই মার্কস্-রচনার আদি পর্বের আলোচনায় "সাম্যবাদী ঘোষণা"র পূর্বেই থামিয়া যাওয়া গ্রন্থকারের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হইয়াছে।

পরিশিষ্ট

'বাংলায় ম্যাকবেথ'

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

আমি বঙ্গীয় শেকসপীয়র পরিষদে একজন সাধারণ কর্মী। সেই জন্য আমি শ্রীরণজিৎ গুহের প্রবন্ধ "বাংলায় ম্যাকবেথ"*—বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে পড়েছি। পড়ার পর মনে হল যে-কোনও কারণেই হোক শ্রীনীরেন্দ্রনাথ রায়ের ম্যাকবেথ অনুবাদ তাঁকে অত্যন্ত উত্তেজিত করেছে, যার ফলেই হয়তো তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছে; স্পষ্ট জিনিস তাঁর চোখে পড়েনি, এবং অত্যন্ত সোজা জিনিসকেও তিনি বাঁকা দেখেছেন।

আমি যতদূর জানি শেকসপীয়র পরিষদের কোনও অনুষ্ঠানে রণজিৎবাবু কখনও যোগ দেন নি, তার সম্বন্ধে কোনও আগ্রহও তাঁর নেই। নইলে তিনি শেকসপীয়র পরিষদ ও তার সহযোগী সমর্থকদের প্রতি বিরূপ কটাক্ষপাত করিতে পারিতেন না "শেকসপীয়র-ব্যসনী" বলে। তিনি সহজেই জানতে পারতেন যে পরিষদের কার্যাবলী কেবল "সাহিত্যসভার সায়াহ্নিক আসরে আবদ্ধ

নীরেন্দ্রনাথ রায়ের "ম্যাকবেথ"-এর অনুবাদ নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। সেই বিতর্কের উত্তর দেন প্রখ্যাত অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ রায়ের বঙ্গবাসী কলেজে সহকর্মী ও বঙ্গীয় শেকসপীয়র পরিষদের উৎসাহী উদ্যোক্তা। নীরেন্দ্রনাথের অনুসৃত অনুবাদ পদ্ধতি এই প্রবন্ধ পাঠে জানা যাবে।

* পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৬১

ছিল না"। পরিষদের মুদ্রিত নিয়মাবলীতে তার উদ্দেশ্য ও কর্মতালিকা বলা আছে ঃ

—শেকসপীয়রের রচনাবলীর যথাযথ অনুবাদ ;

—বাংলা ভূমিকা, ব্যাখ্যা ও মন্তব্যসহ রচনাবলীর সম্পাদন ;

—অনূদিত রচনাবলীর প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় ;

—অনুবাদ ও মূলে অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতা ;

—স্কুলে ও কলেজে শেকসপীয়র রচনা হইতে মূলে ও অনুবাদে আবৃত্তি শিক্ষা দান ;

—পরিষদের তত্ত্বাবধানে শেকসপীয়রের গ্রন্থাগার সংগঠন ;

—আন্তর্জাতিক শেকসপীয়রের গবেষণার সহিত যোগাযোগ ;

—পরিষদের মুখপত্র প্রকাশ ;

—অভিনয়, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতাবলীর ব্যবস্থা।

আমি ভেবে পাইনা এর কোন্‌টাকে রণজিৎবাবুর ভাষায় "ব্যসন" বলা যায়। অভিনয় সম্বন্ধে রণজিৎবাবু যে গুরুত্ব দিয়েছেন, তা-ও কি এর মধ্যে নেই? শেকসপীয়রকে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের থিয়েটার পাড়ায় নিয়ে যাবার জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে যে চেষ্টা হয়েছিল, তা-ও তিনি একটু খোঁজ করলেই জানতে পারতেন। শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়-কৃত 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর অনুবাদ নিয়ে শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও ছবি বিশ্বাস মহাশয়দের কাছে প্রকাশ্যে অভিনয় করানোর জন্য পরিষদের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল। সে চেষ্টা যদি সফল না হয়ে থাকে তার জন্য কি পরিষদই একমাত্র দায়ী? পরিষদের চেষ্টাতেই বাংলা অনুবাদের শেকসপীয়র অভিনীত হয়েছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, 'লিট্‌ল থিয়েটার'-এর কর্মীবৃন্দ ও রবীন্দ্রনাট্য পরিষদের অধ্যাপক অভিনেতাদের প্রযোজনায়। এরপর অন্তত এটুকু বলা চলে না যে পরিষদ অভিনয় সম্বন্ধে অবহিত নয়।

(২)

প্রধানত নীরেনবাবুর অনুবাদ নীতিই রণজিৎবাবুকে উত্তেজিত করেছে। তাঁর মতে এ নীতি "বন্ধ্যা-নীতি"; "অনুবাদ-আদর্শের গোড়ায়ই গলদ"।

নীরেনবাবুর ভূমিকায় "মূলের প্রত্যেক শব্দের প্রতিশব্দ" এইটুকু পড়ার পরই তিনি এতদূর উত্তেজিত হয়ে পড়েন যে বোধহয় বাকিটুকু পড়ার প্রয়োজন মনে করেননি। নীরেনবাবু যে নীতি অনুসরণ করেছেন, তার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,—

"এই নীতির উদ্দেশ্য মূলের যথাযথ অনুগামী হওয়া। এই নীতিতে মূলের প্রত্যেকটি শব্দের প্রতিশব্দ দিবার চেষ্টা করা হয়; এবং অনুবাদে এমন কোনও শব্দ ব্যবহার করা হয় না যাহার উপযোগী শব্দ মূলে নাই।

"ইহা ত গেল নাটকের অর্থগত দিক। শেকসপীয়রের নাট্যকাব্যে ছন্দের গুরুত্ব শব্দগত অর্থের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বলা বাহুল্য ইংরেজি পঞ্চপার্বিক 'ব্লাংক ভার্স'-এর অবিকৃত প্রতিরূপ বাংলায় ফোটাইয়া তোলা হয়ত অসম্ভব ব্যাপার। যতটা সম্ভব তাহা হইতেছে শেকসপীয়রের বাক্যবলীর শব্দসংযোজন ও যতিসংস্থাপনকে সযত্নে অনুসরণ করা যাহাতে শেকসপীয়র রচনার ধ্বনিসম্পদের কিছুটা আভাস অনুবাদে প্রতিফলিত হয়। মূলে যেখানে গদ্য বা মিত্রছন্দ আছে, অনুবাদে তাহাই করা আছে। এই সঙ্গে সর্বদাই মনে রাখা হইয়াছে যেন অনুবাদে ভাষা অযথা শ্রুতিকটু বা অস্পষ্টার্থ না হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করি, এই নীতিকে কি "অনুবাদিজম্" বা "দুয়ে দুয়ে চার" নীতি বলা চলে? তা যদি না হয় তা হলে মানতে হবে রণজিৎবাবুর সমস্ত যুক্তিজাল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে তাঁর নিজের গলাতেই লটকে গেছে, উত্তেজনাবশে যা তিনি লক্ষ্য করেন নি।

(৩)

আমার দুর্ভাগ্য রণজিৎবাবুর মতো রুশ ভাষা শেখবার সুযোগ আমি পাই নি। তাঁর প্রধান যুক্তিঃ রুশ-অনুবাদক পাস্তেরনাক যেভাবে শেকসপীয়রের অনুবাদ করেছেন, নীরেনবাবু তা করেন নি। তাঁর মতে শেকসপীয়রের অনুবাদে পাস্তেরনাকের উদাহরণ চরম আদর্শ, যার ওপর আর কোনও কথা চলবে না। "নীরেন্দ্রনাথের নীতি যদি উচ্চতম আদর্শ হয়" (গোপাল হালদারের ভাষায়*), "তা হলে পাস্তেরনাকের পদ্ধতিটি একেবারেই ভ্রান্ত বলতে হবে," এই হল তাঁর যুক্তি। সেই সঙ্গে তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে হত্যা-কাণ্ডের দৃশ্যটিতেই পাস্তেরনাক পনেরোটি ব্যতিক্রম ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ পাস্তেরনাক যেখানে শেকসপীয়রের থেকে দূরে সরে যান, সেখানে আর কারও শেকসপীয়রের কাছাকাছি যাওয়ার অধিকার নেই।

* পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯

রুশভাষা না জেনেও আমরা জানি পাস্তেরনাক যশস্বী অনুবাদক। কিন্তু রণজিৎবাবুকে আমি মনে করিয়ে দিতে চাই যে রুশ দেশেও পাস্তেরনাকের অনুবাদকে চরম আদর্শ বলে মেনে নেওয়া হয়নি। সেখানেও চেষ্টা হয়েছে শেকসপীয়রের অনুবাদকে মূলের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাবার। সকলেই জানেন অধ্যাপক মরোজভ ছিলেন সোভিয়েত দেশে শেকসপীয়রের-সাধনায় অগ্রগামী নেতা। তিনি লিখেছেন ঃ

"Our young poet Withelm Levik also belongs to the first rank of our translators of Shakespeare. Before he began his Shakesperian translations he was already known for his translations of Heine's poems. Later he published first-rate translation of several of Robert Browning's poems as well as Coleridge's 'Ancient Mariner'. A year ago he began to collaborate with me on translations of Shakespeare's plays. I prepare a verbatim translation in prose which he uses as a basis for his poetic translation which is then edited by me".

("Shakespeare on the Soviet Stage", P. 22)

মরোজভ আরও বলেছেন ঃ

"Many of our translators of Shakespeare are 'equilinear', that is to say, they contain to be same number of lines as the original play. But even in the absence of an absolute parity in the number of lines the difference between the total number of lines in the translation and in the original is never very significant and usually does not exceed five or six percent, although Russian words are much longer than their equivalents in English".

আমরা জানি যে জার্মানিতে শেকসপীরীয় গবেষণা উচ্চস্তরে পৌঁছেছিল। সম্প্রতি প্রকাশিত Shakespeare Survey (No. 7) গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ

"In February, 1953 the first volume of Richard Fletter's new German translation was brought on the market. The first volume contains the translations of Othello, Macbeth

and the Midsummer Night's Dream. The translator aims, as is to be expected from the author of 'Shakespeare's Producing Hand', to render the folio text as accurately into German as possible, paying particular attention to its punctuation".

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, এঁদের সম্বন্ধে রণজিৎবাবু কী বলবেন? এরা নীরেনবাবুর মতো কেবল 'শব্দদাস' নন, একেবারে 'লাইন-দাস' বা 'কমা-সেমিকোলন-দাস'। নীরেনবাবুও তাঁর অনুবাদে "শেকসপীয়র রচনার শব্দসংযোজন ও যতিসংস্থাপনকে সযত্নে অনুসরণ" করতে চেষ্টা করেছেন। রণজিৎবাবু যদি প্রকৃতই অভিনয়-অনুরাগী হন—ব্যসনী না হয়ে—তিনিও মানতে বাধ্য হবেন যে শেকসপীয়র অভিনয়ে এই "শব্দ-সংযোজনা ও যতি সংস্থাপনের" নাটকীয় গুরুত্ব কত বেশি; এটা কোনও একজন অনুবাদকের ব্যক্তিগত খেয়ালমাত্র নয়।

(৪)

আসল কথা রণজিৎবাবুর মাথার মধ্যে বুর্জোয়া সভ্যতার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। তাই তিনি অনুবাদকের স্বাধীনতার পক্ষে এত ওকালতি করেছেন। তাঁর মনে রাখা উচিত ছিল স্বাধীনতা বস্তুনিষ্ঠ না হলে অনাচারে পরিণত হয়। অনুবাদকের পক্ষে মূল গ্রন্থটাই বস্তু; তাকে আপন ভাষায় যথাসম্ভব অনুরূপভাবে প্রতিবিম্বিত করতে পারাতেই অনুবাদকের কৃতিত্ব। আমরা দেখেছি আধুনিক অনুবাদের ধারা এই পথে উত্তরোত্তর এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অনুবাদকের স্বাধীনতা যে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, এই যথার্থ ধারণা বুর্জোয়া যুগেও জানা ছিল। তাই ইংরেজ কবি পোপ হোমারের যে প্রসিদ্ধ অনুবাদ করেন, তা পড়ার পর মহাপণ্ডিত বেন্টলি বলেছিলেন, "It's pretty but it is not Homer." আমরা সকলেই ফিটসজেরল্ডের "ওমর খৈয়াম"-এর সহিত পরিচিত, ও তার কবিত্বে মুগ্ধ। কিন্তু কোনও পাঠক কি এই বিশ্वবিখ্যাত কবিতাটিকে বিদেশী ভাষার যথাযথ অনুবাদ বলে ভাবতে পারেন? এখানেও বলা যায় কবিতাটি বাস্তবিক সুন্দর কিন্তু অনুবাদ হয়নি। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে, সর্বপ্রকার বিপরীত দাবি সত্ত্বেও, সুখপাঠ্য হলেই ভালো অনুবাদ হয় না।

এইভাবে ভেবে দেখলে বোঝা যায় শেকসপীয়রের "অনুবাদের উৎকট

বিচারে বাংলা পাঠকের ইংরেজি শিক্ষার অভাবের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর", রণজিৎবাবুর এই উক্তি কত ভ্রান্ত। সাধারণ পাঠক মোটামুটি অনুবাদেও কিছুটা আনন্দ পেতে পারেন একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু অনুবাদক যা দাবি করছেন, অর্থাৎ তিনি নিজে এক স্বতন্ত্র সৃষ্টি করেন নি, তিনি আর-একটি শিল্পসৃষ্টিকে প্রতিফলিত করছেন, এ দাবির মূল্য যথার্থ কিনা, তার বিচার করার সামর্থ্য সাধারণ পাঠকের থাকতে পারে না; তার জন্য চাই বিশেষজ্ঞের জ্ঞান। জলমেশানো দুধে তাদেরই ভোলানো যায় যাদের খাঁটি দুধের স্বাদ জানা নেই। তাই পোপের হোমার পড়ে হাজার হাজার লোক আনন্দ পেলেও বেণ্টলির রায় বজায় থাকে, যদি রণজিৎবাবু তাকেও উড়িয়ে না দেন।

(৫)

রুশভাষার প্রতি অনুরাগের টানে রণজিৎবাবু শেকসপীয়রের ইংরেজি নাট্য পাঠে ততটা মন দিতে পারেন নি, যতটা দিয়েছেন পাস্তেরনাকের অনুবাদে। তাই তাঁর প্রবন্ধটি একদিকে অনর্থক পাণ্ডিত্যে ভারাক্রান্ত অন্যদিকে নীরেন-বাবুর মূলানুগামিতার বিরুদ্ধে উদ্ভট মন্তব্যে পরিপূর্ণ। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের অনুবাদ তাঁর ভাল লেগেছে। এতে কারও কিছু বলার নেই। যতীন্দ্রনাথকে অশ্রদ্ধা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তিনি শক্তিশালী কবি; তিনি যে শেকসপীয়র-অনুবাদের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন, সেজন্য আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু মরোজভই দেখিয়েছেন যে নিছক কবিত্বশক্তি শেকসপীয়র অনুবাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। অনুবাদের এই বৈজ্ঞানিক নীতির সঙ্গে যতীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল না, এটা আমাদের দেশের পক্ষে দুঃখের কথা। কিন্তু নীরেনবাবুকে নস্যাৎ করার আগ্রহে রণজিৎবাবু যতীন্দ্রনাথের অনুবাদের পক্ষে যে সব যুক্তি দিয়েছেন, তা অসংবদ্ধ প্রলাপের মতো শোনায়।

ম্যাকবেথ নাটকের সর্বপ্রথম দৃশ্য—ডাকিনী দৃশ্য—শেকসপীয়রের উচ্চতম উৎকর্ষের অন্যতম নিদর্শন। রণজিৎবাবু ঠিকই বলেছেন, এখান থেকেই অনুবাদকের শক্তিপরীক্ষা শুরু হয়। কিন্তু পর মুহূর্তেই যখন পড়ি, "ডাকিনীর হিংসুটেপনা, গায়ে পড়ে কোঁদল পাকাবার পিশাচী প্রবণতা, সু-য়ে আর কু-য়ে জগাখিচুড়িতে নিশ্চিত সর্বনাশের ঘোট পাকানোর দায়িত্বহীন খেলার হালকা চাল", তখন বিস্ময়ে চোখ রগড়াতে হয়। এখানে রণজিৎবাবু কোন্ ডাকিনীদের কথা বলছেন,—শেকসপীয়রের ম্যাকবেথের; না মিডলটনের উইচ-এর? যে ডাকিনীদের শেকসপীয়র এই দৃশ্যে দেখিয়েছেন "চটুল

পৈশাচিকতা" বা "তিড়িংমিড়িং লাফালাফি" মোটেই তাদের লক্ষণ নয়। তাদের কণ্ঠেই ফুটেছে এই ট্রাজেডির মূল সুর; যে সুর মানব-নিয়তির নিষ্করুণ রহস্যময়তায় সুগম্ভীর। তাদের সম্বন্ধে অধ্যাপক গ্রিয়ারসন বলেন, "The y are an objective embodiment of the power of evil. The awe which they inspire, their power to trouble the soul, is felt by Macbeth as well as Banquo". প্রথম দৃশ্যে ডাকিনীদের এই awe inspire করবার ক্ষমতাটা রণজিৎবাবু একেবারেই ধরেন নি। তাই নীরেনবাবুর অনুবাদের গম্ভীরতা তাঁর কাছে নিষ্প্রাণ।

এই দৃশ্যের শেষ দুটি লাইনের অনুবাদে "ভালো-মন্দ" ও "সু-কু"র প্রয়োগ নিয়ে তিনি যে গবেষণা করেছেন, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। কারণ এ দু ধরনের শব্দই বাংলা ভাষায় সুপ্রচলিত; অর্থবোধে কোনও কষ্ট নেই। একথা ঠিক ম্যাকবেথের প্রথম উচ্চারিত বাক্যের সঙ্গে এই দুই লাইনের নিগূঢ় যোগ আছে। গিরিশচন্দ্র তা রাখেন নি; যতীন্দ্রনাথ তা রেখেছেন। কিন্তু রাখতে গিয়ে প্রথম দৃশ্যে তাঁকে লিখতে হয়েছে, "সু মোদের কু আর কু মে াদের সু ভাই।" "ভাই" শব্দ এখানে শুধু অনাবশ্যক নয়, প্রয়োগে fair is foul and foul is fair—এর সংক্ষিপ্ত তীক্ষ্নতা একদম ভোঁতা হয়ে গেছে। সে তুলনায় নীরেনবাবুর অনুবাদ "ভালোটাই মন্দ আর মন্দটাই ভাল" মূলের ভাব ঢের বেশি বজায় রেখেছেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

(৬)

ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদের একটা বিশেষ সমস্যা হচ্ছে—নাটকীয় চরিত্রদের সামাজিক সম্পর্কের। বাংলায় তিনটি রূপ প্রচলিত: তুই, তুমি ও আপনি, ইংরেজিতে দুটি। সুতরাং বাংলা অনুবাদে কখন কোনটাকে প্রয়োগ করতে হবে, সে সম্বন্ধে অনুবাদককে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়। অবশ্য বাংলায় নাটকীয় ভাষায় সব স্থানেই তুমি, তব, তোমা ইত্যাদি দিয়ে কাজ চালানোর একটা প্রবণতা আছে। কিন্তু তাতে পরস্পর সম্বন্ধের অস্পষ্টতা না এসে পারে না। ব্যাঙ্কো যখন ম্যাকবেথকে বললেন, "Good sir, why do you start ?" তখন পরস্পর সম্বন্ধের একটা ইঙ্গিত আছে, বোঝা যায় ম্যাকবেথ ব্যাঙ্কোর শ্রদ্ধার পাত্র, যাঁর সঙ্গে আলাপে বাংলায় 'আপনি' প্রয়োগ করি। সুতরাং এর অনুবাদে, "একি বন্ধু, চমকিলে কেন ?" লিখলে এই ইঙ্গিতটি

অস্ফুট থেকে যায়। নীরেনবাবু তাই ঠিকই অনুবাদ করেছেন, "মহাশয়, কেন চমকান যেন পেয়েছেন ভয়?"

ডাকিনীদের প্রথম দেখা মাত্র ব্যাঙ্কো তাদের "তুই" সম্বোধন করেন, কারণ তাঁর মনে ভীতি বা অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু ম্যাকবেথ প্রথমে তাদের "তুমি" সম্বোধন করেন, কারণ তাঁর সঙ্গে ডাকিনীদের ছিল আত্মিক যোগ—"পার যদি বল ত্বরা কে তোমরা" ("Speak if you can, what are you?")। কিন্তু পরে ডাকিনীদের অন্তর্ধানের সম্ভাবনায় উত্তেজিত হয়ে ম্যাকবেথ বললেন, "Stay, you imperfect speakers'…Speak, I charge you" এখানে নীরেনবাবু উপযুক্তভাবেই ম্যাকবেথের মুখে দিয়েছেন "তুই"-এর প্রয়োগ।

"Was the hope drunk wherein you dressed yourself", নীরেনবাবু এর অনুবাদ করেছেন, "যে আশা-পোষাক তুমি পরেছিলে এতদিন, তা কি ছল মদমত্ত"। এ অনুবাদে রণজিৎবাবুর গভীর আপত্তি, কারণ এতে mixed metaphor আছে যার প্রচলন বাংলায় বেশি নেই। Mixed metaphor ইংরেজীতেও বেশী নেই। কিন্তু শেকসপীয়রের পরিণত স্টাইলের এই একেবারে প্রাণস্বরূপ। তাকে বাদ দিয়ে শেকসপীয়রের অনুবাদ মূলের প্রাণশক্তিকে অস্বীকার করার তুল্যমূল্য।

এইভাবে প্রত্যেকটি উদাহরণ দিয়ে দেখানো যায় নীরেনবাবুর অনুবাদে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য আছে তা রণজিৎবাবু আদৌ লক্ষ্য করেন নি। উত্তেজনাজনিত দৃষ্টিবিভ্রমই বোধহয় তার একমাত্র কারণ। যতীন্দ্রনাথের অনুবাদ পদ্ধতির সঙ্গে নীরেনবাবুর পদ্ধতির যা তফাত তাকে এইভাবে টুকরো টুকরো করে দেখানো এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাই আমি একটি বিশেষ অংশ বেছে নিয়ে তার দুটি অনুবাদই পাঠকদের কাছে উপস্থিত করব; যে অংশটি বেছে দিচ্ছি সেটি যে শেকসপীয়রের নাটকীয় ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তা কেউ অস্বীকার করবে না; সেটি হচ্ছে প্রথম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্য—ম্যাকবেথের স্বগতোক্তি, যা অনুবাদের কৃতিত্বের মাপকাঠি:

If it were done when 'tis done, then 'twere well
It were done quickly. If the assasination
Could trammel up the consequence, and catch
With his surcease, success; that but this blow

Might be the be-all and the end-all here,
But here, upon this bank and shoal of time,—
We'd jump the life to come.

যতীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন—

কারিলেই হত যদি কর্মের সমাপ্তি
দ্রুত ক'রে ফেলা হত ভাল।
এই হত্যা যদি জাল ফেলে তুলিতে পারিত টানি'
সর্ব পরিণতি তার নিরাপৎ সাফল্যের তীরে ;
একটি আঘাতেই যদি হ'ত শেষ কথা, এই পারে,
জীবনের ক্ষুদ্র এই বালুর চরায়, ওপারের অসীমে
যা হ'বার তা হ'ত।

নীরেনবাবু অনুবাদ করেছেন—

শেষের সহিতই যদি এ কাজের হয়ে যেত শেষ,
যত শীঘ্র শেষ ভালো ; যদি এই হত্যাকাণ্ড
পারিত গুটাতে জালে সব ফলাফল, ও সাথে সাথে
দিত সফলতা ; যদি এই একটি আঘাত
হোত এই ধরাতলে প্রচেষ্টার আরম্ভ ও শেষ,
মাত্র এই ধরাতলে, কাল-পারাবার মাঝে
অগভীর কুলে, পরকাল একলাফে হয়ে যাবো পার।

এখন পাঠক বিচার করুন কোনটিতে শেকসপীয়রের নাটকীয়ত্ব ও কবিত্ব বেশি বজায় থেকেছে, কোনটি মূলের নিকটতর হয়েছে।

(৭)

নীরেনবাবুর বিরুদ্ধে রণজিৎবাবুর শেষ অভিযোগ এই যে তাঁর বাংলা 'ইংরেজী-গন্ধী' 'ফিরিঙ্গী বাংলা' ; 'ইংরেজী বাক্যরীতিকে বাংলায় পরচুলা পরানো'। এই অভিযোগ বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শুনলে হাসি সামলানো দায় হয়ে পড়ে। এ যে একেবারে ছুৎ-মার্গ-ইজ়ম্, হিন্দু-মহাসভার যাতাত্ত্বিক সংস্করণ। ইতিহাসের অধ্যাপক রণজিৎবাবু কি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ভুলে গেলেন? তাঁর মনে পড়ে না প্রায় একশো বছর আগে ঠিক এই অভিযোগ এনেছিলেন মধুসূদনের বিরুদ্ধে রাজনারায়ণ বসু :

"তিনি (মধুসূদন) তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু-পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট প্যান্টুলন দেখা যায়" (বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা)। আবার রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছিলেন, "'ধ্বনিলা' 'চেতনিলা', 'অস্থিরিলা', প্রভৃতি চক্ষুশূলরূপ নূতন ক্রিয়াপদ এদের এত শ্রাদ্ধ হইয়াছে যে সেগুলি দেখিলে হাস্য-সম্বরণ করা যায় না"। (বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব)। এমন কি 'ক্যালকাটা রিভিউ'-এ বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে লিখেছিলেন, "We must strongly protest against the introduction of the imitation of the English idiom of such verbs as swanila, stutila, nirghosila." কিন্তু এই প্রতিবাদের কি গতি ইতিহাস করেছে রণজিৎবাবুকে কি তা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে? বাংলায় "রিলেটিভ ক্লজ" ব্যবহারের বিরুদ্ধে আপত্তি আমার মনে হয় ঠিক এই শ্রেণীরই আপত্তি। যখন দেখা যাচ্ছে 'রিলেটিভ ক্লজ'"-এর নানাবিধ ব্যবহার 'সবুজপত্রে'র যুগ থেকে চলে আসছে, এ আপত্তি কি প্রতিক্রিয়াশীল বলে মনে হয় না? এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি সিদ্ধান্ত রণজিৎবাবুকে মনে করিয়ে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্য, য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত; বাংলা দেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা।……তাই বলি, সাহিত্যবিচারকালে বিদেশী প্রভাবের বা বিদেশী প্রকৃতির খোঁটা দিয়ে বর্ণসংকরতা বা ব্রাত্যতার তর্ক যেন তোলা না হয়।" (সাহিত্যের কথা, পৃঃ ১২৭)। নীরেনবাবুকে অপ্রমাণ করার আগে রণজিৎবাবুর উচিত রবীন্দ্রনাথকে খণ্ডন করা।

রণজিৎবাবুর ধারণা ম্যাকবেথ অনুবাদ করে নীরেনবাবু ম্যাকবেথ বধ করেছেন। আমার ধারণা নীরেনবাবুর অনুবাদকে বধ করতে গিয়ে রণজিৎবাবু নিজেকেই হাস্যাস্পদ করেছেন।

PALLI SAMAJ : A CRITIQUE

One evening, four years ago, I called on a friend of mine. I found him turning over the pages of the 'Bharatbarsha' of that month. "So you are reading 'Bharatbarsha", said I. "Yes and no", replied my friend, "for I have finished it just now". "What do you think about the contents of this issue ?" "Nothing very particular : the stories are all insipid and......" I cut him short and said contradicting, "But the first instalment of Palli Samaj is certainly not insipid." "What," said my friend in a tone of surprise, "Is Palli Samaj a novel ?" "Yes, and by Sarat Babu." "God bless me. I thought it was a stereotyped magazine-article written by some disciple of Rousseau, extolling the blessings of country-life and cursing the sins of city-life." And he added, "I did not think any novel could be written on such a theme," and without further words, he opened the book and was lost in the story.

I quote this anecdote not to criticise my friend's oversight nor to publish my own exactness. I quote this because of a

significant sentence used by my friend, "I did not think any novel could be written on such a theme." This was just what the reading public thought before the appearance of the book under review, and they were taught to think thus by their master-writers. From Bankim downwards the village-life of Bengal found no voice in our story-literature. Bankim's creations are largely human. They are instinct with a quivering poetic life, but rent asunder from the life of the soil. His Pratap is as much a Bengali as he is a Persian or a Peruvian. His Surjyamukhi or Bhramar; his Praphulla or Rajani, in none of them can we find a trace of what may be called the chracteristic life of Bengal. The acions of his novels often take place in villages of Bengal, but we need not remember this fact to read and enjoy them, and we are never reminded of it. Such characteristic things as the joint-family system or polygamy or widow re-marriage simply help him to create situations, and they have little influence on the further development of the stories. In "Anandamatha," surely, he tried to paint Bengal. But the sudden presentation of the wonderful organization of the sannyasis in a deep, pathless forest seems like a dream, a phantasmagoria conjured up by a powerful magician. As soon as we come out of the forest, the dream fades into the light of common day. The impression left upon us is the impression of such noble characters as Satyananda and Jibananda, who could be leaders of revolution in any age or country, in France as well as Russia. Exotic as his art was, the soul of Bengal could find no voice in Bankim Babu.

In Rabindranath's novels we find a change, but not in this direction. He created what is called the psychological

novel in our language. While in Bankimchandra we find lovely forms first emerging in our literature just as Urvasi emerged from the depths of the sea, we find in Rabindranath, the souls of such forms unveiled, their conflict of passions fearlessly analysed, their delicate shades of thought and evasive moods permanently recorded. He is more independent of the limits of time and place ; and well he can afford to be so for he dwells on such thoughts and passions and emotions as belong to the eternal nature of man. In "Gora," Rabi Babu attempted to create the epic novel of the age in which he tried to represent young India, with all the complex problems of life, faith and religion. But as is the case with every idealist, his creative element got the better of his critical element, and we are more interested in the fates of such human characters as Binay and Lalita than in the fates of such symboiic personages as Gora and Sucharita. The village-life of Bengal is touched incidentally and treated academically ; the feeble murmur of Bengal is lost in the louder voices of larger issues.

It may seem a wonder that two of the greatest geniuses of modern Bengal, writing in Bengali, could not give expression to the soul of Bengal. And the wonder grows less when we consider that novel writing in Bengal is not an indigenous growth. It was not born like a son in the family, it was adopted full-grown ; and it required time before the two could suit each other, before the exotic plant could be acclimatised. Besides Bankim and Rabindranath had not what Sarat Babu has, an intimate and first-hand knowledge of the life of Bengal. And so in his Palli Samaj, the life of Bengal found its first adequate representation.

In Palli Samaj, Sarat Babu states a problem which is and ought to be the first problem of every thinking brain of Bengal now. We are now eager for a forward march to take a seat in the League of Nations. But how can we march forward when the major portion of the people, "the dumb millions," is groaning under the weight of ignorance and immorality. The cleavage between the town and the village is daily deepening. The cultured community is rising one way, and the mass of people is going down the other. How can they, then, meet at a point ? What can a few scattered lamps do against a universal darkness ?

For truly our village-life is utterly dark. And here Sarat Babu astounds us by his bold realism. He does not paint it like a pastoral poet or like a man who knows the country through the windows of a railway carriage. He is no conservative idealist who thinks of our rural life as the grand panacea for all social diseases, whose idea is that "in these solitary villages, that peace and happiness can still be found which is rare in the thickly-populated towns; where the simple scanty contented villagers melt in sympathy at others' sorrow and come unbidden at happinesses to celebrate their joy; where alone can still be found what is greater than everything religion and social character." But these delightful vagaries he dispels away at the very outset. He paints the village as Truth will paint it and bards will not. Romesh, a cultured young man and almost a stranger to his native village, comes to celebrate his father's sradh ceremony. This creates a great commotion in the little world. His father has passed his life in continuous litigation with the other sharers in the zamindary, one of them being his own brother's son. So great was their

enmity that this uncle and nephew had not met each other in the course of ten years. Now that the father is gone, they conspire to humble him. In the course of a few pages, the fierce party-spirit, the merciless social tyranny, the unscrupulous hypocrisy, the astounding gluttony, the immense selfishness, the shameful vulgarity, the clever "faking up" of law suits and the outrageous vileness of the pillars of society like Beni, Govinda Ganguli, Dharmadas and Paran Haldar are all brought before us with a truthful repulsiveness. As scenes change, other aspects of our village-life are revealed to us : Madhu the shopkeeper, who is ever giving on credit and scarcely paid back, and who is astonished beyond measure at Romesh's coming himself to meet his bill : the village schoolmaster who has to sign for full pay getting only half, and who is ever ready to touch the feet of his young landlord, the total disregard of the villagers for the maintenance of the school and for sanitary conditions even when they themselves are suffering from malarial fever, and above all, the absolute insensibility and irresponsiveness to a man's love and charity. Romesh says one day in a mood of anger and despair, "When I am charitable they think me foolish ; when I do them a good turn, they discover selfishness ; to forgive them is a great sin, for they think it cowardice." As a result of his selfless love and charity, Romesh is "one housed." So great is the negative power of society that none dares defy it, not even Bhairab whom Romesh has saved by a large donation from the clutches of Beni and his crew. Yet this very Bhairab is glad to invite his oppressors to his grandson's "rice-ceremony". For had he not excluded Romesh and invited the "samajpaties," his daughter's marriage would haye been

impossible, and thus he would be what is perhaps the greatest dread of a rigid Hindu, an outcaste.

It must not be gathered form all this that our author takes a wholly unsympathetic view. It is true that in the realistic scenes there pervades an undertone of irony and satire. But he is not a foreign missionary that attacks for pleasure ; he is like a surgeon that applies the lancet only to cure. Without sympathy he could not create Bhairab's wife who comes to life in a single stroke of art, nor Dinu Bhattacharya, that simple good man who is saved by his foolishness and want of intelligence from becoming a villain. It is interesting to note with what unreserve Romesh talks with this piece of rustic stupidity, and how much he feels for this tiny spark of goodness in a land of evil. Our author takes nothing for granted. He brings his own keen insight to bear upon every question and suggests to us unforeseen points of view. He has a few good words to say even for such an obviously defective institution as our modern rigid caste system. One day Romesh condemned the system before his Jathai-ma and said, "If you could read the census-report, you would have been frightened, You would see how the Hindu are daily decreasing and the Mussalmans increasing in number." Jathai-ma smiled and said "I admit this fact, and admit further it is a defect of society. But the caste system is not its cause. No Hindu has ever forsaken Hinduism simply because he is low in caste. No one ever racks his brains in a village, as to whether a man's caste is high or low. A younger brother is not jealous of his elder and is not grieved at heart for being born a couple of years later ; it is just like this about caste in villages." Romesh argued, "Why then such social strife among

us Hindus, and such social amity among the Mussalmans ?" Jathai-ma said, "But the caste-system is not a cause of that. The true cause is that the Mussalman have still a living religion which we have lost. What may truly be called religion has vanished altogether from our villages. What remains is a bundle of superstitious conventionalities and meaningless party-spirit." "Is there any remedy then ?", asked Romesh. "Yes, there is. Remedy is in knowledge alone. You will say, perhaps, that ignorance is largely prevalent among the Mussalmans too. But their living religion has kept them alive and true in all directions...... Do not confuse, my child, the means with the end. The strife among castes that you speak of is merely a sign of progress, not its goal." Then she added, "If those who had grown up outside like you, had come back to their village, and had not gone away cutting off all connections, the condition of the villages would have been otherwise. The village-society would never have taken Gobinda Ganguli on its had, pushing you aside." These her words are well worth pondering over by every student in every town of Bengal.

The situation of Romesh first appearing before the people and trying to reform them reminds one much of Nezhdanov in Turgenev's "Virgin Soil." Nezhdanov was something of an aristocrat by birth, by instinct an aesthete and a poet, and a violent democrat and propagandist by inclination. He applied his whole heart to talking of the 'cause' and the 'question'. He was ashamed of the verses that he was compelled to write as if by some inward pressure. The aim of his life was to 'simplify himself' to go back to the people, to influence them and to lead them on to a glorious revolution. He went far

into the country, wore the people's dress and mixed with them. His first expedition may be summed up in two lines,—

It would all have been so comic
If it had not been so sad.

But the comic charm fled every day. He was irritated at their coarseness. One day, he had to drink vodka with them and came back quite drunk. Day, after day. the immediate touch of the people disgusted him. He, the visionary, the 'Hamlet of Russia', sought for a people that was ready for a revolution, ready as a ripe boil for the stroke of the lancet. But he found them not. His vision faded. His faith in the cause was dead. He asked himself, "To take up the hatchet, but with whom, against whom and for whom ? So that the national soldier may shoot you down by a national rifle, which I call a sort of complex suicide." And he ended his career by a less complex procedure by simple suicide. And in Solomin, Turgenev drew the true hero of and champion of the people. He is a factory-manager, an immensely practical man. He is of the people. He has unflinching faith in the cause. But he is not an enthusiast. He can wait. He does not want to reform Russia in a single night and by a sudden single stroke. And all see people gathering round him, slowly toiling towards their goal. Sarat Babu seems to take a not altogether different point of view. So long as Romesh was an idealist like Shelley, expecting an instantaneous remoulding of the village-society, his Shelleyan liberalism proved futile. He was so far ahead of the people that to them he was a misty illusion whom they could neither understand nor follow. But at last his idealism became alloyed with a grain of realism and his influence then became

operative. The people who could not grasp his larger ideas could understand and utilize his smaller ones. When his enthusiasm was curbed, his liberalism narrowed, when he came to a compromise with his conservative society, and thus became merged in the people, then for the first time he saw glimpses of his ideal being one day realized. This is the constructive ideal the author holds up before us to go back to the village and be its villager and not to stand aloof, to condescend and to patronise.

The message the author preaches openly, as we have seen above, through the mouth of Jathai-ma, who, as Rama says, "knows everything." Truly nothing escapes her ; Rama's secret affilication at Romesh's rigorous imprisonment may be unknown to everybody else, but it is clear to her. She is the ideal mother who can heartily forgive and bless the punisher of her own son, for she sees that her son was in the wrong. She can discern the truth in every case and is always on the side of truth. It is by her profound love and affection that she can thus see into the life of things. In this respect, she forces comparison with Anandamoyee in Rabi Babu's "Gora." I must confess here, my regard for Anandamoyee is greater. She seems to me as more humanised, and beside her Jathai-ma seems rather disembodied. For the latter always talks like a book ; she comes in at critical moments and explains the perplexities. Her predictions always come true. We are rarely allowed to see into her heart. But on one occasion she lays her heart fully bare in which we see what pangs a noble mother bears for the sake of a scoundrel son. She is leaving her home for ever to live for the rest of her life at a holy city. Romesh asks her "What offence have we committed,

Jathaima, that you are leaving us so soon ?" She put her right hand on his head and said, "To talk of offences, my child, that will not be easily ended. So let us drop it." And then added, "If I die here, Beni will do my last rituals. That will destroy my salvation for ever. This life of mine has been a continuous burning-fire ; I go, lest my other life be the same again."

In Rama we come to a character nearer to us. She is more interesting than Turgenev's Marianna. From the first sight we know her to be a "red republian" and we do not wonder much when she attains her austere grandeur and becomes a "Roman woman" indeed. But the case is otherwise with Rama. In her, we see the struggle itself. She had a keen intellect and an affectionate heart, but she was placed in a conservative society and moreover was a Hindu widow, perhaps the most conservative being on earth. Her noble heart was being wasted when Romesh came in. He knew and loved her in his boyhood. When he came back, he had a hope that Rama at least would help him in his noble cause. But he was disappointed. Rama the widow was not Rama the girl. The conservative element in her stood against him. Disappointed, Romesh too set his back against her It is impossible here, for want of space, togo through all the subtle shades of feeling they both underwent, but it is clear that in spite of all their strife they were tending towards each other. Their love episode is painted in such a subdued colour, with such an unrivalled sureness of touch that new windows seem to spring up on the bounds of human vision. Rama's heart began to flower under the sunny influence of Romesh. At last when through her unwilling instrumentality Romesh

was sent to prison on a false charge, her remorse knew no bounds. Burnt and purified by this remorse, she came to perceive the truth. She began to understand Romesh and love his ideal. For the sake of his ideal she stood up against society even at the risk of endangering her reputation as a woman. Romesh came back from the prison, heard her calumny. Rama's proud heart prevented her from disclosing the truth that it is on his account that she is being thus maltreated. But she could not remain there any longer, for she had begun to love him. This is perhaps the greatest sin that can be committed by a Hindu widow. She prepared to leave her home and follow Jathai-ma. Just before they took their last farewell, Romesh came to know the truth about Rama and her love for him from Jathai-ma. But before he could be glad of it, sadness came on him. Rama was going away for ever. And our eyes too become heavy with tears. It seems to us that by God above these two beings were meant for each other, and what tragedy can be more tragic than this in which two such noble souls came to touch each other but could not unite ?

So long we were dealing with the matter of the book. But the manner in which it is written is no less masterly. Events succeed events in a natural course, but the intercst never flags. This is due, most of all, to the charming style in which the book is written. It is perhaps the model style for story-writing. It is free from the verbal bombast of Bankimchandra, and equally free from the mental bombast of Rabindranath. There is no trace of strain or effort in it. Words fly like light breeze, sentences gather like falling snow. Yet this simple style lends itself to how many different moods. It is equally

suited to common conversation, spirited dialogue, vulgar quarrel, sublime expression of love, pathetic appeal to the heart and profound observation and reflection of life. In all its many excellences, the book is like Dutch-wrought diamond of many facets, valued equally for its substance and artistry, that will live far into the future with untarnished brilliance.

PROF. M. GHOSE

(An impression)

Four hours after midnight. Not the least sound anywhere. On a bed shaded off from the glass of electric lights lay an old blind man, apparently sleeping, only now and then rolling his head from side to side, as one may do in a dream. But, in a corner; a huge oxygen cylinder stood like a grim refutation of the peacefulness of the scene. Its presence cast a sinister shadow on the young faces eagerly watching the least movements of the bed-ridden invalid. He was weak, emaciated, reduced literally to skin and bone condition : his breathing was difficult and irregular : the extremities of his body were getting cold and stiff : and then in a fit of cough had vomitted blood. Everyone, in that quiet little room, held his breath in anxious suspense, but still hopefully waited for the arrival of the doctor. Two young ladies sat there, immovable as carved marble, insensible to everything else : their whole being was

concentrated in their eyes, and their eyes were fixed upon their father. They were not weeping, but a vast ocean of tears could be felt swelling in them, ready to break all bounds and overflood the world. A young man was feeling the pulse, another was engaged in adjusting the oxygen tube to the different positions of head. On the faces of these two friends clouds seemed to have gathered and settled. They felt the end was near. All on a sudden, simultaneously, they raised their heads and looked at each other. They suspected all was over. But unwilling to shock the daughters, they remained as they were, one holding the hand, and the other the tube. Minutes seemed to linger in that room with exasperating persistence—as if old Father Time, tired of his ceaseless race, had dropt down exhausted in the middle of his career. The doctor at last came, only to confirm the terrible truth—M. Ghose, professor and poet, was no more.

Such was the quiet and unobtrusive end of one of the most remarkable but least noticed of the sons of India. When the cultural history of modern India comes to be written his name will undoubtedly occupy an honoured place in it. He was not a man to start great movements and stamp them with his personality. Engaged though he was throughout his life in the service of education, he did not make great reforms and improvements to be gratefully and lovingly remembered by his countrymen. He had not produced poems which many of his countrymen would be able to understand, appreciate and enjoy. But he had set an example of undivided devotion to the muses which Young India can ill-afford to ignore or forget. In that near future when the individual political problem of India will be solved, and she will take upon

herself her age-old task of spiritual regeneration of humanity, the holy life of this lonely hermit, hidden in the light of thought, and adoring Beauty with the intensity of a first love and the constancy of a maturer affection, will shine with the glory of the morning sun out of the darkness of night.

There are two ways in which the present discord between the great sections of humanity can be replaced by a harmony. One way is to open the rich treasure-house of Eastern wisdom before the wondering gaze of the West, this is the mission of Rabindra Nath Tagore. The other is to bring the West to the East—not the west of economic exploitation and diplomatic dodges with which we are only too familiar—but the true west, represented by Sophocles and Shakespeare, Pheidias and Michael Angelo, Raphael and Velasquez, Bethoven and Mozart. It was in the atmosphere of this Europe that Professor Ghose lived, moved and had his being. Wherever he went, he carried the literary lip of Oxford along with him. When he came to India, a regular correspondence began between him and his most intimate friend, Laurence Binyon, the famous poet and art-critic. This correspondence, if ever published, will reveal the interesting fact that to these two friends politics were a thing non-existent. In their letters; they wrote of nothing but new ventures in literature, new experiments in metre and verse, Italian frescoes, Chinese landscapes, art-collections and dramatic representations—in short, poetry and painting of different lands and ages.

This vast and varied world of European culture lay spread out before his mental vision, when Professor Ghose discoursed on poetry to his students in Calcutta. That is why they got something in his lectures which was not to be found elsewhere.

English poetry he knew, not through the laborious process of memorising annotations. A poet and classical scholar at the same time, he had direct access to the heart of things ; so, in his classes, poetry did not remain a mere academic affair ; it became a living reality. None could recite more beautifully than he, and he revealed to his students the music of the English tongue. Even ordinary words such as star, flower, rose became redolent with association and vibrating with life, in the lingering, almost caressing way in which he uttered them. He could make a practical demonstration of rich qualities of English language. His extempore dissertations were as enjoyable, from the standpoint of style, as any of Walter Pater or Oscar Wilde. But his eyes, even more than this voice, impressed his students—those dark intricate eyes, orb within orb, which were the external symbols of the depth of his soul. When in the course of chiselling and refining his phrases he halted in his speech, his students did not feel it, for his eyes

filled with light
the interval of sound
and held them bound by a charm as it were.

That matchless voice will sound no more. Those wonderful eyes are shut for ever. The chance of artistic Europe ever coming so near India recedes into dim distance. For is it not almost an impossibility to hope that an Indian boy of the mental calibre of Professor Ghose will have the best of European culture, and coming back will devote his life to the cause of education in India and thus transplant the culture of Europe to the heart of India ?

In another sphere of activity, the life long labour of Prof. Ghose has resulted in a unique service to his motherland. An

Indian, he has written, in English, lyrical poems and epic and dramatic fragments. It is an irreparable loss to England as weli as to India, that he did not live to complete his works. However, what he has left behind is enough to secure for him a place among the immortals of English verses. His writings, it can be confidently prophesied, will not be received in England as a sort of curio. Any English poet might have felt proud to have been the author of poems like his. Of course, he will never become a popular poet. His muse was much too aristocratic for that. Like Spenser he will ever remain "a poet's poet." Mark Pattison's remark on Milton's poetry can well be applied to his—appreciation of his poetry is the last result of consummate scholarship. His lyrical pieces will surely gain their way into the world, but adequate recognition can never be won by his more ambitions attempts, because of their fragmentary character. Indians will specially lament the incompleteness of his drama, **Nala and Damayanti**, probably his only work on an Indian theme—in which there are some scenes written in blank verse of admirable grace and ease of movement. If it were completed, this book might have been, like **Gitanjali** and **Cygne** (French translation of Rabindranath's **Balaka**) another golden arch bridging the intellectual gulf between the East and the West.

His life was like what he loved most, a Greek tragedy,—this is the impression left upon one who knew him. He had to suffer strange anomalies in life; for what Destiny gave him with one hand, she took away with the other. Born in Bengal, he was separated from his parents and brought up from his boyhood in an English family. Educated in London and Oxford; he had to leave England for good when he was

only twenty-six, and thereafter lived an almost isolated life in India. He married a lady of singular beauty and largeness of heart. But ere long she became a confirmed invalid, and the young poet had to throw down his pen to nurse his wife with womanly care. When she left him behind and passed away, he himself became an invalid with only two daughters of tender age to look after him. He had an extremely sensitive constitution but it had to undergo the bitterest sufferings that an ailing physique could inflict. The supreme delight of his life was to read, to compose, to enjoy the masterpieces of art and the beauties of Nature—and his eye-sight left him. He began works he could not finish, he conceived subjects he failed to fashion. When at last he made all necessary arrangements to settle in England once more and pursue his literary activities in the familiar surroundings of his youth, death intervened.

Can anything be more tragic ? Was there ever fate more arbitrary and whimsical ? Yet his poems are a continuous paean of praise to the glory of the Lord. And this faith it was, that haloed his face with such an angelic light even when the spark of life had fled and lifeless body was waiting to return once more to the elements from which it came.

“ভারতীয় স্বাপ্নিক”

ইন্‌ডিইস্কিই মেচ-টাচেল ঃ যে শ্‌ত্যেন বের্গ। মস্কো, ১৯৫৬

বইখানি, গ্রন্থকারের ভাষায়, ঐতিহাসিক উপন্যাস। বছর চারেক আগে প্রকাশিত হইলেও সম্প্রতি এদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আক্ষরিক অনুবাদে বইটির বাংলা নাম হওয়া উচিত “ভারতীয় স্বাপ্নিক”। কিন্তু যে স্বপ্নপরায়ণের ঐতিহাসিক কাহিনী এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু তিনি জাতিতে ভারতীয় নন, রুশীয়। তবে ইহা সত্য যে, ভারতই ছিল তাঁহার স্বপ্নের দেশ। ইহার পরে আজ আর বাঙ্গালী পাঠককে বলিয়া দিতে হয় না, কে এই রুশদেশীয় “ভারতের স্বাপ্নিক”। এখন শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিশেষতঃ নাট্যমঞ্চের অনুরাগী মাত্রের অন্তরে গেরাসিম লেবেদেফ-এর নাম চিরতরে মুদ্রিত হইয়া গেছে।

প্রকৃত পক্ষে এ মুদ্রণকে বলা যায় পুনর্মুদ্রণ। বাংলা রঙ্গমঞ্চের তথ্য নাটক রচনার ইতিহাসে লেবেদেফ-এর নামকে পাশ কাটাইয়া যাইবার উপায় নাই। কিন্তু বহুকাল ধরিয়া তিনি আমাদের মধ্যে নাম মাত্রেই পর্যবসিত ছিলেন। ইংরেজ লেখকদের মতের অনুসরণে তাঁহাকে ভাবা হইত ভাগ্যান্বেষী—এ্যাডভেনচারার—যিনি ধূমকেতুর মতো কলিকাতার আকাশে দিনকতক প্রভা-বিস্তার করিয়া চিরকালের মতো অদৃশ্য হইয়া গেছেন। ভারত হইতে বিদায় লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া তাঁহার জীবনযাত্রার ধারা কি ছিল সে সম্বন্ধে আমাদের দেশে ধারণা ছিল অস্পষ্ট। আর রুশ দেশের সামাজিক ইতিহাসের কোন স্তরে, কোন সাংস্কৃতিক আবেগের তাড়নায়, লেবেদেফ কলিকাতায় আসিয়া বাংলা

রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন, সে সম্বন্ধে অস্পষ্টতম ধারণাও আমাদের ছিল না। ইহা স্বীকার করিতে লজ্জিত হইলেও কুণ্ঠিত হওয়া চলে না। ইহাও বলা দরকার যে, বর্তমানে কুণ্ঠার কারণ অনেকটা অপসারিত হইয়াছে। সানন্দে বলা যায় যে, আমাদের মধ্যে লেবেদেফ সম্বন্ধে জীবন্ত আগ্রহের সঞ্চার হয় গত বৎসর ১৯৫৯ সালের ২৭শে নভেম্বর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে "লেবেদেফ দিবসের" প্রতিপালনে। এই আয়োজনের কৃতিত্ব মূলতঃ লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রাপ্য। পুরানো ঐতিহ্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা অগ্রণী না হইলে এই উপলক্ষে যে সকল প্রবন্ধ রচিত ও ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল তাঁহাদের প্রকাশের কারণ আরো কতকালে দেখা দিত কে জানে।

রুশ দেশেও লেবেদেফ-এর পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা যে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র দিবসে অনুষ্ঠিত নাটকটি দিয়া সুরু হয় নাই—বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। নাটক না হইয়া উপন্যাস হওয়ায় ইহার চিত্রপট বিস্তৃততর। ২৬৯ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি তিন পর্বে ভাগ করা। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের "রডানি" জাহাজে গেরাসিম লেবেদেফ-এর মাদ্রাজে অবতরণ দিয়া গ্রন্থারম্ভ হইলেও, এই পর্বে পাওয়া যায় গেরাসিম-এর জীবনের পূর্ব ইতিহাস। এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে রুশ দেশের তখনকার পারিবারিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি। ইয়ারসলাভল্ শহরের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তানের শিশুকাল হইতেই ছিল সংগীতে পারদর্শিতা ও জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা। পরে বড় হইয়া সংগীত নৈপুণ্যের আনুকূল্যে এই শিশু ইউরোপে সংস্কৃতিবিদ মহলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মাদ্রাজে আসিয়া লেবেদেফ ভারতীয় গায়ক গায়িকার সহযোগে নিজের অর্কেষ্ট্রা দল গড়িয়া তোলেন, যাহার খ্যাতি তখনকার ইউরোপীয় মহলে ছড়াইয়া পড়ে। শ্বেতচর্মের অপরাধে তিনি টিপুসুলতানের বিরাগভাজন হইয়া মহীশূরে বন্দী থাকেন। কিন্তু লেবেদেফ যে জাতিতে ইংরেজও নন, ফরাসীও নন, জানিতে পারিয়া টিপু পরে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া লেবেদেফকে মুক্তি দেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে লেবেদেফ চলিয়া আসেন কলিকাতায়। গ্রন্থটির দ্বিতীয় পর্বের সুরু এইখানেই।

লেবেদেফ কলিকাতায় ছিলেন প্রায় দশ বৎসর—১৭৮৭ হইতে ১৭৯৭। এইখানে একদিকে তিনি ইউরোপীয় সমাজে ঘনিষ্ঠ হন, অন্যদিকে গোলোক নাথ দাসের সহায়তায় তিনি ভারতীয় প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। রুশ গ্রন্থকার এই পর্বে তখনকার কলিকাতার দেশী ও

বিদেশী সমাজের চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস বাদ দেন নাই। বহুল চরিত্রের ও জটিল ঘটনাপ্রবাহের সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি। একান্নবর্তী পরিবার, বহুবিবাহ, সতীদাহ, জমিদারী প্রথার বর্ণনা ত আছেই, আর আছে ভারতীয়দের সহিত ইংরেজদের ব্যবহারের প্রতি কটাক্ষ। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, সদ্য প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির সভায় স্যর উইলিয়ম জোনস-এর সহিত লেবেদেফের তর্কবিতর্ক, শকুন্তলার অনুবাদের মূলানুগামিতা লইয়া।

তৃতীয় পর্বের প্রধান ঘটনা—ডোমতলায় প্রথম বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রবর্তন, তাহার আশাতীত সাফল্য ও সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মূলোৎপাটন। এই ইতিহাস এখন আমাদের দেশে অনেকটা জানা। লেবেদেফের সাফল্যে হইল ইংরেজদের গাত্রদাহ। নানা চক্রান্তের পরে তাহারা লেবেদেফ-কে সর্বস্বান্ত না করিয়া ছাড়িল না। বিফল মনোরথ লেবেদেফ লণ্ডন হইয়া ফিরিয়া গেলেন পিটার্সবুর্গে, ১৮০১ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে। বহুদূরে চলিয়া গেলেও তিনি যে ভারতকে, বিশেষ করিয়া ভারতের জ্ঞানকেন্দ্র কলিকাতাকে ভুলিতে পারেন নাই, তাহার একটি সুরম্য কাহিনী গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন পরিশিষ্টে। লেনিনগ্রাদের এক পুরনো বইয়ের দোকানে হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল, ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের "এশিয়াটিক অ্যানুয়েলের রেজিস্টার", যাহা লণ্ডন হইতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে স্বল্প সংখক স্বাক্ষরকারী গ্রাহকের জন্য মুদ্রিত হইয়াছিল। "এ বই রুশদেশ কি ভাবে আসিল, কে ইহার প্রথম স্বত্বাধিকারী?" এই প্রশ্ন জাগিল গ্রন্থকারের মনে। বইটিতে কাহারো নামোল্লেখ ছিল না, কিন্তু ছিল মাঝে মাঝে রুশভাষায় মন্তব্য। তিনি যেই হোন, ভারতীয় ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহের যে সীমা ছিল না, তাহা সুস্পষ্ট। হঠাৎ এক পৃষ্ঠায় রহস্যের সমাধান হইল, পাওয়া গেল স্বত্বাধিকারীর সন্ধান। রেজিস্টারে জন হাইড-এর মৃত্যুতে শোক প্রকাশের সংবাদ ছিল। তাহার পাশের মার্জিনে একই হাতের লেখায় রুশ ভাষায় লিখিত ছিল ঃ—'জন হাইড প্রকৃতপক্ষে ন্যায়-নিষ্ঠ বিচারক ও মানবদরদী ছিলেন। এ সত্য আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি। গেরাসিম লেবেদেফ।' এই আবিষ্কার বর্তমান গ্রন্থ রচনার মূল প্রেরণা।

একথা বোধ হয় না বলিলেও চলে যে গ্রন্থকারের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার পথ ছিল বিপদসংকুল। বাংলাদেশ বা ভারতকে তিনি কখনও চোখে দেখেন নাই। এ দেশীয় কোন ভাষা জানিলেও তাহার জ্ঞান স্বভাবতঃই সীমাবদ্ধ।

কালানুক্রমের অনেক অসংগতি তিনি এড়াইতে পারেন নাই। গোলকনাথ দাসকে তিনি বলিয়াছেন সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। 'দাস' উপাধি কোন বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবারে থাকিতে পারে কিনা, খুবই সন্দেহের বিষয়। কিন্তু বাঙালী গবেষকেরাও আজ পর্যন্ত গোলকনাথ সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সে যুগে গোলকনাথ যতবড় "হেরেটিক" হোন না কেন, তাঁহার স্ত্রীর সহিত যে সৌহার্দ্যের চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহা মনে হয় না যুগোপযোগী। রামমোহন রায় সম্বন্ধে সগ্রন্থ উল্লেখ আছে বহুবার। কিন্তু যে পর্বের কথা গ্রন্থে বিবৃত তাহাতে রামমোহন অন্বেষু মাত্র, প্রখ্যাত নন। আর দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম ত ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং তাঁহার প্রাসাদে "শকুন্তলা"র অভিনয়ে দর্শক হিসাবে লেবেদেফ-এর উপস্থিত থাকা অবাধ অনৈতিহাসিক জল্পনার নির্দশন। খুঁটাইয়া পড়িলে এইরূপ আরো কিছু বিভ্রান্তি এই গ্রন্থে খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু ত্রুটির দণ্ড দিয়াই কি এই গ্রন্থকারের প্রতি আমাদের ন্যায়বিচার সম্পূর্ণ হইবে। তাঁহার মহৎ অনুপ্রেরণা ও প্রবল অনুসন্ধিৎসার জন্য কি তিনি বাঙালী পাঠকের নিকট সমাদর ও কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করিতে পারেন না?

নীরেন্দ্রনাথ রায় : জীবনপঞ্জী

জন্ম :	২৫ শে বৈশাখ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ ৮ মে ১৮৯৬। খুলনা। পূর্ব-পুরুষ যশোহরের অধিবাসী। পৈতৃক নিবাস : পাঁড়ো গ্রাম, বাদুড়িয়া, ২৪ পরগণা।
পিতা-মাতা :	যাদবচন্দ্র রায় ; নিস্তারিণী দেবী।
জ্যেষ্ঠা ভগ্নী :	আশালতা দেবী।
ছাত্রজীবন :	দর্জিপাড়ার যদু পণ্ডিতের বাংলা স্কুল ; হিন্দু স্কুল ; প্রেসিডেন্সি কলেজ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ম্যাট্রিক ১৯১৩, বি. এ. (ইংরেজি অনার্স) ১৯১৭, এম. এ. (ইংরেজি) ১৯১৯, বি. এল্. ১৯২১।
সতীর্থ : স্কুল-পর্বে—	সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও গিরিজাপতি ভট্টাচার্য (উভয়ে উঁচু ক্লাশে পড়তেন), রাধারমণ মিত্র, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, প্রভাসচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ।
সতীর্থ : কলেজে—	সুভাষচন্দ্র বসু, দিলীপ কুমার রায়, ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।
অধ্যাপনা :	স্কটিশচার্চ কলেজে নিযুক্ত হয়েও যোগদান করতে অস্বীকার, যেহেতু কোট-প্যাণ্ট পরিধান আবশ্যিক। বঙ্গবাসী কলেজে ১৯২০-১৯৫৬ কাল-পর্বে অধ্যাপনা।
পণ্ডিচেরী-বাস :	১৯২৮-৩১ কালপর্বে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে অবস্থান।
পত্রিকা-সম্পাদনায় সহযোগিতা :	'পরিচয়' পত্রিকা প্রতিষ্ঠা শ্রাবণ ১৩৩৮। সম্পাদক সুধীন্দ্র নাথ দত্ত। 'পরিচয়'-গোষ্ঠীতে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, সুশোভন সরকার, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, হামফ্রে হাউস, চারুচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ; ১৯৪৬ সালে 'পরিচয়' (নবপর্যায়) পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংগে যোগ ঃ	জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা' ; সুকুমার রায়, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, জীবনময় রায়ের সংগে 'ফ্রেটানিটি ক্লাব' ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর ও ফ্যাসিস্ট জার্মানী কর্তৃক রুশিয়া আক্রান্ত হলে (১৯৪১, ২২শে জুন) সোভিয়েত সুহৃৎ সমিতি, ফ্যাসীবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, 'পিপলস্ রিলিফ কমিটি' প্রভৃতি।
শিক্ষক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ ঃ	পশ্চিমবংগ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-সমিতি, পশ্চিমবংগ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি।
বামপন্থী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ ঃ	১৯৪৩ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যপদ গ্রহণ ; ১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হলে তাঁর উপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি ; কিছু কালের জন্য আত্মগোপন।
বংগীয় বিজ্ঞান পরিষদ ঃ	১৯৫০ সাল থেকে যুক্ত। জীবনের সমগ্র সঞ্চয় চল্লিশ হাজার টাকা বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চার জন্য দান।
বংগীয় শেকস্পীয়র পরিষদ ঃ	১৯৫১ সালে বাংলা ভাষায় শেকস্পীয়র চর্চার জন্য এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন ও 'ম্যাকবেথের' বংগানুবাদ প্রকাশ করেন।
সোভিয়েত রুশিয়ায় যাত্রা ও অবস্থান ঃ	প্রথম বার ১৯৫৭-৫৮ ; দ্বিতীয় বার ১৯৬২-৬৩ ; রুশ-ভাষা শিক্ষা ও রুশ ভাষায় 'উনিশ ও বিশ শতকের বাংলা কবিতা'—আলোচনাগ্রন্থ প্রকাশ। এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য ১৯৫৮ সালে 'ইণ্ডো-সোভিয়েত কালচারাল সোসাইটি'র পশ্চিমবংগ শাখার সাধারণ সম্পাদক পদ গ্রহণ ও রুশ ভাষা শিক্ষাদান ; 'রুষভারতী' সম্পাদনা।
ইনস্টিট্যুট অব রাশিয়ান স্টাডিস ঃ	১৯৬৬ সালে জুন মাসে নয়া দিল্লীতে এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক রূপে যোগদান।
জীবনাবসান ঃ	১৯৬৬ সালে ৩০শে অক্টোবর সত্তর বৎসর বয়সে মর্ত্যবন্ধন ছিন্ন। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

* নীরেন্দ্রনাথ রায় বিশেষ সংখ্যা—"পরিচয়"—কার্তিক ও মাঘ, ১৩৭৩ থেকে সংগৃহীত।

সংকলন বহির্ভূত নীরেন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত :	'ম্যাকবেথ' (১৯৫৭); দাবী (উপন্যাস); Shakespeare: his audience and his readers (১৯৬৫); বেলুগিনের বিবাহ (রুশভাষা হইতে অনুবাদ)।
গল্প :	তিনরাত্রি (ধীরাজ কুমার হালদার এই ছদ্মনামে লেখা); বিভাবরী; অকৃতজ্ঞ; "নাই বা হোল চৌরিফুল" (অনুবাদ)।
কবিতা :	মায়াবিনী, আবির্ভাব, ভ্রমণ, অন্তিম নির্দেশ (শেভচেংকো), শিকারী পাখীর গান (ম্যাক্সিম গোর্কী), ঝিল্লী সুর, টিনা, দ্বন্দ্ব, চারটি সনেট, কবিতা-গুচ্ছ (অনুবাদ)।

প্রবন্ধ নির্দেশিকা

এই গ্রন্থে যে প্রবন্ধ, সমালোচনা-প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনাদি সংকলিত হয়েছে সেগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য কোথায়, কখন এগুলি প্রকাশিত হয়েছিল তার বিবরণ দেওয়া হল ঃ

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বকবিত্ব	পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৬২
মেঘনাদবধ কাব্যে সমাজ বাস্তবতা	পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৬০
মার্কসবাদী বঙ্কিমবিচার	পরিচয়, মাঘ, ১৩৫৮
মার্কসবাদী বঙ্কিমবিচার প্রসঙ্গে	পরিচয়, চৈত্র, ১৩৫৮
সাহিত্য বিচারে মার্কসবাদ	পরিচয়, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ১৩৫৫
বাংলা প্রগতি সাহিত্যের পটভূমিকা	পরিচয়, চৈত্র, ১৩৫৬
কবিতায় বক্তব্য	পরিচয়, শারদীয়া, ১৩৫৩
পরিচয়ের ভূমিকা	পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৮
শেলির কবিতার অনুবাদ	পরিচয়, কার্তিক, ১৩৩৮
শেকস্‌পীয়র প্রসঙ্গে	পরিচয়, চৈত্র-বৈশাখ, ১৩৫৭-৫৮
বাঙালীর শেকস্‌পীয়র প্রেম	পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৭১ ; March of India, April-May 1952 হইতে অনূদিত
সাম্প্রতিক বিচারে শেকস্‌পীয়র	পরিচয়, ফাল্গুন, ১৩৫২
'ম্যাকবেথে'র ভূমিকা	মডার্ন বুক এজেন্সী, জুন, ১৯৫৭
'The Essential Shakespeare'	পরিচয়, ২য় বর্ষ, ১৩৩৯
পুশকিন স্মরণে	রুষভারতী, ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৬২
সাহিত্যতাত্ত্বিক বেলিনস্কি	রুষভারতী, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৬১
লেয়ফ তলস্তোই-এর সাহিত্যসাধনা	পরিচয়, ফাল্গুন, ১৩৬৭
গোর্কি স্মরণে	রুষভারতী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৬১
লুনাচারস্কির নন্দনতত্ত্ব	পরিচয়, কার্তিক, ১৩৭৩

বাংলায় হার্ডার ও গ্যেটে	পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৫৪
রোম্যাঁ রোলাঁ	পরিচয়, মাঘ, ১৩৫১
ইয়েটস্‌-এর কবিতা	মূল্যায়ন, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪ ; Visvabharati Quarterly (1964-65) হইতে অনূদিত
রবীন্দ্রনাথ ও নন্দনতত্ত্ব	পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৬৮
বাংলা ইংরাজী ও সংস্কৃত	পরিচয়, কার্তিক, ১৩৩৮
স্বাধীন বাংলা ও বিদেশী সংস্কৃতি	পরিচয়, আশ্বিন, ১৩৫৪
শিক্ষা ব্যবস্থায় ভাষা সমস্যা	পরিচয়, আষাঢ়, ১৩৬১
দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ	পরিচয়, পৌষ, ১৩৪৯
বিজ্ঞানাচার্যের হৃদয়বত্তা	আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ (১৯৬৪) ; পরিচয়, পৌষ, ১৩৭০ পুনর্মুদ্রিত
আটুই মে	পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২
স্পেনে গৃহযুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি	পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৫৩

সমালোচনা-প্রবন্ধ

শেষ প্রশ্ন	পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৮
অপরাজিত	পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৩৯
জাগরী	পরিচয়, ফাল্গুন, ১৩৫৩
কামধেনু, গণনায়ক, ছোটবড়	পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৫৬
Just Love	পরিচয়, ফাল্গুন, ১৩৫২
তমসার শেষে, রামধনু, সোভিয়েটের গল্প সংগ্রহ	পরিচয়, কার্তিক, ১৩৫১
মানময়ী গার্লস স্কুল, শুভযাত্রা	পরিচয়, শ্রাবণ, ১৩৪০
সপ্তপর্ণ	পরিচয়, আষাঢ়, ১৩৪৫
Three Men In New Suits ; Bright Day.	পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩

সে নহি, সে নহি	পরিচয়, চৈত্র, ১৩৬৯
Lucretius, De Rerum Natura	পরিচয়, চৈত্র, ১৩৪৪
Karl Marx in his Earlier Writings	পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯

পরিশিষ্ট

'বাংলায় ম্যাকবেথ'—ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ	পরিচয়, অগ্রহায়ণ, ১৩৬১
Palli Samaj : A Critique	Presidency College Magazine, March, 1919
Prof. M. Ghose : An impression	Presidency College Magazine, March, 1924
ভারতীয় দার্শনিক	দৈনিক স্বাধীনতা, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৬০

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	১	লওয়াও	লইয়াও
১০	৫	রোমাটিক	রোমান্টিক
১০	১৯	hed	had
১৬	১	ব্যাথায়	ব্যথায়
২৪	১০	তার	ভার
২৪	২৬	গীতাঞ্জলী	গীতাঞ্জলি
২৮	৩	ঝঙ্কার মুখা	ঝংকার মুখরা
৩৩	১৪	dose	does
৪৪	৮	যেন জনগণ	বেন জনসন
৪৯	২	আরিষ্টোটল	আরিস্টোটল
৫৬	৪	সার্থক চিত্ত	সার্থক চিত্র
৬৪	২০	রামনোহন	রামমোহন
৬৪	২৫	বঙ্কেমচন্দ্র	বঙ্কিমচন্দ্র
৮৭	১৯	তুলিতেন	তুলিবেন
৮৯	২২	melling	smelling
৯৪	১৬	নীতন	নূতন
১২৩	শেষ পঙ্‌ক্তি	প্রকাশক	প্রথম সংস্করণের প্রকাশক
১৩৩	৩	অবসাদে	অবসানে
১৩৯	১৫	নমাজের	সমাজের
১৪১	১	রাজণারায়নের	রাজনারায়ণের
১৪৭	৫	কক্ষায়	কক্ষে
১৪৭	২৮	শ্রাবন	শ্রাবণ
১৫১	১০	রেখেছে	রেখেছ
১৫৭	১	Profaned	profaned
১৫৭	৭	হেলিত	অবহেলিত

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৫৮	৫	তরকার	তারকার
১৫৮	২৩	সয়েছে	সয়েছ
১৬৪	৩০	জর্জও	জর্জ
১৭০	২৪	মেজসের	জেমসের
২০৭	১৭	মানবচরিচ	মানবচরিত্র
২১০	৩০	রাজাব	রাজার
২১২	৯	bench	the bench
২১২	১৩	villany	villainy
২২০	২৬	ট্রাটফোর্ড	স্ট্রাট্‌ফোর্ড
২২৭	৪	উধর্মুখ	ঊর্ধ্বমুখ
২৩৫	২৮	অমনোযোগ	সমনোযোগ
২৩৬	১৭	না	নাই
২৩৭	৫	কিছুই	কিছু
২৩৮	২	আগে	আসে
২৪০	৪	এম্‌পিরিয়োক্রিটিনিজম	এম্‌পিরিয়োক্রিটিসিজম
২৫৯	১৬	গোর্কিং	গোর্কি।
২৭১	১৬	টেলার্স	লেটার্স
২৭৫	৩০	আস্পহাকে	আস্পৃহাকে
২৮৫	২৮	অত্যাধিক	অত্যধিক
২৮৭	৭	উদ্যোগে	উদ্‌যোগে
২৯০	৪		I have been a king
২৯০	২০	blacke..ded	blackened
২৯১	২৩	tressis	tresses
২৯১	২৫	amerosial	ambrosial
২৯৬	৩	The	That
২৯৬	২৮	ran	rann
২৯৬	৩০	cast	I cast
২৯৮	১	roadway	railway
২৯৯	২৯	Abby Theatre	Abbey Theatre

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৯৯	৩০	J. M. Synge-এ	J. M. Synge-এর
৩০০	১৭	warn	worn
ঐ	১৮	drave-groy	dove-gray
ঐ	১৯	wits	with
ঐ	১৯	harn	horn
ঐ	২১	with	white
ঐ	২৫	sihea	silver
ঐ	২৬	lark	dark
৩০২	৭	Althongh	Although
৩০২	২২	wrought	wrought it
৩০৩	৮	১৯৪১	১৯১৪
৩০৩	২৭	drem ond	dream and
৩০৫	২৫	Reel	Red
৩০৮	২৪	Tomas Aquinus	Thomas Aquinas
৩১১	৩০	কাহাকে	কাহারে
৩১২	১৭	পড়িল কক্ষে	পড়িল বক্ষে
৩২৪	৩	কাঁদবে	কাঁপবে
৩২৪	৪	পর্যঙ্ক	পর্যংক
৩২৮	৫	পরিচারিলত	পরিচালিত
৩২৯	৩	কালিসিংহের	কালীসিংহের
৩৩১	৫	whaever	whoever
৩৩৫	৮	কশৌপ্রসাদ	কাশীপ্রসাদ
৩৩৫	১৮	daisics	daisies
৩৪৫	১০	বোধশক্তি	বোধশক্তি বৃদ্ধি
৩৪৫	১২	তাহা	তাহা হইলে
৩৪৬	২০	ভাবে	ভারে
৩৫০	১২	খণ্ডশঃ	খণ্ডতঃ
৩৫১	৫	বিশেষেয়	বিশেষের
৩৫২	২১	মানে	মাপে

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫৮	২	গড়িয়া উঠিয়া	গড়িয়া
৩৬০	৩	পুচ্ছধারিতের	পুচ্ছধারিত্বের
৩৬৩	২০	এক	এই
৩৬৪	১৬	নিতে	নিত
৩৬৫	২	ভবভুতি. ভারতী	ভবভূতি, ভারবী
৩৬৬	২৫	বলিরা	বলিয়া
৩৭১	১১	চাপিয়া	চাপিয়া যাইতে
৩৭৩	২	ডালো	ভালো
৩৭৭	১৩	সোভিরেট	সোভিয়েট
৩৮৩	১০	দ্বন্ধ	দ্বন্দ্ব
৩৯২	১৩	দলালিই	দালালিই
৩৯৬	৯	বিভুতিবাবু	বিভূতিবাবু
৪০৮	২	বন্দোপাধ্যায়	বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৮৪	১২	রিলেটিড	রিলেটিভ
৪৮৬	১২	acions	actions
৪৯১	১৮	had	head
৪৯২	১৮	of and	and
৪৯৪	৯	republian	republican